# হিন্দু-পত্রিকা।

## ১৩০৯ সালের সূচীপত্র।

on the Bible and Biblical Subjects, Religious Sects and Doctrines Household Matters, Education Music, Games, &c.

You pay a few Rupees down; and receive the Volumes at once. No waiting!

## READ WHAT THE PRESS SAYS

The TIMES says:

"The *Modern Cyclopedia* is portable and compact. It keeps pace with the rapid progress of the age, and observes a due proportion in dealing with the different subjects."

St. JAMES'S GAZETTE says:

"An exceedingly useful work of reference. It is modern in the sense that its information is carefully brought up to date. The facts given, so far as we have tested them, are wonderfully accurate."

SCIENCE AND ART says:

"This amazingly cheap and handy volune of reference reflects the greatest credit upon all concerned in its production. It should find a place in the homes of rich and poor alike."

The PRACTICAL TEACHER says:

"Again and again have we been asked for a compact handy reliable cyclopedia at a reasonable price. Here is the very thing."

NATURE says:

"The articles are short but clear, Especial attention has been given to matters which are of living interest in our own day, and we are glad to see that many scientific articles haue been written or revised by specialists."

The BRITISH WEEKLY says:

"It is cheap, unambitious, practical, full, and, so far as we have tested it, accurate. The illustrations are plentiful and generally useful."

The SATURDAA REVIEW says;

"Some handy form of cyclopedia has long wanted. This is comprehensive without being bulky. The information is succinctly given sufficiently copious and strictly relevant."

The SPECTATOR says:

"The articles are distinguished by accuracy not less than by

succinctness. We have been particularly struck with the scientific geographical, and legal articles."

The SCHOOL GUARDIAN says:

"For the teacher a work of this kind is almost indispensable, and we know of no other that combines in so high a degree the qualities of conciseness, comprehensiveness, and cheapness."

UP-TO-DATE, CONCISE, RELIABLE.

## ORDER FORM.

*To The GRESHAM PUBLISHING Company, 49. Fort St, Bombay.*

PLEASE supply me with one copy of THE MODERN CYCLOPEDIA in eight volumes, latest edition, on account of which I send you the initial payment herewith of Rs. 5 - and agree to pay the same amount per month for seven more months to whomsoever you may depute. I undertake not to part with the work until paid for.

Signature......................................................

Rank or Profession ........................................

Address.........................................................

Date........................1902.

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO

THE GRESHAM PUBLISHING COMPANA

49, Fort St. BOMBAY.

---

"আমিত্বের প্রসার'১— ১মখণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিষদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজি ১৩০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ৸০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্য্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অনুকূল এই গ্রন্থে তাহা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে!

যশোহর হিন্দুপত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

The work (আমিত্বের প্রসার) states that amitva, egoism or selflove is the root of all evil in this world and hence its annihilation is taught in the Sastras as the means of attaining summum bonum. Now this annihilation can be effected not only by foregoing all love of self, but also by extending it indefinitely to nonself, or in otherwords not by not loving self, but by loving others like self. And all pre eminently Hindu institutions like the the five sacrifices, the four asramas and the four

castes have all been fromed with a view to attaining this very object and lead, when the duties and injunctions relating there to are obeyed in practice to more or less liberalisation of a person's sympathies and the increase of love for other. Let all Hindus, therefore remember this cardinal teaching of the sastras and carry it out in life by consecrating them selves to the service of their fellow creatures. The Book is exeed ingly well written and its altruistic teaching cannot fail to have a salutary and ennobling effect on the reader.

CALCUTTA GAZETTE. 4th April 1900 Bengal Library Catalogue for the 4th qr. 1899. pp. 18-19, No. 7271.

———o———

ভূগোলচিত্র ।—( খগোল-চিত্র ও সূচিকা সহিত সিদ্ধান্ত সম্মত ) দেবনাগার অক্ষরে লিখিত শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, কৃত, থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোঃ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি অথবা যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রমের ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

———

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি সুলভমূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে ১। ঋগ্বেদভাষ্যোপোদ্ঘাত প্রকরণম্ ২৲ টাকা স্থলে ১৲ ২। আমিষের-প্রসার ৸০ স্থলে ।০ ৩। শাণ্ডিল্যসূত্র ১৲ স্থলে ৸০ ৪। ৺প্রভাবতী দেবীর কৃত অমল-প্রসূন ১৲ স্থলে—৸০ ৫। শ্রীযুক্তবাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দার্শনিকমীমাংসা ১৲ স্থলে ৸০ মোট ৩৸০। যাঁহারা ৪খানা পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ৩৸০ স্থলে ২৸০ আনায় পাইবেন। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য প্রেরণের সময় সহৃদয় গ্রাহকগণ দরিদ্র আশ্রমকে যেন স্মরণ করেন।

শ্রীকালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

———:———

## ম্যানেজারের বিজ্ঞাপন।

হিন্দুপত্রিকা নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের অনুগ্রহেই হিন্দুপত্রিকা এতদিন জীবিত থাকিয়া হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের সেবা করিতে পারিতেছে। হিন্দুপত্রিকার মূল্য সামান্য বার্ষিক ১।।০ টাকা মাত্র। মনিঅর্ডারে পাঠাইতে ৴০ আনা লাগে মাত্র। পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। গ্রাহকগণ স্বীয় স্বীয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার, হিন্দুপত্রিকা।

যশোহর
১লা আষাঢ়

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতেরেজষ্টীকৃত।]

# হিন্দু-পত্রিকা।

| ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩১৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা, |
|---|---|---|

ওঁ তৎসত্।

## মঙ্গলাচরণ।

——•:০:•——

ওঁ শান্তিঃ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতং, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম অণীস্থঃ শ্রুতন্মে মাপ্রহাসীরনেনাধীতেন অহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ হরিঃ।

জগৎ যাঁহার করুণাছায়ায় লালিত, পালিত, সঞ্জীবিত-সম্বর্দ্ধিত, সেই মহামহিম পরমেশ্বরের চরণকমলে প্রণিপাত করি। জীব-জীবনের মানদণ্ডস্বরূপ পরমপবিত্র, মহৎ হইত মহীয়ান, গুরু হইতেও গরীয়ান্‌'ধর্ম্ম'কে নমস্কার করি। পরমারাধ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বাক্য যেন অকপটতা অবলম্বন করিতে পারে। মনে যে সত্যতত্ত্ব যেরূপে প্রতিভাত হয়, বাক্যও যেন তাহাতেই পর্য্যবসিত হয়; মনের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, বাক্য "চৌর্য্যবলে" যেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই সংগ্রহ করে না। সত্য যেন আমার নিকট স্বরূপে আবির্ভূত

হয়। যেন জ্ঞানপ্রদ সত্য অর্থ মনেই দিন-যামিনী যাপন করিতে পারি। সত্যের দ্বার যেন সম্মুখে উদ্ঘাটিত থাকে। এই অনীত-ক্রান্তসত্য যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। সত্য বলিব, সত্য বলিব। সত্যই জীবনের একমাত্র শান্তি। সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন। সত্য-স্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

## বর্ষপ্রারম্ভে।

পুরাতন বর্ষের অবসান। শত আদর-অভ্যর্থনায় দৃক্পাত করিল না, কত ক্রন্দন, কত মর্ম্মপীড়াপ্রকাশ, কিছুই শুনিল না; নীরবে জগতের চ'খে ধূলি দিয়া পুরাতন-বর্ষ মহাকালের বিরামমন্দিরে অস্তমিত হইল। বর্ষ গেল বটে, কিন্তু প্রাণের জ্বালা, মনের বেদনা, চিত্তের অশান্তি, সংসারের উপদ্রব, কিছুই লইয়া গেল না! পতিবিরহিণী রমণীর আকুল আর্ত্তনাদ, পুত্রহারা মাতার হৃদয়ের তীব্র অনল, বন্ধুহীন স্বজনের সুতপ্ত অশ্রুবারি, রুগ্নব্যক্তির পীড়াপ্রদাহ, যেমন তেমনি রহিল! কালের গতি অনিবার্য্য, সুতরাং সহস্র অনুরোধেও মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করা সম্ভব হইল না। কিছুরই প্রতিবিধান কি করিয়া গেল না? অবশ্যই গেল। মানবের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধানে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া চলিয়া গেল। কতকগুলি স্মৃতি-কণ্টক মর্ম্মস্থানে বিঁধাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। যে কণ্টকগুলি কর্ত্তব্যের তাড়নায় অবিমৃশ্যকারী মানবের পথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবে, সেই স্মৃতিকণ্টক আমূল হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল। অজ্ঞতার অন্ধকারে দৃষ্টিহারা, আত্মহারা আমরা দেখিতে পাই না, পুরাতন বর্ষ আমাদের কি মহোপকার করিয়া গেল। অবশ্য অনেকাংশে অতীতের ব্যবহার নির্ম্মম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে "নির্+মম" ব্যবহারই সুচারু-কর্ত্তব্যের পরিচয়। "মম" জ্ঞানই জগৎকে কর্ত্তব্য-বহির্ভূত পন্থায় লইয়া যায়। অনুচিত পক্ষপাত অবলম্বন করিতে, মানব কেবল একমাত্র 'মমত্বের' নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে কর্ত্তব্যসাধন, সেইখানেই নির্ম্মমতা, সেইখানেই তীব্রতা; কর্ত্তব্যের মার্গ বড় দুর্গম--বড় দুরারোহ। শাস্ত্র বলেন, "ক্ষুরস্য ধারানিশিতা দুরত্যয়া" কর্ত্তব্যপন্থা ক্ষুরধারের ন্যায় দুরত্যয়ই বটে। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, কঠোরতার শিক্ষা নাই। পুরাতন বর্ষ নীরবভাষায় বলিয়া গেল, "জাগ, কর্ত্তব্যের অনুসরণ কর।" ভ্রান্ত আমরা শুনিতে পাইলাম না, সে নীরব-অপূর্ব্ব ভাষার অপূর্ব্ববাণী কর্ণগোচর হইল না! তাই পুরাতন বর্ষ স্মৃতিকণ্টক হৃদয়-দেশে বিঁধাইয়া রাখিয়া গেল! যদি এ নেশা ছুটে, যদি এ দশার পর্য্যবসান ঘটে, তবে সেই এক একটী কণ্টকের একটু একটু বেদনা আমাদিগকে অকর্ত্তব্য মার্গে পদার্পণ করিতে সহস্রঅসুরবলে বাধা দিবে। তাই বলিতেছি, পুরাতন বর্ষ অনেক শিক্ষা ও কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া গিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য জীবনে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই কল্পিত আদর্শের প্রতিকৃতিরূপে জীবন গঠন করিতে হইবে। নচেৎ যে তিমিরে-সেই তিমিরে, সেই অঘোর নিদ্রায়!

বর্ষপ্রারম্ভে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, সেই উপদেশই যেন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা নববর্ষে নব নব কর্ত্তব্যভার মস্তকে বহন পূর্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠ হিন্দু-সমাজের নিকট উপস্থিত। ধার্ম্মিকের আশীর্ব্বাদে, পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণের অপূর্ব্ব-মাহাত্ম্য-বলে, যেন কর্ত্তব্যের তীব্র অগ্নি-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, ইহাই পরমেশ-পদে প্রার্থনা। হিন্দু-পত্রিকা যেন সাধু-অসাধু শত্রু-মিত্র সকলকেই সমস্নেহে আলিঙ্গন করিতে পারে। সকলেরই প্রীতির কারণ হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকা হিন্দু-সমাজের পরিচর্য্যাব্রতে যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ করিতে পারে; দেশের দশের কাছে, হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও হিন্দু-পত্রিকার প্রতি স্নেহশীল মহাত্মাদের কাছে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলপ্রবাহে যেন হিন্দু-পত্রিকার কলেবর কর্দ্দমাক্ত না হয়। নিন্দাপ্রশংসার পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য পালনেই যেন ইহার জীবন অতিবাহিত হয়, সকলের নিকট এই আশীর্ব্বাদ চাই। সমাজের দ্বেষ-বিদ্বেষের অংশ গ্রহণে যেন হিন্দু-পত্রিকার অধিকার না থাকে, ইহাই চাই। বন্ধুগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ যেন অক্ষয় কবচরূপে হিন্দু-পত্রিকার অঙ্গে লগ্ন থাকে। মঙ্গলময়ের চরণে প্রার্থনা করি, হিন্দু-পত্রিকার অনুগ্রাহক গ্রাহকমণ্ডলী যেন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহামান্য সত্যগুলির সম্মান সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হন। হিন্দু-পত্রিকার সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। আমরা স্বধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়গণের প্রতি ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশে যথোচিত সম্মাননা প্রদর্শন পুরঃসর "পরস্পরের কর্ত্তব্যবিনিময়ই প্রার্থনীয়" এই অনুরোধ করিয়া নববর্ষের কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ।

---

## ধর্ম্ম কল্পিত বস্তু নহে।

(ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ—, উৎকৃষ্টই হউক আর অপকৃষ্টই হউক, সকলই কালধর্ম্মের অধীন। মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী কবলে বিলীন না হইবে, এমন বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, ক্রিয়া, কিছুই এ সংসারধামে সম্ভবে না। অল্লাধিক ভাবে সকলের উপরই কালচক্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা কথঞ্চিৎ বিকৃতি বা অন্যথাভাবও সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইয়া থাকে; ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে, শেষে আমাদের স্থূলদর্শী লোচন উহা গ্রহণ করিতে পারে। সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য ভাব গ্রহণে আমরা সততই অপারগ, এইজন্য বিশেষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকৃতপদার্থের প্রকৃতরূপ পরিগ্রহে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অপারগতা পরিলক্ষিত হয়। কালমাহাত্ম্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অবস্থা-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আকার প্রকার অন্যভাব ধারণ করায়, বাহ্যদর্শী বৈদেশিক

পণ্ডিতগণ বস্তুতঃ উহার তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিতেছেন না।

পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, জগতের আদিম বয়সে জীবকুল ধর্ম্ম-প্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় ইত্যাদি কত কিসের প্রিয় ছিল; আবার অধুনাতন সময়ে লৌকিক সুখ বা বিলাস-তরঙ্গেই ডুবিতে ভালবাসে। তাঁহারা ইহাদ্বারা সময় সময় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে (!) উপনীত হন যে, ধর্ম্ম বস্তুতঃ কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, উহার কোনও যৌক্তিকতা নাই; জনসমাজের বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধাহ্রাস হইতেছে; অতএব ধর্ম্ম কেবল সমাজের শৈশবাবস্থার চিত্রক্রীড়া মাত্র, বুদ্ধিমান্ মানব উহার কোনও অস্তিত্ব পাইবেন না।"

পণ্ডিতপ্রবরের তর্কবিতর্ক উল্লেখ করা ও তাঁহার খণ্ডন মণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মহর্ষি মনুর নিকট আমরা ধর্ম্মের যে লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা যে জনসমাজের শৈশবাবস্থার ক্রীড়ামাত্র নহে, এবং তাহাই যে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ বলিয়া জগৎ গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, এই কথাই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। যদি জগতে 'ধর্ম্ম' নামে পরিচিত পদার্থ বুদ্ধির বালক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই না হয়, যদি কল্পনা ব্যতীত সত্তা উহার সংস্পৃষ্ট না হয়, তবে উহা যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না।

কল্পনার কুহকে অনুসন্ধিৎসু বিংশ শতাব্দীর মানব বাস্তবিকই ভুলিতে চাহে না। বিজ্ঞানের অভিমান এখন সমাজের মজ্জায় মজ্জায় খর-বেগে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। এদিনে কেহই আর ভিত্তিশূন্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাসবান হইতে চাহে না। প্রাচীন তন্ত্র, মন্ত্র, বচন রচন আর এখনকার গণ্য মান্যজনসমাজে আদর পায় না! অবশ্য যুক্তির আড়ম্বর, তর্কের কর্কশতা না হইলে এখন চলিতে পারে না। অতএব বাধ্য হইয়া আমরা তাহার বিবেচনা করিতেছি।

ধর্ম্ম শব্দ 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার দ্বারা যে বস্তু ধৃত হয়, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যে শক্তি-বলে পদার্থ ধৃত অর্থাৎ অবস্থিত থাকে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পদার্থের স্বরূপ যাহাদ্বারা রক্ষিত হয়, যে অনির্ব্বচনীয় বলে পদার্থ আপন প্রকৃতরূপ বা অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হয়, অথবা বিরূপতার (ধ্বংসের) করাল-কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করে, পদার্থের সেই অন্তর্নিহিত মেরুদণ্ডের মত শক্তি-বিশেষই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ। ভাবাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই স্থানে আসিতে পারি। অগ্নির ধর্ম্ম দাহকতা, দাহকতাই অগ্নির স্বভাব রক্ষা করিয়াছে, দাহকতার বিগমে আর আমরা অগ্নির অনুসন্ধান পাই না। অগ্নির দাহকতাই ধর্ম্ম। অগ্নির স্বরূপ রক্ষা আবশ্যক হইলে, দাহকতার পরিরক্ষণ বা পরিবর্দ্ধনে যত্ন করাই সঙ্গত হয়। প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্মই তাহার আত্মরক্ষার উপায়। মানব সমাজেও 'ধর্ম্ম' বলিলে ঐরূপ বুঝা আবশ্যক হয়। যে শক্তি আছে বলিয়া আমরা মানুষ, যাহার অপগমে আমরা আর মানুষ থাকিতে পারি না, তাহাই আমাদের (মানুষের) ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না। কখনও ইহা কোনও মানবে পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হয়, আবার কোনও স্থানে ইহাকে নিদ্রিত ভাবে আমরা লাভ করি। মনে করা উচিত, উপযুক্ত উপকরণের সাহায্য ব্যতীত আমরা বহ্নির দাহকতাও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার কোনও পদার্থবিশেষ দ্বারা অগ্নির দাহকতা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাতেই 'দাহকতা নাই' এরূপ অনুমান সঙ্গত নয়। অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেখানে আমরা স্পষ্টতঃ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না, সেখানে ঐ ধর্ম্ম বীজভাব বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিয়া ঐ বস্তুকে বিজাতীয় পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতেছে। যদি ঐ ধর্ম্ম বস্তুতই বিদ্যমান না থাকিত, তবে ঐ বস্তুর জাত্যন্তরপরিণাম সংঘটিত হইত। এখন বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে "মনুষ্যধর্ম্ম" স্বীকার করিতে হয়, তাহা কোনও মনুষ্যে অল্প, কোথাও তদপেক্ষা অধিক, আবার অন্যত্র অধিক বা অল্প মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এক কথায়, মানুষ নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা প্রত্যেকেই বিকাশিত মনুষ্যধর্ম্ম লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের বিকাশের সহিতই তাহাদের মনুষ্য নামের সার্থকতা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এই মনুষ্যত্ববিকাশের জন্যই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশের আবশ্যকতা। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাগ অশেষ শাখায় বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক বই নানারূপ হইতে পারে না। যে সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকাশদশা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠান দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অসংখ্য বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজের অদূরদর্শিতায়, অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অজ্ঞতায় অন্ধতায়, উপায় অনুষ্ঠান অনুপযুক্ত পাত্রে, অস্থানে অসময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গৌরবময় অধিকার-নির্ব্বাচন বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, অনুচিত অধিকার অনুপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়া, উদ্দেশ্যের মূলদেশ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ সুদূরপরাহত হওয়ায় ক্রমে নিদ্রিতভাবের আধিক্য উপস্থিত হইতেছে। তবে এখনও ধর্ম্মজীবনের বিকাশাবস্থা বহুজনাকীর্ণ মহানগরীতে বিরল বলিয়া, একেবারে বিরল হইতে পারে নাই।

এখন আমরা দেখিব, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মলক্ষণ মানবজীবনে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কি না। ধর্ম্মলক্ষণ যথা,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

(৬ অঃ ৯২ শ্লোক মনুসংহিতা।)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্ম এই দশ আকারে মানবদেহে বিরাজিত। প্রাচীন পণ্ডিত কুল্লুকভট্ট বলেন— ধৃতি অর্থ সন্তোষ। ক্ষমা অর্থ অপকারীর প্রতি প্রত্যপকার না করিয়া হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ। চিত্তবিকারের নানাবিধ প্রলোভক উপকরণ উপস্থিত

হইলেও, অন্তঃকরণকে স্বাভাবিক সংযত ভাবে রাখার নাম দম। অস্তেয় শব্দের অর্থ অন্যায়রূপে পরধন গ্রহণ না করা। আর শৌচ অর্থ দেহশুদ্ধি। (এখানে অন্তঃশুদ্ধির কথাও বুঝিতে হইবে) ইন্দ্রিয়গণের অধীনরূপে বিষয়চর্চা না করিয়া ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীন করার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ধীঃ অর্থে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান। (আত্মার স্বরূপ কি? এই দার্শনিক মহারহস্যের আবিষ্কার) সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অক্রোধ অর্থ ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অসাধারণ ধৈর্য্য-বলে ক্রোধের নিবারণ করা।

এই দশটী দ্বারা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়। মানুষের স্বতন্ত্রতা-অসাধারণতার মূলাধার এই দশটী। ইহারই নাম 'মনুষ্য-ধর্ম্ম"। সন্তোষের অভাবে জীবন শ্মশানে পরিণত হয়, সন্তোষ বড় সুখদ, বিশৃঙ্খল-সংসারে মানবাত্মার একটু বিরাম। এ বিশেষত্ব কল্পিত নহে, সমাজের শৈশব জীবনের খামখেয়ালীও নহে। ক্ষমা যথার্থই মানবের মহত্ব, ক্ষমাহীন মানব দানবের জ্যেষ্ঠভ্রাত। এ তত্ত্ব অবশ্য বুঝা আবশ্যক, ইহা জগতের অত্যুচ্চ নীতি। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, তাহা-রই কথায় তাহার পাছে যাইতে লাগিলে, প্রকৃতির স্রোতে ভাসমান পশুর সহিত মানবত্বীর বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখাইতে পারি-বেন না। ব্যবহার নীচতায় মনের সহিত দেহেরও পরিবর্ত্তন অল্পেঃ সাধিত হয়। প্রায়, "ভ্রাবভাবিত" হইলে তত্তদ্দেহলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের বশ না হওয়া মনুষ্যের আত্মরক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তদমনও এইরূপ। অন্তঃ-করণে কলুষিত চিন্তার আবির্ভাবে বাধা দেওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, লোভের সামগ্রীতে উচ্ছৃঙ্খল মন না যাইতে পারে, ইহাও স্বাতঃ দেখিবার বিষয়, ইহা আলঙ্কারিকের কল্পিত-তত্ত্ব নহে। শরীরের শুচিতা ও মনের শুচিতা উন্নতির সোপান। মন অশুচি অব-নত হইলে নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দেহ অশুচি থাকিলে আবার মন শুচি থাকিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে, শুচিসম্পন্ন হইতে হয়। গ্রন্থের অনুশীলন দ্বারা আমরা যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করি, তাহাও আমাদের মনুষ্যত্ব রক্ষার উপায়। অবশ্য পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সত্য পাঠ করা এবং অপরোক্ষপরীক্ষিত সত্য লাভ, ভিন্ন পদার্থ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত টী অপরোক্ষ জ্ঞানের উপকরণ, সুতরাং স্বরূপরক্ষার অনুকূল। ইহা ত্যাগ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব মলিন হইতে থাকে, ক্রমশঃ অনু-শীলনহীন পশুপ্রকৃতির সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ দিবার আবশ্যকতা নাই, সভ্যজগতে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত। বিদ্যা অর্থ আত্মজ্ঞান, এই "আমি কি?" চিন্তায় একমাত্র মানুষের অধিকার। এতাদৃশ মস্তিষ্কযন্ত্র বা স্নায়বিকশক্তি আপাততঃ অন্য কোনও জীবের দেখা যায় না, যাহা আত্ম-স্বরূপ নির্ব্বাচনরূপ গুরুতর চিন্তায় স্থান দিতে পারে। যদি আমাকে আমি না চিনিলাম, তবে আমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ কিসে? সত্যের কথা বলিতে চাহি না,

সমগ্রজগৎ সমস্বরে সত্যের মহিমা ঘোষণা করে। সত্য যে মনুষ্যত্ববিকাশের একান্ত অনুকূল, যথার্থ ব্যতীত কৃত্রিম উপকরণ আত্মরক্ষার উপায় হইতে পারে না, ইহা নীতিবাদের বিজয়দুন্দুভিতে মহারবে ঘোষিত হইয়াছে, এখানে উহা বক্তব্য নহে। উদার নীতির মধ্যে অক্রোধ শ্রেষ্ঠাসনে বসিবার যোগ্য। এই সকল গুলির নাম ধর্ম্ম, ইহাই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে। এগুলিকে ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুর সহিত মানুষের বিশেষ কিছু পার্থক্য আর তখন দেখান যায় না।

তাই আমরা বলিতে চাহি, লৌকিক-যুক্তি-বলেই এগুলি দ্বারা মনুষ্যত্ব রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কল্পনার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয় না। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ধর্ম্মের এই লৌকিক-আদর্শই অনেকে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অনেকে নীতিবাদী হন। তাঁহারা ইহার অলৌকিক তত্ত্ব আত্মস্বরূপ লাভটা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি-তর্কের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, নীতি কেবল সংসারের চ'খে ধূলি দেওয়া মাত্র হইলে চলে না, উহাতে নীতির মূল্য অত্যল্পই থাকে। মহাসত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মহীন নীতি কুনীতি, নীতিহীন ধর্ম্ম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও নীতি একই দ্রব্যের লৌকিক এবং অলৌকিক দুই পৃষ্ঠ। একটী ছাড়িলে অপরটীর গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়; পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিত ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কার্ত্তিক-চৈত্র সংখ্যায় (১৩০৮) হিন্দু-পত্রিকায় 'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে "নীতি ও ধর্ম্মের অপেক্ষা পারস্পরিক, যেহেতু দুইটী একই জিনিষের অবস্থাদ্বয়" ইহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিতে পারেন।

সময়ান্তরে আমরা দেখাইব "নীতি-বিজ্ঞান ধর্ম্মের অনুকূল। কেবল লৌকিক মানিলে চলিবে না, ধর্ম্মের অলৌকিক স্বরূপও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে" বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই বলা আবশ্যক, মনূক্ত দশলক্ষণধর্ম্ম মানবের আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট লৌকিক কারণ। ঐ ধর্ম্ম বীজভাবে আমাদিগের সত্তায় অবস্থান করিতেছে বলিয়াই আমরা মানুষ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ঐ বীজভাবাপন্ন ধর্ম্মকে জাগাইতে হইবে; তাহাহইলে মনুষ্যত্বও জাগিবে। নামে মানুষ, কার্য্যেও মানুষ হওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত না হইলে, মানুষ নাম ধারণ বৃথা। ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতিকে পরিপক্ক অবস্থায় না লইতে পারিলে, ধর্ম্ম বিকশিত হইল না। ধর্ম্মজীবন পূর্ণতা লাভ করিল না, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া গেল না; এক কথায়, প্রকৃত মানুষ হওয়া গেল না; তাই নানাবিধ আনুষ্ঠানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক আচার ব্যবহারই আত্মবিকাশের অনুকূল, মানবাত্মার উন্নতির উৎকৃষ্ট উপকরণ। তবে সময়বিশেষে গৃহীত আচার, আবশ্যক অতীত হইলেও কুলক্রমাগত ভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে।

একটী বাল্যকালের গল্প মনে আসিল, পাঠকগণ চপলতা মার্জ্জন করিবেন। কোনও

গৃহস্থের গৃহে পালিত কতকগুলি মার্জ্জার ছিল, তাহারা ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবহার্য্যসামগ্রী-গুলি অপবিত্র করিবে মনে করিয়া গৃহস্বামী ধর্মকার্য্যের দিনে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইতেন। অপরিণত-বুদ্ধি বালক পুত্র পিতার এই কার্য্য শিক্ষা করিল, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিল না। পরে পিতার মৃত্যুর পর, ধর্মকার্য্যমাত্রেই সে মার্জ্জার বন্ধন করিত ; গৃহে পালিত মার্জ্জার না থাকিলেও অন্য বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে করিত উহা ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। বর্ত্তমান অনেক আচার ঐ প্রকার কারণ হইতে আসিয়াছে। উহারা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কোনও প্রথা সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, এই জন্য অনেক শাস্ত্রীয় প্রথাও আত্মবিকাশের প্রতিকূল হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ না ভাবিয়া, কেবল উপধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন ক্ষীণ করিতেছি। অবসরে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ মনুষ্য-ধর্ম্মবিকাশের জন্য যে আনুষ্ঠানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিব এবং উপযোগিতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

দীন শ্রী—————ভারতী।
(যশোহর, বেদবিদ্যালয়।)

## বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন।

জাতি-বিভাগ নির্ব্বাচন তত্ত্ব লইয়া আজ আমরা হিন্দু সমাজে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, মহাব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাইতেছি। মহামান্য টি মাধবরাও এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "যতই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা যায় এবং যতই অধিক পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতিই, হিন্দু-সমাজের ন্যায় নিজেদের স্বইচ্ছায় সৃষ্ট সুতরাং সহজেই পরিহার্য্য সামাজিক আচার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি হইতে যত অধিক দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন, রাজনৈতিক কার্য্যাবলী হইতে সেরূপ বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করেন না।" আত্মসৃষ্ট বিপদাবলীর মধ্যে জাতিপ্রথা অন্যতম বিপদ। হিন্দু-সমাজে ইহা অভিশাপের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। প্রত্যেকে জাতিগর্ব্বে গর্ব্বিত। স্বদেশহিতৈষিতা ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্বজাতি ব্যতীত, অন্য কোন জাতি বা শ্রেণীরে সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। জাতিভেদ-প্রথা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর চামার প্রভৃতি জাতিকে স্পর্শ করাও অপবিত্র বোধ করেন। ত্রিবাঙ্কুড় দেশে কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণের পাঁচাত্তর পদ পরিমিত স্থান অপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে না। উচ্চ-বংশের কোন লোক তাহাদের নিকট আসিতে লাগিলে তাহারা রাস্তা হইতে ঘুরে চলিয়া যায়। যদিও বর্ত্তমানে সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেকটা শৈথিল্য দৃষ্ট

হয়, তথাপি কোন কোন নীচ জাতীয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করাহয়, তাহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহই সহ্য করিতে পারেনা। এমনকি, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ ধনশালী সুবর্ণবণিক ও সাহাদিগের প্রতি এতদূর অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করাহয় যে, উচ্চ শ্রেণীর কেহই তাহাদের জল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, জাতিপ্রথাই যে জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ, তাহা যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অবনতির প্রধান কারণ সেই জাতিপ্রথা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রায় সকলকেই বদ্ধপরিকর দেখা যাইতেছে। নীচ জাতিদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করি, তাহা একান্ত অন্যায়। বরঞ্চ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মানুযায়ী নিকৃষ্ট জাতি সকল সমাজে যে অবস্থায় পরিণত ও যে যে কার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহারা যদি সে অবস্থায় থাকিতে ও সেই সব কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তখন যে সমাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রজকের জল কোন হিন্দুই ব্যবহার করে না এবং কাহার ঘরেও সে প্রবেশ করিতে পায় না। যদি সে তাহার পৈত্রিক বস্ত্রধৌত-করণ ব্যবসায় করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বোম্বে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব চন্দ্র বার্কর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "জাতি-প্রথার পক্ষপাতীদিগকে আমি অনেক সময়ে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিতে পাই যে— "ইংলণ্ড দেশেও কি জাতিপ্রথা প্রচলিত নাই? আভিজাত্যাভিমানী কোন ব্যক্তি কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করিতে অপমান বোধ করেন না কি? এই প্রশ্নোত্তরে আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষে যে আকারে ও যেরূপ ভাবে জাতি-প্রথা প্রচলিত আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিলাতের কোন লর্ড কোন কৃষকের কন্যার পাণিগ্রহণ করা অপমানসূচক বোধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই কৃষক আবার সময়ে নিজেই একজন লর্ড হইতে পারেন। কার্ডিন্যাল নিউম্যান সাহেব খৃষ্টিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজ জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। 'যাহারা এখন খৃষ্টিয়ান দলভুক্ত নহে, তাহারা যে কোন সময়ে ঐ দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এরূপ বলা যাইতে পারে না।' কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকিবে, শূদ্র শূদ্রই থাকিবে। শূদ্র কস্মিন্ কালেও ব্রাহ্মণ হইবার আশাও করিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে আদৌ সৌহৃদ্য ভাবও দৃষ্ট হয়না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন হিন্দু-সভাতে বারনস সাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলি অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল:—

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোকের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কবি কারলাইল বলেন যে—"কঠিন পরিশ্রমকারী, বঙ্কিম দেহধারী সদাশয় শ্রমজীবীগণকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। প্রখর রৌদ্রতাপে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনকারী শ্রমজীবীদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ভ্রাতাগণ! লোকে তোমাদের প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে। তোমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তোমাদিগকে অবশ্য আমরা দয়া করিব এবং ভালও বাসিব। আমাদিগের জন্যই তোমার পৃষ্ঠদেশ এরূপ ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদিগের জন্যই তোমার সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের জন্যই পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার শরীর এরূপ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। তোমার সুন্দর আকৃতি আদৌ বিকাশিত হইতে পারে নাই। অনবরত শারীরিক পরিশ্রমে ইহা বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আত্মা এবং শরীর কখনও স্বাধীনতার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই। অনবরত পরিশ্রম করাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। দলিল জাল, মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী, আলস্যপরায়ণ, ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে জীবিকাঅর্জ্জনকারী চণ্ডালও শতগুণে শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয়।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে জাতিপ্রথার প্রতি বিশেষ অনুকূল দেখা যাইতেছে। এই জাতিপ্রথার আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষভাবে থাকা উচিত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে ইহা আরও উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন। শিক্ষিত হিন্দু-সমাজে যে নব জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট যে অসন্তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। জাতিপ্রথার তথ্য অনুসন্ধানে, গভর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। জমির সহিত বিভিন্ন জাতির সংস্রব, তাহাদের খাজনা পাওয়ার অধিকার, বাণিজ্যের সহিত তাহাদের সংস্রব, এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক অন্যান্য বন্দোবস্ত, এই সমস্ত বিষয় রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জাতিপ্রথার বিশেষ অনুসন্ধানে আধুনিক মানববিজ্ঞান [ anthropology ] শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত স্যর জন লাবক, স্যর হেনরী মেন, টেলর সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণও বিশেষ সাহায্য ও উপকার পাইতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটী বিদ্বেষ ভাবের উৎপত্তি না করিয়াও এই সমস্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। যদিও স্যর লিপেল গ্রিফিন এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "জাতি প্রথা এখনও বিশেষ বলবৎ আছে এবং সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ঐ জাতীয় বিদ্বেষভাব একেবারে উন্মূলিত না করিয়া বরঞ্চ আরও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেন।" তথাপি গভর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে, এই জাতিপ্রথা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুসংস্কারই ইহার প্রধান শত্রু। সেই

সেপাহীবিদ্রোহও জাতিপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকারের প্রধান সনন্দস্বরূপ সেই ১৮৫৮ সালের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে গভর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য জাতিপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু ইহাকে কোনরূপে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জাতির প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করাই উচিত।

জাতিবিভাগের অবশ্য অনেক প্রকার সুবিধা আছে। যখন কোন একটী ব্যবসায় বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতে থাকে, তখন সে ব্যবসায়ে পিতার উপার্জ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য সহজেই পুত্রে আসিয়া বর্ত্তায়। অসভ্য মনুষ্যগণ পশুদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী জাতিবিভাগে পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মানব একই স্বার্থবিশিষ্ট বৃহত্তর একটী পরিবারভুক্ত হওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে মানবকে শান্তস্বভাববিশিষ্ট এবং কর্তৃপক্ষদিগের প্রতি সম্ভ্রমশীল করে। এক পক্ষে যেমন এই সব সুবিধা আছে, অন্যপক্ষে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধাও আছে। জাতীয় উন্নতির প্রথম অবস্থায় জাতিবিভাগ আবশ্যকীয় হইতে পারে, কিন্তু চরম উন্নতির পক্ষে ইহা চরমে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদিগের শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আমরা কতকটা উন্নতি করিয়া ক্ষান্ত আছি। দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেই অবস্থায় আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে বাষ্পীয় যন্ত্র ও সূত্রপ্রস্তুতির যন্ত্রাদি যে মহাত্মারা করিয়াছেন, তাঁহার সেই২ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন না। এদেশে আমরা শিল্প কার্য্য ও ব্যবসায়কে বিশেষ ঘৃণা করি। সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি নীচ জাতি মধ্যে গণ্য। অন্যান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণও বিশেষ সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হন না। সমাজ যে ব্যবসায়কে সম্মানিত বিবেচনা না করেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেরূপ ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইবেন না। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথেও জাতিপ্রথা নানারূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করে। বোধ হয়, কেবল একমাত্র হিন্দু-জাতিরই কোন বৈদেশিক বাণিজ্য নাই। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে এবং জাতীয় ভাবের উন্নতি বিষয়ে বিঘ্ন করিয়াছে। ইহাতে সমস্ত জাতিকে অবনত করিয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে। মনুসংহিতা পাঠে চণ্ডাল ও শূদ্রদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, কোন মানবে যে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কতকগুলি পশুবধে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, একটী শূদ্র হত্যাতেও সেই প্রায়শ্চিত্তের

বিধান রহিয়াছে। শূদ্র হত্যা করিলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, বিড়াল, নকুল, কুকুর, ভেক, সরীসৃপ, পেচক বা কাক মারিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দাসত্ব করার জন্যই শূদ্রের জন্ম। ক্রীত বা অক্রীত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দাসত্ব করিতে বাধ্য করিতে পারেন। তাহার প্রভু তাহাকে মুক্তি দিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শূদ্রের দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণে নিরুদ্বেগে দখল করিতে পারেন। যদি কোনরূপ অসম্ভ্রমসূচক ভাবে সে উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখ করে, তবে দশ অঙ্গুল পরিমাণ তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। সে যদি তাঁহাদিগকে গালাগালি করে, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবে। সে যদি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে তাহার পশ্চাদ্ভাগে তপ্ত শলাকা দ্বারা দাগ দিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে অথবা সেই পশ্চাদ্ভাগ একেবারে কাটিয়া ফেলিবে। মৃত ব্যক্তিদিগের ত্যক্ত পরিচ্ছদাদিই চণ্ডালেরা বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে এবং ভগ্ন পাত্রে তাহারা আহার করিবে। লৌহের গহনা পরিধান করিবে এবং অনবরত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এই সমস্ত বিধান পাঠকরিতেও শরীর কম্পিত হয়। জাতিপ্রথানুযায়ী উচ্চশ্রেণীস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল লোকই একরূপ অজ্ঞ থাকিবে। উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেণীর লোক বোধহয় শতগুণ অধিক। জাতিপ্রথানুসারে তাহারা সকলেই অজ্ঞ থাকিবে।

জাতিপ্রথা প্রকৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষে ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হঠাৎ ইহা রহিত করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই জাতিবিভাগই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতির প্রধান কারণ এবং সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া সর্ব্ববিষয় সংশোধন করিতে হইবে। ভারতমাতার সন্তানগণ জাতীয় বিদ্বেষভাব আর বর্দ্ধিত না করিয়া সকলেই কমাইতে চেষ্টা করিবেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে "জাতিপ্রথা মানবমণ্ডলীর ভ্রাতৃভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সামাজিক পার্থক্যকে ঐশ্বরিক বিধানরূপে পরিগণিত করে এবং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ শত্রুতা ও বিবাদের সূচনা করিয়া দেয়। ইহাতে এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। তাহাকেই শিক্ষা দীক্ষার ভার এবং সামাজিক প্রাধান্যের অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা অর্পণ করে। তাহাকে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগ্য মানবকে চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছভাবে পদদলিত করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয় এবং অন্যান্য লোকদিগকে স্বর্গের বা মনুষ্যত্বের অযোগ্য, অপবিত্র নীচজাতীয়রূপে পরিগণিত করে। এইরূপ ঘৃণিত দাসত্বের বিধান এবং এইরূপ কষ্টকর যথেচ্ছাচার কে সহ্য করিতে পারে? অপর, আর একজন পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, 'জাতিপ্রথা যুক্তি এবং বিবেকবিরুদ্ধ এবং ইহাতে নানারূপ অবনতি ঘটে। ইহাতে সমাজের অধিকাংশ লোক বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ ও পবিত্রতাশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে পরম পিতা পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও রাগ-দ্বেষপূর্ণ বলিয়া পরিচয় দেয়। আমি এজন্য পুনরায় বলিতেছি যে, আমরা যদি মানবপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়মের প্রতি লক্ষ্য এবং দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা করি, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য"।

বনপর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে "সকল মনুষ্যেরই জন্ম, মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহার চরিত্র পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ"। যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে "জন্ম, বংশ বা জটাজুটদ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাঁহাতে সত্যতা ও ধর্ম্ম বিরাজমান, তিনিই ব্রাহ্মণ।" বর্ত্তমানে যাঁহারা জাতিপ্রথা ও বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতিপ্রথা হইতে কোনরূপ সুফল লাভের আশা করা একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে যেরূপ জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ। অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব বলিয়াছেন যে, মনুসংহিতায় উল্লিখিত এবং বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত জাতিপ্রথা বৈদিক সময়ে বিদ্যমান ছিল না। কি বিভিন্ন জাতিবিভাগ, কি ব্রাহ্মণদিগের নানারূপ স্বত্বাধিকার, কি শূদ্রদিগের নীচ অবস্থা, ইহার কোন বিষয়েরই বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের একত্র বাস করা, পান আহার করা কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক কোন বিধান ছিল না। বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতিবিভাগ বৈদিক সময়ে ছিল না, কিন্তু মনুসংহিতায় উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে, জাতিবিভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হইয়াছে এবং ইহা বেদবিধানানুযায়ী নহে। শ্রুতিশাস্ত্রের সহিত পুরাণ বা স্মৃতিশাস্ত্রের অনৈক্যস্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য।

ক্রমশঃ—

---

# শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

## তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি
সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥"

তৃণ হতে নিজকে যে নীচ মনে করে।
তরু হইতেও যেবা সহিষ্ণুতা ধরে॥
নিজে যে অমানী হয়ে অন্যে মানদাতা।
তারি দ্বারা হরি হন কীর্ত্তনীয় সদা।

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রকৃত হরিসংকীর্ত্তনকারীর উপযোগিতা বা লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শুধু শব্দের "হরি" হয়ত

অনেকের দ্বারাই কীর্ত্তিত হন, কিন্তু অর্থের হরি— ভাবের হরি— রসের হরি— স্বয়ং হরি কেবল উপরোক্ত লক্ষণালঙ্কৃত নিরীহ নিষ্কিঞ্চন সুদীন ভক্তের পবিত্র কণ্ঠেই প্রকীর্ত্তিত।

"হরি" ত অনেকেই বলে, কিন্তু বলার মত বলিতে পারে কজনে? শিক্ষিত পক্ষীও ত হরি বলে। শুকের মুখে সুখের সময়েই কৃষ্ণনাম,—বিড়ালে ধরিলে কেবল ক্যাঁ ক্যাঁ—! সে অন্তিমে আর সে 'অন্তিমের ধন কৃষ্ণনাম' মুখে আসেনা। মনে যাহা নাই, তাহা কি আর তখন মুখে আসে? ভগবন্নামকে যে অন্তিমের সম্বল বলিয়া ঠিক চিনিয়াছে, অন্তিমকালে নাম তাহাকে ত্যাগ করেন না। আমাদের 'হরি' বলা একরূপ সখের হরি বলা; সুতরাং তাহাও শুকের হরিবলা-বিশেষ। আমাদের হরিনাম যেন পোষাকী, সুদীন ভক্তের হরিনাম প্রকৃত "আটপহুরে।" "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যের তাহাই তাৎপর্য্য। কাহারও অন্তরে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন হইতেছে, যিনি শুনিবার তিনি শুনিতেছেন; বাহিরের লোকের শ্রুতি-নিরপেক্ষ-নীরবতায় সে সংকীর্ত্তন সংহত হয় না। সে অন্তঃশীলা সুধা-স্রোতস্বতী সদাকালই বহিতে থাকে।

"লোক-প্রতীতি বিষয়ে প্রবদামি কৃষ্ণং।
চেতঃ পুন র্বিষয়রাশি-নিবেশিতং মে॥
ভ্রষ্টাবধূর্নিজকরেণ পতিং স্পৃশন্তী।
গোপ্যাঙ্গমর্পয়তি জারজনায় সুপ্তং॥"

লোকেরে বুঝাতে বৈষ্ণবতা মোর
"কৃষ্ণ" বলি রসনায়।
কিন্তু মম চিত্ত নিত্য নিবেশিত
বিষয়রাশিতে হায়॥
ভ্রষ্টাবধূ যথা করি আলিঙ্গন
করে সুপ্ত স্বপতিরে।
স্বগোপ্যাঙ্গ করে গোপনে অর্পণ
আপন উপপতিরে॥

আমাদের হরিবলা এইরূপ। ভক্তের হরি স্বয়ং হরি, আর আমাদের হরি যেন 'হ' আর 'র' এ "ইকার"-ধারী! দীনের হরি রাসবিহারী, আর দাম্ভিকের হরি কেবল রসনা-বিহারী!

"অন্তরে বিষয়াসক্তি, বাহ্যে ভাক্ত হরিভক্তি,
দেখে শুনে 'হরিভক্তি উড়ে।'
ভাক্ত স্বর্ণ-অলঙ্কারে, আশু অঙ্গ শোভা করে,
পরীক্ষা-অনলে মরে পুড়ে॥"

অতএব শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে হরি-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাক্ত অনধিকারীর হরি-কীর্ত্তন-হুঙ্কারে কণ্ঠ বিদারিত, বায়ু বিকম্পিত, এবং নভোস্থল নিনাদিত হইলেও তাহা ভূলোকের ব্যোমভূতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভক্ত অধিকারীর নীরব অন্ত-কীর্ত্তনও ভূলোক এড়াইয়া, দ্যুলোক ছাড়াইয়া, গোলকের সেই মোহন-মুরলী-তানে মুখরিত হয়! তাহাতে গোলকেশ্বরীর পুলক-নৃত্য-বিলাস বর্দ্ধিত হয়। হরিসংকীর্ত্তনের সার্থকতা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যে যে লক্ষণে অধিকারী হইলে, এহেন সার্থক-সংকীর্ত্তন-সাধনের অধিকার সুলভ ও স্বাভাবিক হয়, তাহারই শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষাশ্লোকটির উদ্দেশ্য।

'তৃণাদপি সুনীচেন।'—দীনতায় তৃণ হইতেও নীচ ভক্তের দ্বারা হরি কীর্ত্তনীয় হন। তৃণ হইতেও নীচ হওয়া কি? রূপকার্থে আলোচনায় ইহাই বলা যায়, তৃণ হইতে নীচ মাটি; অতএব তৃণ হইতে নীচ হওয়াই মাটি হওয়া। আপাততঃ তৃণ সকলেরই নীচে, সকলেরই পায়ের তলে। বিষ্ঠার কৃমিটাও তৃণের উপর দিয়া যায়। তৃণ যেন দীনতার আদর্শ হইয়াই জীব-জগতের পদতলে পড়িয়া আছে। কিন্তু মাটি এই তৃণেরও নীচে, সুতরাং মাটি দীনের দীন। সকলের পদানত যে তৃণ, মাটি সে তৃণেরও পদানত! মাটি চরম দীনতার পরম উদাহরণ। মাটির মত বিনীতা বৈষ্ণবী কে? "সর্ব্বংসহা" মাটির দৈন্যের উপমা মাটির উপরে নাই! হরিকীর্ত্তনকারীকে মাটি হইতে হইবে অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি সাধন করিতে হইবে। মাটির আদর্শে "মাটি" হইয়া মাটিতে থাকিতে হইবে।

নিন্দার্থক ভাবে 'মাটি' শব্দও অস্মৎসমাজে প্রচলিত আছে। যথা—"লোকটা সঙ্গদোষে মাটি হইয়া গেল" ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গগুণে স্তুত্যর্থক মাটি হওয়াই সাধনের মাটি হওয়া। সাধুসঙ্গ-গুণে তৃণাদপিসুনীচত্ব-সম্পদ নাম-সাধক ভক্তের অনায়াসলভ্য হয়।

একটা "নেড়ার তুক্কো" গানে আছে,—

"যদি হবে খাঁটি, হওরে মাটি,
নৈলে মাটি হবে জান্।
হয়ে আছে মরা, ত্যজ ত্বরা,
মাটির দেহের অভিমান॥"

ফলে বক্ষ্যমাণ শিক্ষাশ্লোকের তাৎপর্য্যালোচনেও এই উপদেশ লভ্য হয় যে, মাটি না হলে খাঁটি হওয়া যায় না। উদারতায় ও দীনতায় মাটি না হইতে পারিলে সাধন-ভজন সব মাটি হয়—মানবজীবনটাই মাটি হয়। "মাটির মানুষ' কথাটি অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ স্তুত্যর্থক বটে, কিন্তু কখন কখন সাত্ত্বিক আত্মসম্মানবোধ, সদ্বুদ্ধিবিবেক ও সাধন-ভজনের অভাবে এই মাটির মানুষত্ব অকর্ম্মণ্যতা বা অপদার্থতায় পরিণত হয়। সুকৃষিকার্য্যের অভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্র আগাছায় পরিপূর্ণ হয়। কেবল ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিতেই সে আশঙ্কা থাকেনা।—অতএব মাটির মানুষ হইবার জন্যও যেখানে নামকীর্ত্তন আবশ্যক, সেখানে স্বভাবতঃ মাটির মানুষ হইয়া যে ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করে, সে বড়ই দুর্ভাগা। সে হেলায় "মাল জমী গোভাগাড়" করিয়া ফেলে।—সে 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে'!

যাহাহউক, আপনাকে অতীব দীন হীন অকিঞ্চন জ্ঞান করাই এস্থলে মাটি হওয়া বা তৃণেরও নীচ হওয়া। আমি কিছু না, আমার কিছু নাই; আমি পদে২ অপরাধী! নীতি-পুণ্য-পবিত্রতা, জ্ঞান-ভক্তি-বৈষ্ণবতা, আমার কিছু নাই। আমি এমন দীন—যে দীনতা-বোধেও হীন। আমার এমন অভাব—যে অভাব-বোধেরও অভাব! আমি কৃষ্ণ-বিরহে কাঙাল, কিন্তু ততোধিক কাঙাল সেই বিরহ-বোধ-বিরহে! আমি যে আমার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণানন্দ হারাইয়াছি, হায়! সে জ্ঞানও হারাইয়া বসিয়াছি! তাই এত দুঃখেও বুক ফাটেনা, প্রাণ

কাঁদে না, মন গলেনা, নয়ন ঝরে না। কাঁদিলে দুঃখীর দুঃখের লাঘব হয়; যাহার কাঁদিবারও অধিকার নাই, তাহার মত দুঃখী কে? কৃষ্ণ-বিরহে যে আমার কান্না আসে না, এ দুঃখেও যদি একটু কান্না আসিত, তবু কৃতার্থ হইতাম। দুঃখ আমার দূর হওয়া দূরে থাক্, দুঃখ বুঝিলেও একটু বাঁচিতাম। আমি কৃষ্ণধনের কাঙ্গাল বলিয়া যে আমার দুঃখবোধ নাই, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ!" ইত্যাকার ভাবানুবন্ধ যাহার মনে জীবন্ত হইয়া উঠে, যাহার মনের প্রতিকৃতি গঠে, সে-ই যথার্থ মাটি হওয়ার যোগ্য; হরি-কীর্ত্তন তাহারই ভাগ্যে ভোগ্য।

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন তখন প্রায়ই বলিতেন, "আমি দীনের দীন হীনের হীন।" আহা! অমন দীন হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দীননাথের ইচ্ছায় সাধন-জগতে অমন ধনী মহাজন হইয়াছিলেন। তাই ভগবান রামকৃষ্ণ আজ তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলে রাম-কৃষ্ণের অবতাররূপে অর্চ্চিত। দীন দেখিলে দীননাথ দান করেন; আর তাঁহার দানে সকল অভাবের অভাব হয়। দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, অনাথশরণ, অধম-তারণ, পতিতপাবন, কাঙালের ঠাকুর, এই সমস্ত আশাময় মধুময় শ্রীভগবন্নাম দীন-ভক্তেরই প্রাণের প্রদত্ত; এ অমৃতের প্রকৃত রসাস্বাদ দীন ভক্তেরই ভাগ্যায়ত্ত।

"কাঙালের ঠাকুর শ্রীহরি, সবে বলে।
কে পায় সে হরি-কৃপা কাঙাল না হলে॥
কাঙাল হইয়া যারে আঁচল যে পাতে।
দয়াময় প্রসাদায় ভিক্ষা দেন তাতে॥
অদীন উদ্ধত যেবা যায় হরি-দ্বার।
দ্বারী-হস্তে "অর্দ্ধচন্দ্র" ভাগ্যে ঘটে তার।
দীন হীন হয়ে চেয়ে থাকে দ্বার পাশে।
দেখা দিবে দীনবন্ধু দিবা অবসানে॥"

"এই জগৎস্বামিনী আয়ু-দিবার অবসান সময়ে,— সেই কাল-যামিনীর ঘোর তিমিরা-কাল-সঞ্চালন-সময়ে— দীনবন্ধু-দর্শন ভক্তি-দৈন্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ, দৈন্যই সাধুর সম্পদ, দৈন্যই সেবকের শোভা। আর সেই শোভা স্বয়ং সেবক-বৎসল মনোমোহনের মনোলোভা। দৈন্য চাই। দৈন্য ভিন্ন মানুষ নরম হয় না। নরম না হলে গঠন হয় না। ঘৃত যেমন ময়দার "ময়ান"—দৈন্য তেমনই মানব-মনের ময়ান। ময়ান-শূন্য মনো-পিষ্টক ইষ্টকবৎ অখাদ্য হয়। তাহা ঠাকুর-সেবায় দেওয়া যায় না। মোলায়েম হওয়া চাই। শক্তের সুগঠন সম্ভবে না। নব-মের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন পরিগঠন চলে। অতএব "তৃণাদপি সুনীচ" মাটি হইতে হইবে। মৃদবস্থা ভিন্ন মৃদুতা অর্থাৎ কোমলতা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণ-সেবার সর্ব্বোপকরণেই মৃদুতার প্রয়োজন। সাধুগণের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠো-রাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। যখন বিষম বিষয়-বিগ্রহে বাসনা-নিগ্রহের প্রয়োজন, তখন কঠোর বজ্র, আর যখন আনন্দ-আগ্রহে ভগবচ্চরণার্চ্চনের আয়োজন, তখন কোমল কুসুম!

কৃষ্ণ বড় কোমল ভালবাসেন। গোপীরা তাঁহাদের প্রাণ-কৃষ্ণকে "নিপট-কপট-শঠ-কঠিন কালিয়া" বলিয়া গালি

দিতেন।” কোনও রসিক ভক্ত বলেন, “উহা গালি নহে, স্তুতি; কারণ স্বরূপ-বর্ণনা।” তাই বুঝি কৃষ্ণ নিজে কঠিন ধাতিয়াই নিজ অভাব পূরাইতে ব্রজগোপী-বধূ কমলিনীর কমলাধিক সুকোমল হৃদ্-কমলবিলাসী! কোমলের কাছে কঠিন পদার্থ, কঠিন আয়ত্ত। দয়া ন্যায়কে আয়ত্ত করে, ভক্তি জ্ঞানকে অধীন করে। শীলতায় জলদ গলে; চন্দ্রিকায় সিন্ধু উথলে। প্রবাহে পর্বত কাঁপে; লতা তরুকে বাঁধে। তাই প্রকৃতিতে পুরুষ পরিচিত; শক্তিতে চৈতন্য নিয়মিত; ভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত। তাই মহাশ্মশানে রণরঙ্গে শিব-হৃদয়ে শ্যামার নর্ত্তন; আর তাই মদনমোহন-মোহিনীর মানভঙ্গে শ্যামের শ্রীমুখে “দেহি পদপল্লবমুদারম্!”

সে যাহাহউক, দৈন্য ভজনের একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ; অথচ তাহার স্বাভাবিক সম্প্রাপ্তি ভিন্ন সাধন-সম্প্রাপ্তি সহজ নহে। কেবল করযোড়, গলবস্ত্র, শিরাবনতি, বাক্য-বিনতি, অঙ্গ-সঙ্কোচন, আত্মনিন্দন, ভূ-লুণ্ঠন, ভূরি-অভিবাদন প্রভৃতিতেই প্রকৃত দৈন্য প্রকটিত হয় না। দৈন্য অন্তরের বস্তু। উহার বহির্বিকাশ কেবল শিক্ষাসাধ্য হইলে, তাহা দৈন্যের অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অন্তরে অকৃত্রিম দৈন্যের উদয় হইলে, তাহার ঐ সমস্ত বাহ্যলক্ষণ স্বতঃ বিকসিত হয়। সাধুসঙ্গ, ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্র-সেবন, তীর্থভ্রমণ, অনুতাপ বা আত্মাপরাধ-চিন্তনে নিরন্তর অন্তর্বিলাপ, এই সমস্ত [illegible] আন্তরিক দৈন্যসিদ্ধির সাধন। [illegible] বস্তুতঃ সহজ নহে। [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] উক্ত—

“বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ।
‘তৃণাদপি সুনীচে’ ঘটালে পরমাদ॥”

যথার্থ দৈন্য বহু-পুণ্য-প্রেরিত, কৃপা-ময়ের বহুকৃপা-প্রসাদিত, সন্দেহ নাই। কণ্ঠী-তিলক-মালার থলী, কৌপীন-করোয়া-নামাবলী, বৈষ্ণবতার এই সব বাহ্যসজ্জা সহজেই সংগৃহীত হয়, কিন্তু দুর্লভ দৈন্যই একমাত্র অন্তঃসজ্জা। সে সজ্জার অভাবে ভজনপথে পদার্পণ কেবল সাধু-সমাজে লজ্জার কারণ হয় মাত্র।

লোকে বলে “কষ্ট ভিন্ন কৃষ্ণ পায় না” তাহা সত্য, কিন্তু দৈন্যশূন্য কাষ্ঠ-বৈষ্ণবের তপস্যাজাতীয় শতসহস্র কষ্টেও কৃষ্ণ মিলা-ইতে পারেনা, কিন্তু দীনতায় একটু কাতর ক্রন্দনও নন্দ-নন্দনের পদারবিন্দে প্রেম-বন্ধন প্রদান করে! বলিয়াছিত কৃষ্ণ কেবল কোমল ভালবাসেন।

“কোমল-নয়না, কোমলবয়না,
কোমল-হৃদয়া রাধা!
(ওতার—)
কোমল প্রেমের কোমল বাঁধনে
কঠিন কৃষ্ণ বাঁধা!”

তাই কোমল-বিলাসী কৃষ্ণ সাধুচিত্ত-হারী—ভক্তহৃদ্বিহারী! তাই কৃষ্ণের নিত্য ননী-চুরী। তাই বুঝি কৃষ্ণাকৃষ্ট-মতি গোপ-যুবতীরা প্রাণেশ্বরের পাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে ধরিতেও সঙ্কুচিতা; আর প্রৌঢ়া গোপিকারা কোমলবক্ষ-বিলেপিত কুঙ্কুম-চন্দনে শ্রীনন্দ-নন্দনের পদ-প্রসাধন-নিরতা। অতএব কেবল কোমলতায় কৃষ্ণ-সেবার ব্যবস্থা।

“চাঁদ নিঙাড়িয়া, অমিয়া ছানিয়া,
রাধা-তনু বিধি গঠিল তায়।

তাই দিবানিশি, কোমল বিলাসী,
শ্যাম প্রেম-শশী তাহে লুটায়॥"

দিশাহারা কবি-লেখনী অগত্যা রাধা-হৃদয়ের সৌকুমার্য্য শশী সুধা সহ, কথঞ্চিৎ উপমিত করিয়াছে। ফলে যেখানে সাত্ত্বিক সুকুমারতার চরম পরিণাম, সেইখানেই শ্রীনন্দকুমার সানন্দে বিরাজমান! তাই বিশুদ্ধ দৈন্যের সাত্ত্বিক সৌকুমার্য্যময় ভক্ত-হৃদয় সেই রূপময়েরই সুখাধিষ্ঠান।

শ্রীকৃষ্ণ লীলায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই যুগলতত্ত্বেরই পূর্ণবিকাশ। তন্মধ্যে ব্রজ-লীলায় মাধুর্য্যের পূর্ণতম পরিণতি, আর ঐশ্বর্য্যে সকল লীলারই গতি ও নিয়তি; কেননা তাহাতেই বহির্ঙ্গ সাধক-সাধারণের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্বের প্রতীতি। কেবল মধুর-রসতত্ত্বাধিকারী অন্তরঙ্গ সাধকেরই সাধ্যতত্ত্ব ভগবন্মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অতুল কোমলাঙ্গের সুকোমল অঙ্গুলিতে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ ঐশ্বর্য্য-ভক্তের অতুল আন-ন্দের কারণ; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ নবনীত-চোরের নবনীতাধিক কোমল করে মা যশো-দার বন্ধন চিহ্নও মাধুর্য্য-ভক্তের সহনাতীত! কঙ্কর-কুশ-কণ্টকিত গোকুল-গোষ্ঠে গোপা-লের গোচারণ ভ্রাম্যমান পদযুগলে মাধুর্য্য-ভক্তের হৃদয় পাদুকারূপে পরিবেষ্টিত। মাধুর্য্য-ভক্ত মাথুর-কীর্ত্তনের মর্ম্মভেদী কৃষ্ণবিরহ-বর্ণন আকর্ণন করিতেও অক্ষম! কবি-উক্তি বুঝি এ হেন ভক্তের মুখেই বসিয়াছিলেন,—

"বিনয়ে বারণ করি, এসনা এসনা হরি!
এ হিয়ার মাঝে।
কঠিন পাষাণ-সঙ্গে, সুকোমল ও শ্রীঅঙ্গে
ব্যথা লাগে পাছে॥"

ভক্তের কি সুন্দর ভয়! ভক্তের সবই সুন্দর। ভয়ও সুন্দর, সাহসও সুন্দর। কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শের সাহসও সুন্দর এবং নিজের পর-কর-স্পর্শের ভয়ও সুন্দর! ভব-ভয়-জয়যুক্ত মুক্ত পুরুষও ভক্তের এববিধ মধুময় ভয়ে ভীত হইবার জন্য লালায়িত! সে যাহাহউক, ফলতঃ কি ঐশ্বর্য্য-ভক্তি, কি মাধুর্য্য-ভক্তি, কিছুতেই তৃণাদপি সুনীচতা ভিন্ন অধিকার লাভ অসম্ভব। অকিঞ্চনতা—দীনতা ভিন্ন কোনরূপ ভক্তি-ভজনেরই অধিকার হয় না। অদীন অনধিকারীর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ভক্তিচর্চ্চা কেবল তাণ্ডবে পরিণত, সুতরাং বিনাশের হেতুভূত।

"অধিকারী নহে চাহে ভক্তি আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

বিদ্যা-বুদ্ধি গুণ-জ্ঞান বিশেষ কিছু না থাকিলেও, একমাত্র দৈন্য থাকিলেই, ভজনা-ধিকার থাকে; ভক্তির অপর সহস্র উপ-যোগিতাতেও সে অধিকার অধিগত হয় না; সুতরাং, অনধিকার চর্চ্চার বিষময় ফল অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য।

দৈন্য বৈষ্ণবের বর্ম্ম। অনেক অপরা-ধের আঘাত উহাতে ব্যাহত হয়। যশের-আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিষ্ঠা ভজনের প্রধান শত্রু। অনেক সাধক অনেকদূর উঠিয়াও আবার এই শত্রুর আক্রমণ-আকর্ষণে অধঃপতিত হন। একমাত্র দৈন্য-সৈন্য-সহায়েই এই শত্রুর সংহার-সাধন সুসাধ্য। যে ঠিক ভাবিতে পারে যে, আমি কিছু না, আমার কিছু নাই, তাহার প্রতিষ্ঠা বা যশ-তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথা হইতে আসিবে?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।"

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচী কেবল
নাচে মম হৃদাগারে।
শুদ্ধ সাধু-প্রেম সে অশুচি স্থল
পরশিবে কি প্রকারে॥"

তাই এই প্রতিষ্ঠা-পিশাচীকে সুদীন সাধুরা বড় ভয় করেন। সবলাধিকারী সিদ্ধভক্ত মহর্ষিগণ ইহাকে বড় ঘৃণা করেন। 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবং। প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রয়ন্ত্যক্‌্বা হরিং ভজেৎ॥

অভিমান হয় হায়! সুরাপান সম।
গৌরব জানিবে ঠিক রৌরব-উপম॥
প্রতিষ্ঠারে শূকরীর বিষ্ঠা জ্ঞানকরি।
এই তিন পরিহরি ভজ সে শ্রীহরি॥

ভজন-বাধক এই তিনের পরিহারে সাধকের দৈন্যই উত্তম উপায়। যে জানে যে আমার কিছু নাই, তাহার কিসের অভিমান হইবে? সে কিসের গৌরব করিবে? সে কিসের জন্য প্রতিষ্ঠাশা ধরিবে? যেখানে বিষ-বৃক্ষের মূলের অভাব, সেখানে আর ফলের ভয় কি? তাই বলিতে হয়, দৈন্যই সাধকের ধর্ম্ম-রক্ষার বর্ম্ম, আত্মরক্ষার অভয়-আশ্রয়।

দৈন্য বৈষ্ণবের লাবণ্য। বিশুদ্ধ দৈন্য ভিন্ন আর কোন গুণেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-কান্তি বিকশিত হয় না। তবে দৈন্যের আবার বিশুদ্ধাবিশুদ্ধি কি? স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্যই বিশুদ্ধ দৈন্য; আর শিক্ষিত—অভ্যস্ত বা সাধিত দৈন্যও অকৃত্রিমতায় শুদ্ধ ও মধ্যম; কিন্তু বাহ্যসর্ব্বস্ব আভিমানিক ভাবটুকুই কৃত্রিম ও অধম। উহা দৈন্যই নহে। কৃত্রিম দৈন্য ও "গিল্টী-সোনা" এক জাতীয় বস্তু। উহা স্বার্থ-সংরচিত চপল চাতুর্য্যের ছদ্মবেশ মাত্র। বরং উলঙ্গ ঔদ্ধত্য ভাল, তবু দৈন্য-ছদ্মবেশিনী ধূর্ত্ততা ভাল নয়। সাধক সর্ব্বদা হরিনাম করিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। কৃত্রিম দৈন্য বৈষ্ণবের আত্মহত্যা মাত্র।

জন্মান্তরীণ সংস্কার-সিদ্ধ স্বাভাবিক দৈন্য নিখুঁত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহা কয়-জনের ভাগ্যে ঘটে? কলে সাধারণতঃ দৈন্য শিক্ষণীয় ও সাধনীয় বটে। অকৃত্রিম দৈন্যের ঐকান্তিক আবশ্যকতাবোধ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহ অন্তর্য্যামী কৃপাময়ের কৃপায় সময়ে সহজেই শিক্ষাধিগত ও সাধিত হয়; আর উহাতেই সাধকের স্বভাব-দৈন্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই ঔদ্ধত্য, উদ্দামতা, ধৃষ্টতা, ব্যাপকতা ও প্রগল্‌ভতার যুগে সাবধানে সাধুসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে আর্ত্ত-দীনতাবোধের সাধনা বর্দ্ধন ও পোষণ করিতে হইবে।

যে কোন বিষয়ের অভ্যুদয়-সাধনে অভাববোধই আদি-মূল। অভাববোধ ভিন্ন উপার্জ্জনের আবশ্যকতাই প্রতীত হইতে পারে না। এই দৈন্যও অভাব-বোধময়। যথার্থ অভাববোধ ব্যতীত অকৃত্রিম দৈন্য সম্ভবেনা। অকৃত্রিম দৈন্য ভিন্নও সাধনো-ন্নতি সম্পন্ন হয় না।

'দুর্লভ জনম পেয়ে কিছুই না করিলাম
অলসে অবশে হায়! মিছে কাল হরিলাম।
কিছুই না জানি হায়! কিছুই না বুঝি
খুঁজিতে এসেছি যারে, তারেও না খুঁজি
হৃদয় শ্মশান মোর—মন মরুভূমি।

কড়ার ভিখারী বঙ্গে শ্মশানেতে ভ্রমি ॥
যুটাতে খেয়ার কড়ী নাহিক যোত্তর।
মানস-প্রদেশে ঘোর মহা মন্বন্তর ॥
নৈতিক নগরে ঘোর মহামারী ঘোর।
বিরাজে অরাজকতা হৃদি-রাজ্যে মোর ॥
অবিচার-অত্যাচার—নিত্য হাহাকার।
নিরাশাস—দীর্ঘশ্বাস—সার অশ্রুধার ॥
কিছুনই—কিছুনই—কিছু আমি নই।
দীনহীন অধীন হইনু হায় কই ॥
দীন হয়ে না ভজিনু দীননাথ হরি।
গেছে কাল হরিনাম, হরি হরি হরি ॥"

এইরূপ জীবন্ত ভাব-প্রবাহ, চিন্তা চর্চ্চা, ধারণা ও সাধনাভিব্যঞ্জনাই দৈন্যের চারু-চিত্র। এবম্বিধ অকিঞ্চনতা-বোধ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দৈন্যের প্রকৃত মূর্ত্তি খোলে। কিন্তু দৈন্যের সঙ্গে আশা চাই। আত্মোন্নয়নে উৎসাহ চাই। সাধন-ভক্তিতে আস্থা ও দৈন্যের শক্তিতে বিশ্বাস চাই। নচেৎ অসহায় দৈন্য সাধককে অবসন্ন করিয়া বরং হিতে বিপরীত ঘটাইতে পারে। "আশাবদ্ধতা" সিদ্ধির প্রধান উপাদান। এইজন্য আশার আহার দিয়া দৈন্যের পালন আবশ্যক। আত্মঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তারিত উচ্চাদর্শ দর্শনে দৈন্যের বিবর্দ্ধন-প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনে যেমন নিম্নাদর্শ দর্শন প্রয়োজন, দৈন্যের বিকাশ-বিবর্দ্ধনে তদ্রূপ উচ্চাদর্শ দর্শনের প্রয়োজন। সাংসারিক সন্তোষ সাধনার্থে নিম্নে তাকাইতে যদি দৈন্যের অঙ্কুর আঘাত লাগে, [illegible] উপরে তাকাইয়া সে আঘাত [illegible] নিজে [illegible] দৈন্যের [illegible]

হইবে। দৈন্যদর্পে অহঙ্কার [illegible] কোন দৈন্যই প্রেরণ করুক, ভগবন্নাম-দুর্গাশ্রয়ে তাহা নিশ্চিত নিরাপদে থাকে।

অধুনা কালধর্ম্ম-বশে বোধহয় অনেক সাধকবেশীর স্বগত আত্মোক্তি এইরূপ,—"আমি বাস্তবিক দীন নহি; ধনী না হইলেও অন্ততঃ 'মধ্যবিত্ত' সন্দেহ নাই। পড়া-শুনা লেখাশেখা একরূপ মন্দ হয় নাই। গীতাখানি প্রায় আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ; অন্যান্য অনেক শ্লোক-শাস্ত্র মুখস্থ। মাসিক পত্রিকায় (লোকে বলে) সুলেখক। আবার প্রয়োজনমত ধর্ম্মপ্রচারক, সুতরাং (লোকে বলে) সুবক্তা। আমার মুখে হরিকথা শুনে অনেক পাষাণ-চক্ষেও ভাসান আসে। আমার মুখের কীর্ত্তন গানে অনেক শুষ্ক হৃদয় সুধায় ভাসে। আর মোটামুটি পাপ একরূপ করি না বলিলেই হয়। মাছ-মাংসে লোভ থাকা সত্ত্বেও জোর করে ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রায় মশা-পিপড়াটিও মারি না। মিথ্যা কথায় হাত এড়াইবারও বিশেষ চেষ্টায় আছি। গুরু কৃপায় ইন্দ্রিয়-সংযমাদিও কিঞ্চিৎ সুসাধ্য হইয়াছে। ভগবৎপ্রসঙ্গে কখন কখন বেশ কান্না পায়। চেহারাটাও আমার বিবেচনায় (ভগবৎ কৃপায়) অন্ততঃ অভক্তের মত নয়। কয়েকবার কয়েকজনে আমার শিষ্য হতেও চাহিয়াছিল। তবে যেন আমি কিঞ্চিৎ হইয়াছি [illegible] দীন নিশ্চয়ই নহি [illegible] দৈন্যকেও আশ্রয় [illegible] আমি যে [illegible] লোকে নারায়ণ [illegible] আমাকে [illegible] সাধু বলিয়া [illegible] এই 'সাধু' শব্দটি [illegible] একটু [illegible] আসে বুঝি [illegible]

একেবারে দানপত্র উৎসর্গ করিতে হইবে। তবে কিনা, তাঁর জিনিস তাঁরেই দেওয়া—কলিতার্থে গ্রহণ মাত্র। আমার অন্তর-বাঞ্ছা ভগবৎপ্রাপ্ত হইলেই, আমি যাহা পাইবার তাহা পাইলাম। কৃতার্থতাই বলুন আর চরিতার্থতাই বলুন, মানুষের ভাষার যে শব্দ উপযুক্ত বুঝেন, তাহাই ব্যবহার করুন, মোটকথা, জীবের একটা আত্মগত চরম ও পরম লাভের কল্পনা আমিত্বসর্ব্বস্ব জীবত্ব-ধর্ম্মে স্বাভাবিক। ভগবানকে দেওয়া হইলেই আমারও পাওয়া হইল।

ভগবানকে আত্মসর্ব্বস্ব সমর্পণের প্রক্রিয়াই ভজন। অষ্টপ্রহর ভজনে না থাকিলে স্বর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

"উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে
উপাসনা বাধা নাই।
ওঠা বসা খাওয়া শোয়া এ সবাইতে
উপাসনা আনা চাই॥
ভোজন আমার আহুতি-প্রদান,
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গি মুদ্রা-বিরচন,
যে ভাবেই বসি, সেই ত আসন,
যে চিন্তাই করি, তাঁরি ধ্যান ধরি;
এ জীবন তাঁরি যন্ত্র।"

ইহাই আত্মসমর্পণ। সবেতেই আছি, অথচ কিছুতেই নাই—কেবল ভগবানেই আছি। অর্থাৎ এবই ভগবান অপরা-অপ-[illegible] ... এ [illegible] নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ—সবই তিনি। এই জগৎ[illegible] ... তিনিই [illegible] তিনিই [illegible] কর্ত্তা তিনিই সর্ব্বকার্য্যের কারণ। এই ভাব সিদ্ধ হইলেই জীবন উপাসনাময় হয়। নিবেদিতাত্ম সিদ্ধ ভক্তের সর্ব্বকার্য্যই ভগবদ্ভজন মাত্র।

"প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥"

প্রাত হতে সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যা হতে প্রাতঃকাল,
যাহা কিছু করি,
সে সকলি সুনিশ্চয়, তোমারি পূজন হয়,
জগন্নাথ হরি!

ইহাই আমাদের আদর্শ। তবে কিনা, আত্ম-নিবেদন ভিন্ন এ উক্তির উপযুক্ত অধিকারী হওয়া যায়না। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া, গুরু-কৃপা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; তারপর যত দিনে বা যত জন্মেই হউক, ভগবদিচ্ছায় যথাসময়েই ভগবানের সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকর্ম্মগত ভজন-সম্পদ লাভ হইবে; সন্দেহ নাই। এই জন্যই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। সহিষ্ণুতা ভিন্ন এ নিত্য ভজনের আশা নাই। দিবারাত্রির মধ্যে কয়েক বার কয়েক মিনিটের জন্য একটু সাময়িক ভজনে বসিলেও, যত রাজ্যের বিঘ্ন, বাধা, উৎপাত, উন্মনস্কতা যেন পরামর্শ করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়! সব সময়ে সব কাজের মধ্যেই উপাসনা চালান কি সহজ কথা? তবে কিনা গুরু কৃপা হইলে, সকল অসাধ্যসিদ্ধি ও সকল অসম্ভব সম্ভাবিত হয় [illegible]। এ সাধনে সহিষ্ণুতা প্রধান উপকরণ, অসহিষ্ণুতা প্রধান অন্তরায়। [illegible] সংসারের অবস্থা, সংসার[illegible] অনেক বাধা [illegible] আমাদের [illegible]

আছে। অর্থাৎ কিনা সংসার কষ্টময়, বিপদ্‌-সঙ্কুল, সুতরাং পদে পদে সহিষ্ণুতার প্রকট পরীক্ষাস্থল। সহিষ্ণুতার সহায়তায় সংসার-সঙ্কটে শান্ত সমাহিত না থাকিতে পারিলে এই সংসার-সাধনের সাময়িক সাধনও সম্ভবেনা; তবে সর্ব্বকাল, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বকার্য্যগত সাধনের আর কথা কি?

সত্ত্বাদি গুণত্রয় ভেদে সহিষ্ণুতাও তিন-প্রকার। কষ্টের অনুভূতি স্পষ্ট বিদ্যমান, অথচ ভয়াদি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ফলে অধিকতর কষ্টের আশঙ্কায় বা ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোন উত্তেজনা সহিয়া থাকা তামসী সহিষ্ণুতা। আর কষ্টানুভূতি সত্বেও যশের আশায় বা পুণ্যাদির আশায় যে সহিষ্ণুতা, তাহা রাজসী। ফলতঃ সর্ব্বমঙ্গলময় ভগ-বানের মঙ্গলেচ্ছা-সঞ্জাত শুভাশুভ সমস্ত ঘটনাতেই যে সহিষ্ণু ভক্ত সাধকপ্রবরের স্বতঃসিদ্ধ নিষ্কাম সহিষ্ণুতা, তাহাই সাত্ত্বিকী-সহিষ্ণুতা। ভক্ত-গুরুর কাছে সেই সহিষ্ণুতাই শিক্ষণীয়। নিত্য ভজনার্থ চিত্ত-গঠনের প্রয়োজনে সেই সহিষ্ণুতাই সাধনীয়।

ভক্ত কেন অসহিষ্ণু হইবেন? ভক্ত জানেন, অসহিষ্ণুতার উত্তেজক সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টই সেই বিশ্বগুরুর হাতের বেতের বাড়ি। সেই বিশ্ব-চিকিৎসকের বিকট বিষ-বড়ী! বুদ্ধিমান ছাত্র এবং জ্ঞানবান রোগী কখনও শিক্ষক-দত্ত দণ্ড পাওয়ায় এবং বৈদ্য-দত্ত বিস্বাদ ঔষধ খাওয়ায় অসহিষ্ণু হন না। পতিপ্রেম-বিহ্বলা সতী-স্ত্রীর প্রিয়তমের প্রতিকার্য্যই প্রেম-মধু-মুগ্ধ নয়নে সতত সুন্দর দেখে। সুন্দরতম প্রিয়তমের প্রতি কার্য্য সুন্দর, প্রতি কথা সুন্দর; চক্ষের দৃষ্টি, অঙ্গের ভঙ্গি, সব সুন্দর! প্রিয়তমের নিশ্বাসটি—আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত সুন্দর-সুমধুর!

আহা! বঙ্কিমচন্দ্র কি মধুরই গাহিয়া-ছেন,———

"এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোনলো মধুর বাণী।
এই মধুবনে শ্রীমধুসূদনে
দেখলো সকলে আসি॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর হাসে।
মধুর আদরে মধুর অধরে
মধুর মধুর ভাসে॥
মধুর শ্যামল বদন-কমল,
মধুর চাহনী তায়।
কনক নূপুর যেন মধুকর,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে আমার সঙ্কেতে
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে মাধুরী হেরিতে
ধৈরয নাহিক মানি॥"

সতীধর্ম্মী ভক্তের নিকট প্রিয়তম পতি ভগবানের সবই সুন্দর। তাঁহার দণ্ড-পুরস্কার, নিগ্রহ-অনুগ্রহ, সব সুন্দর। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার তত্ত্ব বা তাঁহার স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়—মধুময়! তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বসমন্বিত নামতত্ত্ব———

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং" [illegible] ভগবানের নাম-রূপ (ধাম-প্রভৃতি) [illegible] সর্ব্বস্ব [illegible] নিখিলবিলাসের [illegible] মধুময় [illegible]

"মধুরং মধুরং [illegible]
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

মধুগন্ধী মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"
মধুর মধুর বপুটি বিভুর,
মধুর মধুর বদন মধুর।
মধুগন্ধী মৃদু হাসি সুমধুর,
মধুর মধুর মধুর মধুর!

যাঁহার সব মধুময়, সব মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্যে কি কখনও দুঃখ হয়? দুঃখদ কার্য্যের কর্তৃত্ব কি সে সুখস্বরূপে সম্ভবে? অমৃত-বৃক্ষে কি বিষফল ফলে? জীবের যে দুঃখ, তাহা কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। ভক্তিভরে ভগবৎপদে প্রপন্ন হইলে সে অবিদ্যা কাটে। ভগবান নিজেই কাটিয়া দেন। অবিদ্যা ভগবানেরই জীবাবরণী মায়া। প্রপন্ন ভক্তের জৈবিক তত্ত্বের উপর হইতে ভগবান আপনি আপনার সে জাল গুটাইয়া লন। গীতায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"
আমাতে প্রপন্ন যারা।
এ মায়ায় তরে তারা॥

অবিদ্যা-মায়ামুক্ত সাত্ত্বিকীসহিষ্ণুত্ব-শক্তিযুক্ত মুখ্য ভক্তের আর দুঃখের হেতু থাকেনা। সে নিত্যপ্রসন্নচিত্তে সূক্ষ্মভাবে প্রতিকার্য্যেই ভগবানের নিত্যভজনের অধিকারী হয়। যাহা মন্দ, তাহাই দুঃখদ; যাহা দুঃখদ, তাহা অবশ্য অপ্রিয়; সুতরাং যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। ভক্তের চক্ষে ভগবানের বিশ্বৈশ্বর্য্য-লীলা-মূর্ত্তি স্বরূপ এই জগতের কিছুই মন্দ বোধহয়না। সবই সুন্দর-মধুর-সুখদ; সুতরাং কদাচ কিছুতেই অপ্রিয়তার সম্ভাবনা নাই; অতএব অসহিষ্ণুতার অবকাশ কোথায়? এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত্ত্বিক সহিষ্ণু দীন ভক্তকেই নিত্য হরি-সংকীর্ত্তনের উত্তম অধিকারী বলিয়াছেন। বিশেষতঃ অসহিষ্ণুতায় চিত্ত উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন হয়। ঐহিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও অপ্রসন্ন চিত্তের উপাসনা সে নিত্যানন্দধামে পঁহুছায় না। সংকীর্ত্তন অতি শ্রেষ্ঠ উপাসনা। অন্তরে বাহিরে সদা স্থূল ও সূক্ষ্মসংকীর্ত্তন ভক্তের জীবনাবলম্বন। সেই অবলম্বন সুদৃঢ় রাখিবার জন্যই এই সহিষ্ণুতার সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। এতাবতা শত দার্শনিকতত্ত্ব-বিচার অপেক্ষা একটি উপযুক্ত উদাহরণের ফলোপধায়কতা অধিকতর বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই সুগহন শিক্ষা-বিষয়ে কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তবে অসহিষ্ণুতার একটি অবকাশ আছে;—সেটি ভগবদ্বিরহ। বিরহ সহজে সহ্য হইলে আর মিলনের জন্য ব্যগ্রতা থাকে না। "লালসা" হইতে "মৃত্যু" পর্য্যন্ত বিরহীর উত্তরোত্তর দশা-বিপর্য্যয় কেবল অসহিষ্ণুতার ফল। ভগবদ্বিরহে অস্থির-ব্যাকুল-উন্মত্ত হইয়া মহাপ্রভু যে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" ভক্ত-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই সাধকের পক্ষে অসহিষ্ণুতার সাত্ত্বিকী কার্য্যকারিতা সর্ব্বতোভাবে শিখাইয়াছেন। ঐহিক বিষয়ে মহাপ্রভুর যেমন অসাধারণ হইতেও অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ভগবদ্বিরহে তদ্রূপ উন্মাদিনী অসহিষ্ণুতা। ঐহিক বিষয়ে ভক্তের অসহিষ্ণুতা অসম্ভব। ঐহিকে ভক্তের বাসনাই নাই। বাসনা কেবল সেই শ্রীমদনমোহনের কোমল-ক্রোড় লাভে

শ্রীপদকমলে! ঐহিক বিষয়ে যা হবার তা হউক, কিন্তু শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে চিরবিরাজিত রহুক্, ভক্তের ইহাই আশা; আর সর্ব্বাশা ইহাতেই কেন্দ্রীভূত।

ঐহিক লোক ঐহিক সামান্য বিষয়ের বিরহে অসহিষ্ণু হয়। কিন্তু ভাগবত জন ঐহিক বস্তুর বিরহ-মিলনে সমভাবাপন্ন।

"সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা
লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" (গীতা)

কিন্তু ভগবদ্বিরহ ভক্তের অসহ্য; কারণ সর্ব্বমধুময় ভগবানের বিরহটিই কেবল অমধুর, অপ্রিয়, অরুন্তুদ।

উত্তরচরিতের শ্রীরামচন্দ্র সীতার সর্ব্ব-প্রিয়তা ও সর্ব্বমধুরতা বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিলেন,——

"কিমস্যা নপ্রেয়ো যদি পরমসহ্যো ন বিরহঃ।"

অর্থাৎ আমার প্রিয়াতে অপ্রিয় কিছুই নাই, কেবল প্রিয়ার বিরহই অতি অসহ্য :— সুতরাং অপ্রিয়। ভগবান সম্বন্ধেও ভক্তের প্রাণও এইরূপ বলে;——আমার প্রাণ-কৃষ্ণের সমস্তই প্রাণতোষক, কেবল বিরহই প্রাণ-শোষক; সুতরাং অসহ্য। ভক্তের অসহিষ্ণুতা এই স্থানে। এস্থানে বরং সহিষ্ণুতারই নিন্দা।

এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীমতীর শ্রীমুখের "করুণ কথা" শ্রীরূপগোস্বামীর বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিমোহিনী ললিতমাধবে শুনুন ;—

"প্রত্যাশাতিক্রমসুখাশয়া শিথিলতা
গুরুর্জনত্রপা।
প্রাণেভ্যোহপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ॥
ধর্ম্মঃসোহপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো।
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী॥"

যার আলিঙ্গন-সুখসঙ্গ-আশাভরে।
গুরু-গঞ্জনার লজ্জা গণিনি অন্তরে॥
প্রাণাধিকা সখী তোরা-তোদিগেও হায়।
দিয়েছি কতই কষ্ট তাহারি আশায়॥
সাধ্বী রমণীর যাহা পরম ধরম।
তাহারি আশায় তাও করিনি গণন॥
তবু বেঁচে আছি হয়ে উপেক্ষিতা তার।
পাপীয়সী আমি—ধিক্ ধৈরযে আমার॥

এ বিষয়ে আধুনিক বঙ্গ-কবিও রাধা-উক্তিতে ভক্ত-হৃদয় কাঁদাইয়া গাইতেছেন,—

"প্রাণাধিক শ্যাম-বঁধুর বিরহে,
দহে দাবানল সম।
নিলাজ এ প্রাণ তবু দেহে রহে;
ধিক্! এ ধৈরযে মম॥
যেত যদি প্রাণ প্রাণনাথ-সনে,
চকোরী পাইত চন্দ।
চিত-চাতকিনী পেত নবঘনে,
বিরহে মিলনানন্দ॥
ধৈরয আমার বিষম বিপক্ষ,
দেহে প্রাণ রাখে ধোরে।
আছে অভাগীর কে হেন স্বপক্ষ,
বধিয়া বাঁচাবে মোরে॥"

অথবা————

"মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ-বরণ তুঁহু, মেঘ জটা-জুট,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
মরণরে! তুঁহু মম শ্যাম সমান॥"

যেখানে মৃত্যুই প্রার্থনীয়, সেইখানেই

সহিষ্ণুতা অনাদরণীয়। তখন অসহিষ্ণুতার বিহ্বলতা ও উন্মত্ততাই সাধকের সর্ব্বস্ব। সে অসহিষ্ণুতার স্বয়ং ভগবানের সহিষ্ণুতা পর্য্যন্ত হয়! ভক্তপ্রেমাধীন ভক্তিপ্রিয় ভগবান সেধে এসে আপনি ধরা দেন। তখন ভক্তপ্রেম-পদ্ম-মধুপ মধুর হরি আপনি ভক্তের হৃদয়মাঝে উদয় হন।

হায়! কোথায় আমরা, আর কোথায় সেই পরমর্ষিজন-স্পৃহণীয় "ভগবদ্বিরহ"! আমাদের এখন বিরহেরই বিরহ! আমাদের এখন কৃষ্ণ-বিরহের সঙ্গেই মিলনের প্রয়োজন। কৃষ্ণ-মিলন হয়ত আমাদের শতজন্মদূরবর্ত্তী নিশার স্বপন! আমরা কৃষ্ণ-বিরহ-বিরহী বলিয়াই ঐহিক অসংখ্য বিরহে অনুক্ষণ অসহিষ্ণু। অতএব সহিষ্ণুতার শিক্ষা আমাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য। হরিবিরহ জাগাইতে হরিনামই আমাদের সম্বল। বিরহ ত আছেই, কেবল বোধের অভাব। বলিতে কি, হরি যেন এখনও আমাদের "হরির খুড়ো"! নামেতে তিনি এবং নামই তিনি বলিয়াই ক্রমিক নাম-সাধনে "নাম রুচি" অর্থাৎ তাঁহাতে রুচি হইলেই, তাঁহাকে ক্রমে প্রিয় লাগিবে, মধুর লাগিবে, আর ক্রমে বিরহও জাগিবে। বিষয়-বিক্ষুব্ধ চিত্তে নাম-সাধন শুধু শব্দ-সাধন হইয়া পড়ে; এই জন্যই ত সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা। ঐহিক ভোগ-লুব্ধ বিষয়-বিক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু জীবের হরি-সংকীর্ত্তন ঠিক হয় না। তাই গৌরহরি শিক্ষাষ্টকে বলিতেছেন,—— "তরোরপি সহিষ্ণুনা——কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—

নিজের মান যাহার তুচ্ছ জ্ঞান, অথচ অন্যকে মান দিতে যিনি নিত্য যত্নবান্, তিনিই নিত্য হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। শ্লোকের এই শেষাংশেও ফলিতার্থে দৈন্যেরই উপদেশ। দাম্ভিকেরই প্রতিপদে আত্মমানের অপেক্ষা, কিন্তু ভক্ত দীনের তাহাতে অতীব উপেক্ষা। আত্মশ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধিই মান-লাভেচ্ছার জনয়িত্রী। দীন আপনাকেই হীন জানিয়া নিজ নিকৃষ্টতারই চিন্তা করেন, সুতরাং স্বীয় অমানীত্ব-বোধই তাঁহার স্বাভাবিক। অপিচ, যিনি আত্মবিনয়বৃত্তির নিত্য-নমনীয়তায় সকলকেই— অন্ততঃ অনেককেই আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ভগবদধিষ্ঠান ভাবিয়া জীব মাত্রকেই আদর করেন, তিনিই যথার্থ মানদ। পরকে মান না দিলে যেন পরাৎপরকেই মান দেওয়ার ত্রুটি হইল, এইরূপ তাঁহার মনে হয়। যিনি আপনার কৃষ্ণদাসত্ব কল্পনায় কৃতার্থ হন, তিনিই জগতের দাসত্বে আগ্রহে অগ্রসর। সুদীন ভক্ত অমানী মানদের এইখানেই বৈষ্ণবতা। এই বৈষ্ণবতার বলেই তাঁহার নিত্য হরি কীর্ত্তনের অধিকারিতা।

স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে অমানী হইয়া জগৎকে মান দিয়াছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "আপনি আচরি ধর্ম্ম, শিখাইল জীবে।" শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর স্কন্ধারোহণে সেই প্রেমবিহ্বলা ভারতীয় জগন্নাথ দর্শনের ঘটনা স্মরণ করুন। এইস্থানে অসাধারণ অমানীত্ব ও মানদত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। হরিভক্তি-দীনতার সুদীপ্ত মূর্ত্তি

প্রদর্শিত। যেমন দীনতা, তেমনি সহিষ্ণুতা; যেমন অমানীত্ব, তেমনই মানদত্ব। ফলে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক এইখানে যেন মূর্ত্তিময়। মহাপ্রভুর মহতী চরিত-লীলায় এ শ্লোকের শুক্ল সুধা দেদীপ্যমান। প্রভু-শব্দ মানের হেতু, কিন্তু যিনি প্রভুর প্রভু, যাঁহার আখ্যাই "মহাপ্রভু"—তিনি মূর্ত্তিমান অমানীত্ব। সাধারণতঃ যিনি প্রভু তিনি মানাদ (মান-গ্রহীতা), কিন্তু যিনি আমাদের মহাপ্রভু, তিনি মানদ (মানদাতা)।

"অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্"

দৈন্যের এই পঞ্চ উপকরণ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রপঞ্চে এই পঞ্চের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত। দৈন্যপোষণের উপাদান নির্দ্দেশে গীতা বলেন,—'মার্দ্দবং হ্রীর-চাপলম্।' মহাপ্রভুর মহোপদেশে এ উপাদান অজস্র বিতরিত। মহাপ্রভু স্বয়ং দৈন্যের প্রশান্ত মহাসিন্ধু; আর তাঁহার পরিকর ভক্তনিকরও এক এক জন মূর্ত্তিমান দৈন্য। এই বর্ত্তমান দাম্ভিকতার যুগে তাঁহাদের এক এক জনের অসামান্য দৈন্য-দৃষ্টান্ত "পাগলামী বিশেষ" বোধ হওয়াও অসম্ভব নয়। হরিদাস ও শ্রীরূপ-সনাতন—ইঁহারা তিনজন আত্মদৈন্যের আবেগে শ্রী শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিতেন না। তাঁহারা তাঁহার ধ্বজা ও চক্র দেখিয়াই প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতেন। শ্রীসনাতন শ্রীশ্রীগোপী-নাথ দেবের মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে যাইতে স্বীয় দৈন্যের আবেগে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির সিংহদ্বারের পথ দিয়া যাইতেন না; প্রত্যুত অত্যন্ত যন্ত্রণাকর উত্তপ্ত বালুকাপথে যাইতেন; তাহাতে পদতল বিদগ্ধ ও অত্যধিক হইলেও গ্রাহ্য করিতেন না। সনাতন ভাবিতেন, তিনি অতি অপবিত্র, অধম, সিংহদ্বার-পথে শুদ্ধ সাধুগণের সর্ব্বদা যাতায়াত; পাছে তাঁহার অশুচি-সঙ্গে তাঁহাদের অসেবা ঘটে! ধন্য এই অপূর্ব্ব দৈন্য! গৌর-লীলায়, গলিতকুষ্ঠী বাসুদেবের কি অলৌকিক দৈন্য! এহেন মহাব্যাধির মুক্তি হইলেও, তাহাতেও যেন সুখ নাই; পরন্তু পাছে তজ্জন্য অদৈন্য আসিয়া তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবতার আধার স্বরূপ দৈন্যকে দূরীভূত করে, এই ভয়! তাই মহাপ্রভুর প্রতি মহাব্যাধিমুক্ত বাসুদেবের উক্তি এইরূপ,—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে মোর অহঙ্কার জন্মিবে আসিয়া॥"

চমৎকার! এমন না হইলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গনই বা পাইবে কেন? কুষ্ঠমুক্তই বা হইবে কেন? আহা! অব্যাহত দৈন্যে কুষ্ঠ-ব্যাধিও স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যাহত দৈন্যে কন্দর্প-কান্তিও অগ্রাহ্য! দৈন্য বৈষ্ণবের বিষ্ণু-সেবা-গ্রাহ্য অন্তঃ-সৌন্দর্য্য; তাহাই যদি নষ্ট হইল, তবে কুষ্ঠমুক্তি-জনিত বাহ্য সৌন্দর্য্যে প্রয়োজন? বাসুদেবের এই ভাব! অতএব ধন্য তাঁহার দৈন্য-প্রভাব!

তৃণাদপি সুনীচত্ব, তরোরপি সহিষ্ণুত্ব, আত্ম-অমানীত্ব ও পরমানদাতৃত্ব, এই চতুরঙ্গসমন্বয়ই দৈন্যের প্রধান উপাদান। বৈষ্ণবের অত্যাবশ্যকীয় দৈন্যের শিক্ষাই শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকটির সমগ্র উদ্দেশ্য। এই দৈন্যের সমন্বয় পরমাত্মা হরির আকর্ষণী।

"আমি কিছু নই, তুমিই সকল।
তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র কেবল॥
তুমি খেলোয়াড়, আমি পুতুল।
'আমি আমি' শুধু আমারি ভুল॥"

সকলই তোমার, ভুলটি কেবল আমার! তা এটিও তুমি গ্রহণ কর, সকল লেঠা চুকিয়া যাউক্। আত্মনিবেদনার্থী ভক্তের ভগবৎপ্রতি এইরূপ আত্মোক্তি। ভগবান কিন্তু ঐটি নিতে সহজে সম্মত নহেন। জ্ঞান-যোগে ওটি ভগবানে সমর্পণ কলিযুগে বড় কঠিন, তাই ভক্তিযোগের সুলভ ব্যবস্থা। আর একমাত্র ভগবন্নাম-সাধনেই সে ভক্তি-যোগের সিদ্ধি; কিন্তু নিরপরাধ নামসাধন চাই। এই নাম-সাধনে শ্রবণ-কীর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে। বিশেষতঃ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-মনন সবই হয়; সেইজন্যই হরি-সংকীর্ত্তনের এই বিশ্বব্যাপী গৌরব। তার-পর, এই হরিসংকীর্ত্তন বাহিরে সাময়িক ভাবে থাকিলেও, অন্তরে নিরন্তর থাকা চাই। কেবল গান গাওয়াই হরি-কীর্ত্তন নয়; কেবল বাগিন্দ্রিয়-সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গই 'কীর্ত্তন' নয়; হরির নাম-রূপ-গুণ-লীলার স্মরণ মননাদি অন্তশ্চর্চ্চা বা মানস-বর্ণনও হরি-কীর্ত্তন। এবম্ভূত হরি-কীর্ত্তন সিদ্ধ হই-লেই সাধকের অন্তরকন্দরে নিরন্তর নাম-নির্ঝরিণী ঝরিতে থাকে। ফলে হরি-কীর্ত্তনের উপযুক্ত অধিকার লাভ ভিন্ন এই দেবদুর্লভ নিত্য-নাম-সেবা কাহার ভাগ্যে ঘটে? এই অধিকার লাভে সাত্ত্বিক দৈন্যই সাধকের সর্ব্বপ্রধান সহায়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে হরিকীর্ত্তনের যোগ্যাধিকারপ্রদ দৈন্য-সাধনের শিক্ষা দিয়াছেন।

যে প্রভুর জীবের প্রতি এই দৈন্য-শিক্ষাদান, তাঁহার নিজের দৈন্যলীলা কাজেই প্রকৃত দৈন্যের পূর্ণাদর্শস্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বীয় প্রিয়পার্ষদ ভক্তগণের কণ্ঠ ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, যখন নয়ন-জলে চন্দ্রবদন ভাসাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেন—"আমি অতি দীন-হীন—ভজনবিহীন, আমাকে তোমরা কৃপা কর। আমি কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙাল, তোমরা আমারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন দানকর"—তখন বুঝি পাষাণও গলিয়া যাইত, মরুভূমেও বারি আসিত! একবার মানসচক্ষে সে দৃশ্য ধ্যান করিলে দৈন্য-সাধক কৃতার্থ হইবেন।

যে প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে জগৎ মাতিয়াছে, যে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্লাবনে জগৎ ভাসিয়াছে, যে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ-বিহ্বল, উন্মত্ত-উদ্ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত-মৃতবৎ, তিনিই অসামান্য দৈন্যাবেশে বলিতে-ছেন, "হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের লেশমাত্রও আমি পাইলামনা।"

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী-বিলাস্যানন-লোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

হরিতে প্রেমের মর্ম্ম নাম-গন্ধ নাই।
তবে যে কাঁদি, সে শুধু সৌভাগ্য জানাই।
যেহেতু না হেরে বংশীবিলাস-বদন।
করিতেছি বৃথা প্রাণ-পতঙ্গ পোষণ।

শ্রীমন্ত,—

স্তুত মো। ক্ষান্তি পাপীয়া মাপরাধীচ কণ্ঠমা।
পরিহাসেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম

আমার সমান পাপী নাহি হয়।
মম সম কেহ অপরাধী নয়॥
কি আর কহিব হে পুরুষোত্তম।
পরিহারেতেও লজ্জা হয় মম॥

অপিচ,——

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবনং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।"

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবন বিনা,
বৃথা মোর দিন গেল।
শিলা-শুষ্ককাষ্ঠ সম দেহেন্দ্রিয়
ভার মাত্র সার হল॥
কেন তবে আর বিলজ্জ হয়ে,
বৃথা ফিরি হায়! সে ভার বয়ে?

লোকশিক্ষার্থ মহাপ্রভুর দৈন্য-প্রকাশক এইরূপ অনেক উক্তি প্রচারিত আছে। ফলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি-ভাবাবিষ্ট দৈন্য যে কি অসাধারণ অনুপম অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? কেবা বুঝাইতে পারে? যাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-বিলাপের অজস্র অশ্রুজলে সত্য সত্য শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাঁহার অমানুষী দীনতা মানুষের ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কলিপাবন কৃষ্ণনাম প্রচারার্থই যিনি অবতীর্ণ, যাঁহার শ্রীমুখে একবার শ্রীনাম শ্রবণ মাত্র প্রচণ্ড পাষণ্ডও সুধীর বৈষ্ণব হইয়াছে, যাঁহার উচ্ছলিত নাম-বন্যার উচ্ছ্বাসে আজ সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল, তিনি নিজে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

আমরা আর কি বলিব? যাহাহউক, ভুবনপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-লীলামৃত সেবন করিলে, বোধ হয় মূর্ত্তিমান ঔদ্ধত্য ও দম্ভেরও দৈন্যলাভ অসম্ভব নহে। ফলকথা "গৌরকৃপাহি কেবলম্।" তবে শ্রীগৌরের শ্রীচরণোদ্দেশে আমাদের ন্যায় অদৈন্য-দীনদলের জন্য একটি আর্ত্ত আদর্শ আবেদন এই যে,——

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাবনঃ।
ইতি চিত্তে সমাধায় যথেচ্ছসি
তথা কুরু।"

মম সম নাহি পাপীজন।
তব সম নাহিক পাবন॥
ইহা চিত্তে সমাধান করি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর হরি॥

এ প্রার্থনাটীও কিন্তু দৈন্যপূর্ণ! দৈন্য ভিন্ন প্রার্থনাই হইতে পারে না; "হুকুম" হইতে পারে বটে। "অনুরোধ" জন্যও কিছু দৈন্য চাই। তবে অদীনের দৈন্য-প্রার্থনার্থ যেটুকু অগ্রিম দৈন্য চাই, তাহা গৌর-কৃপায় দৈন্য-প্রার্থনার প্রয়োজন-বোধের পুরস্কার স্বরূপেই পাওয়া যায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রয়োজন-বোধের উপায় কি? এইরূপে "শিকলি-গাঁথা" প্রশ্নপরম্পরা চলিতে পারে। শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনবাক্য অনুসারে তাহার উত্তর-পরম্পরাও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা অনন্ত——অফুরন্ত। কলিতার্থে এই অনন্তপার কেবল প্রশ্নোত্তরই মাত্র। অতএব এ বিষয়ে উপসংহারে আমাদের এই মাত্র নিবেদন যে, সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থে 'আদ্যৈ

শ্রদ্ধা ইহাই শাস্ত্রোক্তি; সাধুসঙ্গাদি ক্রমে তাহার পরে পরে। অতএব এই শ্রদ্ধাটি যেন স্বয়ম্ভূ তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ "শ্রদ্ধা" অর্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে চলিত কথায় 'মনের টান' বা 'ঝোঁক' বলা যায়। (ইংরাজীতে Tendency বলা যাইতে পারে।) এইটিকে আপাততঃ যেন স্বভাব-সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রও সাধন-ক্রম প্রদর্শনের একটা মূল ভিত্তির আবশ্যকতায় সেইরূপই ধরিয়া লইয়াছেন; ফলে কিন্তু কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। শ্রদ্ধারও কারণ আছে। অনাদি-অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টির সহিত সৃষ্ট জীবের কর্ম্মবন্ধ-পরম্পরাও অনাদি অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য! দর্শনশাস্ত্র এখানে হাবুডুবু খাইয়াছেন; অগত্যা 'অনাদি অনন্ত' তত্ত্বেই ইতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জ্ঞান-মার্গের এই জটিল কুটিল সিদ্ধান্ত-রহস্য ভক্তিমার্গে আসিয়া ভগবদিচ্ছা-তত্ত্বে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তারপর ভক্তিভজ-নাদীর অত্যাবশ্যকীয় "আশাবন্ধ" বিধানার্থে কৃপাময় ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন "ভগবৎকৃপা"। যদি "শ্রদ্ধা" এই ভগবৎকৃপার হেতু বলা যায়, তবে শ্রদ্ধার হেতুও আবার এই ভগ-বৎকৃপা! ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভগবৎকৃপা! ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তে মূল ভিত্তিই ভগবৎকৃপা। অখিল ধর্ম্ম-মূল বেদ ঘোষণা করিলেন,—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। এ ব্রহ্ম অবশ্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম নহেন। নির্গুণে কৃপা-গুণ অসম্ভব। তাই পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র বেদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা সংক্ষেপতঃ ভগবৎকৃপাই সার। এই ভগবৎকৃপাবলে চরমে কৃষ্ণদাসত্ব বা ভগবৎসেবানন্দ লাভই জীবের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। কলিযুগ-পাবনাবতার কৃপাময় শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া ইহার কালোপযোগী সুগমপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই পথের সম্বল হরি-নাম প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল গৌর কৃপা-বলেই জীবের সে সম্বল লাভ হয়। অতএব "গৌরকৃপাহি কেবলম্।"

"গৌর-কৃপা সর্ব্বসার।
গৌরকৃপায় জীবোদ্ধার॥

গৌর-কৃপা-বলে তবে গৌর-কৃপা চাই।
গৌরকৃপা পেলে কৃষ্ণ-সেবানন্দ পাই॥
গৌরপ্রেমানন্দে সবে হরি বল ভাই॥"

—:—

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত।]

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

## বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—•:০:•—

শূদ্রের বেদাধিকার-বিচার।

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

(১১।১২)

—:—

৩৪। শূদ্রস্য তদনাদর শ্রবণাৎ-দাত্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

৩৫। ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চোত্তরশ্চ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

৩৬। সংস্কার পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ।

৩৭। তদভাব নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।

৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।

৩৯। কম্পনাৎ।

৪০। জ্যোতির্দর্শনাৎ।

৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ।

৪২। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন

৪৩। পত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

—:—

৩৪। আত্ম অপ্রশংসা শ্রবণে দুঃখকর্ত্তৃক প্রচালিত হওয়াতেই 'জনশ্রুতি' 'রৈক' কর্ত্তৃক "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্র-জাতীয়ত্ব-হেতুতে নহে।

৩৫। চৈত্ররথের সহিত একত্রে উল্লেখিত হওয়াতেই জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমিত হইয়াছে।

৩৬। উচ্চ ত্রিবর্ণের উপনয়ন-সংস্কার থাকায় এবং শূদ্রের তাহা না থাকায়, শূদ্রের বেদে অনধিকার বিহিত হইয়াছে।

৩৭। সত্যকাম জাবাল শূদ্র নহে, বুঝিয়াই গৌতম তঁাহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন; এই জন্যও শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৮। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও শূদ্রের বেদ-শ্রবণ-অধ্যয়ন বারিত হওয়াতে, শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩৯। প্রাণই ব্রহ্ম, যেহেতু বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থই ইহাতে কম্পিত হয়।

৪০। ব্রহ্মই, জ্যোতিঃস্বরূপ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হওয়াতে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪১। আকাশ নাম-রূপ-উপাধির অতীত উক্ত হওয়ায়, "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৪২। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ বোধ হইলেও, তত্ত্বতঃ উভয়ের একত্ব উক্ত হওয়ায়, জীবাত্মা না বুঝাইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

৪৩। "পতি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

———০———

৩৪হইতে ৩৮সূত্র পর্য্যন্তের বিষয়, শূদ্র যে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী, তাহা প্রমাণ করা। ফলে এ প্রামাণিকতা "শূদ্র" পদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের প্রতিই নির্ভর করে। যাহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা মানসিক শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শে উপনীত হইতে পারেনাই, তাহারাই যদি প্রকৃত পক্ষে "শূদ্র" অভিবাচ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেরূপ শূদ্র-লক্ষণ অপর উচ্চতর ত্রিবর্ণের মধ্যেও বিস্তর লক্ষিত হইবে। যদি কেবল গুণানুযায়ী জাতিবিচার না ধরিয়া জন্মানুযায়ী জাতি-বিচারই ধরিতে হয়, তবে প্রাচীন কালে অনেক অনার্য্য জাতীয় ব্যক্তিও যে উচ্চতর আর্য্য-বর্ণত্রয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত-প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইবে। পুরাকালে যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, এবং তঁাহারা পরস্পর পরস্পরের অবনয়ন ও স্বজাতীয় উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণ বীর পরশুরামাবতারের অভ্যুদয়। তিনি অনার্য্য জাতীয়কেও গুণোন্নয়ন মতে ব্রাহ্মণত্ব দিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্পোষণ ও বলবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ উদাহরণ ভূরি পরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদ-স্বাধ্যায়ের সদুপযোগিনী বিদ্যা-শিক্ষার অভাবই যদি শূদ্রত্ব হয়, তবে তাহা সর্ব্ববর্ণের প্রতিই খাটে, এবং তাহাহইলে শূদ্রের বেদাধিকারের নিষেধবিধির কোন সার্থকতা থাকেনা। মূর্খেরা ত বেদের কাছে ঘেঁষিতেই পারে না, ঘেঁষিবেও না। তবে আর কাহাদিগকে নিবারণ করিতে উক্ত নিষেধ-বিধির প্রয়োজন হইবে? প্রথমে আমরা দেখিব যে, উক্ত বিষয়ে বাস্তবিক সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য কি এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, তঁাহার স্বাভাবিকী সদুদার-নীতি সত্বেও উক্ত সূত্রাবলীর ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে তাৎকালিক সমাজ ও কালধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় কিরূপ সংকীর্ণতায় পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫শ সূত্রের উক্তি এইরূপ যে, মনুষ্যগণ বেদ-স্বাধ্যায়ের অধিকারী; কিন্তু এই "মনুষ্য

পদে উপযুক্ত শিক্ষাধিকারসম্পন্ন মনুষ্যকেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজ ত্রিবর্ণের মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। মীমাংসা দর্শন বলেন যে, দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কারই বেদ-স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত হইবার অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রাথমিক অনুষ্ঠানবিশেষ; উহা দ্বিজ ত্রিবর্ণের জন্য; উহা শূদ্রজাতির জন্য বিহিত হয় নাই।

৩৪ হইতে ৩৮ সূত্র পর্য্যন্ত, এই পঞ্চ সূত্রের প্রতিজ্ঞাও ঐ একই বিষয়ের প্রতিপাদ্য, এবং শূদ্রের বেদাধিকার প্রতিপাদনের অনুকূল তর্কসমূহের খণ্ডনই তাহার বিষয়। উক্ত খণ্ডনসমূহ বক্ষ্যমাণ বেদান্তসূত্রে যে ভাবে পরিব্যক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এমন কি, সূত্রগুলির সংগঠন-সময়েও শূদ্রগণের বেদাধিকারের অনুকূল অভিমত সূত্রকারের স্বশ্রেণীস্থ অনেকের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল; নচেৎ উক্ত খণ্ডনসমূহের কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়োক্ত জনশ্রুতি ও রৈক-আখ্যান দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে যে, "শূদ্র" পদের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক, উক্ত পদে পরিচিত জাতীয়ের বেদে অনধিকার; কিন্তু উক্ত জনশ্রুতি ও তৎপরবর্ত্তী সত্যকাম জাবালের আখ্যানে শূদ্র যে বেদে অনধিকারী নয়, তাহারই বরং অনুকূলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় তাহার বিপরীত প্রমাণেরই প্রযত্ন করিয়াছেন।

আখ্যায়িকাটী এইরূপ,—জনশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি বদান্য, পরোপকারপরায়ণ ও অতিথিসেবী ছিলেন। তাঁহার পুরী হইতে কেহই অভুক্ত যাইতে পারিত না। একদা একদল রাজহংস তাঁহার রাজপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তীটি রাজা জনশ্রুতির প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী রাজহংসটি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, "রাজা জনশ্রুতির যশ রৈকের যশের সহিত কোন ক্রমেই তুলনীয় নহে।" পরদিন প্রাতঃকালে যখন প্রথা রীত্যনুসারে ঐ রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছিলেন; তৎকালে সেই রাজহংসের বাক্য তাঁহার বিশেষ স্মরণ থাকায়, তিনি রৈকের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া, ছয় শত পালিত গবাদি, একগাছি কণ্ঠহার ও যুগল-বড়ব-বাহিত এক রথ উপহার স্বরূপ লইয়া, রৈক-পূজিত দেবতার সাধনশিক্ষা লাভের প্রার্থনায় রৈক-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তখন রৈক প্রায় অর্থলোভী বর্ত্তমান পুরোহিত দলের প্রাচীন আদর্শ স্বরূপে বলিয়া উঠিলেন—"হে শূদ্র! এই সমস্ত পশ্বাদি, কণ্ঠহার ও রথ তোমারই থাকুক।" জনশ্রুতি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; পরন্তু পুনরায় সহস্র পশু, কণ্ঠহার, বড়বযুগ-বাহিত রথ এবং অধিকন্তু তাঁহার এক রূপসী যুবতী কন্যা উপহার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন এই তথাকথিত ঋষি রৈক পশু ও স্বর্ণাদির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেও এই যৌবনী কন্যার মোহ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন "হে শূদ্র! তুমি

কি ইহাকেও আমার জন্ত আনিয়াছ? যদি তাহা হয়, তবে এই কন্তাই তোমার সহিত আমার আলাপের হেতুভূতা হইবে। যাহাহউক, ইহাতেই তিনি জনশ্রুতিকে "সম্বর্গবিদ্যা" শিক্ষা দিলেন। আদি তত্ত্বের জ্ঞানই সম্বর্গবিদ্যা। তাহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নি, সূর্য্য এবং জলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বায়ুতত্ত্বগত এবং বায়ুর মূল সত্তা ব্যোমই জড় জগতের আদি মূল সত্তা। জীব পক্ষে জীবনই বৈদিক তত্ত্বের মূলতত্ত্ব। বাক্য, চিন্তা, সংকল্প, মন, এ সমস্তই মূলজীব-তত্ত্বগত; তাহাতেই উদ্ভূত, তাহাতেই বিলীন। বায়ু এবং প্রাণ যুগল মূলতত্ত্বোক্ত যুগল তত্ত্ব, ইত্যাদি। যাহা হউক, এই প্রকার সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ জনশ্রুতির প্রদত্ত মহার্হ উপহার নিচয়ের সমযোগ্য হইয়াছিল কি না, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। যদি তিনি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমূলর অতি সুযোগ্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রৈকের প্রদত্ত শিক্ষা জনশ্রুতির প্রদত্ত বৃহৎ উপহারের যোগ্য হয় নাই। সে যাহাই হউক, বিচার্য্য বিষয় এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, কিম্বা কেবল রৈক কর্ত্তৃক অবজ্ঞার সহিত "শূদ্র" আখ্যায় অভিহিত। জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র, অথবা ক্ষত্রিয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। ৩৫ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়ই হইবেন; নচেৎ সেই একই অধ্যায়ে রৈকপ্রদত্ত সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দান প্রসঙ্গে জনশ্রুতির সহিত ক্ষত্রিয় চৈত্ররথের নামোল্লেখ হইবে কেন? কারণ, একই বিষয়ে পরস্পর সমধর্ম্মী বস্তুদ্বয়েরই একত্রে উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণে, মহাভারতে এবং এমন কি, বেদেও আর্য্য ও অনার্য্যের বহু স্থলে একত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা পরস্পরের জাতি-বিপর্য্যয়-সংঘটন অপ্রমাণিত।

অতঃপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, জনশ্রুতির বন্দী, দূত, রথ, ধনসম্পদ ইত্যাদি রাজন্য-জন-সুলভ যত কিছু ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারেন। এ যুক্তিও অদৃঢ়, কারণ পুরাকালে ভারতবর্ষে অনেক অনার্য্য রাজা ছিলেন এবং তাঁহারা তাৎকালিক ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বন্ধুতাদি বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন কালে জনৈক অনার্য্য রাজা গুহকের ভবনে কি ভাবে উপনীত ও তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির সমাগমে যেরূপ তাঁহাকে অভিভাবক স্বরূপ গুরু-গৌরব দানে সমাদরে সসম্ভ্রম-সম্বর্দ্ধনা করে, গুহক ঠিক সে ভাবে রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করেন নাই; পরন্তু পরমপ্রেমাস্পদ প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্ঞানেই স্বকাসনে বসাইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত যাত্রার আসরে বা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে গুহককে অতি নীচ চণ্ডাল রূপে প্রদর্শিত ও রামচন্দ্রকে সমুচ্চ ক্ষত্রিয়রাজ রূপে প্রদর্শিত করা হয়। এতদ্দেশে এবম্বিধ অভিনয় সচরাচর সকলেই দেখিয়াছেন। অন্ততঃ রাম-গুহক-মিলন পরস্পর সমযোগ্য বন্ধু

ভাবেরই মিলন; আর্য্য-অনার্য্যের গুরুত্ব-লঘুত্বগত উচ্চনীচ মিলন নহে।

অপর, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, জনশ্রুতি শূদ্র হইলে কদাচ ব্রাহ্মণ রৈক তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতেন না। এ যুক্তিরই বা দৃঢ়তা কোথায়? আর্য্য-অনার্য্যের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদাহরণ বিস্তর বর্ত্তমান। অনার্য্য দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে ঋষিরাজ পরাশর বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাদেরই সুবিখ্যাত পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মাতৃবর্ণানুসারে বেদব্যাসের অনার্য্যত্ব থাকিলেও, তিনিই তৎসাময়িক ঋষিবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া অসংখ্য শাস্ত্র-পুরাণাদি প্রণয়ন করেন এবং বেদের 'ব্যাস' অর্থাৎ বিভাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'বেদব্যাস' উপাধি লাভ করেন। জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতীর পুত্র আস্তিকই আর্য্যানার্য্যের বিখ্যাত বিবাদ-বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রের বিরাট ভাণ্ডারে এবম্বিধ ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইতে পারে।

সূত্রকার এবং টীকাকারের মত এই যে, জনশ্রুতি বাস্তবিক শূদ্র নহেন; কিন্তু হংস-মুখে আপন অপেক্ষা রৈকের প্রশংসাবাদ শুনিয়া তিনি যে তামসধর্ম্মরূপ দুঃখে বিচলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার "শূদ্র" অভিধানের হেতু। "শুচাদ্রবতীতি শূদ্রঃ"—অর্থাৎ যে শোকের দ্বারা প্রচালিত, সেই শূদ্র। এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ অনুসারেই জনশ্রুতির শূদ্রত্ব দুঃখ-প্রতিষ্ঠিতচিত্ততা জন্যই তাঁহার শূদ্রাখ্যা; ফলিতার্থে তিনি প্রকৃত শূদ্রজাতীয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,— "কথং পুনঃ শূদ্র শব্দেন সুশুৎপন্না সূচ্যতে ইতি উচ্যতে তদা দ্রবণাচ্ছুচমভিদুদ্রবে শুচা বাভি সুদ্রুবে শুচা বা রৈকমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থ সম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ।"

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, জনশ্রুতির অন্তরোদ্ভূত শোক তৎপ্রতি প্রযুক্ত "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতে পারে কিনা? বাস্তবিক 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা শোক সূচিত হয়, সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি সেই শোকের দ্বারা বিচলিত ও অভিভূত হইয়াছিলেন। শোক তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত বা তিনি শোকে সমাচ্ছিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার শোকবেগ তাঁহাকে রৈক-সমীপগত করিয়াছিল। আমাদের মতে শঙ্করের ইহা শূদ্রত্ব-সূচিকা কষ্টকল্পনা মাত্র। আলোচ্য-স্থলের শূদ্র-সম্ভাষণ অনেকটা আলঙ্কারিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান বিতর্কে শঙ্করের যুক্তির সার এই যে, জনশ্রুতি রাজহংস-সম্বাদে বাস্তবিক বিষাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কথিত রৈক ঋষি তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে "শূদ্র" সম্বোধন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যায় যিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, তিনি হউন; কিন্তু আমাদের মনে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এতদ্দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার-প্রতিপাদনের সম্ভাবনা নিবারণোদ্দেশেই ভাষ্যকার ঐ প্রকার অসরল ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতঃ সুযোগ্যাধিকারী শূদ্রগণ কদাচ বেদ-বাখ্যানে বঞ্চিত হন নাই। যজুর্ব্বেদে স্পষ্টই উক্ত

হইয়াছে,—"যথেমং বাচং কল্যাণীম্ বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়।"

এ কল্যাণী বেদবাণী
উচ্চারিয়া বলি আমি—
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গণে,
শূদ্র আর বৈশ্য জনে।

স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যজাতিই শূদ্র হউক, আর মূল আর্য্যজাতিরই কোন অধস্তন শাখাবিশেষই শূদ্র হউক, ফলে শূদ্রের বেদাধিকার যে বৈদিক সময়ে বারিত হইয়াছিলনা, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, বেদাধিকারে শূদ্র-বারণ বিধির প্রবর্ত্তনা হইলেও, তাহা কার্য্যতঃ সেরূপ ছিলনা। তখনও স্বীয়গুণে সুযোগ্যাধিকারী শূদ্র বেদ-স্বাধ্যায়ে সমর্থ হইতেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সত্যকাম-জাবাল-সংবাদে সুপ্রতিপন্ন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই শূদ্র-বেদ-বারণ-বিধি বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"ইহা সাধারণতঃ অনুমিত হয় যে, ভারতীয় চতুর্থ জাতি শূদ্র প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসী বলিয়া জাত্যংশে বস্তুতঃ তাহাদের বিজেতা আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, এবং এরূপও হইতেপারে যে, (কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নাই) প্রকৃত আর্য্য-সন্তান হইয়াও কার্য্যদোষে, গুণাবনতির জন্য তাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যাধিকার-বিচ্যুত শূদ্রের তুল্য, সামাজিক নীচত্ব অথবা [illegible] জাতিনীচত্ব বা [illegible] প্রাপ্ত। [illegible] দারিদ্র্য ও অন্যান্য বিবিধ দোষদুষ্ট অবস্থায় পড়িয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণের নিম্নে শূদ্রস্থানীয় হইয়াছে, তাহারা বেদাধ্যয়নবিদ্যায় বারিত হয়নাই। অনেক সময়ে অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মনে প্রকৃত শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়ে বিতর্ক উঠিয়াছে; কিন্তু অবশেষে তাঁহারা সেই নিষেধ-বিধিতেই লাগিয়া রহিয়াছেন। ফলে উপনিষদের বিবিধ বাক্য-প্রমাণে ইহা অনুমিত হয় যে, অন্ততঃ পুরাকালে উক্ত নিষেধ-বিধির বিশেষ দৃঢ়তা ছিলনা। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্র আমরা অবশ্য বিস্মৃত হইবনা, যাহাতে স্পষ্টই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রহ্মা হইতে শূদ্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। অপর, ইহা অবশ্য অপ্রকাশিত নহে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সহিত সমভাবাভাবীই ছিলেন। উপনিষদে অন্ততঃ জনশ্রুতি ও সত্যকাম, এই দুইজন সম্বন্ধে শূদ্রের বেদাধ্যাধিকার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে ৩৫ সূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য আলোচনায় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, শূদ্র শব্দের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট অর্থ জনশ্রুতি বিষয়ক উদাহরণে প্রচলিত ও প্রবল থাকার কোন সুযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয়না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ কোন শূদ্রত্বসূচক রূপক অর্থ পরিগৃহীত বা প্রতিপন্ন হয় নাই। যদি শূদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বীকার না করিয়া, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, তবে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যে কোন কারণে শোকাভিভূত হওয়াতেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কেন না বলা হয়? "শূদ্র" শব্দে এমন কিছুই নাই, যাহাতে তদভি-

বানীগণ বেদাধিকার-বঞ্চিত হইতে পারে। আর বেদেও তাহার সমর্থক কোন বচনঃ প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জনশ্রুতির শূদ্রাভিধান প্রচলিত অর্থানুসারে পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবই বা কেন? বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থানুসারে জনশ্রুতি কোন অনার্য্যবংশ-সম্ভূত শূদ্র রাজা হওয়া কি অসম্ভব? আর তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য উপযুক্ত গুরু-প্রণামী সহ রৈক্কের শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু রৈক্ক আধুনিক লুব্ধ ও কোপন গুরু-পুরোহিতের ন্যায় প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও অবশেষে সেই শূদ্ররাজের সুন্দরী কন্যার সুন্দর মুখের মোহে পড়িয়া পরে তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, ইহাই বা অসম্ভব কি?

অধুনা ভারতীয় অনেক জাতিই "শূদ্র" বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। তর্ক-স্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহা-দিগকে আমরা বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা তদিতর একটি ভিন্ন জাতি, তাহা হইলেই বা সেই শূদ্র-জাতীয়ত্ব কোনরূপ লজ্জার বিষয় কিরূপে হইতে পারে? ভারতবর্ষের একজন সর্ব্ব-প্রধান সম্রাট অশোক শূদ্র চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র। যে বাসুকির সহিত বিখ্যাত আর্য্যরাজগণের বিবিধ বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি শূদ্র ছিলেন। শূদ্র অনার্য্য হইলেও বেদে তাহাদিগকে শক্তিশালী জাতি বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সুন্দর নগর সমূহ, সুবিস্তীর্ণ সুরম্য উদ্যান সমূহ, সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ এবং পাষাণ বা লৌহময় দুর্গ-সমূহের বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লইয়া যে আর্য্য জাতির সহিত তাহাদের সমর-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাঁহাদের অপেক্ষা সভ্যতায় তাহারা অত্যধিক হীন বলিয়া বোধ হয়না। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান শূদ্রগণ তাহাদেরই উত্তর পুরুষ হন, তবে তাহাতেও কিছু মাত্র লজ্জা বা হীনতার কারণ নাই। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভীম ও অর্জ্জুনের অনার্য্যবংশীয়া সহধর্ম্মিণী ছিল এবং তাঁহাদের প্রপিতামহী সত্যবতী স্বয়ং অনার্য্য রাজার কন্যা ছিলেন। আমাদের জগদ্বিখ্যাত রামচন্দ্র বিভিন্ন অনার্য্য জাতির সামরিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াই সেই অশেষশক্তিসম্পদ-সম্পন্ন অনার্য্য রাজা রাবণকে সবংশে সংহার করিয়াছিলেন। ফলে এই আর্য্য-অনার্য্য, দেব-অসুর বা নর-রাক্ষস প্রভৃতি জাতি আদিমূলে একই সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত; সুতরাং রাবণাদির জাতীয়তাও তদুদ্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্নতা বা বৈপরীত্য, ক্রমে উত্তর পুরুষ-পরম্পরায় বিবিধ কারণে সংঘটিত হইয়াছে। ফলতঃ সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্য-অনার্য্যের ভেদ অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর। যদি পুরাকালে তাই হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে উক্ত ভেদের বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা কিছুই নাই, এবং শতশত শতাব্দী হইতে বিবিধ কারণে শতশত জাতির মিশ্রিত শোণিত আজ ভারতীয় হিন্দু-ধমনীতে প্রবহমান। জাঠ, রাজপুত, গুর্খা, এখন সকলেই হিন্দু। রাজপুতেরা রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষত্ব দাবী করেন,

কিন্তু ইতিহাস দ্বারা কি ইহা ঠিক প্রমাণিত হয়? যাহাহউক, রাজপুত যদি এক্ষণে নিজ জাতিতে সূর্য্যবংশীয়শোণিতের অবিকৃত অস্তিত্ব ঠিক প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে কি তিনি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগে মানবের বিবিধ-বিষয়িণী উদারতা বিবিধ প্রকারে বর্দ্ধিতা হইলেও, জাতীয়তার অধিকার-অনধিকারের ঘোঁট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না; বরং যখন ভারতীয় জন-সমাজ আপনাদের জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই খবর রাখিত না, তখন যেন ইহার এত অধিক বাঁধাবাঁধি বা বাড়াবাড়ি ছিলনা।

যাহাহউক, আমরা আবার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যালোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন যে, স্মৃতি শূদ্রের বেদাধিকার বারণ করিতেছেন, যথা— "যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কারবশাৎ বিদুর-ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তি প্রতিবদ্ধং, জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগম চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার-স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।" অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত শূদ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-সিদ্ধ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে স্বতএব অবারিত, কারণ ঐকান্তিক জ্ঞানের ফল জন্মজন্মান্তর-নির্ব্বিশেষে অবিধ্বংসী। স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে অধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।

"শূদ্র" শব্দের যেরূপ অর্থই গৃহীত হউক না কেন, মন্বাদি স্মৃতি যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে ইতিহাস-পুরাণইবা কি? মনে করুন, মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা উপনিষৎসমূহের সারসংগ্রহ স্বরূপ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। গীতা-মাহাত্ম্যে ত স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,

"সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধাগোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃসুধীর্ভোক্তাদুগ্ধংগীতামৃতংমহৎ"
সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী, দোহাল গোপাল সুত।
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা দুগ্ধ মহাগীতামৃত॥

ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি-সমূহ-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র তবে কিরূপে শ্রুতি-অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্তের সূত্র ও টীকাকারের মতে তাহা হইলে গীতাধ্যয়নও শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাত হইতেছে না। গীতাতে শূদ্রাদি স্বচ্ছন্দে শ্রুতি আবৃত্তি করিতেছেন! এখন মনে করুন, গোলাপকে অন্য নামে ডাকিলে কি তাহার গোলাপত্ব নষ্ট হয়? যাহা কার্য্যতঃ সংঘটন, তাহা শত শাস্ত্রবচনেও ব্যাহত হয় না। "বচন-শতেন বস্তুনোঽন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে শ্রুতিসারসংগ্রহ, তাহা পণ্ডিতগণের সুবিজ্ঞাত; অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী-শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত

বা ব্যবস্থিত রহিয়াছে ! বস্তু একই, কেবল "বেদ-বেদান্ত" না বলিয়া "পুরাণ-ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র ! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও কতিপয় উপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা অবাধে শূদ্রাদির অধীত হইতেছে। কঠশ্রুতির নচিকেতোপাখ্যান ও তাহার কতিপয় শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত এবং সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য ; কিন্তু সেই মূল কঠশ্রুতিই মাত্র শূদ্রের অধিকারাতীত ! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে ? ফলিতার্থে ইহা সাধারণ-জ্ঞান-বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কুফল মাত্র। কতকগুলি লোক এই জ্ঞান-বিস্তার বিরোধিনী সঙ্কীর্ণা নীতির চিরপক্ষপাতী ; আবার কতকগুলি উদারনৈতিক লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী। একটি সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সুপবিত্র শিক্ষায় চিরবঞ্চিত রাখা কদাচ তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাঁহারা কদাচ এই বিদ্বেষ-বিদূষিত স্বার্থসঙ্কুচিত সাম্বাতিক মতের পরিপোষক নহেন।

ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদান্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক গর্ব্বিত-বিপ্রপুত্রও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদ-বিদ্যালাভার্থে প্রপন্ন হইতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে যে শ্বেতকেতু আরুণি এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের আখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্ম বিদ্যালোচনায় কতদূর অধিকার ছিল, তাহা জানা যায়। আখ্যানটি এইরূপ, ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু একদা রাজন্য প্রবাহণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ বালক তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বালক শ্বেতকেতু স্বীয় পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া, অভিমান ব্যথিত-ভাবে-রাজার কৃত-প্রশ্ন ও স্বকীয় উত্তরদান-অক্ষমতা নিবেদন করিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন, এমন কি, তিনিও তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তৎপর পিতা উক্ত রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমার ভাণ্ডারের ঐহিক-দ্রব্যরাশির মধ্যে আপনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাহাই প্রার্থনা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ও সব অনিত্য ধন আপনাতেই থাকুক, আমি উহার প্রার্থী নহি। হে রাজন্ ! আমার পুত্রকে আপনি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাখ্যা করুন। "রাজা কহিলেন" কোন ব্রাহ্মণই ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না, পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সমর্থ।

"স হ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।

শঙ্করাচার্য্য ইহার তাঁৎপর্য্য এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তৎকালে উক্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না; ক্ষত্রিয়েরাই উহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন এবং উহা পুরুষ পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতেই নিবদ্ধ ছিল। এতাবতা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষত্রিয় উক্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন, তবে কেবল প্রবাহণের ন্যায় উদারচেতা রাজন্যগণই তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোন পার্থক্য বিধান করেন নাই।

তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐরূপ আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ 'আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি" এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা আপনারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উদ্দালক সমীপে গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত-উত্তর দানে অক্ষম হইলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন; রাজা অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্য-শাসন সম্বন্ধীয় কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন, এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে ও কোন দস্যু তস্কর নাই, কোন কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই; মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণীও নাই" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আসেন নাই; তাঁহারা ধনের প্রার্থী নহেন; তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী। এতচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমি আগামি কল্য এ বিষয় আপনাদিগকে বলিব। তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষা-লাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম-সমিধাদি সহকারে তাঁহারা রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরং মধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। তেভ্যাহ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার সহ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নাহিতাগ্নি র্নাবিদ্বান্ স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি॥ তে হোচুর্যেন হৈবা র্থে পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি তান্ হোবাচ* প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈব বৈ তদুবাচ।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয় সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ উপস্থিত হইতেন; কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র নহে, পরন্ত

পুরাণাদি সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদবিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য, শূদ্রজার পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ কর্ত্তা, এবং তাঁহারই প্রামাণিক নায়কত্ব মতে শূদ্রগণ বেদাধিকারে বঞ্চিত! যাহাহউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্যকার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যাধিকারের জয় অপ্রতিহত; এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, "যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে। ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক-সমাজের উক্তবিষয়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকারবিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিভেদে বস্তুতঃ শূদ্র নহে; অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে যাহারা বাস্তবিক "শূদ্র" অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদাধিকার নিশ্চিত অবারিত। স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদ-বিরোধিতায় তাহা অপ্রযোজ্য, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অথবা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়; যথা—স্মৃতিশাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু গুণ-কর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে! এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্টকল্পিত, যুক্তিযুক্ত, ন্যায়বিচারপূত ও বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতি সমূহের উক্ত নিষেধোক্তি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবিতর্কিতভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচপ্রকৃতিধারী ও হীনকার্য্যকারী, অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় স্বতঃই অনধিকারী সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষাশাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব জন্ম ও জাতিগত হইয়া পড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে; এমন কি এহেন শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

আরও দেখুন, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারেই আমি বর্ণবিভাগ করিয়া এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্ট গুণ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যম গুণ অর্থাৎ রিপুর উত্তেজনা—অথচ

কর্ম্মকারিতা প্রদ রজোগুণ প্রবল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং রজস্তম মিশ্রিত মধ্যমাধম-গুণ-সম্পন্নগণ বৈশ্য, আর অজ্ঞানতাপ্রদ সর্ব্বাধম তমোগুণ ভূয়িষ্ঠ মানবগণই শূদ্র। আবার শিক্ষার উন্নতি-অবনতিতে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। কখনও সাত্ত্বিক ব্যক্তি শিক্ষা ও সঙ্গদোষে রাজস—তামস হইয়া পড়িতেছে; কখনওবা শিক্ষা ও সঙ্গাদিগুণে রাজস তামসগণও সাত্ত্বিক হইতেছে। এই তিনগুণ দেশ কাল পাত্র বিশেষে পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইতেছে। যথা গীতা—(১৪।১০)

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বংতমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা॥
অভিভূত করি রজস্তম গুণদ্বয়।
হে ভারত! সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়॥
রজোগুণ বাড়ে যার সত্ত্ব তম পড়ে।
সত্ত্ব রজ অভিভবে তমোগুণ চড়ে॥

অতএব তমোগুণ প্রধান শূদ্রদেরও একেবারে নিরাশ হইবার কথা নহে; তাঁহারাও শিক্ষা সঙ্গগুণে তমোভাবকে অভিভূত করিয়া এবং উন্নততর গুণসম্পন্ন হইয়া বেদবিদ্যাধিকার লাভ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত-তত্ত্ব এবং পুরাকালে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৮৮।৮৯ অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
পূর্ব্বে বর্ণের ভেদ ছিল না সব ব্রহ্মময়।
... কর্ম্মভেদে বর্ণে বর্ণে ভেদজাতি হয়।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, শাস্ত্র মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য ও অপর আধ্যাত্মিক গুণনিচয় অধিকার করিয়াছেন, এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বীরধর্ম্মের সাধক ও তদানুসাঙ্গিক গুণাবলী ধারক, এবং বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা কৃষি বাণিজ্য পশুপালন কারী এবং আনুসাঙ্গিক অপর কতিপয় গুণাধিকারী বেদাধ্যয়নশীল, তাহারা বৈশ্য, কিন্তু যাহারা একেবারে বেদ-বিদ্যা-বিমুখ ও বিবর্জ্জিত এবং অস্তর্ব্বাহ্যশুদ্ধ বর্জ্জিত, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের একটি বিশেষণ "ত্যক্তবেদঃ" অর্থাৎ ত্যক্ত হইয়াছে বেদ যৎকর্ত্তৃক, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে-বিমুখ, কিন্তু বেদ-অধ্যয়নেই অনধিকারী উক্তপদের এরূপ অর্থ কদাচ সরল ও সঙ্গত হইতে পারে না।

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ।
সর্ব্ব ভক্ষ্যে সদা যার রুচি,
সর্ব্বকর্ম্মকারী যে অশুচি;
ত্যক্তবেদ অনাচারী যেই,
স্মৃতি মতে শূদ্র বটে সেই।

"বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থে বেদাধ্যয়ন; অতএব যে অন্তর্বাহ্যে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতঃই ধর্ম্ম বিমুখ, বেদাধ্যয়নের তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সেই "ত্যক্তবেদ" শূদ্র। সে আপন স্বভাবদোষে স্বেচ্ছায় স্বীয় বেদাধিকার হারাইয়াছে, সমুদার শাস্ত্র সর্ব্বাংশে খিলরূপে তাহাকে বেদ-বর্জ্জিত

করে নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত-তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল শাস্ত্রবোধের ভুলক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া, "আকৃতি-প্রকৃতি-প্রাধান্যাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতীয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত। ফলিতার্থে তাহারই তিক্তবিষাক্ত ফল।

শূদ্রে চ যত্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

শূদ্র বংশে জাত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণান্বিত হয়, আর ব্রাহ্মণ-বংশে জাত ব্যক্তি যদি শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্র ব্রাহ্মণ বটে, এবং সেই শূদ্রলক্ষণ ব্রাহ্মণ শূদ্রই বটে।

গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং দোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যেরূপ বর্ণলক্ষণ বর্ণিত হইল, তদনুসারে এক বর্ণের লক্ষণ অপর বর্ণজ-পুরুষে লক্ষিত হইলে, তাহার লক্ষণানুসারেই বর্ণ-বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। তারপর স্মৃতিরাজ মানব-ধর্মশাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন;—

"[illegible] ব্যাপকাপক্ষা [illegible] : স্বকর্ম্মভিঃ"

যাহার জন্ম প্রচ্ছন্ন বা যাহার কুল অজ্ঞাত, তাহার স্বকর্ম্মদ্বারাই বর্ণ বিনির্ণয় হইবে। মনু আরও বলেন,—

তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

তপস্যা ও জ্ঞান-বলেই মানব যুগে২ জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব গুণই শ্রেষ্ঠজাতীয়তার হেতু এবং দোষ বা গুণাভাবই নিকৃষ্টজাতীয়তার হেতু। স্থলান্তরে মনুও স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্"

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। অপর একস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।"

আর্য্যপিতা ও অনার্য্যমাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে। সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গৌতম বলেন, "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।" গুণের উৎকর্ষাপকর্ষতা ফলেই মনুষ্যের বর্ণান্তর প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ও গুণাপকর্ষে অপকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অপর, মনুর পরেই বিখ্যাতনামা ব্যবস্থাশাস্ত্রকার মহামুনি অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ও অনিত্য-সংসার মোহ-মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ। যে বীর-ধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয়কর্ম্ম, সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিশুদ্ধ বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু মাংস লবণ-বিক্রয়ী, অজ্ঞ, অলসী, সেই শূদ্র। আর যে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, [illegible] ও সর্ব্ব [illegible]

-সিন-দক্ষ, সেই চণ্ডাল। অত্রির এই অভিমতে গুণ-ক্রিয়াগত জাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, গৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্ম-ভেদে বিভক্ত করিলেন। যথা বায়ুপুরাণ——

"পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ——গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ" ইত্যাদি।

হরিবংশ অবিকল বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে প্রসিদ্ধ "পুরুষসূক্ত" প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্ব্বপণ্ডিত-সমাজেই রূপক-সিদ্ধান্তে সমাদৃত, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন-বর্ণের উৎপত্তি। যথা পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। এস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে কি প্রকারে পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় প্রতিপন্ন হইবে? মুখ কাহাকে বলা যায়? বাহু কাহাকে বলে, উরু এবং পদই বা কাহাকে বলা যায়? যথা—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য, কৌ বাহূ কা উরু-পাদা উচ্যেতে।" উত্তর পরিষ্কার'—যথা ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ স্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয় স্বরূপ এবং উরু ও চরণই বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বর্ণভেদ প্রথা গঠিত হইয়া আসিলে, বর্ণভেদের পক্ষপাতিগণ ঋগ্বেদে উক্তবাক্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া আত্মমতস্থ বর্ণভেদ-বিধির প্রাচীন ও সমীচীন সমুৎপত্তি সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যাহা'হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি, পুরুষসূক্তের উক্তবাক্য জাতিভেদের মৌলিক-অস্তিত্বের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই এবং সায়ন ও মহীধর প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক টীকাকারগণও উহাকে রূপকার্থ ভিন্ন অন্যার্থে গ্রহণ করেন নাই। পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে মাত্র এই তাৎপর্য্য টুকু ব্যক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ, উত্তম ক্ষত্রিয়, মধ্যম বৈশ্য, এবং অধম শূদ্র। আর্য সমাজ দেহের অঙ্গ বিভাগ এইরূপ। সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"
বদনে ব্রাহ্মণ জাত, ক্ষত্র বাহুদ্বয়।
উরুতে উৎপন্ন বৈশ্য, পদে শূদ্র হয়॥

যদি কেহ বলে স্বর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তবে বুঝিতে হইবে যে, অবশ্য অলঙ্কারের পূর্ব্বেই স্বর্ণ, তদ্রূপ যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ মুখরূপে পরিণত হইল, তবে মুখের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাহাহউক, ব্রাহ্মণঃ মুখ, এই উভয় শব্দই একবচনান্ত হওয়াতে মুখ শব্দকেও কর্তৃকারক ধরা যাইতে পারে, এরূপ বলা যায়; কিন্তু তৎপরেই দেখা যায় যে, রাজন্য "পদ একবচন" কিন্তু বা-

দ্বিবচন এবং "কৃতঃ" পদও একবচন, সুতরাং একবচনান্ত রুদ্রের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "বাহু রাজন্যঃকৃতঃ" বাক্যে, বাহুর পূর্ব্বেই রাজন্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

উক্ত-সূক্তি দ্বারা বস্তুতঃ বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না; কেবল এতদ্দ্বারা এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, একই সমাজ-দেহের চতুরঙ্গ এই চতুর্ব্বর্ণ; ফলে পরবর্ত্তী অপর সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই চতুর্ব্বর্ণ এক মূল বর্ণ হইতে কর্ম্ম ভেদে উৎপন্ন। মহাভারত বলেন, চতুর্ব্বর্ণের সকলেই এক পবিত্র ভাষাভাষী। যথা— "ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী" যদি শূদ্র অপর দ্বিজ ত্রিবর্ণ হইতে প্রকৃত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি হইত, তবে তাহারা কখনও দ্বিজ-ভাষিত-ভাষায় সমভাষী হইতে পারিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আর্য্য ও আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী কিন্তু শূদ্র অপর আর্য্য বর্ণত্রয়সহ সম্পূর্ণ সমভাষা-ভাষী। বেদে দেখা যায় যে, অনার্য্যেরা "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই; তাই পাশ্চাত্য অধ্যাপক-প্রবর মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে স্বীয় জাতীয়ত্বে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই শূদ্র; কিন্তু তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যথা— "ধর্ম্মযজ্ঞো ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে" ইত্যাদি।

"বজ্রশুচি" উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে; কারণ জীব বহুবিধ-দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ এক প্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপই শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না। জন্ম জাতিগত ভাবেই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই; যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর অনেক মনুষ্য ও বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্যের দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে; ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব কেবল জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারাত্মক টীকা ভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশূচি বস্তুতঃ এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বজ্রশূচী বস্তুতঃই বজ্রশূচী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে আর এক

ষের কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর একচেটীয়া বস্তু নহে। গুণের দ্বারা যিনি উপযুক্ত হইবেন, তিনিই বেদ পাঠাদের সমাদৃত-অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আখ্যান শূদ্রের বেদে অনধিকারের প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সত্যকাম জাবালের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। সে গুরু-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষায় নিজ মাতার নিকট স্বীয় গোত্র জানিতে চাহিয়াছিল। মাতা বলিলেন-"বৎস! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি বহুগোত্রীয় পুরুষের পরিচর্য্যায় ছিলাম, সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রজ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। যাহাহউক, তোমার নাম সত্যকাম এবং আমার নাম জবালা; অতএব জবালার পুত্র স্বরূপে তুমি সত্যকাম জাবাল নাম ব্যবহার করিও। তৎপর সত্যকাম জাবাল ঋষি হরিদ্রুম গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম লাভের প্রার্থনায় উপনীত হইলে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসিত হইল; তখন সত্যকাম মাতৃসকাশে শ্রুত বিবরণ অবিকল নিবেদন করিলেন। ঋষিবর সত্যকামের সম্পূর্ণ সরল সত্যবাদিতা এবং নিজের লজ্জাজনক জন্মকুৎসা বর্ণনেও অপূর্ব্ব অকুণ্ঠতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ কেহ বলিতে পারেনা। তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হও নাই; অতএব আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। যাও বৎস! সমিধ আনয়ন কর। এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, পুরাকালে এক মাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পিতা মাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাত-পিতৃগোত্র-সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্য-নিষ্ঠ-প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে পরিগৃহীত হইল। ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষাদানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদিও ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তথাপি উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণাখ্যা একচেটিয়া শ্রেণীবিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্যপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ; তবে ত বর্ণ-ভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম-জাবালের ঘটনায় ইহাই ঘটিয়াছে। এই আখ্যানটিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণত্রয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন; এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহার মাতার বর্ণিত-বিবরণে তাহাকে নিচজাতীয় বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তিনি তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় হইল না, পরন্তু তাহার আত্মিক চরিত্র

গৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়, তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। তথাপি যদি গুণ ধরা যায় যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট গুণপ্রাপ্ত শূদ্র স্বীয় শূদ্রত্বমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব যুক্ত হইয়া তবে বেদাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে ফলিতার্থে শূদ্রপক্ষই সমর্থিত হয়। সে হিসাবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রই নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এবং এইরূপে হীন জন্ম হইতেও অনেকের কার্য্যতঃ ঋষিত্ব ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্যের অভাব নাই।

৩৮ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাবও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসাঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী যুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি। যাহাহউক, যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে মনু বলেন,——

"বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে
সেই ত "ত্রিদণ্ডী" বাচ্য বুদ্ধি নিষ্ঠ যার—
বাগ্‌দণ্ড মনদণ্ড কায়দণ্ড আর।

অর্থাৎ, কায়, মন ও বাক্য যাহার [illegible] তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী! যজ্ঞোপবীতের সূত্রা [illegible] এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকারিত্ব কোন স্থূল বাহ্যলক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনুক্ত সূক্ষ্মযজ্ঞসূত্রেরই অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটি স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র; সুতরাং অভাব কদাচ প্রকৃত গুণের অভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যজ্ঞোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্র সংজ্ঞিতগণেরও দেব-পিতৃ কার্য্যে স্কন্ধদ্বয় লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সেই আখ্যান ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সার সংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িণী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল

তৃতীয় দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারাপন্নতা ও অসংযত সত্ত্বতার পূর্ণ প্রভাব ভারত-বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। অপর তত্তৎশাস্ত্রগত অনেক শ্রুতিবাক্য সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহতভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যে ও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিলনা এবং এখনও নাই। যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্যজাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে বেদ-বারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু ভারতীয়-প্রাচীন-সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ-দুর্ঘটনায় বহুসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণ অপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সে হেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত, এবং বেদে অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিত্বের বিচারে, কি মানসিক-সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষা-সাধনায়, কি ধর্ম্ম-মর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদ-বারণ-বিধি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্রীয়-অনুশাসনকে যথার্থ [illegible] তাঁহারা শাস্ত্র-বিরুদ্ধের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদার-নীতি ও হীন-বিদ্বেষ-দূষিত-স্বভাবের ফল। বেদ বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণে বেদ-বিদ্যা বিস্তারিতা হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ-হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। যে ব্রাহ্মণেরা বেদ-বারণ বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতু-ভূত। যাহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতাভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলেও তাহাতেও সমাজে সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ-জ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদবিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর-পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পতিত আত্মাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন; কিন্তু যিনি সেই পতিতের চিরপতিতাবস্থাই আকাঙ্ক্ষী

তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ লক্ষ্যাক্রান্ত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমুদ্র গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-নীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদারভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামীর হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না, অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞাত ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয়-বিধান, অপক্ষপাতবিচার ও যুক্তিপ্রমাণ এ সমস্তই 'সমাজের সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক'' এই অভিমতি বা নীতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার স্থাপিত। ২৫সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই শিক্ষাই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া ত্রিজবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অসঙ্গত বা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না; ফলে সম্ভবতঃ উক্ত পর সূত্র প্রক্ষিপ্ত।

৩৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কম্পন হেতু প্রাণই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (২১। ৬-২) উক্ত হইয়াছে—"যদিদংকিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

যাহা কিছু এই সর্ব্বজগন্ময়।
প্রাণেতে প্রাণ প্রকম্পিত হয়॥
মহদ্ভয় সমুদ্যত বজ্র প্রকার।
যারা জানে তারা অমৃতত্ব পায়॥

এ স্থানে 'প্রাণ' পদের অর্থ প্রাণ-বায়ু অথবা ব্রহ্ম, তাহাই এই সূত্রের বিচার্য্য বিষয়। ইহার ভীষণসত্তা উক্ত হওয়াতেই যে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; অতএব ইহা বিবেচনা করাই অসঙ্গত যে, মূল-বিষয় ছাড়িয়া এতদ্দ্বারা কেবল বাতাসেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আর বাতাসকে জানিয়াই বা কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? কঠোপনিষদে আর একটি এইরূপ শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের ভীষণ-সত্তা প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
এঁর ভয়ে ভীত হয়ে, বৈশ্বানর বিশ্ব দহে,
ভয়ে ভানু তাপে বসুধায়।
এঁর ভয়ে ইন্দ্র ভীত, ভয়ে বায়ু প্রবাহিত,
পঞ্চমতঃ ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

বেদে ঠিক এই তাৎপর্য্যের আর একটি শ্রুতি এই যে,—

ভীষস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এঁর ভয়ে হয়ে ভীত, বায়ু হয় প্রবাহিত,
এঁর ভয়ে সূর্য্য সমুদিত।
ভীত ইন্দ্র এঁর ভয়ে, এঁর ভয়ে অগ্নি দহে,
পঞ্চমতঃ মৃত্যু প্রধাবিত॥

কোথাওবা আলঙ্কারিকভাবেও 'প্রাণ' পদের প্রয়োগ হইয়াছে; যথা—"প্রাণস্য প্রাণম্" এই স্থলে এই প্রাণের প্রাণটিকেও ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

৪০ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জ্যোতিই ব্রহ্ম; যেহেতু ঔপনিষদী শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্বই দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১২-৩) দৃষ্ট হয়,—

এষ সম্প্রসাদস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণ বিনিষ্পদ্যতে

এ শরীর হতে সমুত্থান করি,
সেই সম্প্রসাদ স্ব স্বরূপ ধরি,
সে পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ তখন,
করে সে অমনি আত্মসমর্পণ।

এই সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত "জ্যোতি" শব্দ সূর্য্যাদির জ্যোতির ন্যায় সাধারণ আলোক বুঝাইবে না। এতদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম এবং শ্রুতিতে পরজ্যোতি পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

৪১ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আকাশই ব্রহ্ম; যেহেতু নাম-রূপ-উপাধির অতীত রূপেই এ তত্ব পরিচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১৪-১) উক্ত হইয়াছে,—

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্মতদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে।"

আকাশ পদেতে হন পরিচিত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥
এই সর্ব্ব নাম-রূপ যাঁর অন্তর্ভূত।
ব্রহ্ম-আত্মা-অমৃত স্বরূপে তিনি স্তুত॥

এখানে স্পষ্টই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক স্বরূপে উক্ত এই "আকাশ" পদ "ব্রহ্ম" পদেরই প্রতিশব্দ বিশেষ। পরন্তু উহা এস্থলে অনিত্য ভৌতিক-আকাশ বা ব্যোম বাচক হয়। ব্রহ্মকে যেমন ইতঃ পূর্ব্বে আলঙ্কারিকভাবে 'জ্যোতি' বলা হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপ আলঙ্কারিকভাবে 'আকাশ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ নাম রূপ-উপাধির পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং পূর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৭।৩-২) বলেন—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম রূপে ব্যাকরবাণীতি।

এই সর্ব্ব জীবেতে জীবাত্মা সমন্বিত—
প্রবেশিয়ে নাম-রূপ করি প্রকাশিত।

উপরোক্ত-শ্রুতিতে অতি বিশদরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই যাবদীয় নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক। এস্থলে জীবাত্মা কর্তৃকই নাম রূপাদি-প্রকাশক কথিত হওয়াতেও উক্ত তাৎপর্য্যের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই; যেহেতু পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপাদির প্রকাশ করিতেছেন। কলিতাথে

জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক স্বরূপ নহেন।

৪২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের সুষুপ্তি সময়ে ও মৃত্যুতে জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া যান; অতএব জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্‌তত্ত্ব, এরূপ সিদ্ধান্ত অবিশুদ্ধ; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা পারমার্থিক একত্বই শ্রুতি সিদ্ধান্ত সম্মত।

বক্ষ্যমাণ শ্রৌত-প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যই পরমাত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন, সুতরাং সুষুপ্তি সময়ে দেহ হইতে দেহীর অর্থাৎ জীবাত্মা উৎক্রামণ জন্য উক্ত জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন শ্রুতিবিরুদ্ধ।

৪৩ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পতি প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকায় তদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধিতব্য।

"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত; যেহেতু 'সর্ব্ব' অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ামক, বিশ্বের প্রভু ও বিশ্বের পাতা সেই বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা কদাচ হইতে পারে না, ইতি।

(৩য় পাদ সমাপ্ত।)

(ক্রমশঃ)

---

# আহার।

## পঞ্চমাধ্যায়।

### পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তবে এখন দেখা যাউক কি বিশেষ কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে কারণ, বশতঃ কুষ্মাণ্ডাদি বিশেষ নিয়মের বিশদ যুক্তি। সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা হইয়াছে। এই সকল বিধির মূলে যে একটি গূঢ় অভ্রান্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আর হয়ত এখন কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি যেন আমার এই প্রবন্ধ পাঠ না করেন, আমি তাঁহার জন্য এত কথা লিখি নাই।

### প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড।

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদেই শ্লৈষ্মিক-ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণরসাশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা স্বভাবতঃই লবণরসাত্মক।* রসাদির গুণাবধারণ করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, লবণরস ব্রণাদি ক্লেদরোগবর্দ্ধক। কুষ্মাণ্ডেও আবার লবণের ভাগ (ক্ষার) অত্যধিক পরিমাণে আছে। অতএব কুষ্মাণ্ড যদি প্রতিপদে ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তিথির ক্রিয়ানুসারে বর্দ্ধিত-লবণরসের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রণাদি ক্লেদরোগ উৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্যই প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

### দ্বিতীয়ায় বৃহতী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয়ায় স্বভাবতঃই পৈত্তিকধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ুও রুক্ষ হয়। অতুষ্ণ পিত্তে এবং রুক্ষাদি বায়ুবিকারে 'অর্দ্ধশিরোরোগ' জন্মিয়া থাকে। অর্দ্ধশিরোরোগকে

---

* শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। তমো গুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥ ভাব প্রকাশ।

ইংরাজি ভাষায় বোধ হয় "cancer" বলে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই অর্ব্বুদরোগের উক্ত হেতু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উষ্ণগুণবিশিষ্ট বীর্য্যবর্দ্ধক কোন দ্রব্য ভোজন করিলে দৈহিক-উত্তাপ স্বভাবাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অপরিমিত দৈহিক-উত্তাপ এবং বায়ুর রুক্ষতায় কি ক্রূরতায় রক্ত ও মজ্জা (মেদ) দূষিত হইয়া পড়ে। সেই সময় যদি পিত্ত সমধিক-উষ্ণ অথবা শ্লেষ্মা ক্রূর থাকে, তাহা হইলে সেই বিকারগুলির পরস্পর সংক্রামণে "অর্ব্বুদরোগ" জন্মিয়া থাকে।

বৃহতীর গুণাবধারণ করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃহতী পিত্তোষ্ণকারিণী এবং ক্রূরবায়ুবর্দ্ধিনী। সুতরাং দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ করিলে উক্ত তিথিসম্ভূত-পিত্তের উষ্ণতা এবং বায়ুর ক্রূরতা আরও অধিক প্রবল হইবার সম্ভাবনা। যদি দুরদৃষ্টক্রমে তাহাই হইয়া উঠে, তাহা হইলে অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষগণ দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

### তৃতীয়ায় পটোল।

তিথি-সম্ভূত ধাতুবিকার নির্ণয় করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়ায় শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রূর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় শোণিত অতিশয় সাচীভাবে চালিত হইয়া ধমনীর ভিতরে আলোড়িত হইতে থাকে। যদি কেহ ঐ সময় শোণিতোষ্ণতাবর্দ্ধক অথচ স্নিগ্ধোষ্ণ কোন দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে তাহার ফলে সেই স্বভাবাতিরিক্ত উষ্ণ সাচীগামী, বাতাক্রান্ত রক্ত আরও অধিক উষ্ণ হয়। বিকারভাবাপন্ন-রক্তের এই ক্রিয়াবৈষম্য রক্তবাতব্যাধি জন্মে। পটোল যদিও বাতাদি ত্রিদোষনাশক, কিন্তু শোণিতের উষ্ণবিকার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ পারগ। আরও একটী কথা আছে,—বায়ুর ক্রূরতা বা রুক্ষতানাশক কোন একটী দ্রব্য ভোজন মাত্রেই কি বায়ুর-বিকার সম্যক্ উপশমিত হয়? দ্রব্যের লঘুগুরু ভেদে, ন্যূনাতিরিক্ত বিলম্বে ক্রূর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধোষ্ণ বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রূরবায়ু বিলম্বে সরল হয়। কিন্তু শীতলদ্রব্যে অতি সহজেই সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বীর্য্যবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধোষ্ণগুণ সম্পন্ন বলিয়াই, ত্রিদোষনাশক হইলেও পটোলে অতিবিলম্বে যে ক্রূর বায়ুর সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা অভ্রান্ত ও সত্য। বায়ু স্বয়ং সম্পূর্ণ সরল না হওয়া পর্য্যন্ত ধমনীর ভিতর প্রবাহিত সেই সাচীগামী শোণিত কি প্রকারে সরলপথে নীত হইতে পারে? সুতরাং যে দ্রব্যে বায়ুর ক্রূরতা নাশও হয় অথচ রক্তও উষ্ণ হয়, যদি বায়ু ও রক্তের বিকারের সময় তাহাই ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এতদুভয়ের বিকারভাব নষ্ট করিতে করিতে যে কালবিলম্ব হইয়া থাকে, তাহাতেই ঐ দ্রব্যবিশেষের গুণে তিথি মাত্রাত উষ্ণরক্ত অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হইয়া তৎকালিক বায়ুর সংমিশ্রণে, রক্তসংযোগে পরিণত হইয়া

পারে। উক্ত কথার প্রমাণ দিবার জন্য আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রবন্ধের ক্ষান্ত হইতে পারি।

## চতুর্থীতে মূলক।

চতুর্থীতে শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়। সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রুরভাব ধারণ করে। তদ্ধেতু মলাধারস্থ-মল ভালরূপ নিঃসৃত হইতে না পারিয়া দূষিত হয়। ধাতুদ্বয়ের উক্ত বিকার বশতঃ মলাধারে বেদনা ও উদ্বেগ অনুভূত হয়। ইহাই আমরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই সময় যদি বায়ুর ক্রুরত্ব এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার রুক্ষতা নাশক কোন দ্রব্য ভোজন করা না যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমরোগ জন্মে। মূলক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা-ফলে আমরা বেশ বলিতে পরি যে, ইহা বাতাদি দোষের সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্দ্ধক এবং আমরোগ কারক। মূলকের গুণনির্দ্ধারক-শ্লোক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং চতুর্থীতে মূলক ভোজন করিলে বাতাদি ত্রিদোষ অস্বাভাবিকরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া আমোৎপাদন করিতে পারে বলিয়াই ঐ তিথিতে মূলক ভক্ষণ নিষেধ।

## পঞ্চমীতে বিল্ব।

পঞ্চমীতে পিত্ত অতিশয় প্রবল হয়। বিল্ব ও পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পঞ্চমীতে বেল ভক্ষণ করিলে তৎপ্রাঙ্গারে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। তাহার ফলে, পিত্তসম্বন্ধীয়-রোগ হইবার সম্ভাবনা। তাই পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ নিষেধ।

## ষষ্ঠীতে নিম্বুক।

নিম্বুক শৈত্যরসপরিবর্দ্ধক এবং অম্লগুণসম্পন্ন। ষষ্ঠীতে শিরাসমূহ অতিশয় শৈত্যরসাশ্রিত হইয়া থাকে। তাই তিথিসম্ভূত শৈত্যরসের সহিত নিম্বুকের শীতাম্লরস যখন শিরার ভিতর মিশ্রিত হয়, তখনই জলব্যাধি (কোষরোগ প্রভৃতি) জন্মিবার সম্ভাবনা।

## সপ্তমীতে তাল।

সপ্তমীতে পিত্ত এবং রক্ত এতদুভয়েই যুগপৎ তরল হয়। রক্তপিত্ত রোগবর্দ্ধক তাল যদি এই সময় ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিথিসম্ভূত ঐ তরলপিত্ত এবং রক্ত সেই তালরস সংমিশ্রণে রক্তপিত্তরোগে পরিণত হইবার আশঙ্কা করা যায়।

## অষ্টমীতে নারিকেল।

যে সময় অগ্নি মৃদুভাবাপন্ন এবং পাকস্থলী দুর্ব্বল থাকে, সেই সময় রেচকগুণসম্পন্ন, অগ্নি উদ্দীপক লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করাই বিধেয়। অষ্টমী তিথিতে পাকস্থলী এবং অগ্নি উভয়ই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু নারিকেল অতিশয় দুষ্পাচ্য, মলরোধক এবং গুরু। এই প্রকারের একটি গুরুদ্রব্য দুর্ব্বল পাকস্থলীতে যাইয়া কিছুতেই জীর্ণ হইতে চাহে না। সুতরাং অজীর্ণ রোগ আসিয়া দেখা দিতে পারে। এই সকল কারণেই অষ্টমীতে নারিকেল খাওয়া উচিত নহে।

## নবমীতে অলাবু।

নবমী তিথিতে বায়ু কুপিত এবং শ্লেষ্মা উগ্র হয়। অলাবু বাতশ্লৈষ্মিকরোগকারিণী

সুতরাং নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে সেই কুপিত বায়ু এবং উষ্ণ শ্লেষ্মা আরও অধিক বিকার প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ জন্মিতে পারে।

## দশমীতে কলম্বী।

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী। দশমীতে আবার ক্রূরপিত্ত এবং অম্লের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদুভয়ের সংক্রামণেই অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। যদি এই ধাতুবিকারের সময় কলম্বী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিকার প্রশমিত না হইয়া যে আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহাতে আর সন্দেহ কি। সুতরাং অবশেষে অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। এই কারণেই দশমীতে কলম্বী ভক্ষণ করিবার আদেশ নাই।

## একাদশীতে শিম্বী।

বাতশ্লৈষ্মিক, শ্লৈষ্মিক এবং জ্বরকারক রসে একাদশী তিথিতে নাড়ী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা স্বভাবের নিয়ম। শিম্বী জ্বরকারিণী, তাই একাদশীতে শিম্বী উদরস্থ করিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

## দ্বাদশীতে পূতিকা।

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, দ্বাদশীতে রক্ত এবং ক্রূর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও ক্রূর হয়। ধাতুদিগের এইরূপ বিকার উপশম করিবার চেষ্টা না করিলে, সেই ক্রূর শ্লেষ্মা প্রোক্ত [illegible] দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া কণ্ঠদেশ [illegible] কাসরোগাঙ্কুরে পরিণত হয়। এদিকে পূতিকা আবার ত্রিদোষবর্দ্ধিনী অর্থাৎ রক্ত কাস এবং বাতাদি ত্রিদোষ, পূতিকা সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দ্বাদশী তিথিতে কাসের সঞ্চার কালে যদি যক্ষাকাস উৎপাদক কোন দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রস ক্রূর বায়ুর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডস্থিত রক্তের সহিত শ্লেষ্মার সংযোগ করিয়া দেয়। রক্ত এবং বিকার ভাবাপন্ন শ্লেষ্মার এই ভয়াবহ সংমিশ্রণে যক্ষাকাসের অতঃপর উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

## ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী।

বার্ত্তাকী বায়ুপ্রকোপনাশিনী, রক্তবর্দ্ধিনী, কণ্ডুকারিণী। কিন্তু তিথ্যনুক্রমেই ত্রয়োদশীতে বায়ু মন্দগামী হয় এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ুর মন্দগতি বশতঃ সেই গাঢ় শোণিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যথোপযুক্ত ভাবে চালিত হইতে পারে না। তাই স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দূষিত রক্তই যে কণ্ডু রোগোৎপাদনক্ষম, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ত্রয়োদশীতে প্রোক্ত রক্তদোষ নিবারক, বাতোদ্দীপক কোন দ্রব্য ভোজন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বার্ত্তাকী ভক্ষণে

---

* পূতিকা ত্রিদোষকারিণী, সুতরাং কোন তিথিতেই পূতিকা ভক্ষণ করা উচিত নহে। তাই শাস্ত্রে আছে :—

'কুষ্মাণ্ডং নারিকেলশাকং বৃন্তাকং পূতিকা তথা ভক্ষয়ন্ পতিত [illegible]

সেই বার্ত্তাকীর রস শরীরস্থিত তিথিসম্ভূত গাঢ়রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঢ়ভাবেই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উপযুক্ত বাতাভাবে স্থানে স্থানে বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। সেই সকল দূষিত রক্ত হইতে কণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে।

## চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই।

তিথিগত ধাতুবিকার নির্ণায়ক-শ্লোক হইতে জানা যায় যে, চতুর্দ্দশীতে অপান বায়ু উর্দ্ধগামী হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ (আনাহ) রোগ প্রাদুর্ভূত হয় এবং উদরও স্ফীত (স্তম্ভিত) হইয়া পড়ে। কিন্তু মাষকলাই বহুমলবর্দ্ধক, অতিসার রোগোৎপাদক এবং গুরুপাক। চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ করিলে সেই ভুক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মলাধারস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত মল সংক্রামিত হইয়া আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও দূষিত হইয়া থাকে। ইহাই অবশেষে অতিসারাদি উদরাময়ে পরিণত হইতে পারে।

## পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় মাংস।

কোন অত্যাচার না করিলেও, উক্ত দুই তিথিতে কফের সঞ্চার হয়। কফ সঞ্চারিত হইলে পাচিকা শক্তি দুর্ব্বল হয়। তখন শরীর উষ্ণ বোধ হয় এবং জ্বরের লক্ষণ সকল কতকাংশে অনুভূত হয়; মাংসের গুণাবধারণ করিবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহা গুরু এবং কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারক। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি ভোজনান্তে মাংস পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় পাচিকা শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল থাকার জন্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকের ব্যতিক্রম ঘটিলেই পাকস্থলী দূষিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করে। ইহা ভিন্ন যে সময় নাড়ীতে কিছু প্রবল ভাবে কফের সঞ্চার হয়, সে সময়ে মাংস ভোজনে উক্ত নাড়ীসংস্থিত কফ, মাংসের কফপিত্তরস সংমিশ্রণে অতিশয় কুপিত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে পিত্তশ্লৈষ্মিক পীড়া উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় মাংস ভোজন করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

# রতন সুত্ত।

যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং ॥১॥
তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মা হি নে রক্খথ অপ্পমত্তা ॥২॥
যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন।
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৩॥
খযং বিরাগং অমতং পণীতং

যদ্ অজ্ঝগা সক্যমুনি সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৪॥
যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিম্ আনন্তরিকঞ্ঞম্ আহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদং পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৫॥
যে পুগ্‌গলা অট্ঠ সতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৬॥
যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন
নিক্কামিনো গোতমসাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৭॥
যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৮॥
যো অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিয়ন্তি।
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥৯॥
সহাবস্স দস্সনসম্পদায়
তয়স্স ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বা পি যদত্থি কিঞ্চি ॥
চতূহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিঠানানি অভব্বো কত্তুং
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১০॥
কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১১॥
বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরম্ অদেসয়ী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায় ॥
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১২॥
বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরম্ অদেসয়ী।
ইদং পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৩॥
খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরূল্‌হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো ॥
ইদং পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥১৪॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি

ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥১৫॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥১৬॥
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥১৭॥

## ভাবানুবাদ।

যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূমিতলে কিবা অন্তরীক্ষগত—
সকলে সুমনা হইয়া পর,
শাক্যের বচন শুন অনন্তর ॥১॥
শুন, জীবদল! শুন, হে মানবগণ!
সর্ব্বভূতে কর যত্নে মিত্রতাবন্ধন,
দিবানিশি করে যারা বলি আহরণ
তাহাদের হ'তে কর দোঁদের রক্ষণ। ২
যাহা কিছু বিত্ত দূরে বা এখানে,
উৎকৃষ্ট রতন যাহা স্বর্গস্থানে
তথাগত সম কিছুই নয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৩
ক্ষয় ও বিরাগ, পবিত্র অমৃত—
যাহা শাক্য পাল হয়ে সমাহিত;
সে ধর্ম্ম সমান কিছুই নয়।
ইহাও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৪
শুভপ্রদ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ [illegible]

সেই শুচি সমাধিকে [illegible] যান
কিছু নাই বিশ্বে সেই সমাধি সমান।
ইহাও ধরমে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন। ৫
চারিযুগধরি সেই অষ্টজন
সুগত সেবক প্রশংসিত হন,
দক্ষিণা দানের যোগ্য তাঁরাই কেবল;
তাঁদের করিলে দান হবে মহাফল।
ইহাও সংঘে পরম রতন
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন। ৬
দৃঢ় চিত্তে অনুসরি গৌতমশাসন
সুপ্রযুক্ত সুনিষ্ক্রান্ত যত মহাজন,
পরম অমৃত পেয়ে করিয়া গ্রহণ
আনন্দে নিবৃত্তি ভোগে প্রীতচিত্ত হন।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ৮
যথা ভূমে সুপ্রোথিত খেতস্তম্ভটির
ইতস্ততঃ বায়ুভরে প্রকম্পিত নয়,
সেইরূপ সাধুজন নিকম্পহৃদয়
আর্য্যসত্য অবেক্ষণে কাটান সময়।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন ॥ ৮
গম্ভীরপ্রাজ্ঞের উপদেশ মত
আর্য্যসত্য যাঁরা ভাবেন সতত
তাঁরা যদি (ও) হন প্রমাদময়,
অষ্টম জনম তবুও নয়।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ৯
সত্তাবদর্শনসম্পদের বলে,
তিন ধর্ম্ম হয় বিনষ্ট সমূলে।
[illegible]
যত কিছু আছে [illegible]

যাকলি তখন টুটিয়া যায়।
চারি উপায়ের গিয়া বাহিরেতে
তয় অভিমান না পারে করিতে।
ইহাও সঙ্ঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক স্বস্তি সংঘটন ॥ ১০
এই পন্থা যেই করে দরশন
কেমনে সে করে পাপ আচরণ?
শরীরে বচনে অথবা মনে
যা করে, রাখেনা কভু গোপনে।
ইহাও সংঘে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১১
গ্রীষ্মের প্রথমে গ্রীষ্ম মাসে
বনে অগ্রে যথা কুসুম বিকাশে,
সেইরূপ হিতার্থে দেন উপদেশ
নির্ব্বাণদ শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সে বুদ্ধেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে স্বস্তি হ'ক সংঘটন ॥ ১২
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠজ্ঞানময় বরদ মহান্
অনুত্তর মরাহর ক'রেছেন দান
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উপদেশ।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৩
পূর্ব্বজন্ম ক্ষীণ, নবজন্ম নাহি হয়,
আগামি জনম হ'তে সুবিরক্তচিত্ত
অবিরুদ্ধমনা ক্ষীণবীজ ধীর যত
প্রদীপ সমান, চির নির্ব্বাপিত হয়।
ইহাও বুদ্ধে পরম রতন,
এই সত্যে হ'ক্ স্বস্তি সংঘটন ॥ ১৪
শুন, যত জীবগণ হেথা সমাগত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
দেবনরপূজ্য সেই বুদ্ধ তথাগতে
করি নমস্কার, হ'ক্ স্বস্তি বিধি মতে ॥ ১৫
শুন, হেথা সমাগত ভূতগণ যত,
ভূমে কিম্বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত—
দেবতামানবপূজ্য ধর্ম্মে তথাগতে
করি নমস্কার, হ'ক্ স্বস্তি সংঘটিত। ১৬
হেথা আছ সমাগত জীবগণ যত,
ভূতলে বা অন্তরীক্ষে যারা অবস্থিত,—
শুন, দেবনরপূজ্য সংঘে তথাগতে
করি নমস্কার, হ'ক্ স্বস্তি বিধি মতে ॥ ১৭
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।
শ্রী———ভারতী।

## হরিবোল!

(১)

জেগেছে যুক্তির যুগ,
লেগেছে ঘোর হুজুগ,
তর্ক তেজে ভরা বুক,
তর্কের তরঙ্গ।
"আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক"
এই বুলি দিগ্বিদিক্,
মূলে কিন্তু ভূগ ঠিক
ভৌতিকের রঙ্গ।

(২)

কি করিবে তর্ক ছার,
"পুতুল" আর "নিরাকার"
তুমি যে দুয়ের বা'র,
হায়রে বুঝিলে না!
এটা ভাল—ওটা মন্দ,
ওতে প্রেজুডিসের গন্ধ,
এইরূপে করে দ্বন্দ্ব,
[illegible] বুঝিলে না

[illegible]

হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টিয়ান্,

বৌদ্ধ-জৈন-মুসল্‌মান্,

সকলেই যারে চান,

তুমি যদি তারে চাও;

মতের গুণে পথের গুণে,

না মিলে সে কুলে মানে,

কেনা সে ধন ভক্তি-ধনে,

এই সার সত্য লও।

( ৪ )

গালাগালি দলাদলি,

কেন আর সে ঢলাঢলি?

কোলাকুলি গলাগলি,

করে দেখ কি মধুর!

সাধা-সুধা ফেলে দাও,

জেদ্ করে বিষ খাও,

সগর্ব্বে গোল্লায় যাও,

যেন কত বাহাদুর!

( ৫ )

গলাবাজি—কলম্‌বাজি,

মন-পাজী তায় বড়ই রাজী,

আসল্ কাজের নয় সে কাজী,

এ দিকে যে বাজী ভোর।

ক্রমে ছায়া হেল্‌ছে পূবে,

অতল-তলে চল্‌ছে ডুবে,

পত্তন্-পাতালপুরে নেবে,

চৌদিকে ঘেরিল ঘোর!

( ৬ )

খেলায় ভুলে বেলা গেল,

আঁধার করে সন্ধ্যা এল,

চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হ'ল,

পথ্টা গেল হারায়ে!

"কর্ত্তে হবে—কর্চ্ছি করি"—

সেই থেকে যে এখন মরি;

আস্তে জীবণ হরি হরি!

পান্থা গেল ফুরায়ে!

( ৭ )

উদ্দেশ্যে ঔরাম্ভ ভারি,

উপায় লয়ে মারামারি,

ননী ফেলে কাড়াকাড়ি,

কচ্ছ খালি নিয়ে ঘোল।

শাঁসের তত্ত্ব নাহি জানি,

খোসা নিয়ে টানাটানি,

গম্যস্থান নাহি চিনি,

শুধুই পথের গণ্ডগোল!

( ৮ )

ঢের হয়েছে, আর কি চাই?

অধঃপাতের বাকি নাই;

নাক জিনে জল উঠ্‌ল ভাই!

আর কি আশা আছে?

আছে বৈকি, প্রাণ আছেত,

হয়নি সেত কণ্ঠাগত,

দশেন্দ্রিয় অব্যাহত

আছে দেহের মাঝে!

( ৯ )

আজও ভাব বহে স্নায়,

ফুস্ফুসে সঞ্চরে বায়,

বুঝি একটু আছে আয়ু,

আছে একটু আশ।

খোলা আছে কাণের খোল,

ঐ শোনা যায় 'হরিবোল'!

আর কেন ভাই গণ্ডগোল?
হয়ো না নিরাশ।

(১০)

রসনা রয়েছে বশে,
রসাও সে নাম-রসে,
বাসনা-বিষ বিরসে
মজোনারে আর,

বাজা করতাল খোল,
হরি-হরি হরিবোল!
হরিবোল!—হরিবোল!
সর্ব্বসিদ্ধি-সার।

(১১)

হুজুগ! তফাৎ যাও,
তর্কবাদ! দূর হও,
বক্তৃতা! বিলয় পাও,
সভা! রও চুপ।

পদে পদ দলাদলি,
গলে পর গলাগলি,
প্রেমে কর ঢলাঢলি,
হরি বল খুব!

(১২)

বল্ হরি—হরিবোল!
ভাবেতে হয়ে বিভোল,
প্রেমে সবে দাও কোল,
ধন্য হ'ক্ প্রাণ;

বল্ হরি—হরিবোল!
হৃদয়-দুয়ার খোল্,
হরি-হরি—হরিবোল!
কি মধুর নাম!

(১৩)

হরি হবার তৈরি হবে,
[illegible] আবার সেইটি পাবে,
আর কিছু না করতে হবে,
কেবল হরিবোল্।

আপনি হরি নিবেন্ তার,
কি ভয়-ভাবনা আর?
তোমার শুধু নামটি সার,
হরি হরিবোল!

(১৪)

হরিবোল সত্য,
হরিবোল পথ্য,
হরিবোল নিত্য,
হরিবোলে তরি।

হরিবোল চাও,
হরিবোল দাও,
হরিবোল গাও,
হরিবোল হরি!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

—:০:—

## সংস্কারকর্ম্ম।

—০—

চিত্রংকর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎসাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

কোনও একটী চারুচিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নির্ম্মাতা এক সময়ে একভাবে একরূপ কার্য্য করিয়া ঐ চিত্রটীর সকল অবয়বের সকল ভাব পরিস্ফুট করিতে পারেন না। তাঁহাকে এক এক শ্রেণীর সংস্কারের দ্বারা ঐ চিত্রের এক একটী ভাব ফুটাইতে হয়। চিত্রারম্ভেই উহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়বাদি স্ফূর্ত্তি পায় না। সাময়িক

সংস্কার বিশেষ দ্বারা ক্রমশঃ উহার উদ্বোধ হয়। উন্নতি ক্রমশঃ এক সোপান হইতে উর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু ক্রম ভঙ্গ করিয়া অনিয়তভাবে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না! কার্য্য কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমের সমষ্টি মাত্র। একটী ক্রম অতিক্রম ত্যাগ করিলে অন্য ক্রম সন্নিকৃষ্ট হয়, একটীকে বাদ দিলে অন্যটীকে পাওয়া বড় কষ্টকর। সুতরাং চিত্রের সৌন্দর্য্য বিবিধ সংস্কার কার্য্য দ্বারা যথোচিত ভিন্ন সময়ে পুষ্টিলাভ করে। প্রত্যেক কার্য্যের বিভিন্ন অংশই এইভাবে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন স্বতন্ত্রতা বা বিশেষত্ব এইরূপে উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ইত্যাদিকে বিকশিত করিতে হইলেও উহার ক্ষুদ্র২ আংশিক সংস্কারের সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণত্ব বিকাশের আশা করিলে, উহার ক্ষুদ্র ভূমিকা অতিক্রম করা প্রয়োজন। জাতবালক যাহাতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার একটী সংস্কার আবশ্যক। ঐ সংস্কার দ্বারা সে ক্রমশঃ আপনার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট দেখিতে পারিবে। যাদৃশ সংস্কার সম্পন্ন হইলে জ্ঞানার্জ্জনে অধিকার হয়, তাদৃশ সংস্কারের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনোপযোগী আত্মকর্ষণ প্রসন্ন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রয়াস পাইতে হয়। নৈতিক পুরুষকেও স্বীয় উপযোগিতার পরিচয় স্বরূপ কিছু কিছু সংস্কার-সম্পন্ন হইতে হয়, নচেৎ প্রবেশাধিকার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বি এ পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ লাভ করিতে হইলে, এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণতারূপক নিদর্শন আবশ্যক, আবার এফ.এ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাইনর পাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই সকল অধিকারেই নিম্নাধিকারী তদধিক অধিকার লাভের জন্য এক একটী সংস্কার গ্রহণ করেন। গৃহস্থোচিত ধর্ম্মের স্ফুরণই গার্হস্থ্য লাভ। গৃহস্থতা লাভ করিতে হইলে, যে সংস্কার যাদৃশ শিক্ষা আবশ্যক, উদ্বাহ প্রথা তাহাই শিক্ষা দেয়, তাদৃশ উপযোগিতা আনয়ন করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক ভূমিকায় উপস্থিত হইলেই উৎকর্ষ লাভের জন্য অপর ভূমিকার যোগ্য হইবার জন্য এক এক প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানেও আত্মার নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পাদন আবশ্যক হয়। সর্ব্ববিধ সংস্কার লাভের পর সুসংস্কৃত মানব ভগবানের অমৃতময় রাজ্যে যাইবার অধিকারী হইয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হন। সুতরাং সংস্কার অত্যাবশ্যক, সংস্কার ব্যতীত মানব কোনও বিষয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

শ্রী——ভারতী, যশোহর।

---

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চরিত্র গঠন। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মোহন [illegible] [illegible] ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। [illegible]

চরিত্রগঠন পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেরূপ অনুদার এবং উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কর্ত্তব্যপালন হইবে না। বর্ত্তমান বিপর্য্যস্ত ভাবের সংস্কারার্থে ইহাদিগকে বহুবিধ নৈতিক শিক্ষা প্রদান আবশ্যক হইয়াছে। বিদ্যালয়ে নৈতিকপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে অনিষ্টাশঙ্কার মূলে আঘাত লাগিতে পারে এই বিবেচনায় আমরা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রচলনের পক্ষপাতী। চরিত্রগঠন পুস্তকখানিতে নৈতিক জীবনগঠনের উপযোগী প্রায় সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলনে বিশেষ ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গের অনেক সুসন্তান প্রবাসে থাকিয়াও বঙ্গভাষার পদপূজনে বিরত নহেন, বরংচ অধিক উদ্যম আগ্রহ সহকারে প্রয়াস পান। গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্র বাবু বঙ্গমাতার পরিচার্য্যাগ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা বঙ্গদেশের গৌরবের ও বাঙ্গালী জাতির বঙ্গভাষানুরাগের পরিচয়স্থল। গ্রন্থখানিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে। বিষয়গুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য না থাকিলেও স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ পাইয়া মনে কেমন একটু খটকা লাগিয়া যায়। মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে আমাদের মনে হয়, উদীয়মান বঙ্গ [illegible] তিনি আদৃত হন, তাহাই ভবিষ্যত সাহিত্যের আশার আলোকের আভাস। পুস্তকের কাগজ ভাল, মুদ্রাঙ্কণও বেশ পরিষ্কার।

---

## দ্রষ্টব্য।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহাকুমার অন্তর্গত লাউপালা গ্রামে স্বর্গীয় বালকদাস বাবাজীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দিরটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রদেশে এই শ্রীগোপাল-বিগ্রহ বড়ই প্রসিদ্ধ, অনেক মাহাত্ম্য সংবাদও প্রচারিত আছে। এখানে শ্রীশ্রীগোপালের রথোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যাপার। প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তিরক্ষণের জন্য প্রত্যেক স্বধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগৌরবহিতার্থী ব্যক্তি সাধ্যোচিত যৎকিঞ্চিৎ দান করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হন না। এই মন্দিরটীর জীর্ণ সংস্কার যে কত প্রয়োজনীয় এবং ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দান যে কত পুণ্যপ্রদ, দেবমন্দির নির্ম্মাতা ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু সম্প্রদায়কে বোধ করি একথা বিশেষ রূপে বুঝাইতে হইবে না। প্রাচীনকীর্ত্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, দেশের সকল সুসন্তানই সমবেত- চেষ্টা বলে তাহা সম্পাদন করিতে সতত মনোযোগী হইবেন আশা করা যায়। শ্রীশ্রীগোপাল মন্দিরের সংস্কারার্থে যে মহাত্মা যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা মহাকুমা বাগের হাটের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ কর্ম্মকারের নিকট পাঠাইবেন।

অনুরোধকৃমা।

## সম্পাদকের রাজ-সম্মান।

প্রতিষ্ঠালাভের প্রত্যাশায় মানব প্রাণ সতত ব্যাকুল। প্রতিপত্তির জন্য যদি বিবেক বুদ্ধির পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত করিতে হয়, তাহার জন্যও মানব প্রস্তুত। মনুষ্যত্বের নির্ব্বাসনে অনুমোদন করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই। সমাজে শতকরা ৯৯ জনের আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ প্রতিষ্ঠায়, আশার পর্য্যবসান প্রতিপত্তিতে, মনের তৃপ্তি মানে, প্রাণের প্রীতি-যশে। এক কথায় লৌকিক সর্ব্ববিধ তৃপ্তি বা তুষ্টির মূলাধার খ্যাতি-মান-যশ-প্রতিষ্ঠা। যশের আশায় সংসারে না সম্পন্ন হয়, এরূপ কঠোর কার্য্য কি আছে? মানব যতই আশা কুহকে মুগ্ধ হউক না কেন, শেষে ইহার অসারতা দর্শনে আপনিই বৈরাগ্যের চরণে শরণাগত। কবি বলিয়াছেন "যেই শিরে বাঁধ সোনার পাগড়ী শ্মশানে যাইবে গড়াগড়ি।" আজ যে মুকুটধারী রাজা, যিনি স্তাবকগণ কর্ত্তৃক স্তুত, অধীন গণের নিকট প্রশংসিত ও পূজিত, দেশের নিকট, দশের কাছে মহামহিমান্বিত, তাঁরও চরম দশা দীনহীন ক্ষীণ কুটীরবাসী প্রজার সহিত বিভিন্ন নহে। "আমি" "আমার" জ্ঞানে—এই মহামোহজনক অহঙ্কারে জগৎ প্রমত্ত, তাই প্রতিষ্ঠার চঞ্চল অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কষ্ট পায়। জ্ঞানীর নয়নে 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা' "মানং গর্হ্য সুরাপানং।" সংসারের প্রশংসা, নিন্দা, সম্মাননা, অবজ্ঞা, তিরস্কার, পুরস্কার সকলেরই মূল্য তত্ত্বদর্শীর নিকট একরূপ। জ্ঞানী, প্রশংসা বা নিন্দার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, প্রতিষ্ঠার আশা মনে না রাখিয়া নীরবে আপনার কর্ত্তব্যপথে পদচারণ করেন, কর্ত্তব্যের বিন্দুবিসর্গও স্খলিত না হয়, এজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পরোপকার করেন, প্রত্যুপকার প্রার্থনায় বা প্রশংসা কামনায় নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে; অপরের নয়নের বারিবিন্দু দর্শন করিলে অবিরল দরদর ধারে অশ্রুপাত করেন এবং প্রতীকারের প্রযত্ন করেন, মোহমূলক দুর্ব্বলতায় নহে, মানবোচিত গভীর সহানুভূতির বশে। কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে নিন্দুকের অহেতুক উপহাস ও সজ্জনের স্বভাব-সুলভ সমাদর ইহার কোনটীতে তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণের কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই অচল, এতই সুদৃঢ়। সাধারণতঃ কোনও প্রকার অভিসন্ধিমূলকভাব ত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিলে ও জনসাধারণে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারে না, মনে করে তিনিও কামনার অধীন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে ধর্ম্মানুমত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কার ভগবান অযাচিতভাবেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রমাণ স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে সম্মান অর্পণ করিয়াছেন। ইনি ইহার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। সংসারে এইটুকু কর্ত্তব্যের মহিমা, ইহা সত্যানুষ্ঠানের মর্ম্ম। বর্ত্তমানকালের রাজ-সম্মান অনেকস্থলে অনুচিত পাত্রে পতিত হওয়ায় সমাজের অহিতকর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারিব যোগ্য পাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, উহাদ্বারা দেশেরই উপকার করা হয়। প্রকারান্তরে সৎকর্ম্মকারীর সমাদর দর্শনে সাধারণের সৎকর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। 'সম্মান' সৎপাত্রে অর্পিত হইলে সৎকার্য্যের প্ররোচক হয়। আমরা পরম পুলকিত হৃদয়ে যশোহর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান "হিন্দু-পত্রিকা" এবং "ব্রহ্মচারীর" সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি এল্ মহাশয়ের রাজকীয় রায় বাহাদুর উপাধিলাভ উপলক্ষে যোগ্যতমের আদর

পরিচয় পাইয়া সর্ব্বফল দাতা ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং সুবিজ্ঞ রাজকীয় প্রধান পুরুষগণের নির্ব্বাচন চাতুর্য্য ও গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতেছি। অযাচিতভাবে গবর্ণমেণ্ট যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টের অপমান করা হয় মনে করিয়া, সম্পাদক মহাশয় ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করেন না। যদিও গবর্ণমেণ্ট "মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্" বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীযুক্ত যদু বাবুর সাহিত্যসেবা, ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্রের অশেষ উপকার সাধন ও অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষিতা ইত্যাদি ও গবর্ণমেণ্টের অবিজ্ঞাত নাই।

সম্পাদক মহাশয়ের রাজকীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে, বঙ্গের বহুস্থান হইতে অস্মদ্দেশের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া যে সকল পত্র ও বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতি স্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখিয়া, স্বীয় অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন। বঙ্গের প্রজাবৎসল ছোটলাট মহামান্য সারজন উড্বার্ণ কে, সি, এস্, আই, মহোদয় স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—

The Shrubbery,
Darjeeling.
29th June 1902.

DEAR SIR,

I offer you my hearty congratulations on the title given you in to-day's Honours list. It is the recognition of the active and effective work you have done in the Municipality of Jessore and I am glad of the opportunity of giving you my personal thanks.

Believe me, sincerely yours,
J. Woodburn.

বঙ্গের প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, এবং লণ্ডন পোলিসের ভূতপূর্ব্ব চিফ্কমিশনার, যিনি পূর্ব্বে যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এইরূপ ম্যাণ্ডরেট চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রত্যহ শত শত দীনদুঃখী রোগীকে নিজে এবং নিজের পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও জামতার দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, সেই স্বনামখ্যাত জে, মনরো সি, বি, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

Locknagar.
Darjeeling.
27-6-02

My dear sir,

I am very glad that the son of my old friend, Tara Prasanna Babu has been distinguished in this manner. I know that you have well deserved the honour. May you long live to enjoy the distinction which will show people that Government is not blind to good work done by those who are not officials.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বর্ত্তমান কমিশনার এম্ ফিন্লুকেন্ সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

Dear sir,

I congratulate you on the well deserved honour of Rai Bahadurship conferred upon you, and hope you will live long to enjoy it.

Yours sincerely, M. Finucane.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয় লিখিয়াছেন,—

My dear Jadu,

It is a sincere pleasure to me to see your name in the Coronation Honours list as Chairman of the Jessore Municipality, but the Govt. must have been well aware of your other distinguished services to our country, as an expounder of Hinduism and elevator of the educated classes to a higher sphere of thought.

Long may you live to enjoy your present honour as well as any future honours that may come unasked.

Your sincere will wisher,
Radhika Prasanna Mukerjee.

স্বদেশ এবং ধর্ম্মবৎসল 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন এটর্ণি মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

We do not know if Babu Jadu nath Mozoomdar cares to have and to keep the title Rai Bahadur ship which a discerning Government has conferred on him as a gift. This honour is in recognition of his valuable services as Chairman of Jessore Municipality. The people have honoured our friend these many years for his many learned contributions in regard to Hindu religion.

There is no more earnest religions reformer in Bengal than Babu Jadu nath Mozoomdar.

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা লিখিয়াছেন,

One of these is that of Babu Jadu Nath Mojumdar, Chairman of the Jessore Municipality, one of the ablest and most independent of non-official Municipal Chairmen in Bengal, and for some time Editor of the Tribune. A devoted worker in the cause of social and religious progress of his people, Babu Jadn Nath honours the title of Roy Bahadur rather than being honoured by it?

বঙ্গ সাহিত্যের মহারথী বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিছেন,—

The elevation of a man of your worth to the rank raises the title itself in the estimation of all intelligent man. You have been doing yeoman's service to the cause of Literature in Bengal.

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, স্থানাভাবে তাঁহাদের পত্র প্রকাশ করা গেল না, নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম মাত্র লিখিত হইল। যথা,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্ এ গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরিয়ান্। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রফেসর সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা বাবু পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম্ এ বি এল্, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাঁকীপুর। বাবু বিপিন

বিহারী বসু জমিদার শ্রীধরপুর। মিঃ এফ্ এল্ মোর্শহেড্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এইক্ষণ কলিকাতার কষ্টমের কলেক্টর, বাবু হরিচরণ সেন এল্ এম্ এস্, ডাক্তার বৈদ্যনাথ। বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম্ এ বিএল্, উকিল হাইকোর্ট। বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার বি এল্. মুনসেফ্ পিরোজপুর। বাবু রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি এ, রাজসাহী। বাবু নরেন্দ্রভূষণ রায় জমিদার নড়াইল। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বিএল্, উকিল ঢাকা। বাবু দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ জমিদার চৌগাছা যশোহর। বাবু প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্, সব্ ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট উলুবাড়িয়া। বাবু প্রসন্ন চন্দ্র রায় এম্ এ বিএল্. উকীল হাইকোর্ট। বাবু সুরেন্দ্র কুমার দেবরায় জমিদার ছান্দড়া যশোহর। বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেন এম্ এ বিএল্, উকীল হাইকোর্ট। বাবু রাখাল মোহন বানার্জ্জি এম্ এ, সব্ ডিভিশনাল ম্যাজিষ্টেট নড়াইল। বাবু শ্রীনাথ দত্ত স্বর্গীয় গোপাল লাল শীলের ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। মিঃ জে প্লেটল্ সেসন্স জজ বরিশাল। খাঁ বাহাদুর আব্দর রহমান কলিকাতার স্মলকজকোর্টের জজ। পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক মেট্রপলিটান কলেজ। বাবু বিধুভূষণ গাঙ্গুলী বিএল্ হাইকোর্ট উকীল। বাবু নরেন্দ্র কুমার বসু এম্ এ বিএল্। বাবু কৈলাশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল বিএল্, উকীল আলিপুর। বাবু কৈলাশ চন্দ্র বসু উকীল আলিপুর। বাবু চারু চন্দ্র বসু মহাবোধি পত্রিকার সম্পাদক। বাবু মঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী ভাগলপুর। গোস্বামী আব্দুল ছালাম সব্রেজেষ্টার। ডব্লিউ আর ম্যাগডোনাল্ড যশোহরের ভূতপূর্ব্ব সিবিলসার্জ্জন বর্ত্তমান কলিকাতার বন্দরের স্যানিটারি অফিসার। মিঃ এফ্ রডিস্ যশোহরের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস। মিঃ এ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ জে চ্যাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা। মিঃ সৈয়দ সামশুল হুদা হাইকোর্টের উকীল ইত্যাদি।

যোগ্যপাত্রে সম্মান অর্পিত হইলে, সমাজ তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আনন্দিত। আমরা আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক অনুগ্রাহক গ্রাহক হিন্দুধর্ম্মের সহায় স্বরূপ হিন্দু পত্রিকার সম্পাদকের সম্মানলাভ শ্রবণে আমাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট সমগ্র হিন্দু সমাজ ঋণী। ইঁহাকে সম্মানিত করায় হিন্দুধর্ম্মানুরাগের পুরস্কার প্রদান ও হিন্দুসমাজের স্বধর্ম-পরায়ণতার প্রেরোচনা করা হইয়াছে মনে হয়। কর্ত্তব্যমার্গে পদচারণা করিতে যেন শত বাধা বিপদে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে নাপারে, উত্তরোত্তর অশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশে স্বধর্ম্মানুরাগীর পুরস্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপে সুখে কালাতিপাত করুন ইহাই একান্তিক প্রার্থনা। আমরা বুঝিব, ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের এক অধ্যায় "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীকেদারনাথ ভারতী,
যশোহর।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[ ১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

| ৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা। |
|---|---|---|

## বেদান্ত-সূত্র।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

( ৬ষ্ঠ ও ৭ম )

দ্বিতীয় পাদ।

৯ । অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

১০। প্রকরণাচ্চ।

১১। গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মা নৌহিতদ্দর্শনাৎ।

১২। বিশেষণাচ্চ।

১৩। অন্তর উপপত্তেঃ।

১৪। স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

১৬। শ্রুতোপনিষৎক্ গতাভিধানাচ্চ।

১৭। অনবস্থিতেরসম্ভাবাচ্চ নেতরঃ।

১৮। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।

১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

২০। শারীরশ্চোভয়েহপি ভেদে নৈনমধীয়তে।

২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।

২২। বিশেষণ ভেদব্যপবদেশাভ্যাঞ্চনেতরৌ।

২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ।

২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণঃ শব্দবিশেষাৎ।

২৫। স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি।
২৬। শব্দাদিভ্যোন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন, তথা দ্রষ্ট্র্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।
২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।
২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।
২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।
৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ।
৩১। সম্পাত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।
৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

---

৯। "চরাচর" পদের প্রয়োগ হেতু অত্তা (খাদক) শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১০। প্রকরণ অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় অনুসারেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১১। "গুহা-প্রবিষ্ট দ্বয়" বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এক বস্তুর দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিলে, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সমজাতীয় বস্তুই বুঝায়।

১২। বিশেষণ হেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৩। উপপত্তি হেতু "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৪। অধিষ্ঠানাদির বর্ণনা থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৫। "সুখবিশিষ্ট" অভিধানহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৬। বেদান্ত-বিদের পরমগতি নির্দ্দেশ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৭। "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা বুঝায় না; যেহেতু অন্য আত্মা [অস্তুতাত্মক ভাবে] অনিত্য এবং বর্ণিত অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের গুণ তাহাতে অপ্রযোজ্য।

১৮। গুণ-সমন্বয় হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৯। গুণ-বিরোধ-হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে সাংখ্যাদি-স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদ্য নহে।

২০। "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে "শরীরী" অর্থাৎ জীবাত্মা প্রতিপাদ্য নহে; কারণ আরণ্যকের উভয় শাখাতেই লক্ষণ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। অদৃশ্যতাদি লক্ষণ বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২২। বিশেষণ-ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, পরমাত্মা ব্যতীত প্রধান বা জীবাত্মা অপ্রতিপাদ্য।

২৩। রূপের উপন্যাস থাকাহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৪। বৈশ্বানর ও আত্মা, এই দুই পদাযুগতরূপে দুয়ের লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, "বৈশ্বানর" পদে পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য।

২৫। অপিচ, স্মৃতির বর্ণনা আমাদিগকে শ্রুতির অর্থ সম্বোধে সমর্থ করে।

২৬। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ লওয়া যায় যে, বৈশ্বানর পদের অর্থ-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং জঠরাগ্নির লক্ষণ পুরুষান্তর্বর্ত্তিতার উল্লেখ থাকায়, উক্ত পদে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ নহেন; সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গলোক জঠরাগ্নির মস্তক হওয়া অসম্ভবহেতু এ

বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি-পক্ষে অপ্রযোজ্য "পুরুষ" পদের প্রয়োগহেতু উক্ত পদে পর-ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৭। উপরোক্ত হেতুবাদে 'বৈশ্বানর' অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবও নহে, ভৌতিক অগ্নিও নহে।

২৮। জৈমিনির মতে বৈশ্বানররূপে পরব্রহ্মের স্বরূপোপাসনার কল্পনাতেও কোন-রূপ আপত্তি বা অনুপপত্তির হেতু নাই।

২৯। ঐশ্বরিক প্রকাশহেতু আশ্মর-থ্যের মতেও তাহাই বটে।

৩০। অনুস্মরণহেতু বাদরির মতেও তাহাই বটে।

৩১। কাল্পনিকনির্দ্দেশন হেতু জৈমি-নির মতে পরব্রহ্মই "প্রাদেশ মাত্র" বাক্যে বিজ্ঞেয়; বিশেষতঃ উহা শ্রুত্যুক্তি-সম্মত।

৩২। অপিচ, [জাবালমতে] মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান-ব্যাপিত্ব-কল্পনাহেতু "প্রাদেশমাত্র" বাক্যে পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়।

—

৯ম ও ১০ম সূত্র।—নবম ও দশম সূত্রা-নুসারে কঠোপনিষদুক্ত "অত্তা" (খাদক) পদে পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যু-র্যস্যোপসেচনম্ কইত্থা বেদ যত্র সঃ।"

কেমনে কেজানে, কোন্ অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত তিনি হন।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁর উভয়ে আহার,
মরণ উপকরণ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এতদুক্তি পর-মাত্মা-প্রতিপাদক কিনা? উত্তর, বিশ্বের তাবৎ পদার্থই যে স্থলে ব্রহ্মে প্রলয়-প্রাপ্ত হয়, সেস্থলে ব্রহ্মকেই বিশ্বগ্রাসক বলা যায়। অত-এব কঠবল্লী বলিতেছেন যে, তিনি সেই খাদক, এই বিশ্বচরাচর যাঁর খাদ্য। "ব্রহ্ম-ক্ষত্র" সমবেত সর্ব্বভূতেরই উদাহরণ-উপলক্ষ্য স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মই অত্তা বা খাদক। অগ্নি এ খাদক হইতে পারেন না; কারণ অগ্নি "অন্ন-খাদক" পদে স্পষ্টই শ্রুতি-প্রতি-ষ্ঠিত। যথা—"অগ্নিরন্নাদঃ।" (বৃঃ উঃ ১।৪।৬) কিন্তু "সর্ব্বাদঃ" বা সর্ব্বখাদক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং" বাক্যেই ব্রহ্মের বিশ্ব-খাদকত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

যদি এরূপ তর্ক ধরাযায় যে, নিরাকার পরমাত্মা নির্লেপ—নির্ভোগ, তাঁহার খাওয়া সম্ভবে না, এই তাৎপর্য্যই সচরাচর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, পরন্তু জীবাত্মাই ভোগী বা খাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভি-চাকশীতি (মুঃ উঃ।৩।)

উত্তর এই যে, জীবাত্মার এই যে ভোজন, ইহা জগৎ-গ্রাসন নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল-ভোজন মাত্র; কিন্তু পরমাত্মা নির্লেপ—সুতরাং নির্ভোগ, কারণ তিনি কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন; তিনি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র। জীবা-ত্মাই কাম-কর্ম্মী ও ভোগী, অর্থাৎ যাচক ও খাদক। আর সমগ্র জগৎ-সমষ্টির খাদক বলিলে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই বিশ্ব বিলীন হয়। অত-এব সূত্রোক্ত "অত্তা" পদের ব্রহ্মবাচকত্ব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন নহে।

কঠোপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের ব্রহ্মই অবলম্বন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ",

[কঃ উঃ ১।২।১৮] অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা যিনি, অজ ও অমর তিনি। এস্থলে যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা বুঝিতে হয়, তবে আলোচ্য বিষয়ের মূল-বিবৃতি-বিপর্য্যয়-জনিত স্থূল অপ্রসক্তি দোষ ঘটে; কিন্তু তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব; সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্মই অজ ও অক্ষর।

১১শ ও ১২শ সূত্র।—এই দুই সূত্রে কাঠোপনিষদের নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত সমাহিত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।"

[ কঃ উঃ ১।৩।১ ]

দুয়ে ভবে সুকৃতের সুধারস পিয়ে।
সে পরম ধামরূপ গুহাগত দুয়ে॥
সে দুয়েরে 'ছায়াতপ' বলে ব্রহ্মবিদ্জন।
ত্রিনাচিকেতাগ্নিযাজী তথা পঞ্চাগ্নিকগণ॥

কোন দুয়ের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে? এ দুই কে কে? অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বটে; কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? যেস্থলে মুণ্ডকোপনিষদ্ স্পষ্টতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অভোক্তা দ্রষ্টারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম এস্থলে আবার সুকৃতকর্ম্মের সুফল-সম্ভোগী বলিয়া ব্যক্ত হইবেন কিরূপে? উত্তর এই যে, যদিও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ কর্ম্মফলের অতীত, কিন্তু এস্থলে পরমাত্ম-বাচকত্ব ] ঔপমিকভাবেই ব্যবহৃত। এস্থলে বিশদরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, জীবাত্মাই নিশ্চয় কর্ম্মফল-ভোক্তা বটে, কিন্তু দ্বিবচনের প্রয়োগহেতু আমাদিগকে অবশ্য আর একটি আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি মাত্র "আত্মা" সংজ্ঞক আপাত-সমধর্ম্মী চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ-সত্তা স্বতঃসংবুদ্ধ থাকায়, ঐ অপরাত্মা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।

অপর, "গৌর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্য।" এই গরুর দ্বিতীয়টি চাই, এ কথায় কিছু আমরা ঐ দ্বিতীয়টির পূরণার্থ গরু ব্যতীত কোন মনুষ্য বা ঘোটকের অনুসন্ধান করিব না; কারণ সাধারণতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, একাধিক বচনের পদ-প্রয়োগে সেই পদ-প্রবোধিত পদার্থের একজাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মাকে কিরূপে গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয় প্রবিষ্ট বলা যাইতে পারে? ফলে উক্ত বাক্য রূপকভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রহ্ম বিশ্বময় বটেন, তথাপি সগুণাধিকারীর সসীম জ্ঞান-জনিত বিশদ-বোধার্থে তাঁহার সসীম স্থিতি-স্থানবিশেষ কল্পিত হইতেছে। যথা বিষ্ণু বিশ্ব-বিনিবিষ্ট হইয়াও, সগুণ-সাধন-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শালগ্রাম-শিলাধারে পূজিত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, জীব ও পরম, এই দুই আত্মাই ছায়া ও আতপরূপে কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা অজ্ঞানান্ধতমোরূপিণী অবিদ্যার অধীন, কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যার অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞ জীবাত্মা ছায়া এবং অবিদ্যামুক্ত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা আতপ।

১২শ সূত্রের সমাধেয় এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট থাকায়, এই দ্বিবিধ আত্মাই এ স্থলে অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে।

কঠোপনিষদে (১৩৩) উক্ত হইয়াছে,—
"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥"
আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥

এই স্থলে আত্মা পদে জীবাত্মাই বুঝাইতেছে। আবার আমরা উক্ত কঠবল্লীর ষষ্ঠ শ্লোক এইরূপ দেখিতে পাই,—

"বিজ্ঞান সারথির্যস্য মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥"

বিজ্ঞান-সারথি, আর মানস-প্রগ্রহ যার, পরিবদ্ধ রয়।
পার-হয়ে ভ্রাম্য পথ, বিষ্ণুর পরম পদ সেই প্রাপ্ত হয়॥

এ স্থলে বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরমধাম সেই পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় ও নবম শ্লোক দ্বারাই প্রথম শ্লোকের অর্থ বিশদীভূত হইতেছে।

অতঃপর মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) দৃষ্ট হয়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানংবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়াশোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

প্রেমবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে এক বৃক্ষ-পর॥
সে দুটির একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥
এক বৃক্ষে করি বাস বঞ্চিতাত্ম পাখী।
শোকে ক্ষুণ্ণ আপনাকে শক্তিশূন্য দেখি॥
যবে সে পরাত্মা দেখে হয়ে যোগযুক্ত।
মহিমা বুঝিয়া হয় শোক-মোহ-মুক্ত॥

এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই। ফলে অনেকে এ স্থলে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ভাবিয়া ভুল করেন।

১৩শ হইতে ১৭শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫) দৃষ্ট হয়,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচৈ তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। তদযদ্যপাস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।"

সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম অভয় অমর॥
যে পুরুষ অধিষ্ঠিত অক্ষি-অভ্যন্তর।
সর্পি বা সলিল ইথে হলে সুসিঞ্চিত।
পথদ্বয় বাহি হয় বহির্বিনিঃসৃত॥

এস্থলে এই "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে অপরের অক্ষি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন পুরুষবিশেষের প্রতিকৃতি প্রতিপাদিত হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য। পরমাত্মা ব্রহ্মই অভয় ও অমৃত। অতএব অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অভয় ও অমৃত, এ কথায়, উক্ত পুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বিরোধের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তের সহুপপত্তি

সম্পাদিত হইবে। অক্ষিমণ্ডলে ব্রহ্মের অবস্থান রূপককল্পনা মাত্র। উহাদ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মধর্ম্মের পরম নৈর্ম্মল্য ভাবই আভাষিত হইতেছে। অক্ষি-মণ্ডলে কিছুরই স্পর্শাঙ্ক প্রলিপ্ত থাকে না, উহা সতত সমুজ্জ্বল ও সুনির্ম্মল; এইজন্যই রূপক ভাবে অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত ও কথিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অক্ষি-মণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান-স্থান রূপে উক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭) আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ,সূর্য্য, চন্দ্র,নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত ভৌতিক মহৎ পদার্থই কল্পিত ও কথিত হইয়াছে। বহু নাম-রূপ-উপাধিই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। এবম্বিধ উপাধির অবলম্বই ধ্যান-ধারণার অনুকূল উপায়।

১৫শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা "ক" অর্থাৎ সুখ, এই শ্রৌতবাক্যবিশেষ দ্বারাও প্রতিপন্ন। সত্যকাম-জাবাল নামক ঋষির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যার্থী দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল ব্রহ্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন; তথাপি তাঁহার উক্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। অবশেষে গুরুদেবের আরাধিত আহিত অগ্নিস্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" "প্রাণ" অর্থাৎ প্রাণবায়ু [ শ্বাস ] ব্রহ্মস্বরূপ, "ক" অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম স্বরূপ, "খ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ তাঁহাকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে এ বিষয়ে আরো শিক্ষা দিবেন। পরে গুরুও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের ব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার অমরত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এস্থলে গুরু সেই ব্রহ্মতত্ত্বই শিখাইলেন, যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত অগ্নিগণ "ক" শব্দাত্মক শ্রুতি উল্লেখে শিখাইয়াছিলেন। অতএব "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞাপিত।

"ক" (সুখ) শব্দ ভৌতিক সুখকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রহ্মানন্দই বুঝায়; "খ" শব্দে ভৌতিক আকাশ বুঝায় না, কিন্তু উক্ত ব্রহ্মানন্দের আধারতত্ত্ব বুঝায়। এইরূপ আধার-আধেয়ত্ব ভাবেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত। "যদ্বা কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং।" যাহা ক, তাহাই খ; যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে 'খ'এর সমবায়িতায় 'ক'তত্ত্ব ভৌতিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখবোধের অতীত আধ্যাত্মিক সুখ বা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়াছে এবং 'ক'এর সমবায়িতায় 'খ'তত্ত্ব ভৌতিক ব্যোম বা আকাশের অতীত ব্রহ্মানন্দাধার স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়িত্ব বা পরস্পর-সাপেক্ষত্ব ভাবজনিত মৌলিক একত্ব "নীল-লোহিত ন্যায়" অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। যথা কোন বস্তুকে "নীল-লোহিত" বলিলে, তাহাকে নীলও বলা হয় না, লোহিতও বলা হয় না; ফলিতার্থে নীল-সাপেক্ষ লোহিত বা লোহিত-সাপেক্ষ নীলই বলা হয়। তৎপর, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইতেছে, যথা—"এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে

এতং হি সর্ব্বাণি বামম্ভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়স্তি। এষ উ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি।”

সর্ব্ব পবিত্রতা তাঁতে থাকে।
সংযদ্বাম বলে তাই তাঁকে॥
সর্ব্বাশীষ তাঁহা হতে ফলে।
তাই তাঁকে বামনীও বলে॥
সর্ব্ব লোক তাঁতে দীপ্তি পায়।
তাই বলে ভামনীও তাঁয়॥

এই বর্ণনা শুদ্ধ মাত্র পরমাত্মাতেই প্রযোজ্য।

১৬শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাহা এইরূপেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্রহ্মকে জানে, সে মোক্ষ লাভ করে, এইরূপ শ্রুতি আছে এবং যে অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে জানে, সে মোক্ষলাভ করে, এরূপও শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যেখানে মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা নাই, সেখানে উক্ত উভয় মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা স্থলে সেই একই ব্রহ্ম সূচিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

১৭শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবাত্মা প্রভৃতি অন্য কোনবিধ আত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা 'আত্মা' পদবাচ্য হইলেও অমিতা। অভয়' 'অমর'প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিরুপাধিক নিত্য পরমাত্মা ব্যতীত উপরোক্ত অপরাপর কোন সোপাধিক অনিত্য আত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারেনা। অপরের অক্ষি-দর্পণে কোন পুরুষবিশেষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা, বা ভয় ও মৃত্যুর আস্পদীভূত বিজ্ঞানাত্মা বা সূর্য্য প্রভৃতি জনন মরণশীল দেবত্মা, [যাঁহাদের তথাকথিত অমরত্ব সুদীর্ঘজীবীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে] ইহারা কেহই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ হইতে পারেন না, কারণ উক্ত পুরুষের অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব স্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, দেবতারাও ভয়াতিক্রান্ত নহেন।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি
সূর্য্যঃ ভীষ স্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।'

এঁর ভয়ে ভয়ে, বায়ু সদা বহে,
এঁর ভয়ে সূর্য্য উঠে।
এঁর ভয়ে ভয়ে বহ্নি বিশ্ব দহে,
চন্দ্র ছুটে—মৃত্যু ছুটে॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণেই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৭) কথিত "অন্তর্যামী পুরুষ" সেই পরমাত্মাই বটে। সেই অন্তর্যামী পুরুষ পৃথিবীতে, জলে, অনলে, পবনে, তপনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, দেহে, মনে, ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৎসমস্তকে নিয়মিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা কি না? এতদুত্তরে বলা যায় যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণই সূচিত হইতেছে। অন্তর্যামীত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ব্রহ্মলক্ষণেই সমন্বিত। অতএব ব্রহ্মই উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ।

বৃহদারণ্যক [৩৭] উপসংহারভাগে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—তিনি "অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্টিকরেন,অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ করেন, অমনোগত হইয়াও মনন করেন এবং অজ্ঞাত হইয়াও জানেন। কেহ দেখে না, তিনি দেখেন। কেহ শুনে না, তিনি শুনেন। কেহ মনন করে না, তিনি মনন করেন। কেহ জানিতে পারে না, তিনি জানেন। তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমর—অর্থাৎ নিত্য। তদিতর যাহা কিছু, সমস্তই মর্ত্ত্য অর্থাৎ অনিত্য।" এতাবতা ইহা বিশদীভূত যে, অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত "প্রধান" উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ কেন হইতে পারে না? প্রধানও অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞেয়। প্রধানও বিশ্বের কারণরূপে পরিগণিত, অতএব অন্তর্যামী পুরুষের লক্ষণে প্রধান কেন লক্ষিত হইতে পারে না? এ তর্কের সমাধান এই যে, অন্তর্যামী পুরুষের এরূপ লক্ষণবিশেষও বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রানুসারেও তাহা কদাপি প্রধানে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায়, যথা—প্রধান জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দর্শন-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি জ্ঞান-ক্রিয়া প্রধানে কদাচ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় সম্ভবে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের দর্শন-শ্রবণাদি উল্লিখিত হওয়ায়, উহাতে পরমাত্মাই সূচিত হইতেছেন।

২০শ সূত্র।—অতঃপর আর একটি এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা দেহাভ্যন্তর্বর্ত্তী রহিয়া দৈহিক ক্রিয়াদি নিয়মন ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি চেতন স্বরূপ ও অদৃষ্ট; কারণ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহিত যুগপৎ কর্ত্তার কর্ম্মত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব। "ন দৃষ্টে র্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ।" দৃষ্টের দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টব্য নহেন; অতএব জীবাত্মাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পারেন। উত্তর এই যে, যদিও জীবাত্মা উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যদিও দেহাভ্যন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করেন, কিন্তু ইনি বৃহদারণ্যক-বর্ণিত অন্তর্যামী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করেন না। অতএব ইনি কিরূপে সেই অন্তর্যামী পুরুষ হইবেন? দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কাণ্ব (বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২২) বলেন যে, "যিনি স্বয়ং জ্ঞানাধিষ্ঠিত, জ্ঞান যাঁহাকে জানে না, জ্ঞানই যাঁহার দেহস্বরূপ; যিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে জ্ঞানকে নিয়মিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।" ইহাই কাণ্বোক্ত সিদ্ধান্ত। আর যদি আমরা এস্থলে জীবাত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাত্মার স্থানীয় ধরি, তবেই আমরা মাধ্যন্দিনোক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই। কাণ্বোক্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব মাধ্যন্দিনোক্ত জীবাত্মতত্ত্ব দ্বারাই অববোধিত। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এইরূপে পার্থক্য পরিসূচিত হইতেছে।

তৎপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অন্তর্যামী পুরুষ দুইটি কিনা। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা নিয়ামক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; এই দুইটি কিনা?

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্বতঃ একত্ব শ্রুতিসম্মত। এস্থলে উত্তর এই যে, আত্মা মোটে একটি মাত্র! উপাধির অবচ্ছেদবশে বহুবৎ প্রতীয়মান। যথা- ঘটাকাশ ঘটোপাধি-অবচ্ছিন্ন মহাকাশ। মায়িক জগতে এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মা হইতে এবং পরমাত্মা হইতে প্রভিন্ন; কিন্তু সাধনবলে যাঁহার অন্তশ্চক্ষুর অন্তিক হইতে অবিদ্যাবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমাত্মা মাত্র প্রকাশিত। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য—জ্ঞাতা জ্ঞেয় একত্বে পরিণত। শ্রুতি বলেন, 'যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ।" অর্থাৎ—দ্বৈতজ্ঞান যেখানে, যথাদেখি সেখানে। অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যথা, কেবা কারে দেখে তথা?

২১শ সূত্র।---মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঃ ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হন।
এ দুয়ে জানিতে হবে-ব্রহ্মজ্ঞেরা কন॥
ঋক্-যজুঃ সামাথর্ব্ব চারি বেদগ্রন্থ।
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত ও ছন্দ॥
জ্যোতিষ সহিত এই বেদ-অঙ্গ ছয়।
এ শিক্ষা অপরা-বিদ্যা-বলে সিদ্ধা হয়॥
পরাবিদ্যা-বলেতে অক্ষর হন জ্ঞাত।
অদৃশ্য অগ্রাহ্য যিনি অবর্ণ অজাত॥
অচক্ষু অশ্রোত্র যিনি অপাণি অপদ।
নিত্য বিভু সুসূক্ষ্ম অব্যয় সর্ব্বগত॥
যাঁহাহতে সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত ভবে।
পরাবিদ্যাবলে জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান লভে॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রের সমাধেয় এই যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত সর্ব্বভূত-সমুৎপাদয়িতা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণ-বেদ্য যিনি, তিনি পরমাত্মা বা জীবাত্মা। সিদ্ধান্ত এই যে,"সর্ব্বভূত-সমুৎপাদক" বলিলেই পরমাত্মা বুঝায়; অন্যান্য বর্ণিত বিশেষণের বিচার বাহুল্য মাত্র। যে সমস্ত গুণ বা লক্ষণ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্যতীত দেহোপাধি-অবচ্ছিন্ন অবিদ্যাধীন জীবাত্মা বা মাত্র জড়-তত্বস্বরূপ অচেতন প্রধানে কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, প্রধানও অদৃশ্য তত্ব এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূত উদ্ভূত, বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, মুণ্ডকোপনিষদে যে পুরুষের তত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শুধু অদৃশ্যত্বই মাত্র তাঁহার গুণ বা লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বান্তর্যামিত্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ-গত বিশিষ্ট লক্ষণাবলীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি। [মুঃ উঃ ১।১ ৯] পরমাত্মা ব্যতীত উক্ত বিশেষণগুলি স্বভাবানুসারে কদাচ প্রধান বা জীবাত্মার যোগ্য নয়। তারপর, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" [মুঃ উঃ ১।১৩]

হে আর্য্য! জানিলে কারে।
সমস্ত জানিতে পারে?"

এই শ্রুত্যুক্তিদ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্বথা সুপ্রতিপন্ন।

২২শ সূত্র।—সর্ব্বভূতযোনি যে পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন, তাহা এই দ্বাবিংশ সূত্রে একটি অতিরিক্ত সুযুক্তি সহযোগে সমর্থিত হইয়াছে। এক পক্ষে পরমাত্মার তত্ত্ব লক্ষণাবলী ও অপরপক্ষে প্রধানের তত্ত্ব-লক্ষণাবলী পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুবিশদ। মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।২) বিস্পষ্ট বলিতেছেন,—"দিব্যো-হ্যমূর্ত্তপুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোঽ-প্রাণো অমনা শুভ্রঃ।"

সে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ যিনি,
বাহ্য-অভ্যন্তর অজ ও অমর,
অপ্রাণ অমন-অমল তিনি।

এ বর্ণনার বিষয়ীভূত বা অধিকারাস্পদ হওয়া প্রধান বা জীবাত্মপুরুষের যোগ্যতা-বহির্ভূত।

অতঃপর সেই সর্ব্বভূত-জনয়িতার এরূপও লক্ষণ লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বিধায়, এই সৃষ্ট বিশ্বের ভৌতিক সুসূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব প্রধানকে এস্থলে "অক্ষর" বলা হইয়াছে। এই প্রধান স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত থাকিয়া বিবিধ জাগতিক নাম-রূপ বা পরমাত্মার বিবিধ উপাধি কল্পনা করে। তর্কস্থলে যদি প্রধানকে স্বাধীনসত্ত্বও কল্পনা করা যায়, তথাপি "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এ কথায় স্পষ্টই প্রধান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থান্তর সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব সেই পদার্থান্তর প্রধান হইতেও প্রধান—পরাৎপর পরমাত্মা।

২৩শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, যেরূপ রূপোপন্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান কখনই সর্ব্বভূত-জনয়িতা-রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। "অগ্নি-র্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অগ্নি মূর্দ্ধা, রবীন্দু নয়ন।
দিক্ শ্রুতি, বেদোক্তি বচন॥
বায়ু যাঁর নিশ্বাস-নিস্বন।
হৃদি যাঁর এ বিশ্বভুবন॥
চরণে ধরণীধর যিনি।
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা তিনি॥

এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মেরই সম্ভবে, কিন্তু প্রধানের বা জীবাত্মার নহে; কারণ অজ্ঞান প্রধান কখনও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারেন না; আর উপাধিবদ্ধ অবিদ্যা-বাধ্য জীবাত্মাও জগজ্জনয়িতা হইতে পারেন না।

পরমাত্মা ব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন জন্যই যে এরূপ রূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহা নহে; উহা রূপকোক্তি মাত্র। উহাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বভূতান্তরাত্মস্বরূপতাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপেও পরমাত্মা সূচিত হন না।"

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং,

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

সমুদিত সর্ব্বাগ্রে—হিরণ্যগর্ভ যিনি।
একমাত্র জাত ভূত-পতি হন তিনি॥
স্থাপিলেন তিনি এই আকাশ পৃথিবী।
কোন্ দেবোদ্দেশে মোরা নিবেদিব হবিঃ॥

এই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা নহেন; কিন্তু পরমাত্মা হইতে সম্ভূত দেবপুরুষ বা ঈশ্বরবিশেষ। ইনি ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপাত্মক প্রথমাবতার স্বরূপ। শ্রুত্যন্তরে ইঁহাকে 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। ঔপনিষদী উক্তি অনুসারে ইঁহাকে "সর্ব্বভূতাত্মা" বলিলেও অনুপপত্তি হয় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূত সৃষ্টির আদিকারণ নহেন।

২৪শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।২) একটি উক্তিতে আত্মা "বৈশ্বানর" পদে উক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রশ্ন এই যে, এই বৈশ্বানর পদে জঠরাগ্নি, বাহ্য-জড়াগ্নি।অগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেবপুরুষবিশেষ ইত্যাদিই বুঝাইবে না পরমাত্মা বুঝাইবে। অপিচ, উক্ত পদ আত্মার সাধারণ লক্ষণ-বিশেষত্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদ্বারা "জীবাত্মা" বুঝাইবে কিনা, তাহাও আলোচ্য।

উত্তর এই যে, উহাদ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হইতেছেন। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং এতদ্দ্বারা তদিতর পদার্থান্তর সূচিত হওয়া সম্ভবে না। অতএব যদিও "বৈশ্বানর" পদে জঠরাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্ব সূচিত হইলেও, অন্যান্য লক্ষণানুসারে আত্মতত্ত্বও সূচিত হয়; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট থাকায়, উক্ত আত্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্বই বটে, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মস্বন্নমত্তি, তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহবহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যোমনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি।"

প্রাদেশ মাত্রাভিমানী বৈশ্বানর-ধাতা যেই।
সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বাত্মসম্ভোগী সেই॥
এই বৈশ্বানরাত্মার মস্তক সুতেজোময়।
বিশ্বরূপ নেত্র তাঁর—শ্বাস পৃথগ্বর্ত্ম হয়॥
সন্দেহবহুল তাঁর—বস্তি রয়ীরূপ।
চরণধরণী—বক্ষ বেদিকা স্বরূপ॥
লোমাবলী বেদিকার তৃণরূপী হয়।
গার্হপত্য অগ্নিরূপী তাঁহার হৃদয়॥
অন্বহার্য্য অগ্নিরূপী হয় তাঁর মন।
যে অগ্নি আহবনীয়,সে তাঁর আনন॥

উপরোক্ত বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্বই বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্ম-মূর্ত্তি স্বরূপেই অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাত্মা বোধক ভাবেই 'অগ্নি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা কদাপি একের স্থলে অন্যের সূচনাদ্বারা প্রমাদপাতিত হন নাই।

২৫শ সূত্র।—স্মৃতিও পরমাত্মার বর্ণন করিতেছেন উহা উপরোক্ত বৈশ্বানরাত্মা-বর্ণন-প্রণালীতেই বর্ণিত। স্মৃতিদ্বারাই শ্রুতির অর্থ আমাদের অধিগত হয়।

স্মৃতির পরমাত্মবর্ণন এইরূপ,—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ,সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত-প্রণেতা।"

বলেন ব্রাহ্মণবর্গ, মস্তক যাঁহার স্বর্গ,
অন্তরীক্ষ নাভি যাঁর, রবীন্দু নয়ন;
দিক্ যাঁর শ্রোত্ররূপ, পৃথিবী পদস্বরূপ,
তিনি হন সর্ব্বভূত-অনাদিকারণ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বৈশ্বানর শব্দেও সর্ব্বভূত কারণই সূচিত হন।

২৬শ সূত্র।—এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, বৈশ্বানর শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে উহা অন্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? অন্তরস্থ বৈশ্বানর বলিলে, উহা বৈশ্বানরের স্বভাব-বিশেষত্ব হেতু উহা-দ্বারা জঠরাগ্নিত্বই প্রতিপন্ন হয়, এবং এই হেতুই উহা পরমাত্মা-প্রতিপাদক হইতে পারে না। উত্তর এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব এই-রূপেই বোধবিষয়ীভূত হন। সসীম-উপাধ্য-বচ্ছিন্নত্ব ব্যতীত অসীম পরমাত্মার বোধ-বিষয়িত্ব সম্ভবে না; এই হেতুই এ স্থলে বৈশ্বানরত্ব তাঁহার উপাধি স্বরূপ।

চতুর্ব্বিংশ সূত্র প্রকরণে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাহ্য জড়াগ্নি বা জঠরাগ্নি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে, উহা ফলিতার্থে অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। যদি তদ্দ্বারা মাত্র জঠরাগ্নিই বুঝাইত, তবে "পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নি" বাক্যেই তাহা সিদ্ধ হইত; কিন্তু বাজসনেয়িগণ কর্তৃক তাহা "পুরুষ" পদেও অভিহিত হইয়াছে, অতএব উক্ত বর্ণনায় অগ্নি বা জঠরাগ্নি বুঝাইবে কিরূপে? বাজসনেয়িগণ তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

"স যো হৈতমেব অগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ।"

যেই জন জানে এই অগ্নি বৈশ্বানরে।
পুরুষস্বরূপে আর পুরুষ-অন্তরে॥

২৭শ সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের আলোচিত হেতুবাদ বশে "বৈশ্বানর" মাত্র ভৌতিকাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা কোন দেব-পুরুষ-বিশেষ হইতে পারেন না।

২৮শ সূত্র।—ষড়বিংশ সূত্রের আলো-চনায় "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যে জঠরাগ্নিত্ব অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু উহাদ্বারা অন্তঃসাক্ষীত্ব স্বরূপে পরমাত্মাও বুঝাযাইতে পারে। যেহেতু পরমাত্মা প্রতি-পুরুষান্তরে অফলভোগী থাকিয়া সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপে সংস্থিত, এইরূপ শ্রুত্যুক্তি আছে। অতএব মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, জঠরাগ্নিকে উপাধিস্বরূপ মধ্যবর্ত্তীরূপে কল্পনা না করিয়া, উক্ত ঔপনিষদী উক্তিদ্বারা স্বয়ং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা পরমাত্মাই সংপূজ্য, এইরূপ সহজ উপপত্তিই গৃহীত হইতে পারে। এই শ্রুত্যুক্তি যেস্থলে বৈশ্বানরকে পুরুষান্ত-র্ব্বর্ত্তী—অথচ স্বয়ং পুরুষস্বরূপ বলিয়াছেন, সেস্থলে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই পরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন,সন্দেহ নাই। "বৈশ্বা-নর" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, যথা—

"বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বা অয়ংনরঃ, বিশ্বেবা নরা অস্যেতি বিশ্বান পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানর তদ্ধিতো ন্যার্থঃ।"

বিশ্বরূপ, যিনি নররূপ,
বিশ্বনররূপ যিনি,
বিশ্ব-জীব-আত্মা, নরাত্মা পরাত্মা
"বৈশ্বানর" বটে তিনি।
বিশ্বানর পদ, বৈশ্বানর পদ,
সমার্থসূচক হয়।
তদ্ধিত প্রত্যয় প্রয়োগে নিশ্চয়
ভিন্নার্থবাচক নয়।

২৯শ হইতে ৩২শ সূত্র।—আচার্য্য অশ্মরথ্য বলেন, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বমিতি-মাত্রাতীত, তথাপি তাঁহার ধ্যানাধিগম্যতা-মূলক প্রকাশ কল্পনায় তাঁহাকে "প্রাদেশ মাত্র" বলা হইয়াছে। সাধকগণের হিতার্থে পরব্রহ্ম হৃদয়, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধ্যানাধিগম্যভাবে প্রকাশিত। বাদরি বলেন,— পরব্রহ্মকে "প্রাদেশ মাত্র" বলার হেতু এই যে, তিনি অনন্তমাত্রায় বা মাত্রাতীত সত্তায় "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"— কিন্তু মনের উপাস্য হইতে হইলে, তাঁহাকে সান্তমাত্র ও মনের ধ্যানাধিগম্য বা স্মর্ত্তব্য স্বরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এজন্যই তিনি শাস্ত্র-কথিত হৃদয়স্থ প্রাদেশমাত্রাত্মক— অর্থাৎ মনের আয়ত্তিযোগ্যভাবে স্বয়ংই "প্রাদেশমাত্র" রূপে কল্পিত হইয়াছেন। অথবা সরলভাবে এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে "প্রাদেশ মাত্র" না হইলেও, "প্রাদেশ মাত্র' রূপেই তিনি যোগী-হৃদয়ের যোগ-ধ্যানাধিগম্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য জৈমিনিও বলেন, "প্রাদেশ মাত্র" বিশেষণ ব্রহ্মের কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদিকে বৈশ্বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াছেন। শিরোর্দ্ধ দেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান প্রাদেশ-পরিমিত; ইহার মধ্যস্থলে ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদলে" যোগীর ধ্যানারূঢ় ঐশতত্ত্ব অবস্থিত। অতএব ত্রিভুবনাত্মা ভগবান প্রাদেশমাত্রাত্মকরূপে ঐ স্থানে বিদ্যমান। "বৈশ্বানর" পুরুষের তথাবিধ প্রাদেশমাত্রাত্মক বিদ্যমানতা বর্ণিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদন হইতেছে। জাবাল তাঁহাকে মূর্দ্ধা ও চিবুক দেশের ব্যবধান-মধ্যবর্ত্তী বলেন। ফলে নাসিকাগ্র অর্থাৎ ভ্রূমধ্যই পরমাত্মার যোগধ্যানাধিগম্য স্বরূপের অধিষ্ঠান স্থান।

[ ক্রমশঃ ]

শ্রীশঃ—

---

# শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

( পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ )

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১৫

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবংজ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥

অন্বয়ঃ— সএব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, বিশ্বাধিপঃ, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবম্ জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি।

ন্নিগমপদব্যাখ্যা— "স এব" পূর্ব্বপূর্ব্ব-

শ্রুতি সমূহে) যাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী-রূপে বর্ণনা করাহইয়াছে, তিনিই, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরই। "কালে" — অতীত-কালেষু, জীবসঞ্চিতকর্ম্মপরিপাকসময়ে ইতি-ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যাঃ; স্থিতিকালে ইতি-শঙ্করানন্দঃ জীবের সঞ্চিত কর্ম্মের পরিপাক-সময়ে, অথবা স্থিতিকালে। "ভুবনস্তগোপ্তা" জগতঃ তত্তৎ কর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিতা— জগতের যাবতীয় কর্ম্মের অনুগুণতা-নিবন্ধন জগতের অদ্বিতীয় পরিপালক। "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াঽ-বস্থিতঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয়-পদার্থে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত। "যস্মিন্"-চিদ্‌ঘনা-নন্দবপুষি যে চিদ্-ঘন-আনন্দময় পরমপুরুষ। "ব্রহ্মর্ষয় সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ। "দেবতাশ্চ" ব্রহ্মাদি-দেবতাগণও। "যুক্তা" — ঐক্যং প্রাপ্তাঃ ইতি শঙ্করাচার্য্যাঃ, যোগং আশ্রিত্য প্রবৃত্তাঃ ইতি নারায়ণঃ "জ্ঞাত্বা" ব্রহ্মাহমস্মীতি অপরোক্ষীকৃত "তিনিই আমি" এবম্প্রকারে প্রত্যক্ষকরিয়া। "মৃত্যুপাশান্" মৃত্যুঃ অবিদ্যা, তমঃ, রূপাদয়শ্চ" মৃত্যু শব্দের অর্থ অবিদ্যা, মহামোহ এবং রূপাদি, পাশঃ—পাশ্যতে বধ্যতে অনেন ইতি পাশঃ, যাহাতে বন্ধন করে, মৃত্যুরেবপাশঃ মৃত্যুপাশঃ তান্, অবিদ্যা রূপ মহাপাশ অর্থাৎ প্রধান বন্ধন। 'ছিনত্তি' নাশয়তি—ঐক্যরূপ স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতী-ত্যর্থঃ—ঐক্য অর্থাৎ তৎসাযুজ্যরূপ স্ব-প্রকাশঅনলের দ্বারা দহন করেন।

বঙ্গার্থঃ— সেই পরমদেবতা পরমেশ্বর (যিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রুতি সমূহে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন) জীবের সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ সময়ে এই বিশ্ব রক্ষাকরিয়া থাকেন, তিনিই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধিপতি, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থেই তিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে পরমপুরুষে সনকাদিব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ একতাপ্রাপ্ত হইয়া মিলিয়া রহিয়াছেন, সেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত পদার্থের আশ্রয়ভূমিকে সেই অপায়বিহীন করুণা-নিধানকে "তিনিই আমি" এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সাধক অবিদ্যা, মহামোহ প্রভৃতি সংসারের দুশ্ছেদ্য-বন্ধন ছেদনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর প্রতি-নিয়ত অবিদ্যার কঠিনতম-শৃঙ্খলে সম্পিষ্ট হইতে হয়না।

বিশেষব্যাখ্যা—আমাদের যে অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা প্রকৃত-মৃত্যু নহে; প্রকৃত-মৃত্যু অবিদ্যাচ্ছন্নতা, তাঁহার হৃদয় শ্বাস-প্রশ্বাস-যুক্ত থাকিয়াও অবিদ্যামুক্ত নহে. তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। এই মহা-মোহ বা প্রগাঢ় "তমঃ"ই শ্রুতিতে মৃত্যু নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর্বৈ তমঃ" "তমঃ"ই মৃত্যু। এই তমো-বিনাশেরই নামান্তর মৃত্যুবিনাশন। মায়া-বিনী-অবিদ্যার মায়ার কুহকে আত্মহারা হইয়া জীব ইতস্ততঃ উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে বাসনা-পরিতৃপ্তির লুব্ধ-আশ্বাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিদ্যার কুহক-সম্ভূত এই বাসনার বিনাশ-সাধনের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-চিন্তা-ভগবদ্-বিষয়িণী রতি। ভগবানের চরণ-নখময়ূখের মনোরম দীপ্তিতে যে হৃদয় পরিদীপ্ত, অবিদ্যা-রূপিণী নিশাচরীর তিমির-পূর্ণা-বাসনাছায়া সে হৃদয়ে কদাচও প্রবেশ করিতে পারেনা। স্বর্গীয় কৌমুদীর সম্মুখে কি নারকীয়

অন্ধকার স্থান পায়? তাই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যদি হৃদয়ের অশান্তিদায়িনী অবিদ্যার করাল-কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতেচাও, তবে সেই সর্ব্বশক্তিময়ের চিন্তাকর; তদীয় দিব্য-বিভূতি স্বীয় উষর-হৃদয়ে ধারণা করিতে অভ্যাস কর। নতুবা অবিদ্যার কঠোরবন্ধকবালহস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

১৬

ঘৃতাৎপরং মণ্ডনমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্—
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়ঃ— ঘৃতাৎপরংমণ্ডনমিব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ দেবং জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "মণ্ডনম্"— সারঃ মণ্ডন শব্দের অর্থ সার। "সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ম্" ইহা পূর্ব্ব শ্রুতিতেই অনুবাদিত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—ঘৃতের উপরিভাগে বিদ্যমান অতিসূক্ষ্মতম-মণ্ডনের ন্যায় যিনি সূক্ষ্মহইতেও সূক্ষ্মতম, ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রতমতৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে যাঁহার দিব্যবিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, নিয়ত মঙ্গলময়, সেই জগতের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক পরমদেবকে আত্মার সহিত অভিন্নভাব জানিতে পারিলে সাধক দুঃশ্ছেদ্যসংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের শান্তিপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন জন্মের মত তিরোহিত হয়।

১৭

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাহভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা চ, (অয়ং) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (এষঃ) হৃদা মনীষা (মনীষয়া ইত্যর্থঃ অত্র ছান্দসাৎ বিভক্তি-বিপর্য্যয়ঃ) মনসা (চ) অভিক্লৃপ্তঃ (ভবেৎ)। যে এতদ্ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "বিশ্বকর্ম্মা"—"মহৎ" আদি বিশ্বঃ "কর্ম্ম" কার্য্যং অস্য ইতি বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থের আদি কর্ত্তা। "মহাত্মা"—সর্ব্বব্যাপী। "দেবঃ"—দ্যোতনাত্মক। "মনীষা"—বিবেকবুদ্ধিরদ্বারা। "হৃদা"—নেতি নেতি নেতি নিষেধোপদেশেন—ইহানয়, ইহানয়, ইহানয়, এই প্রকারে- প্রতিবিষয়ে তিতিক্ষা পুরঃসরী যে বুদ্ধি, তাহা দ্বারা। "মনসা"—বিচার পরিপূত-জ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ অন্ধবুদ্ধি বশতঃ নয়) "অভিক্লৃপ্তঃ" প্রকাশিতঃ—প্রকাশিত হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—বিশ্বের আদিকর্ত্তা সেই সনাতন-পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জীব-হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার অধিষ্ঠান-বিচ্যুত হয়না। তিনি নিরন্তর সর্ব্বজীবেরঅন্তঃকরণে সন্নিবেশ করিয়া আছেন। বিবেক-মার্জ্জিত--প্রতিভা তিতিক্ষাপূর্ব্বিকা বুদ্ধি এবং আত্ম-বিচার-পরিপূত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্বস্ব হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করা-যায়। যাঁহারা ঐ সমুদয় দুশ্চর সাধনা-

সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের সংসার যাতনা চিরদিনেরমত তিরোহিত হয়। অনন্তশান্তিসংস্পর্শে তাঁহাদের মন-প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

১৮

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

অন্বয়ঃ—যদা অতমঃ (ভবতি) তৎ (তদা) দিবা ন (ভবতি), রাত্রিঃ ন (ভবতি), সন্ ন (ভবতি), অসৎ চ ন (ভবতি)। কেবলঃ শিবঃ এব প্রকাশতে, তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, তস্মাৎ (হি) পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—"যদা"—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। "অতমঃ" তমোনিবৃত্তিঃ অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। "তৎ" তদা, সেই সময়ে; "দিবা ন ভবতি"- দিন-কল্পনা থাকেনা। 'রাত্রিঃন ভবতি' রাত্রি-কল্পনা থাকেনা। "সৎ ন ভবতি" সৎ অর্থাৎ কারণ বা ভাব কল্পনা থাকেনা। "অসৎ ন ভবতি" অসৎ অর্থাৎ কার্য্য বা অভাব-কল্পনাও থাকেনা, "কেবলঃ"—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশূন্য নির্ব্বিকার। "শিবঃ" চিদ্রূপ অবিদ্যাস্পর্শ-রহিত জ্ঞানময় আনন্দাত্মা। "তৎ"—সেই প্রসিদ্ধ-বিজ্ঞানময় পরম-জ্যোতিঃ। "অক্ষরং ব্যাপক বা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য। "সবিতুঃ" প্রাণিনাং উৎপাদকস্য সর্ব্বজনকস্য ইতি শঙ্করানন্দঃ, সমস্ত প্রাণীর জনক সবিতৃদেবের "বরেণ্যং" সম্যক্‌প্রকারে ভজনীয়। "পুরাণী প্রজ্ঞা"—পুরাঽপি নবীনা সর্ব্বদা একরূপা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যজন্যা ইত্যর্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ, প্রাচীনতমা হইলেও সর্ব্বদা এক-রূপা অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার জ্ঞান জন্যা নিত্যা আত্মবিদ্যা।

বঙ্গার্থঃ—যখন "তমঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া সুবিমল স্বপ্রকাশজ্ঞানালোকের সমুদ্ভাস হয়, তখন কি দিন, কি রাত্র, কি ভাব, কি অভাব, কিছুরই কল্পনা থাকেনা। সমস্ত কল্পনাই অবিদ্যার কুহকবিজৃম্ভিতা, সেই অবিদ্যার ধ্বংসে তাহার ক্রিয়াবলীরও ধ্বংস হয়। সেই সময়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদ-পরিশূন্য, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অবিদ্যাস্পর্শ-রহিত জ্ঞানময় আনন্দ জ্যোতিঃই ইতস্ততঃ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় পরমজ্যোতিঃ ব্যাপক—অর্থাৎ সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য; সর্ব্বপ্রাণীর জনক পরম-ধ্যেয় সবিতৃদেবও তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই, প্রাচীনতমা হইলেও সর্বদা অবিকৃতা "আমিই ব্রহ্ম" এবংবিধা নবীনা অধ্যাত্মবিদ্যা বিনির্গতা হয়। তিনিই সর্ব্ববিধ বিকল্পের একমাত্র পরিচ্ছেত্তা তাঁহাকে জানিলে সমস্ত বিকল্পই দূরীভূত হয়। যে অবস্থার কথা বর্ণিত হইল, তখন যে কোনপ্রকার কল্পনাই থাকেনা; তাহা অপরাপর শ্রুতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে— "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তম আসীদিতি"।

১৯

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ-যশঃ ॥

অন্বয়ঃ— ( কশ্চিদপি ) এনং উর্দ্ধং ন পরিজগ্রভৎ, তির্য্যঞ্চং ন পরিজগ্রভৎ, ( বা ) মধ্যে ন পরিজগ্রভৎ, তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ কুত্রচিৎ কেনাঽপি অগ্রাহ্যত্ব', অদ্বিতীয়ত্বাৎ নিরুপমত্বম্ সর্ব্বেভ্যঃ সমধিকযশঃস্বরূপঞ্চ প্রকটয়তি ইয়ং শ্রুতিঃ।

পরিজগ্রভৎ—পর্য্যগ্রহীৎ বা পরিগ্রহীতুম্ শক্নুয়াৎ, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। "তস্য প্রতিমা ন অস্তি"—অদ্বিতীয়ত্বাৎ তস্য উপমা নাস্তি। অদ্বিতীয়তানিবন্ধন তাঁহার উপমা নাই, অর্থাৎ তিনি কোন পদার্থেরই সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহেন। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।— যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত যশোরাশি জগতের প্রতিস্তরে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "নাম"—প্রসিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—সেই কূটস্থব্রহ্ম কি উর্দ্ধ কি অধঃ, কি মধ্য, কোথায়ও কাহার পরিগ্রাহ্য নহেন, কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। ( তবে তাঁহাকে কি করিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে যে ) তাঁহার উপমা নাই, ( অতএব তিনি অমুক পদার্থের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; তবে তিনি কিরূপ? কি করিয়া তাঁহাকে বুঝিব? এতদুত্তরে উক্ত হইতেছে ) তাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত প্রসিদ্ধযশঃ বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেই বিরাজিত রহিয়াছে, জগতের যাবতীয় বস্তুই যাঁহার কীর্ত্তিমেখলায় বিমণ্ডিত। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপদার্থে তাঁহার কীর্ত্তি-সত্তা-পরিগ্রহ করিতে প্রথমতঃ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ভূতভৌতিক প্রপঞ্চজাত তদীয় সনাতনী কীর্ত্তি। সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা করিলে, প্রতি পদার্থেই সেই কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কৌমুদী অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হওয়া যায়; কিন্তু সকলের মূল সমাধি, সেই সমাধি বর্জ্জিতহৃদয়ে তদুপলব্ধির আশা কদাচ সম্ভবপর নহে।

২০

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়ঃ—অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি, কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে এনং হৃদিস্থং হৃদা মনসা চ এবং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"সন্দৃশে"—( সম্যক্ প্রকারেণ দৃশ্যতে অত্র ইতি সম্+দৃশ্+ক, চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেশঃ—তত্র,) চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্থানে। "হৃদা"—শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা। "মনসা"—মননধর্ম্মক মনে দ্বারা। "হৃদিস্থং"—হৃদাকাশগুহাস্থ। "তে অমৃতাঃ ভবন্তি"—ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—এই পরম ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দ স্বরূপ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানে অবস্থান করে না, অর্থাৎ ইহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, ইহাকে কেহ

চক্ষুদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেনা। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্ত যোগাধিকারি-সন্ন্যাসিগণ সুপরিশুদ্ধ-সমাধিমার্জ্জিত বিমলবুদ্ধি ও নিশ্চলমনের দ্বারা হৃদাকাশগুহাস্থ এই পরমপুরুষকে "ব্রহ্মাহমস্মি" "ব্রহ্মই আমি" এই ভাবে জানিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা অপরোক্ষীকরণ-মহিমা বলে অমৃতত্বলাভ করেন। মরণের হেতু অবিদ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলের দ্বারা দগ্ধীভূত হওয়ায়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী-দিগকে আর পুনরায় দেহান্তরভজনা করিতে হয়না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি।"

২১

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ
প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যম্।

অন্বয়ঃ— (ত্বম্) অজাতঃ ইতি এবং (কর্ণয়িত্বা) ভীরুঃ (সন্) (ত্বাম্ এব শরণম্) প্রতিপদ্যতে। হে রুদ্র! যৎ তে দাক্ষিণং মুখং, তেন মাং নিত্যং পাহি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"অজাতঃ" জন্ম-জরা-অশন-পিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিত। "ভীরুঃ"—সংসার হইতে ভীত হইয়া। "ত্বামেব শরণং প্রতিপদ্যতে" তোমাকে শরণপ্রাপ্ত হইতেছে। "দক্ষিণংমুখং"—উৎসাহজননং রূপং তোমার উৎসাহজনন আহ্লাদপূর্ণ চিন্ময়রূপ। "পাহি"—রক্ষা কর।

বঙ্গার্থঃ—সাধক জন্ম, জরা, মরণ, অশন, পিপাসা, শোক, মোহ প্রভৃতি অনন্ত-ক্লেশ-পরিপূর্ণ সংসার হইতে ভীত হইয়া, তত্তৎ ক্লেশাত্মক-ধর্ম্মবর্জ্জিত তোমাকে একমাত্র নিরপায় সংশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন। হে রুদ্র অর্থাৎ হে অবিদ্যাবিনাশক! তোমার নিয়তানন্দময় উৎসাহজনক রূপদ্বারা তুমি সর্ব্বদা আমাকে অবিদ্যার করাল-কবল হইতে রক্ষা কর। হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অনুপমদ্যুতি প্রকাশিত করিয়া, আমার মনের চিরান্ধতমসের বিনাশসাধন কর। তুমি জন্ম-জরা মরণ প্রভৃতি অকল্যাণ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত; তাই হে রুদ্র! অর্থাৎ হে অবিদ্যাধ্বংসক! তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি, তুমি তোমার চিরোৎসাহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমার জড়তা-পন্ন জীবন পুনরুৎসাহিত করিয়া দাও।

২২

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু
রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো—
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥

অন্বয়ঃ— হে রুদ্র! (ত্বম্) নঃ তোকে, তনয়ে, আয়ুষি গোষু অশ্বেষু (চ) মা রীরিষঃ। ভামিতঃ (সন্) বীরান্ নঃ মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ (বয়ং) সদমিত্ত্বাহবামহে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "তোকে"— পুত্রে— অর্থাৎ পুত্রকে। "তনয়ে"— পৌত্রকে। "আয়ুষি"— আয়ুঃ। "অশ্বেষু"—অপরাপর শরীরিসমূহকে। "মা ন রীরিষঃ" বধং মা কার্ষীঃ— বধ করিও না। "ভামিতঃ

বীরান্ নঃ মা বধীঃ”—অত্র শঙ্করঃ—“যে চাস্মাকং বীরা বিক্রামন্তো ভৃত্য, হে রুদ্র! তান্ “ভামিতঃ ক্রোধিতঃ সন্ মা বধীঃ’,—হে রুদ্র! আমরা তোমার বিক্রমশালী অর্থাৎ ঔদ্ধত্যযুক্ত ভৃত্য; তুমি ক্রোধিত হইয়া, তোমার এই সকল ভৃত্যকে বিনষ্ট করিওনা। “হবিষ্মন্তঃ” হবিযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ নিয়ত হোমপরায়ণ হইয়া। “সদমিৎ”—সদা সর্ব্বদা, “ত্বা” ত্বাম্—তোমাকে। “হবামহে”—রক্ষণার্থং আহ্বয়ামঃ—রক্ষারনিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থঃ—হে রুদ্র! হে অনন্তশক্তে! তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, হবিঃ-সাধন গো এবং অন্যান্য শরীরধারীদিগকে বিনাশকরিও না। আমরা শত উদ্ধত হইলেও, তোমার ভৃত্য; হে নাথ! তুমি তোমার ভৃত্যের প্রাণ-সংহার করিও না। আমরা প্রতিনিয়ত হবিরাদি সাধন দ্বারা তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।
মেট্রপলিটান কালেজ।

---

## এক ও অনেক।

এক চন্দ্র অন্ধকার হরে;
অনেক তারায় কিবা করে?। ১
রাজ্যরক্ষা একটি রাজার;
নাহি হয় অনেক প্রজার। ২
এক সেনাপতির শাসনে,
অনেক সৈনিক রত রণে। ৩
এক শিক্ষিতের শিক্ষামত—
সম্প্রদায় হয় সমুন্নত।
মিলিয়া অনেক মূর্খজন,
কোন শিক্ষা না করে সাধন। ৪
ভাল এক বাক্যও সার্থক,
অনেক প্রলাপ অনর্থক। ৫
একটি সুখাদ্য স্বাস্থ্যরয়,
অনেক কুখাদ্য কিছুনয়। ৬
সুপুত্রেকে সুখ-সম্ভাবনা,
কুপুত্র-অনেকে বিড়ম্বনা। ৭
সুপাঠিত এক গ্রন্থ সার,
কুপঠিত অনেক অসার। ৮
সুকৃত এক কাজেও হিত,
কুকৃত অনেক বিপরীত। ৯
একটি সরিৎ সুনিশ্চয়—
অনেক কূপের শ্রেষ্ঠ হয়। ১০
অনেক কুসুম উপেক্ষিত,
একটি গোলাপ সমাদৃত। ১১
অনেক দিনের দাসত্বের তুলনায়,
দিনকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ প্রায়। ১২
দিনেকের তরে ধর্ম্ম-জীবন সার্থক;
অধর্ম্মে অনেক দিন বাঁচা অনর্থক। ১৩
ঘৃণিত অধর্ম্মার্জ্জিত কনক অনেক,
সমাদৃত ধর্ম্মার্জ্জিত কপর্দ্দক এক। ১৪
সুপাত্রে একটি পাই দানও সার্থক;
অপাত্রে অনেক অর্থদান অনর্থক। ১৫
সুকৃত ব্যবসা এক ধনপ্রদ বটে;
কুকৃত অনেকে মাত্র অপহ্নব ঘটে। ১৬
তরুর একটী মূলে জল দিলে ফল,

অনেক শাখার-পত্রে সেচন নিষ্ফল। ১৭
সুসিদ্ধ একটি লক্ষ্যে শুভ ফলোদয়,
অসিদ্ধ অনেক লক্ষ্যে বৃথা কালক্ষয়। ১৮
অনেক নাস্তিক শুধু ধরণীর ভার;
এক ভগবৎভক্ত ভুবনালঙ্কার। ১৯
এককে যে সার করে অনেক সে পায়,
অনেক যে চায়, তার এক পাওয়া দায়।২০

---

# হিন্দু ও অহিন্দু।

---

সত্য হিন্দু হতে যদি চাও,
সত্যপর-ন্যায়বান হও। ১
যদ্যপি প্রকৃত হিন্দু হও,
কায়মনোবাক্যে শুচি রও। ২
স্বার্থত্যাগী পরার্থানুরাগী,
সেই সত্য হিন্দু নামভাগী। ২
সুখে শান্ত দুখে অবিহ্বল,
হিন্দু নাম তাহারি সফল। ৪
ভ্রাতৃভাবে ভাবে যে মানবে,
হিন্দু আখ্যা তাকেই সম্ভবে। ৫
সদা যে কর্ত্তব্য কাজে রত,
হিন্দু সংজ্ঞা তাহারি সঙ্গত। ৬
মূকজীবে যেবা দয়াবান,
সত্য তার হিন্দু অভিধান। ৭
সর্ব্বধর্ম্মে ধীর-দৃষ্টি যার,
হিন্দু নাম স্থায়ী বটে তার। ৮
ঈশে যার রতি-গতি-নতি,
হিন্দু সংজ্ঞা সাজে তারি প্রতি। ৯
খুঁটিনাটি ত্রুটি আচারের—
হেতু নয় "অহিন্দু" নামের।
স্বার্থপর অধার্ম্মিক যেই,
যথার্থ অহিন্দু বটে সেই। ১০
খাদ্য-বিচারের অঙ্গহানি,
তাতেই না যায় হিন্দুয়ানী।
সুচিন্তা সুবাক্য-সুকর্ম্মের—
হানিতেই হানি হিন্দুত্বের। ১১
সর্ব্বভূতে আত্ম প্রসারণ,
সনাতন ধর্ম্মের সাধন।
যে জাতি সে ধর্ম্মে আস্থাবান,
সিন্ধুতীরে যার আদিস্থান।
সে জাতীয় যে জন্মে যথায়,
সাধে ধর্ম্ম যেবা সুবিধায়,
তাহারেই "হিন্দু" নামে মানি;
তদিতর "অহিন্দু" বাখানি। ১২
আহার-বিচার-ভিন্নত্ত,
জল-যানে সমুদ্র-যাত্রায়,
সত্যজ্ঞানে নহে অহিন্দুত্ব;
অহিন্দুত্ব অসত্যেই সত্য! ১৩
চোর দস্যু লোলুপ লম্পট,
নিপট কপট ক্রূর শঠ;
হত্যাকারী অত্যাচারী তথা,
গৃহদাহী মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা;
জালিয়াৎ দাঙ্গাবাজ ঠক,
প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক;
কামুক ও হিংসুক দুর্ম্মুখ,
নিথুক ও বিশ্ব-বিনিন্দুক;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসবিহীন,
চিত্ত যার দীন হীন ক্ষীণ;
নাস্তিকতা নীরস-পরাণ,
মন যার মহামরুস্থান;

নাহি যার স্নেহ দয়া-বিন্দু,
ইহারাই প্রকৃত অহিন্দু। ১৪
(শুধু) ——
অন্নাদি-আচার-ভেদে,
বর্ণাদি-বিচার-ভেদে,
হিন্দু বা অহিন্দু হয়,
এ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নয়;
বিশ্বাস ও কার্য্যে বদ্ধ
হিন্দুত্ব ও অহিন্দুত্ব। ১৫

---

# সেকাল ও একাল।

## আয়কর।

ইনকম্ টেকস বা আয় অনুসারে প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইহা একালে ইংরাজ রাজ্যের একটী উৎপীড়ন বলিয়া যে সাধারণের ধারণা আছে তাহা ভ্রমমূলক। বিজিত জাতি বলিয়া রাজা আমাদের নিকট অতি উচ্চ-হারে এই কর গ্রহণ করেন বলিয়া যে অনেক লোকের সংস্কার আছে, তাহাও ভ্রমমূলক। বাস্তবিক সেকালের "রামরাজ্যেও" ইনকম্ টেক্স ছিল এবং তাহার হার একালের অপেক্ষা বেশী ছিল। একথা কেবল বলিলে পাছে লোকের বিশ্বাস নাহয়, এজন্য একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি।

মনু, ৭ম অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো-দাপয়েৎ করান্॥ ১২৭
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্;
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১২৮
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো বৎস ষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ১২৯
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ-এব বা॥ ১৩০
আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য চ॥ ১৩১
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ ১৩২
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্ জনম্॥ ১৩৭

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ১৩৮

বাণিজ্য দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এবং ঐ দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, আনিতে পথে বিপদাদির কিরূপ সম্ভাবনা, পথে ব্যয়, মাসুল প্রভৃতি কত দিতে হইয়াছে, চোরদস্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কত ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে লাভালাভের কিরূপ সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখিয়া কর ধার্য্য হইবে। যাহাতে রাজা উচিত মত কর পান ও বণিক্ সম্যক্ রূপে আপন কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারেন, উভয় বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া কর সংস্থাপিত হইবে। যেরূপে জলৌকা (জোঁক) রক্ত পান করে বা গোবৎস দুগ্ধ পান করে অথবা ভ্রমর মধু পান করে সেই প্রকার রাজা ও মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প কর গ্রহণ করিবেন। যাহাতে মূলধনের প্রতি কোন ব্যাঘাত, বা উৎপাদিত ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া বণিকের বাণিজ্যে অনুৎসাহ জন্মে, এরূপ একেবারে অধিক কর রাজা গ্রহণ করিবেন না। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; ধান্য শস্যাদি সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬, ৮ বা ১২ ভাগের এক ভাগ; বৃক্ষ, মাংস, মধু, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, শাক, তৃণ, বংশনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃৎপাত্র, বা প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬ ভাগের ১ ভাগ, রাজার গ্রহণীয়।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন দুঃখী প্রজা, যাহারা শাকাদি সামান্য বস্তু বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগের নিকট ও কিঞ্চিৎমাত্র কর বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিবেন। কারু ও শিল্পজীবিগণ—যথা, পাচক, মালাকার, কাংস্যকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর এবং যে সকল শূদ্র নিজের শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

মনুর দশম অধ্যায়ের ১১৮। ১১৯ এবং ১২০ শ্লোকেও এই বিষয়ের কথা আছে। আপৎকালে রাজা শস্যাদির ৪ভাগের এক ভাগ, সুবর্ণাদির ২০ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন, শূদ্র এবং কারু ও শিল্প কার্য্যোপজীবিগণের নিকট কর গ্রাহ্য নহে, তাহাদিগের দ্বারা (সাধারণকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে) কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মনুর ন্যায় হারীতও "* * * ষড়ভাগার্হঃ সদানৃপঃ" (২য়অধ্যায় ৩য়শ্লোক) বলিয়াছেন। বশিষ্ঠও একোনবিংশ অধ্যায়ে প্রায় এইরূপ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ যে মনুর পরবর্ত্তী, ঐ অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন অন্তর্নিহিত ( internal evidence) আছে। এই বশিষ্ঠ যে রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী বশিষ্ঠ নহেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখি নাই।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যায় যে, ভূমি ও ব্যবসায়ের উপর কর সেকালে সাধারণতঃ ১/৬ হইতে ১/১২ পর্য্যন্ত ছিল এবং

আপৎকালে ১/৪ পর্য্যন্ত উঠিত। অর্থাৎ এখন যেমন আফগান যুদ্ধাদিতে লবণাদির শুল্ক বর্দ্ধিত হয় তখনও সেইরূপ হইত। তখনও এই "ঘৃণিত" বনকর ছিল। এখন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনে কাষ্ঠ, মধু, "গোল" পাতা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে তৃণ (১) লাক্ষা (২) "মহুয়া" মধুপুষ্প প্রভৃতি হইতে বন বিভাগের যে শুল্ক আদায় হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে লোকে নানা আপত্তি ও দোষারোপ করে, কিন্তু এ কর নূতন নহে। বঙ্গের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুশাসিত (Regulation District) দেশে "বেগার" নাই; কিন্তু ছোটনাগপুর অঞ্চলের (non regulation) বন্য-প্রদেশে "বেগারের" কুলিদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার (অবশ্য কাজ করিলে পয়সা দিবার) প্রথা আছে। "বেগার" প্রথা সেকালে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; একালে উহা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই চলে। অতি দরিদ্র লোকেও ৩০ ভাগের এক ভাগ কর দিত, ইহাদিগকে এখন কিছুই দিতে হয় না। বিদ্যার উপর কর ছিল না (মনু ৭ম অঃ ১৩৫—১৩৬) বরং বিদ্যাদানের ও লাভের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয় তজ্জন্য বৃত্তি প্রভৃতি দান করা হইত। রাজা এখনও বিদ্যাদানে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন।

[১] "সাবাই" ঘাস (দড়ি ও কাগজের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং পশুচারণার্থ ঘাস গবর্ণমেণ্ট জঙ্গলে "বিলি" হয়।

[২] পলাসবৃক্ষে কীটবিশেষের উৎপাদিত নির্য্যাস।

করবহনক্ষম সকল ব্যক্তির উপর সমানভাবে কর হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত বেশী ভাগ ভরণ পোষণে ব্যয় হয়, অথবা ভরণ পোষণে যে ব্যক্তির বা জাতির ব্যয় আয়ের অনুপাতে যত বেশী সে ব্যক্তি বা জাতি তত দরিদ্র। ছোটনাগপুরের প্যালামৌ অঞ্চলের মফঃস্বলে ৪ হইতে ৮টী গোরক্ষপুরী পয়সা (প্রচলিত ২১/২ হইতে ৪১/২ পয়সা) দিলে স্ত্রীলোকে ও পুরুষে ৭।৮ঘণ্টা কাজ করে, অনেকস্থলে পাকি দেড়সের মকাই বা নিকৃষ্ট চাউল পাইলে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন কাজ করে। এই আয়ে উহাদের উদর পূর্ত্তি হইয়া কষ্টে বস্ত্রাদির জন্য কিছু থাকে, বোধ হয় শতকরা ৯০ ভাগ আহারে ব্যয় হয়। কলিকাতার নিকট যে সকল ভদ্র লোকের কেবল মাত্র চাকুরীই সম্বল, তাঁহাদের ৪২।৪৩, আয় হইতে ১৲ টাকা টেকস্ দেওয়া বড় কষ্ট কর। নিজেদের কথা দূরে থাকুক, বালক বালিকাগণও শরীর পোষণার্থ অত্যাবশ্যকীয় দুগ্ধ ঘৃতাদি উপযুক্ত পরিমাণে পায় না। এস্থলে ঐ ৪২৲।৪৩৲ টাকা হইতে যদি ১৲ টাকা না দিতে হইত, তাহা হইলে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য ঐ টাকাটী ব্যয় হইত এবং সেই পরিমাণে ঐ পরিবারের সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইত।

এক্ষণে চাকরিতে বার্ষিক ৫০০৲বা ততোধিক ২০০০৲ পর্য্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৪ পাই বা ১/৪৮ ভাগ এবং ব্যবসায়ে ৫০০৲ আয়ের উপর প্রায় ১/৫০ ভাগ এবং বার্ষিক ২০০০৲ আয়ের উপর সর্ব্বত্র ১ টাকায় ৫

পাই বা প্রায় ১/৩০ ভাগ কর ধার্য্য আছে। আমাদের রাজার নিজের দেশে গত বৎসর পাউণ্ডে ১ শিলিং বা ২০ ভাগের একভাগ আয় কর ছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে অনেক কোটী টাকা ব্যয় হওয়ায় আয়কর বর্দ্ধিত হইয়া পাউণ্ডে ১ শিলিং ২ পেন্স বা প্রায় ১৯ ভাগের এক ভাগ হইয়াছে।° ইংলণ্ড ধনী, ভারত দরিদ্র' ইংলণ্ডে এই বর্দ্ধিত করে আপত্তিও হয় নাই। ইংলণ্ডে যথেষ্ট টাকা, মূলধনের অভাব নাই, বার্ষিক ৩৲ হারে ধার দিতেও লোকে উৎসুক। ভারতে ব্যবহার যোগ্য মূলধন বড় অল্প, সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা প্রায় দেখা যায়। ব্যবসায়ের উপর কর এদেশে অনেকস্থলে মূলধনে আঘাত করে; মূলধনে আঘাত লাগিলে ধনী প্রথমতঃ ঐ কর দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীর উপর এবং তৎপরে শ্রমজীবিগণের উপর চাপাইতে চেষ্টা করেন; উহাতে ও ঠিক না হইলে ব্যবসায় বন্ধ হয়। দরিদ্র দেশে আরও দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনশালী দেশে অনেক লোকের ২০০০০৲ আয়। তাঁহারা টেক্স দিয়াও যথেষ্ট খায়দায় ও বাবুয়ানী করে। টেক্স কমিলে তাহাদের সেই টাকা যে টাকা জমিতেছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অর্থাৎ ধার দিবার বা কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থ কিছু বাড়িবে। টেক্স বাড়িলে স্বল্প সংখ্যক টাকা জমিল না মাত্র—ঐরূপ টাকা না জমায় সুখস্বাস্থ্যের কিছু প্রতিবন্ধক হয় না, সুতরাং লোকে বিশেষ আপত্তিও করেনা।

প্রত্যেকের আয়, সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কিরূপ অভাব পূরণের আবশ্যক, তৎপরে রাজাকে দিবার মত কত থাকে, ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পথের ব্যয় ক্লেশ ও বিপদ, কিরূপে জাতীয় বাণিজ্যাদির বিস্তার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সকল সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া একালের মত সেকালেও করবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারণের রীতি ছিল। যে ব্যক্তি অধিক সম্পত্তির অধিকারী, তাহার সুখ শান্তির জন্য রাজার সামান্য চৌকি পাহারার বন্দোবস্তও অধিক প্রয়োজন, তাহার করদানের ক্ষমতাও অধিক। কিন্তু যাহার কিছুই নাই, যে শাক বেচিয়া, কাঠ কুড়াইয়া বা সামান্য মজুরী করিয়া কষ্টে খাদ্যের সংস্থান করে, তাহার কর দানের ক্ষমতা নাই, তাহার উপর আয় কর হওয়া অকর্ত্তব্য। ইংরাজ রাজ সেকালের মত এইরূপ দীন দরিদ্র ব্যক্তি বর্গের নিকট আয় করগ্রহণ করেন না, ইহা আমাদের রাজার দয়া, মহানুভবতা ও গভীর অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে হারে আয়কর আছে, তাহা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও ভারতের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা উহার হার বর্দ্ধিত করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বরং বার্ষিক ৫০০৲ আয়ের উপর কর এক বারে তুলিয়া দিয়া যদি ১০০০৲ আয়ের উপর হইতে কর সংস্থাপন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে আমাদিগের রাজা সচেষ্ট আছেন ইহা একাধিকবার প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত

---

মন্তব্য।

রাজা প্রজাদিগের স্বদেশবাসী হইলে তিনি যে করগ্রহণ করেন, তাহা অধিক হইলেও প্রজাদিগের মধ্যে ব্যয়িত হওয়ায় তাহারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। বিদেশীয় রাজার সংগৃহীত কর অল্প হইলেও উহার অধিকাংশই বিদেশ ব্যয়িত হওয়ায় প্রজাদিগের উহা হইতে কোন প্রত্যুপকার পাইবার সম্ভাবনা থাকেনা, এবং দেশ ক্রমশ দরিদ্র হইতে থাকে, রাজা বিদেশীয় হইলে বিদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে দেশী শিল্প বাণিজ্যের অবনতি না হইয়াও পারে না এবং তাহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়ে।

হিঃ পঃ সম্পাদক।

# ভ-গোল-পরিচয়।

৭ম পাঠ।

## বৃষ-রাশি।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের ¾ অংশ ও রোহিণী-নক্ষত্র এবং মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের ½ অংশ দ্বারা বৃষরাশি গঠিত। কিন্তু বৃষরাশির আয়তন মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ও রোহিণী নক্ষত্রের তারা গুলি অবস্থিত। (১)

কৃত্তিকা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় বৃষের ককুৎ গঠিত এবং রোহিণী নক্ষত্র দ্বারা তারা-বৃষের মুণ্ড গঠিত।

বর্ত্তমান সময়ে বৈশাখাদি বর্ষগণনা হয়; রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ এবং প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। প্রাচীনকালে কার্ত্তিকাদি বর্ষগণনা হইত,এবং রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র কৃত্তিকা এবং প্রথম রাশি বৃষরাশি ছিল। (২)

বৃষরাশিস্থ তারাগণ মধ্যে...

(১) হলদ্দীবর্ণ তারা বৃহত্তম, এবং লোহিতবর্ণ এই তারাটী দেখিতে অতি মনোহর। এই তারা রোহিণী নক্ষত্রের যোগতারা; রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা, এজন্য রোহিণীর অপর নাম ব্রাহ্ম বা কমলজ দৈবত। (৩)

১। সাধারণতঃ নক্ষত্র শব্দে রবিমার্গের ৩৬০° অংশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ১৩⅓° অংশ বুঝিতে হইবে। তারা বর্ণনকালে নক্ষত্র শব্দে তারাসংহতি বুঝিতে হইবে।

২। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতার হন বৃষ।

"বাধিদৈবতং দেব অগ্নি প্রত্যাভি দৈবতং" ইতি গ্রহযাগতত্ত্ব।

৩। রোহিণীর অধিপতি ব্রহ্মমণ্ডলস্থ বা অথবা মৃগরূপী কালপুরুষ।

(২) হলদ্দীবর্ণ তারার প্রায় ৮ হাত উঃ পূঃ কোণে অগ্নিতারক অবস্থিত।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারাগণ মধ্যস্থিত দেবসেনা তারা। দেবসেনা বৃষরাশির ৪র্থ তারা। ইহার পাশ্চাত্য নাম Alcyone

## কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগশিরা নক্ষত্র।

দেবসেনা ও হলদ্দীবর্ণ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নিকোণে পরিবর্দ্ধিত করিলে, হলদ্দীবর্ণ তারা হইতে ১০ ফুট অন্তরে একটী ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক। এই তারাটীর নাম কার্ত্তিকেয় তারা। কার্ত্তিকেয় তারা হইতে ২ফুট অন্তরে ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র তারাগুচ্ছ আছে; ঐ তারাগুচ্ছের তিনটী মাত্র ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়। তারাগুচ্ছের উত্তরস্থ তারাটী ৪র্থ শ্রেণীর এবং ঐ তারার নাম এনকতারা। অপর ২টী তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর। তারাত্রয় বিড়াল পদাকৃতি; ঐ তারাগুচ্ছের নাম মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ (৪)

কালপুরুষমণ্ডলস্থ ১১।১৩।১৭তারা = মৃগশিরা নক্ষত্র। এণকতারা-যোগতারা মৃগশিরা)

## কালপুরুষ মণ্ডলস্থ আর্দ্রা নক্ষত্র।

কার্ত্তিকেয় তারার ৪ হাত পূর্ব্বে এবং এণকতারার ৩ হাত অগ্নিকোণে যে একটী

৪। কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগরূপী প্রজাপতির মস্তক।

৫। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্য প্রবেশ করিবা মাত্র অম্বুবাচির সূচনা হয়। অম্বুবাচির স্থিতি ৩ দিন ২০ দণ্ড। অম্বুবাচির সূচনায় ৪র্থ দিনে দীর্ঘতম দিবা এবং হ্রস্বতম রাত্রি হয় এবং বর্ষাঋতুর আবির্ভাব হয়।

১ম শ্রেণীর রক্তবর্ণ তারা দর্শক দেখিবেন, ঐ তারাটীর প্রাচীন নাম বিশাখা আধুনিক নাম আর্দ্রা। আর্দ্রা কালপুরুষমণ্ডলস্থ ২ তারা। সৌন্দর্য্য-বলে আর্দ্রা স্বপ্রকাশে সমর্থ। এজন্য আর্দ্রা তারা এককই নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্র

বিশাখ, তারা = আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ তারা। আর্দ্রাতারা নামের সার্থকতা আছে।

মৃগবাধ মণ্ডলস্থ লুব্ধক তারা পূর্ব্বে আর্দ্রানক্ষত্র ছিল। পৌরাণিক সময়ে অয়নাংশগতি বলে লুব্ধক তারার আর্দ্রানক্ষত্রত্ব লোপ হয়। কালপুরুষ মণ্ডলস্থ বিশাখ তারাকে আর্দ্রানক্ষত্র পদে (৬) অভিষিক্ত করা হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লুব্ধক আর্দ্রালুব্ধক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (৭)

৬। যে তারা অয়নান্ত বিন্দুর সহিত এক ধ্রুবকে অবস্থিতি করে, ঐ তারায় সূর্য্য উপনীত হইলে, বর্ষাগম হয় এবং ঐ তারাকে আর্দ্রা বলা হয়। অয়নান্তবিন্দু বিলোমগতি-বলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিতেছে এবং ক্রমে আর্দ্রা নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতি প্রাচীনকালে সরমা তারা (আধুনিক প্রভাষতারা) আর্দ্রানক্ষত্র ছিল, পরে তৎ-পুত্র শ্বা (লুব্ধক) আর্দ্রা হইয়াছিল; এক্ষণে বিশাখাতারা আর্দ্রানক্ষত্র।

৭। একই তারার আর্দ্রানাম, এবং লুব্ধক নাম, অথবা অগ্রে আর্দ্রানাম পশ্চাৎ লুব্ধক নাম, এই অর্থে আর্দ্রা-লুব্ধক। কিন্তু পণ্ডিতবর হলায়ুধ স্বীয় কোষে বলেন—"আর্দ্রালুব্ধকঃ কেতুগ্রহঃ।"

## মিথুন রাশি।

মৃগশিরা নক্ষত্রের ½ অংশ, ও আর্দ্রা নক্ষত্র এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ¾ অংশ দ্বারা মিথুনরাশি গঠিত। কিন্তু মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে তারামিথুন (অশ্বিদ্বয় = বিষ্ণু-তারা + সোমতারা) অবস্থিত নহে। মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে মৃগশিরা নক্ষত্রের তারাগণ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের তারা অবস্থিত। আদিমতারামিথুন কর্কটরাশিতে অবস্থিত। রাশিচক্রের আদিগঠনকালে তারা মিথুন অবশ্যই মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুনর্গঠনকালে বাহিরে পড়িয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঋশ্য-মৃগরূপী প্রজাপতি কালপুরুষ ও রোহিৎ মৃগ-রূপিণী রোহিণী, এই মিথুন হইতে বর্ত্তমান মিথুন রাশির নামের (৮) সার্থকতা কতকাংশে রক্ষা পাইয়াছে। কারণ মৃগশিরা

৮। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৫—৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—একদা প্রজাপতি ব্রহ্ম স্বদুহিতার প্রতি ধাবমান হইলেন।

(কেহ বলেন দুহিতা অর্থে দিব কে[illegible] বলেন উষা।) প্রজাপতি ঋশ্য মৃগরূপ ধার[illegible] করিয়া রোহিৎমৃগরূপধারিণী স্বদুহিতা[illegible] অনুসরণ করেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখি[illegible] বলেন, প্রজাপতি অকার্য্য করিতেছে[illegible] ইহাকে কে বধ করিবে। দেবগণের [illegible] ঘোরতম আকৃতি ছিল তাহা সমবেত হই[illegible] এক দেবরূপ সম্ভূত হইল। ঐ সম্ভূতর[illegible] ভূতবৎদেব নামে অভিহিত। দেবগণ ভূ[illegible]

নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তনের মধ্যগত বলিলেও বলাযায়; কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তন বহির্গত।

---

বৎকে বলিলেন প্রজাপতি অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্ম করিলেন। ইহাকে বধকর। তিনি বলিলেন—তথাস্তু। তিনি পশুপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ-বরে তিনি পশুমান্ (বা পশুপতি) হইলেন। বাণবিদ্ধ প্রজাপতি উর্দ্ধে উঠিলেন। ইহাকে মৃগ বলে। ভূতবৎ মৃগব্যাধ। রোহিৎরূপ ধারিণী রোহিণী। সেই ইষু ত্রিসন্ধিময় বলিয়া তাহার নাম ত্রিকাণ্ড।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩৩

শত পথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়:—

প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রতি আসক্ত হইলেন; স্বদুহিতা দিব বা উষা তাঁহার সহিত আমি মিলিত হই,এই [ চিন্তা করিয়া] তিনি আসক্ত হইলেন। দেবগণের চক্ষে ইহা পাপ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইল। দেবগণ চিন্তা করিলেন, যিনি স্বদুহিতার,আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি পাপে লিপ্ত। দেবগণ তখন পশুপতি [রুদ্র] দেবকে বলিলেন, যিনি স্বদুহিতার, আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন তিনি পাপে লিপ্ত। নিশ্চয়ই বাণে বিদ্ধ কর।" রুদ্র শর সন্ধানপূর্ব্বক তাহাকে বিদ্ধ করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭ ৪ ১—৩

মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে গৃহী অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন, কারণ মৃগশীর্ষ নিশ্চয়ই প্রজাপতির শিরঃ। শিরঃই শ্রী। শিরঃ অর্থেই শ্রেষ্ঠ।

মিথুন রাশির তারাগণ মধ্যে —

১। স্বাহা তারা, অগ্নিতারার প্রায় ৫ হাত দূরে অগ্নি কোণে অবস্থিত। এই স্বাহা তারা আদিম ইল্বল নক্ষত্রের যোগতারা। পঞ্চতারাত্মিকা প্রাচীন ইল্বল নক্ষত্রের অপর তারাচতুষ্টয় স্বাহা তারার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। (৯)

২। স্বাহা তারার উত্তরেই পুতনা নামক কর্কটাকৃতি তারাস্তবক অবস্থিত।

---

এই জন্য সমাজপতিকে শ্রেষ্ঠী বলে। অর্থাৎ তিনি সমাজের প্রধান। এতৎ সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া যিনি মৃগশিরা নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করেন,তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

অপরপক্ষে বলিতে পারেন,মৃগশীর্ষনক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন ব্যবস্থা নহে। সত্য বটে মৃগশীর্ষ প্রজাপতির দেহ, কিন্তু যখন দেবগণ তদবস্থায় তাঁহাকে ত্রিকাণ্ড বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন,তখন তিনি ঐ দেহ ত্যাগ করেন। শরীর আবরণ মাত্র, অপবিত্র ও নির্বীর্য্য; সুতরাং গৃহস্থের মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান বিধেয় নহে।

যাহাহউক, তিনি মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন। কারণ প্রজাপতির দেহ শব বা অপবিত্র নহে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৮-১০

আমরা কেবল একটী কথা বলিতে চাই, এই ত্রিকাণ্ড বাণ পুরাণোক্ত পাশুপত বাণ।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত মৃগরূপী কালপুরুষের মস্তক নক্ষত্র মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে ইল্বলনক্ষত্র মৃগশীর্ষ স্থানীয় ছিল।
"ইল্বলাঃ তৎশিরোদেশে তারকাঃ নিবসন্তিযে।"

ইতি অমরকোষঃ।

"ইল্বলাঃ সোমদৈবত্যাঃ।"

ইতিগরুড়পুরাণ ১।৫৯

## কালপুরুষমণ্ডল।

মৃগশিরা নক্ষত্রের দক্ষিণে একটী তারাময় চতুর্ভুজক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তারাচতুর্ভুজের উত্তর বাহু ৪ হাত, দক্ষিণ বাহু ৫ হাত, পূর্ব্ব বাহু ৮ হাত এবং পশ্চিম বাহু ১০ হাত দীর্ঘ। তারাচতুর্ভুজক্ষেত্রের অগ্নিকোণে কার্ত্তিকেয় তারা, ঈশান কোণে আর্দ্রা তারা, বায়ুকোণে কার্ত্তবীর্য্য এবং নৈর্ঋত কোণে একটী প্রথমশ্রেণীর অত্যুজ্জল শুভ্রবর্ণ তারা। ঐ তারার নাম বাণতারা। ঐ তারা চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যদেশে শরাকৃতি উজ্জলতারাত্রয়। মৃগশিরা নক্ষত্র সহ এই তারা চতুর্ভুজক্ষেত্র কালপুরুষমণ্ডল নামে অভিহিত। কালপুরুষ মণ্ডল দেখিলে বোধহয়, নাভিদেশে শরবিদ্ধ মৃগ লম্ফপ্রদানে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকে কালপুরুষমণ্ডলকে ত্রিশঙ্কুরাজ বলে। (১০)

## মৃগব্যাধ মণ্ডল।

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ তারাময়শর অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে ১২ হাত দূরে একটী নীলাভ শুভ্রবর্ণ অতি বৃহৎ তারা দর্শক দেখিবেন। ঐ তারার আদি নাম তিষ্য, প্রাচীন নাম স্বন্ ও লুব্ধক এবং এক সময়ে লুব্ধক আর্দ্রা নাম পাইয়াছিল। লুব্ধক ও তৎসন্নিহিত তারাচতুষ্টয় একটী তারাময় মহিষশৃঙ্গ গঠন করিতেছে। যে মণ্ডলে এই তারাশৃঙ্গ অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ মণ্ডল। লুব্ধক তারা মৃগব্যাধমণ্ডলের ১ তারা। লুব্ধক তারা তারাকুলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ৫০০ গুণ বৃহত্তর। প্রাচীনকালে লুব্ধক রক্তবর্ণ ছিল। কালবশে লুব্ধকতারা নীলাভ শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে লুব্ধকতারা আর্দ্রা নক্ষত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এজন্য ইহার অপর নাম আর্দ্রালুব্ধক। কিন্তু লুব্ধক নামেই পরিচিত। মৃগব্যাধমণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎকুক্কুর Canis majoris.

লুব্ধক-গ্রীস দেশে Cyon. (১১)
রোমকে Canis বা Canicula. (১২)
মিসরদেশে Sirus. "জলন্ত"
ইংলণ্ডদেশে Dog star.
ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত। (১৩)

## শুনী মণ্ডলস্থ ও কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র।

আর্দ্রাতারা এবং লুব্ধক তারা পরস্পর ১২ হাত দূরে অবস্থিত। আর্দ্রা তারারপূর্ব্বে ১২ হাত দূরে আর একটী ১ম শ্রেণীর উজ্জল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন; ঐ তারাটীর

---

"ইল্বলাস্তু মৃগশিরঃ শিরস্থাঃ পঞ্চতারকাঃ।" ইতি হেমচন্দ্র।

১০। মহর্ষি বাল্মীকির মতে কালপুরুষ মণ্ডলই ত্রিশঙ্কু মণ্ডল। এই জন্ত এই মণ্ডল জন-সাধারণে ত্রিশঙ্কুরাজ বলিয়া খ্যাত। রামায়ণ ১.৬০

১১। সংস্কৃত শ্বন্ শব্দে কুক্কুর, Gr. cyon.

১২। কুক্কুর তারা হইতে কুক্কুর দিন (Dog days) শব্দ হইয়াছে। গ্রীকগণ Dies caniculares, হিন্দুগণ অম্বুবাচি বলেন।

১৩। তিষ্য তারা ইরাণে তিস্ত্র্য নামে খ্যাত।

নাম প্রভাষ তারা। প্রভাষ তারা শুনীমণ্ডলে অবস্থিত। আর্দ্রাতারা, লুব্ধকতারা ও প্রভাষতারা এই তারাত্রয়ে একটী সুদৃশ্য সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করিতেছে। ঐ প্রভাষ তারা ও তাহার বায়ুকোণস্থ ৪ হাত দূরস্থিত এবং উহা দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সদৃশ। প্রত্যুষ তারা এবং প্রভাষ তারার উত্তরে ১২ হাত দূরস্থিত পাশ্চাত্য সোমতারা নামক একটী ১ম শ্রেণীর তারা ( ) ঐ সোমতারার ৪ হাত অন্তরে বায়ুকোণে হরিদ্বর্ণ বিষ্ণুতারা নামক যে তারা আছে, ঐ বিষ্ণুতারার দক্ষিণস্থ ৫ হাত দূরস্থিত অনিল তারা এবং অনিল তারার ৪ হাত দূরে নৈঋত কোণস্থ অনল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন। সোমতারা, অনিলতারা, অনলতারা, প্রত্যুষতারা, ও প্রভাষ তারা, এই পঞ্চতারায় একটী ধনুকাকৃতি গঠন করিতেছে। ঐ তারাময় ধনুকের নাম পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। এই নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। (ক)

### কর্কট রাশিস্থ
### তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্র।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে মণ্ডলাকৃতি তারাস্তবক আছে, ঐ তারাস্তবকের আকার মধুচক্র সদৃশ, এজন্য উহার নাম মধুচক্র তারাস্তবক। এই তারাস্তবক ঈষৎ রক্তাভ এবং ইহার তারাগুলি ধূলি সদৃশ সূক্ষ্ম। তারাস্তবকের ব্যাস প্রায় ১ ফুট প্রভাষতারা ও সোমতারা হইতে মধুচক্র ৮ হাত দূরে অবস্থিত। তারাস্তবকের তারাপুঞ্জ এত ঘন ও ক্ষুদ্র যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নির্ব্বাচন করিতে অশক্ত। এই তারাস্তবকের ১ফুট দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দুইটী ক্ষুদ্র তারা আছে; তারাদ্বয়ের নাম সুমিত্রা ( ) ও খর ( )। এই তারাদ্বয়ের যোগরেখা অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে, একটী ৪র্থ শ্রেণীর তারার পশ্চিম দিয়া ঐ সংযোগরেখা চলিয়া যাইবে। এই তারার নাম তোমর। তোমরতারা সুমিত্রা তারা হইতে ৪ হাত দূরে স্থিত। পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২ তারার নাম তোমর, ৩ তারার নাম সুমিত্রা এবং ৪ তারার নাম খর, এই তারাত্রয় শরাকৃতি।

পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২।৩।৪ তারা = পুষ্যানক্ষত্র।

সুমিত্রাতারা।—যোগতারা, পুষ্যা = এই নক্ষত্রের নাম তিষ্য। তিষ্য পূষণদেবতা বলিয়া তিষ্য পুষ্যা নামে খ্যাত।

পাশ্চাত্য কর্কটরাশিস্থ ৩।৪ তারা + মধুচক্র = কর্কটাকৃতি এবং এই কর্কট হইতে কর্কট রাশির নামকরণ হইয়াছে। কর্কটটী পূর্ব্বাভিমুখ।

### কর্কটরাশিস্থ
### অশ্লেষানক্ষত্র।

খরতারা ও সুমিত্রা তারার সংযোগরেখা তোমরতারা অতিক্রম করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিলে দর্শকের নেত্র একটী তারাগুচ্ছে নীত হইবে। এই তারাগুচ্ছে ৬ টী ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তারাগুচ্ছের আকার।—

### কর্কটরাশি।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ১ পাদ এবং পুষ্যা ও

---

(ক) অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ। হরিবংশ।
দেবমাতাচ দেবকী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে।

অশ্লেষা নক্ষত্রদ্বারা কর্কটরাশি গঠিত। কিন্তু এই রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারাস্তবক এবং পুষ্যানক্ষত্রের থর ও সুমিত্রাতারাদ্বারা কর্কট দেহ গঠিত। (১৪)

ক্রমশঃ।

---

## আর্য্য কবিতা।*

ওঁ অগ্নি মীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং। ১
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি
রীড্যোনূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ২
অগ্নিনা রয়ি মশ্নবৎ
পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪
অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্র শ্রব স্তমঃ।
দেবো দেবেভি রাগমৎ। ৫
যদঙ্গ দাশুষেত্বমগ্নে
ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমং গিরঃ। ৬
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরংত এমসি। ৭
রাজং তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ৮
স নঃ পিতেব সূনবে
মৃগে সুপায়না ভব।
স চ স্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

অগ্নিদেবে করি আমি স্তব ;—
যিনি যজ্ঞ পুরোহিত, যিনিদীপ্তিমান্।
যিনি সে ঋত্বিক্ হোতা বহুরত্নবান ॥ ১
যিনি পূর্ব্ব ঋষিগণ-স্তুতির ভাজন,

---

১৪। কর্কট দশপদযুক্ত, এজন্য কর্কট উৎকলে দশরথ বলিয়া খ্যাত; আবার উঃপঃ অঞ্চলে সারস পক্ষী দশরথ নামে খ্যাত।

* আর্য্যগণই জগতের আদি কবি এবং তাঁহাদের কাব্যই জগতের প্রথম মহাকাব্য এ কথা এখন সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেই আদি কাব্য ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সুক্তটী এইবার অনুবাদ করিয়া দিলাম; শিক্ষিত মণ্ডলী যদি ইহা পাঠোপযোগী মনে করেন। তবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব নচেৎ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের এস্থানে মনেরাখা কর্ত্তব্য যে, আর্য্যগণ যদিও অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তব করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। একথা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সুক্তের তৃতীয় ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সং প্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা ॥

পরবর্ত্তী মনুসংহিতাতেও ইহা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিম্ ইন্দ্র মেকে পরে প্রাণ মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মনুসংহিতা ১২। ১২৩

যাঁহারে করয়ে স্তুতি নব ঋষিগণ,
তিনি দেবগণে হেথা করুন বহন॥ ২
অগ্নি যজমানে ধন করেন প্রদান
—প্রতিদিন পুষ্যমাণ হেতু বর্দ্ধমান্,
যশঃ আর বীর শ্রেষ্ঠ করে যেই দান। ৩
হে অগ্নি, সর্ব্বতঃ থাক যে যজ্ঞ অধ্বরে,
নিশ্চয় সে যজ্ঞ যায় দেবতৃপ্তি তরে॥ ৪
হোতা, যজ্ঞকারী, আর সত্য পরায়ণ
বিচিত্রকীর্ত্তিসংযুত, সহ দেবগণ
করুন এ যজ্ঞে অগ্নিদেব আগমন॥ ৫
যে কল্যাণ কর তুমি হব্য প্রদাতার,
অগ্নে, অঙ্গিরস, তাহা সত্যই তোমার॥ ৬
আসিতেছি দিনে দিনে নিকটে তোমার,
দিবা রাত্র মনঃ সহ করি নমস্কার॥ ৭
যজ্ঞের রক্ষক তুমি, তুমি দীপ্যমান্
যজ্ঞ দীপ্তিদাতা যজ্ঞাগারে বর্দ্ধমান॥ ৮
পুত্র কাছে পিতৃবৎ, অনায়াস গম্য হও।
মোদের কুশলতরে মোদের সমীপেরও॥ ৯

কস্যচিৎ বৈদিকস্য।

---

# স্বরজ্ঞান

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে এবং স্বরশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে দুইটি বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ১ম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর বিষয়। ২য়,—পঞ্চতত্ত্বের বিষয়। যেমন ব্যকরণ না পড়িলে সংস্কৃত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই; তেমনি ঐ নাড়ী তিনটি ও পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে, "অব্যাকরণ জনস্বন্ধঃ" সদৃশ স্বরশাস্ত্রালোচনা বিফল। কেবল হাতড়ান সার। অধিক কি, ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর পরিচয় না হইলে এবং স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ অবলম্বনে ভাষা পড়িতে চেষ্টা করা যেমন হাস্যাস্পদ, তদ্রূপ নাড়ীজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অগ্রে উত্তমরূপে না হইলে স্বরশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা ও বিকল প্রয়াস এবং পক্ক বিল্বফলে বায়স-চঞ্চু-পুটাঘাতের ন্যায় উপহাসাস্পদ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। একারণ এই দুই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। পরে অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিব। এবার এই অংশটি পাঠকগণের কিছু নীরস বোধ হইবে; কিন্তু ইহাদ্বারা পরে সরসরস উপভোগ করিবার সুবিধা হইবে।

এখানে আর একটি কথা বলি। বেদান্ত শাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্রে অধিক প্রভেদ নাই; ইহাতে অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর হইতে ঋক্, যজু, সামাদি বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ এবং স্বর হইতে গান্ধর্ব্বাদি সঙ্গীত বিদ্যা ও স্বর হইতেই তল, অতল, বিতল, রসাতল, পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং স্বরই আত্মার স্বরূপ। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়*। এই 'হং' শাস্তু-

* হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥
মনুষ্যের শ্বাসপতন কালে হং ও শ্বাস

রূপী, আর 'স' শক্তিরূপিণী। এই প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলনে হংস পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৈদান্তিকদিগের মতেও ইহাকে পরব্রহ্ম এবং হংস বীজরূপে উল্লেখ হইয়া থাকে। "যতোবা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য দ্বারা পরমব্রহ্ম হংসই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই তিনের কারণ।

[ ক্রমশঃ। ]

---

গ্রহণ সময়ে স উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপিণী।

এই হংসো বিপরীত উচ্চারিত হইলে সোঽহং বুঝায়, জীব সর্ব্বদা তাহাই জপ করিতেছে।

সোঽহং হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

সোঽহং অর্থে সেই আমি, অর্থাৎ শিবশক্তিরূপ পরমব্রহ্ম আমি। হংস প্রতিপাদক পরমব্রহ্ম অভেদ শিবশক্তিরূপ। হংসের দুইপক্ষ আগম ও নিগম, পদদ্বয় শিবশক্তি, কণ্ঠ ও নেত্র কামকলারূপ। কামকলাতত্ত্ব অতি গুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। যোগী ও অধিকারী সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে, প্রকাশকের সর্ব্বনাশ হয়; ইহা শিববাক্য ও প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট। কামকলাতত্ত্ব যথা সম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা ও হংসের গূঢ় রহস্য মৎপ্রণীত "যোগের সোপান" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

হংস এই পরমমন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। গতবারে বলিয়াছি যে, এক দিবারাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে।

"একবিংশতি সহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকৃন্তনী।"

যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার 'হংস' পরমমন্ত্র অজপাজপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের ২১৬০০ বার অজপাজপ হইয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালাঝোলা লইয়া আর জপ করিতে হয় না এবং উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয় ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেত না জানায় ও উপদেশাভাবে এমন সহজ জপ সাধনা কেহ বুঝেনা। মুখে 'সোঽহং' বলিয়া বাহিরে কাছা খুলিয়া পরমহংস সাজো, কি রাজহংস সাজিয়া বেড়াও, ভিতরের হংসের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলে বাহিরে আড়ম্বর বৃথা। বড় বড় পেটমোটা নামজাদা পরমহংস দেখিতেছি যে, প্রকৃত হংসের কোন অংশ জ্ঞাত নহে, তাহাপেক্ষা হংস পরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র পাতিহংস সাদা কাপড়ে আবদ্ধ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

মোক্ষদায়িনী অজপা দ্বিবিধ। যথা— ব্যক্তা ও গুপ্তা। ব্যক্তা অজপাজপের অঙ্গন্যাসাদি আছে; কিন্তু গুপ্তা অতি গুপ্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যোগার্ণব ও দক্ষিণমূর্ত্তি সংহিতা এবং কুলমূলাবতার কল্পসূত্র টীকায় বিবৃত আছে; কিন্তু অনেক বিষয় গুরুমুখগত। সুতরাং যোগিগুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে কোন কায হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[ ১৮৯৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রীকৃত। ]

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

# স্বরজ্ঞান।

## পূর্ব্বানুবৃত্তি।

"হংসঃ পরংব্রহ্মরূপঃ সাকারঃ শিবরূপকঃ। কারঃ শম্ভুরূপঃস্যাৎ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥" হাতে দেখাযাইতেছে যে, হং—চিৎকলা, চৈতন্য। সঃ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণময়ী শক্তি, মায়া ও জড়-স্বরূপা। এই শক্তিরূপিণী মায়ার শক্তি দুইটি। একটি বিক্ষেপ শক্তি; আর একটি আবরণ শক্তি। মায়াময়ী প্রকৃতি আবরণ শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তাহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া থাকেন। চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব ভূত হইবার একমাত্র কারণ, ঐ মায়া-পিণী শক্তি প্রকৃতির বিক্ষেপ শক্তি সত্তা রূপ ব্রহ্মে জগৎ আভাষিত করিতেছে। কৃতির শক্তি চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে চৈতন্য থাকিতেও নিষ্ক্রিয়, আর কৃতির সঙ্গে চৈতন্য সংমিলিত না হইলে, প্রকৃতি চৈতন্য-হীনা জড়স্বরূপা। এই জন্য প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ চণকাকার। শক্তি রূপিণী মায়া সত্ত্ব, রজ, তম গুণে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা নামে অভিহিত হয়েন এবং তদুপহিত চৈতন্য বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

বেদান্ত ও স্বর, যোগাদি-শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকার প্রণালী পৃথক হইলেও মূল উদ্দেশ্য ও বিষয় এক পরমব্রহ্ম। পরম-ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে নানা নামে কথিত হইয়া থাকেন এবং উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তান্ত্রিক-সাধক শুনিলেই—মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারের সেবক মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ সাধক ও তন্ত্র এবং পঞ্চমকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কত কথাই বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক

পণ্ডিত নামে সমাজে পরিচিত হইলেও বাস্তবিক অতিমূর্খ মহাপাপী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, তাহারাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে। কোন শাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আদ্যাশক্তি-কালীর সাধনাই ব্রহ্ম সাধনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই উপাসনার শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে "হংস" পরমব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাধনা যোগাদি ক্রিয়ার অতিচমৎকার উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধি ও পঞ্চমকার সহযোগে সাধনের উপদেশ আছে, সেই তন্ত্র বলিতেছেন—

"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঘৃতং।
দেহমধ্যে তথাদেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।"
(গায়ত্রীতন্ত্র)

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি, ফুলে গন্ধ ও দুগ্ধে ঘৃত যেরূপ আছে, মানব দেহের মধ্যে সেইরূপ পাপপুণ্য বর্জ্জিত দেবতা রহিয়াছেন।

গায়ত্রী তন্ত্রোক্ত ঐ একটী মাত্র কথায় তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উহাতেই বেদান্ত ও যোগের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। আর "হংস" স্পষ্টতঃ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাহা অগ্রে বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় আজ কাল সমগ্র তন্ত্র ও তন্ত্রজ্ঞ-গুরু দুষ্প্রাপ্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের কতকাংশ প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত বিধি সর্ব্বদেশে ব্যবহার্য্য নহে। উহা দিক্ক্রান্তাদি দেশভেদে এবং অধিকারী ভেদে প্রযোজ্য। আমরা তাহা বুঝিনা এবং কালের গতি অধিকারী ও লোকের মতি গতি, শরীর ও রুচি অনুসারে সাধন বিধি. পঞ্চমকারের উদ্দেশ্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অথচ মদ্য মাংসাদির উল্লেখ দেখিয়া শুড়ির দোকানের মদ, জলের মাছ, কশাইয়ের দোকানের মাংস ইত্যাদি স্থির করিয়া বসি। সুতরাং কেহ-বা তন্ত্রোক্ত সাধনার নামে মদ্য, মাংস উদরগত ও শক্তিরূপিণী-বেশ্যা ক্রোড়গত করিয়া বসেন। কেহবা তন্ত্রের নিন্দা ও মহাযোগী মহেশ্বরকে পাপাচারের পথ প্রদর্শক অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন। হায়! কালমাহাত্ম্যে তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তন্ত্র, যোগ ও স্বরশাস্ত্র এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ ফলদায়ক সফল শাস্ত্র। শেষোক্ত দুই শাস্ত্রের সফলতা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রথমোক্ত তিন শাস্ত্রের সফলতা ও প্রত্যক্ষতা বর্ত্তমান কালে কলির গৃহী সাধক বৃন্দের ভাগ্যে অতীব দুর্লভ। স্থূল হইবেই বা কিসে?

---

স্বরোদয়শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও নানা কারণে এখন পৃথক শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্র, ও যোগশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন, তন্ত্র শাস্ত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। পারাদি ভস্ম ও দ্রব্যগুণে অতি সহজে স্বল্প সময়ে ধাতু আদি ভস্ম করিবার ও রসায়নাদি করিবার উপায় যাহা তন্ত্রে কথিত প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহা অতি আশ্চর্য্য।

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ।"

সর্ব্বশাস্ত্রের সারভাগ যোগীরা গ্রহণ করেন; আর পণ্ডিতগণ ঘোল আহার করেন। —অসার ভাগ লইয়া বৃথা কচ্‌কচি করিয়া বেড়ান্। সুতরাং কূপমণ্ডুকের ন্যায় সহস্র বৎসর গৃহে বদ্ধ থাকিলে কিম্বা বায়াম্ন কোটী টোলে পড়িলেও উহা শিখিবার উপায় নাই। কেহ যদি পর্য্যটন করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগী ও সাধকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া গৃহে আইসে, তবে সে ব্যক্তি সংসারী মহাশয়মহাশয়গণের নিকট দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিচিত হয়। অধিকন্তু তাহার অমচিন্ত্য-চমৎকারিত্ব-গুণে সব হজম হইয়া যায়। তৎপ্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, কাহারও শিখিবার আগ্রহও নাই। বিশেষতঃ—

'স্বদেশ জাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা।
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা তথাপি পুংসাং পরদারবাঞ্ছা।"

স্বদেশস্থ কোন ব্যক্তির গৃহস্থ জন দুর্লভ কোন বিদ্যা বা গুণ আয়ত্ত থাকিলে, তাহা দেশীয় লোকের উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয় হয়। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অনুতাপে মর্ম্ম-দাহে ব্যথিতান্তঃকরণে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কেহ হয় তো বলিবেন, ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত কেন? স্বরমতে কার্য্য করিবার কথা বলিব, তাহাতে পেনেল সাহেবের রায়ের মত অবান্তর কথা কেন? ইহাতে পেনেলের মতন আমারও কৈফিয়ৎ।

## ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুন্নার পরিচয়।

মানব দেহের মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ী সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া আছে। যথা—

'সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।'

সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী এইরূপ ভাবে রহিয়াছে যে,—

"যথাশ্বত্থদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ।
নাড়ীষ্বেতাসু সর্ব্বাসু বিজ্ঞাতব্যস্তপোধন॥"

অর্থ।—অশ্বত্থ কি পদ্মপত্রে যে প্রকার শিরা সকল বিন্যস্ত থাকে, দেহমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী তদ্রূপ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

মনুষ্য-শরীরে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা ঐ নাড়ী সকলের মুখ হইতে ক্ষরণ হয়। যথা—

"নাড়ী মুখানি সর্ব্বাণি ঘর্ম্ম-বিন্দুং ক্ষরন্তি চ।"

শরীরাভ্যন্তরস্থিত নাড়ীর মুখ সকল বাহিরে ত্বকের উপর প্রত্যেক লোমকূপের সহিত সংমিলিত এবং নাড়ী-মুখ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে নাভির অধোদেশে কুণ্ডলীস্থানকে * আশ্রয় করিয়া সর্পাকার বিংশতি নাড়ী অবস্থিত আছে। উহাদের মধ্যে ১০টি উর্দ্ধমুখী ও দশটি নিম্ন-মুখী রহিয়াছে। যথা—

* নাভির অধোদেশে যে কুণ্ডলী স্থানের কথা বলিলাম। ইহাতে কেহ যেন মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি না বুঝেন। কুণ্ডলী ও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক এবং অব-

"নাভ্যধঃ কুণ্ডলী--স্থানে ভুজঙ্গাকার নাড়িকাঃ।
উর্দ্ধগা দশ নাড্যস্তু দশৈবাধস্ততাঃ স্থিতাঃ॥"

এই বিংশতি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ৭২০০০ নাড়ী সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া জীবনের আধারভূতা হইয়া আছে। এই সকল নাড়ীদ্বারা সর্ব্বদেহে বায়ু ও ভুক্ত-দ্রব্যের রস সঞ্চার হয়। তদ্ধেতু ইহাদিগকে ভোগবহা নাড়ী কহে। মনুষ্য অস্মাদি যাহা

---

স্থিতির স্থান বিভিন্ন। আজ্ কাল্ দেশ-কাল পাত্র সব নূতন রকম কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরকাল পক্ষী পাখালী খাইয়া স্বেচ্ছাহার বিহার করিয়া কেহ হজমিগুলিরূপ শীকা মস্তকে রাখিয়া, কি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া হঠাৎ একেবারে গোঁড়া হিন্দু সাজিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহিরে শীকা ভিতরে ফক্কা! উদ্দেশ্য—বক্তৃতার কেতায় লোক ভুলাইয়া ডঙ্কা মারিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ'—দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ বা যোগের যো পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগ যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চমুদ্রা প্রণামি না দিলে, যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই। অনেকেই আবার বাপের রাখা মায়ের দেওয়া নাম ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দ, কেবলানন্দ, ভুঁবিয়া-নন্দ প্রভৃতি বিশ্রী, বিতিকিচ্ছি নাম গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসন পরিধানে কাচা খুলিয়া যথেচ্ছাচার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে। আবার একদল রাত রাতি 'স্বামী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সাধু হইয়াছে; কিন্তু নিত্য প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে দুগ্ধ চিনি সংযুক্ত ঘৃত হালুয়া প্রচুর ভোজন; প্রাতঃ ভোজন রূপে পরিণত হয়। এই দল অতি চতুর চালাক! এই দলের অর্থোপার্জ্জন ও উদর-পোষণ ও শরীরের তৈয়ার করাই প্রধান কারণ। ইহাদের গৈরিক বসন ও মুখের বচন শুনে অনেকগুলি গবারাম ধনীর টাকায় এই স্বামী দলের সম্পদ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন নগরে, গ্রামে, ঘাটে, বাজারে, রেলগাড়ীতে, পথে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী যুবক যোগী, সাধু দেখিতে পাওয়া যায় অনেকেই বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি একেবারে মহাযোগী ও তত্ত্ব-জ্ঞানী সাধু হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার মূল, ব্যবসায়ীর প্রকাশিত 'ঘেরণ্ডসংহিতা' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু কি গীতা একটু ঘরে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ স্বয়ম্ভূসিদ্ধ মহাযোগী! পাঠকগণ! এই সকল কথা আমার কল্পিত বা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য। বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি মহাযোগী ২।১ জনের জ্বালায় আমি মধ্যে মধ্যে জ্বালাতন হইয়া থাকি এবং অনেকের যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও গুরূপদেশ বিনা স্বয়ং যোগীর পাগলামী অনেক দেখিয়াছি। যাহউক ঐ শ্রেণীর যোগী ও সবজান্তা পণ্ডিতগণ কুণ্ডলিনী একই জিনিষ বুঝিয়া না বসেন। এই জন্য কুণ্ডলীর পরিচয় ও অবস্থিতির স্থান সংক্ষেপে বলিতেছি। বলা বাহুল্য কালে এই প্রবন্ধের শেষে পাঠকগণেরও লাগিবে।

" * * * * * নাভৌ চক্র সমুদ্ভবঃ।
দ্বাদশারযুতং তচ্চক্রং তেন দেহঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্যোর্দ্ধং কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্য-
গধোর্দ্ধতঃ।

অষ্ট প্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলীকৃতিঃ।"

নাভি হইতে এক চক্র সমুদ্ভব হইয়াছে। উহার দ্বাদশ অর (পত্র) এবং উহাতেই সমস্ত শরীর প্রতিষ্ঠিত। এই চক্রের উর্দ্ধ দিকে এবং নাভির তির্য্যক্ উর্দ্ধ ও নিম্ন

আহার করে, তাহা অপানবায়ু-কর্তৃক শরীর-মধ্যগত অগ্নির দ্বারায় পরিপাক ক্রিয়ার সম্পন্ন হইলে, প্রাণ বায়ু সমান নামক বায়ুর সহিত একত্র হইয়া ভুক্ত-অন্নাদির রস-সমূহকে অগ্নির সহিত ঐ ৭২০০০ নাড়ী-পথে শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত করিয়া থাকে।

এই নাড়ীপুঞ্জ মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের নাম যথা—

"সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকাঃ।"

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষ, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্না তিন নাড়ী প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। আবার এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্ন নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিমার্গে সাধনার প্রধান অবলম্বন।

---

দিকে 'কুণ্ডলীর স্থান। এই কুণ্ডলা অষ্ট প্রকৃতিরূপ অষ্ঠ কুণ্ডলাকৃতি।

নরপতি জয়চর্য্য। স্বরোদয়ে উক্ত আছে যে,—

'শরীর পুষ্ট্যর্থমেব নাভৌ কুণ্ডলী মহ।
মহাশক্তিঃ কুণ্ডলী নাড়ীস্যাহি স্বরূপিণী।
চতো দশোর্দ্ধগা নাড়ে। দশ চাধোগতা তথা।"

অর্থাৎ শরীরের পুষ্টির জন্যই নাভিতে কুণ্ডলী রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীস্থান হইতে দশটি নাড়ী ঊর্দ্ধমুখী ও দশটি নাড়ী অধোমুখী হইয়া রহিয়াছে।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ব্যতীত অপর একাদশ নাড়ী চক্ষু, কর্ণ, মুখ, উপস্থ প্রভৃতি এক এক স্থান অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। তদ্বিষয় চিকিৎসাপ্রকরণে বলিব। এক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনায় প্রধান তিন নাড়ীর কথা বলিতেছি।

মনুষ্যের প্রাণবায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস) যাহা নাসাপুট দিয়া বাহির হয় ও ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহা ঐ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী-পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ঐ নাড়ী ও তত্ত্বের দোষ-গুণেই যাত্রাদি সাংসারিক বৈষয়িক সকল কার্য্যের ভাল ও মন্দ ফল হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর পরিচয় জানিয়া স্বরশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, শরীর সুস্থ থাকে ও মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

মানবদেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড দেখাযায়, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। আর মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বস্থিত ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ইড়া নাড়ী—শক্তিরূপিণী এবং ইহাতে চন্দ্র অবস্থিতি করে। এজন্য ইহা সুধা-স্বরূপা ইড়া নাড়ীর গুণ শীতল, স্থির-প্রকৃতি, স্ত্রীরূপা, এবং উত্তরায়না। বর্ণ, শঙ্খচন্দ্রাভা। শুক্লপক্ষ, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিবারের এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে স্থিত ইড়া নাড়ী

বামনাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বামনাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়ী পথে প্রবাহিত হয়। এজন্য বামনাসিকায় শ্বাসবহন সময় "ইড়ারবহন" "চন্দ্রচার" প্রভৃতি নামে কথিত হয়। পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যস্বরূপ, পুরুষ, দক্ষিণায়না। ইহার গুণ উষ্ণ, চর প্রকৃতি, বর্ণ-সিত-রক্তাভা, কৃষ্ণপক্ষ ও শনি, রবি, মঙ্গল এই তিন বারের এবং পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি। পিঙ্গলানাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে থাকিয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ পিঙ্গলা নাড়ী-পথে গতায়াত করে। তজ্জেতু দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালের নাম "পিঙ্গলার বহন" 'সূর্য্যবাহ' ইত্যাদি নামে কথিত হয়

সুষুম্নানাড়ী—অগ্নি স্বরূপা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নানাড়ী রহিয়াছে। ক্ষণে বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, তাহাকে 'সুষুম্নার বহন' বলা যায়। এই সুষুম্নার বহন বড় অমঙ্গল জনক।

ইড়া ও পিঙ্গলার বহন সময় অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে ২ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ সুষুম্নার বহন কাহাকে বলে এবং সুষুম্নার বহন সময়ের কর্ত্তব্য নিম্নে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, একবার বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা ও একবার দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যায় ক্রমে শ্বাস বহন হইয়া থাকে। এই নিয়মে যখন এক নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন অন্য নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে মৃদু বহিতে থাকে। আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হয়, তখন অতি অল্প সময়ের জন্য কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বাস বহন হয়, কিম্বা ঐ সময়ে ক্ষণকালের জন্য একেবারে দুই নাসিকায়ও সমানরূপে নিশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাকে 'সুষুম্নার উদয়' বা সুষুম্নার বহন বলে। এরূপ সময় মনুষ্যের বিবিধ বিপদ, কলহ ও ক্ষতি নিশ্চয়ই হয় এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহার ফল বিপরীত হইবে। মনুষ্য-জীবনে যত কিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হয়।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাহশুভা॥"

ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায়, নিশ্বাস বহিলে সুষুম্নার বহন বলা যায়। এরূপ সময় সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় ও অশুভ জনক।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীত ফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥"

যদি কখন নিশ্বাস একবার বাম ও একবার দক্ষিণ নাসায় ক্ষণে ক্ষণে বহন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ী দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥

যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলায় বহন হয়, অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ উভয় নাসিকায় একেবারে নিশ্বাস বহন হইলে, তাহার অশুভ উপস্থিত জানিতে হইবে।

"উভয়োরের সঞ্চারে বিষুবস্থ সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

যখন দুই নাসিকায় এককালীন নিশ্বাস বহন হয়, তখন বিষুব যোগ বলে। এইরূপ সময় ক্রূর কিম্বা সৌম্য কোন কার্য্যই করিবেনা, করিলে সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দুই নাসিকায় সমানভাবে নিয়ত নিশ্বাস বহন হয়, তাঁহারা সে ভুল সংস্কারটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। দুই নাসিকায় সমানভাবে সর্ব্বদা নিশ্বাস বহিলে, বিঘ্নসঙ্কুল-সংসারে বিবিধ বিঘ্নজালে সতত জড়িত থাকিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়, কচিৎ কখন দুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, সে সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্য্যধ্বংশ, আশানাশ, বিবাদ প্রভৃতি যাহা, কিছু অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটিবে। এজন্য সেরূপ সময়ের কর্ত্তব্য এই—

ঈশ্বর স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥

কচিৎ এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য যদি ঐরূপ সুষুম্নার প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম করিবে। ঐরূপ সময় অন্য কোন কার্য্য করিবে না, কাহারও নিকট যাইবে না; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেনা।

উত্তান ভাবে শয়ন করিলে সুষুম্নার বহন হয়, এজন্য চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নাই, কারণ, মনুষ্যের ক্ষতি, অনিষ্ট, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হইয়া থাকে *। রাগের মত বালাই আর নাই, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কত অকার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটির শত্রু ক্রোধ।

"অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং নহি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥"

বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দীপ্ত ব্যক্তি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু সুষুম্নার বহনের সময়ই চতুর্ব্বর্গের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়, একারণ কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে, দক্ষিণ নাসিকা

* বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি বাগ্‌দী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বিষ্ণুপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিয়া গোচারণ করিতেন। এক দিন রাজোচিত কোন শুভ ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য নয়, ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল বালককে কোন প্রকার উচ্ছিষ্ট খাইতে দিও না এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহারাদি করিও না, আর ঐ বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুষুম্নার বহন সময় শুভক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবে। সত্যই, ঐ বাগ্‌দী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় বালক বিষ্ণুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া টীকাধারী রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিতা।

বন্ধ করিয়া, বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে। তাহা হইলে খুন করিবার মত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, আর কোন অনর্থ ঘটিবে না।

(নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়াদি পরে বলিব।)

যে পর্য্যন্ত বলা হইল, ইহাতে পাঠকগণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থিতির স্থান, বহন ইত্যাদি বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। শারীরিক ও বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য কোন নাড়ার বহন সময় কি ভাবে করিলে, সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ ঐ নাড়ী সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বলিতেছি।

ইড়া নাড়ীকে পিতৃযান ও পিঙ্গলা নাড়ীকে দেবযান বলে যথা—

ইড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযান মিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।

যে নাড়ী দ্বারায় বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া। ইহাকে পিতৃযান কহে।

যে যোগী ইড়া নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি জীবনান্তে পিতৃলোক পথে গমনকরিয়া চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পিঙ্গলা নাড়ীকে পিতৃযান কহে। যথা—

দক্ষিণ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যমণ্ডলগোচরা।
দেবযান মিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী।

যে নাড়ী দ্বারায় দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। ইহা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় এবং পুণ্য কর্ম্মানুসারিণী। ইহাকে দেবযান কহে।

যে সাধক পিঙ্গলা নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি দেবলোক পথে ক্রমে ক্রমে যাইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পিঙ্গলা সাধকের বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তজীবের আবার মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, ব্রহ্মলোকও অনিত্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎ লোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

গীতা বাক্যেও ব্রহ্মলোক অনিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদি করিয়া বলিয়াছেন যে—'পিঙ্গলা সাধনকারী ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না ইত্যাদি।" ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া আপনাপনি জ্ঞানী যোগী সাজিলে উহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।

যাহাহউক, যোগিগণ কঠোরকঠোর যন্ত্রণাভয়ে পিঙ্গলা সাধন ও ব্রহ্মলোক কমন করেন না। তাঁহারা সুষুম্নার সাধন করিয়া থাকেন। কারণ—

মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।
(যোগ স্বরোদয়)

সুষুম্নাই মুক্তির মার্গ স্বরূপ। যে ব্যক্তি

পূর্ব্ব-সুকৃতি বলে উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া সুষুম্নার সাধন শিখিয়াছেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ সুষুম্না সাধনকারী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"সুষুম্নায়াং ভবেম্মোক্ষঃ" সুষুম্না যে মোক্ষ-দায়িনী ইত্যাদি যোগ-স্বরোদয়ে অনেক বার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্তি মার্গে সুষুম্না নাড়ী। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি মুক্তির সোপান বলিয়া যে সকল শাস্ত্র-বাক্য আছে, তাহা প্রবৃত্তি ও ভক্তি-উদ্দীপক মাত্র। নিষ্কর্ম্মী হইলে মুক্তি হয় বটে; কিন্তু মনু-ষ্যের মধ্যে নিষ্কামী ও নির্ম্মম কেহ আছে কি? জটাধারী সন্ন্যাসী সুদূর নির্জ্জনবনে বসিয়া আছেন, তিনি কি মুক্তির উপযোগী-কামনা ও মায়া শূন্য হইয়াছেন? কখনই না। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিকদেহে জীবাত্মা বাস করিবেন, ততক্ষণ জীব-কামনা ও মায়া শূন্য হইতেই পারে না এবং কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিনিচয় কখনই ধ্বংশ হইতে পারে না। সুতরাং সুষুম্না সাধন ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। এই সুষুম্না ও শম্ভুরূপাচ, শম্ভুর্হংসঃ স্বরূপক। হংসের পরিচয় অগ্রে বলিয়াছি। সুষুম্না সম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত করিলাম, রসের রসজ্ঞ (যোগী ও স্বরসাধক) ক বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা ঐ রসে ত, তাঁহারা স্বরজ্ঞ—যোগী গুরুর নিকট দশ গ্রহণ করিবেন। ফলকথা, পূর্ব্ব ত ফলে প্রাণের ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা ন, গুরুর কৃপায় উপযুক্তগুরু নিই দেখা দেন। ভক্তির প্রকৃত গুরু হয় না। অতএব প্রাণের আগ্রহ ও তা চাই।

সুষুম্নাকে জ্ঞানজননী নাড়ী কহে।

সুষুম্না বাক্যের ঈশ্বরী, এজন্য সুষুম্নার নাম বাগীশ্বরী এবং জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার কারণ, সুষুম্নার বিকাশাভাব। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে সুষুম্না হইতে শ্লেষ্মা অপসারিত হয়, আর সেই সঙ্গে সুষুম্নার ক্রমবিকাশ হইয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

নাড়ী সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ দশ বায়ুর রূপ বলিব।

## দশ বায়ুর রূপ।

১। প্রাণ,—"ইন্দ্রনীলপ্রতী কাশং
প্রাণ রূপং প্রকীর্ত্তিতং।"

প্রাণ বায়ুর রূপ পদ্মরাগমণি নামক বিখ্যাত মণির বর্ণ ও জ্যোতির ন্যায়। পদ্মরাগমণির বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ। বিশ্বসারে উক্ত আছে, "প্রাণ আদৌ হৃদিস্থানে পদ্মরাগ-সমদ্যুতিঃ।"

২। অপান—ইন্দ্রগোপ প্রতীকাশঃ (১)
সন্ধ্যা-জলদ—সন্নিভঃ।

অপান বায়ু কাপাসিয়া পোকার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কিম্বা সূর্য্যাস্ত হইবার সময় সন্ধ্যা

---

(১) ইন্দ্রগোপো—রক্ত বর্ণ কীট বিশেষঃ। কাপাসিয়া পোকা ইতি ভাষা।

বর্ষাকালে কাপাসিয়া পোকা অধিক দৃষ্ট হয় এবং রক্তবর্ণ কাপাসিয়া পোকা একস্থানে অনেক গুলি একত্রিত থাকে, পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ধান্যের গাছের ভক্ষণ করিতে অভি-লাষী থাব-সংহের বায়ুর অদৃষ্টক্রমে অদৃষ্ট ও জ্ঞানাতীত।

কালে পশ্চিম আকাশে যে রক্তবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

৩। সমান—গোক্ষীর সদৃশাকারঃ সর্ব্ব-
দেহে ব্যবস্থিতঃ।

সমান নামক বায়ু গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলাকার।

৪। উদান—উদানো নাম মারুতঃ বিদ্যুৎ
পাবক-বর্ণঃ স্যাৎ।

উদান বায়ুর রূপ বিদ্যুদগ্নি সদৃশ।

৫। ব্যান—মহারজত সঙ্কাশঃ (২)
সর্ব্বব্যাধি প্রকোপনঃ।

ব্যান বায়ুর রূপ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বব্যাধি প্রকোপক।

৬। নাগ—উদ্গারে নাগ ইত্যুক্তো
নীলজীমূত সন্নিভঃ।

নাগ বায়ুর রূপ নীলমেঘের ন্যায়।

৭। কূর্ম্ম—উন্মীলনে স্থিতঃ কূর্ম্মো
ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভঃ।

কূর্ম্ম নামক বায়ুর রূপ গাঢ় কজ্জলের সদৃশ।

৮। কৃকর—ক্ষুৎকর শ্চৈব জবাকুসুম-
সন্নিভঃ।

কৃকর নামক বায়ুর রূপ জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এবং ইহার কার্য্য ক্ষবথু (হাঁচি)

৯। দেবদত্ত—বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধ-
স্ফটিকসন্নিভঃ।

দেবদত্ত বায়ুর রূপ বিশুদ্ধস্ফটিকের বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনুষ্যের মুখে যে হাই উঠে, তাহাই এই বায়ুর কার্য্য।

১০। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয় স্তথা ঘোষে মহারজত-
বর্ণকঃ।

ধনঞ্জয় নামক বায়ুর রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ সদৃশ। (৩)

এই দশ বায়ু মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবশরীরে রহিয়াছে। আর প্রথমোক্ত পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব জীব-দেহের ন্যায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব রহিয়াছে। যথা—

"ককারস্যোর্দ্ধকোণেষু প্রাণবায়ুঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ।

অপানো বামভাগেচ সংস্থিতশ্চ সদা
প্রিয়ে।

সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধস্ফটিক-
সন্নিভঃ।

উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব
চ॥"

ককারের ঊর্দ্ধ কোণে প্রাণ বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিত। বামভাগে আপন বায়ু ও দক্ষিণ কোণে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ সমান বায়ু এবং অঙ্কুশে উদান বায়ু, আর ব্যান বায়ু মাত্রাতে অবস্থিত।

---

(২) মহারজতং—কাঞ্চনং।

(৩) ধনঞ্জয় ও ব্যান বায়ুর রূপ একই প্রকার স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। ইহাতে অনেকের মনে তর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্যক সময়ে ব্যান কি ধনঞ্জয় বায়ু নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? কিন্তু এখনকার প্রচলিত ধরণে পুথিগত বিদ্যা কিম্বা বিনা গুরূপদেশে স্বয়ং যোগী হইলে উপায় নাই। এই স্বরোদয় শাস্ত্র ও যোগাদি যোগী গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। কি গুরু মুখে শিক্ষা হইলে, শরীরের স্থান ও কার্য্য বিশেষে এক বর্ণ বিশিষ্ট ঐ দুই বায়ুর পার্থক্য বুঝা যায়, তদ্ভিন্ন মুদ্রিত শাস্ত্র পড়িয়া কি স্বয়ং হঠযোগী সাজিলে বুঝিবার উপায় নাই। দশ বায়ুর কার্য্য ও অবস্থিতি স্থান চিকিৎসা প্রকরণে বলিব।

পাঠকগণের অবগতির জন্য কেবল 'ক' অক্ষরের পঞ্চ বায়ু বলিলাম। প্রত্যেক অক্ষরে এইরূপ পঞ্চবায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। তদ্বিস্তারিত বিবর বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে আছে; কিন্তু ইহার গুঢ়রহস্য তত্ত্বজ্ঞ যোগীর নিকট জানিতে হয়।

উপরে দশ বায়ুর রূপ বলিয়াছি; কিন্তু সকলেই জানেন বায়ুর কোন রূপ নাই। এখন বিজ্ঞান বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বায়ুর রূপজ্ঞান কিম্বা রূপদর্শন বর্ত্তমানবিজ্ঞানবিদগণের জ্ঞানাতীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যদি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলেন যে, উহা ঋষিগণের কল্পনা প্রসূত; উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা কেমন করিয়া বলিব?

মনুষ্য শরীরে কোন চর্ম্মরোগ হইলে, চিকিৎসকগণ রক্ত বিকৃতি কারণ বলিয়া তৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং বহুদিন তৈলমর্দ্দন ও ঔষধ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। তাহার ফল নিঃসন্দেহ ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ, হয় তো কিছু দিন রোগ অদৃশ্য হইয়া যাপ্য থাকে। কিন্তু স্বরজ্ঞ যোগিগণ বায়ুর রূপানুসারে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং যে বায়ুর রং বিকৃত হইয়া কিম্বা যে বায়ুর স্বল্পাধিক্য বশতঃ পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন এবং রোগ সমূলে নির্ম্মূল হয়। ডাক্তার ও কবিরাজগণ যে সমস্ত পীড়ার কারণ বায়ু কি রক্তের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ঐ সকল এবং অন্যান্য বাতজ, রক্তজ পীড়ায় যোগিগণ দশ বায়ুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের রূপ ও গুণানুসারে আশ্চর্য্য উপায় দ্বারা অতি সহজে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলিব যে, বায়ুর রূপ কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চতত্ত্বের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করা যায়; তখন কোন্ সাহসে বলিব যে উহা কল্পনা মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মগণ সংসারের সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনবনে ও সুদূর হিমালয়ের হিম-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ আমাদের জন্য শাস্ত্রে কল্পনাবলে মিথ্যা-কথা বলিয়া গিয়াছেন কি? এখন পাশ্চাত্য দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ক্রমোপ্যাথি প্রভৃতি কত রকম বিরকম চিকিৎসা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের বনবাসী ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোন দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, বায়ুর রূপ জানিতে পারিলে চর্ম্ম পীড়া (Skin deases) ও চক্ষু পীড়া অতি সহজে আরোগ্য করা যায় *। আজ কাল ইউরোপ

---

* দুঃখের বিষয়, বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি শিক্ষা ও সাধ্যায়ত্ত হইলেও চিকিৎসা বিষয়টী সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পারি নাই সাধ্যাতীত বলিয়া নহে। পরমারাধ্য জনক জননীর অপার্থিব স্নেহ মমতা অত্যাচার

প্রদেশে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে আমরা বাহবা বুলি, আর সেই দিকে দৌড়িয়া মরি! আমাদের ঘরে কি আছে, তাহা দেখি না; দেখিতে বুঝিতে চেষ্টাও করি না। ইংলণ্ডের অস্তিত্ব প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবাসী কর্ত্তৃক গ্যাসালোক বিদিত ছিল এবং গ্যাসের নাম 'পুবীয্য অগ্নি' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যের 'চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি' ইত্যাদি ভারতবাসীর অবিদিত ছিল না। অধুনা ইহা কয়জনে জ্ঞাত আছেন? ভারতে না ছিল কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, শিল্পাদি যাহা ছিল, তাহার তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশ অদ্যাপি সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু হায়! বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, চাল চলন অশন, বসন সবই বিকৃত, আর্য্য-তেজ, কার্য্য বল, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, ভক্তি, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান সকলি বিদূরিত। আমাদের ঘরে কি আছে দেখিনা, নিজস্ব মহার্ঘ জিনিষের মূল্য জানি না—গৌরব বুঝি না, দেবোপম পূর্ব্ব পুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতা জানি না, তাঁহাদের বিধি নিষেধ মানি না। কি পরিতাপ! জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনন্তভাণ্ডার সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতবর্ষে এখন বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মী কেহ কচিৎ হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্রের এক আধ টুক চুট্‌কী ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা শুনিয়া আমরা মোহিত স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। আমরা কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণের গোত্রোৎপন্ন। শাস্ত্র অশ্রদ্ধ করিয়া শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া শারী রিক মানসিক বল, ধর্ম্ম হারাইয়া ক্র কিম্ভূত কিমাকার ঘৃণিত জীব হইতে এবং সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার নিকৃ ও নিন্দনীয় হইতেছি। একি কম বিড়ম্বনা আহা! কালের গতি অতি কুটিল, যা অঘাট ও অঘাট ঘাট হইয়া উঠিতেছে আমাদের কি ছিল কি হলো, আরো বা কি হয়! ভারতবাসিগণ! আগে ঘ রক্ষা কর, পরে বাহিরে চেষ্টা কর। আ শাস্ত্র বিশ্বাস কর, লুপ্ত প্রায় গুপ্তরত্নে উদ্ধার কর, ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ় কর, ধর্ম্মে ম রাখিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শিথিল সমা ছিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, অবমিত আত্মীয় আচ ব্যবহার প্রকৃতিস্থ কর, দেখিবে পূর্ব্ব বি ক্রমোন্নতি হইবে, হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব র

---

দুঃখ-সন্তাপ-হারিণী জড়-জীবনের মহাশক্তি-স্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্ম্মিণীর অপ্রতিম ভক্তি, ভালবাসা, আত্মিক অংশ মায়ার-পূর্ণ বিকাশ প্রাণাধিকা কন্যার মায়া ভুলিয়া, সংসারের প্রচুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-পথে চিরদিন বিচরণ করিব আশা ছিল। সুতরাং ঐ বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন ততোধিক মনে করি নাই, সংসারে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু হায়! মনুষ্যের সব ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? আর যাহা কখন চিন্তা করি নাই, কল্পনায় আইসে নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইয়াছে। সম্মুখে বসিয়া জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিব বলিয়াছি, বিধাতা বুঝি আবার সংসারের প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। এখন ভাবিতেছি, তখন যদি যত্ন পূর্ব্বক উহা শিখিতাম, তবে অনেক কার্য্যে লাগিত। কিন্তু এখন অনুশোচনা মাত্র। যতটুকু দেখা শুনা আছে, তাহা চিকিৎসা প্রকরণে বলিবার ইচ্ছা আছে।

হইবে, হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

## পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়; কিন্তু সেই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় যথাক্রমে হয়। যথা—

এক নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাস বহন সময় প্রথমে পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল ইংরাজী ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত থাকে; পরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল, ইং ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল, ইং ১২ মিনিট থাকে। পরে বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইং ৮ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্ব শেষে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল, ইং ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ পলে ২॥০ দণ্ড ইং এক ঘণ্টা পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয়ে ঐ নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া এক নাসিকায় শ্বাস বহন একঘণ্টা পূর্ণ হয়।

যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই নাসিকায় ঐরূপ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক তত্ত্বের স্থিতি হয়।

এই তত্ত্ব বিচার করিয়া নিশ্বাসের অনুকূলে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সুফল হয়। পরন্তু সাংসারিক বৈষয়িক কোন কার্য্য বিফল হইল বলিয়া হতাশাস চিত্তে খেদ প্রকাশ করিতে হয় না।

তত্ত্ববিচার করিয়া কার্য্য করার জন্যে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও পাণ্ডবকুল-ধুরন্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপরীত তত্ত্বে যাত্রা করিয়া কৌরবগণ বিহত হইয়াছিলেন।

তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে॥

দেখিলেন! স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ও বিষ্ণু-সখা অর্জ্জুন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কৌরবগণ অমিত তেজা কর্ণের বীরত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া মহা অহঙ্কারে অন্ধ বশতঃ তত্ত্ব বিচার করেন নাই, সেজন্য ভীষ্ম-প্রমুখ বীরপুঞ্জ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বিঘ্ন সঙ্কুল সংসারে তত্ত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে কার্য্য না করিলে হতাশাস হইব বৈচিত্র্য কি?

কোন্ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়, কোন্ তত্ত্বের উদয় কালে কিরূপে কার্য্য করিলে, সমস্ত কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় এবং তত্ত্ব চিনিবার যে সহজ উপায়াদি, তাহা বারান্তরে বলিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল পাইবেন, কোন কার্য্যে আশা-ভঙ্গ. মনস্তাপ জনিত হা হুতাশ করিতে হইবে না। আরও দেখিবেন যে, দয়াময় মহেশ্বর মোকদ্দমায় জয়লাভ, ক্রুদ্ধ প্রভুকে সন্তোষ ও দুষ্ট শত্রু ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার জন্য—মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতীত কেমন সহজে বশীকরণ এবং সাংসারিক বৈষয়িক সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি চিরপূজ্য হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস

স্থান পায়, তাহা হইলে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের নাম স্মরণ করিয়া উন্নত কণ্ঠে বলিতেছি প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

প্রসঙ্গাধীন বলিতে হইতেছে যে, স্বর-জ্ঞানের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত মহাত্মা উৎসুক চিত্তে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর আমার পূর্ব্বাপর পরিচয় এবং সাংসারিক অবস্থা—যে অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি—শুনিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই বলি, যে হতভাগ্য কিঞ্চিৎ ন্যূন পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা মাতা, ভগ্নী ও কন্যা, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি—জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসমনে, আকুল হৃদয়ে, আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য প্রাণে লক্ষ্য হারা ধূমকেতুর ন্যায় বেড়াইতেছে; তাহার আবার পরিচয় কি? বর্ত্তমান বয়ক্রম অতিপ্রৌঢ় অতিক্রম করিবার উপক্রম—এখন কন্যা ক্ষীরোদবাসিনী, জামাতা অমরনাথ তৃষ্ণায় জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিবার স্থল এবং অন্ধের নড়ি সম্বল। ইহার পর যাহা হইবে, তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গভীর-গহ্বরে গাঢ় প্রোথিত।

যদি স্বরজ্ঞানে কাহারও কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে, কিম্বা কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান শিক্ষা যাহা আছে, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাবু অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

যশোহর।

---

## বস্ত্র ও সভ্যতা।

প্রত্যেক সমাজেই বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, আহার বিহার ইত্যাদিতে কতকগুলি আদর্শ থাকে এবং যে কার্য্যগুলি সেই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়, সেই কার্য্যগুলিকে আমরা সাধারণতঃ অসভ্য আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। সমাজ বিশেষে এই আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন সমাজে যে কার্য্য সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় অন্য সমাজে তাহা হয় ত অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় সমাজে বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সমুদয় সমাজে যদি কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকে, অথচ সে উন্মাদ নয় কিংবা নিতান্ত শিশুও নয়, তাহা হইলে তাহাকে অসভ্য বলা হইয়া থাকে। আবার যে সমুদয় দেশে বস্ত্র পরিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সমাজ বিশেষে কোথাও বা সমুদয় অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, কোথাও বা কেবল মাত্র অধর আবৃত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেহ নাভির উর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখি

আমরা তাঁহাকে অসভ্য বলি না। কিন্তু ইউরোপ-বাসীদিগের নিকট উহা ভয়ানক অসভ্যতা। এই জন্য, আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সমস্ত দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া যান। একজন অতি অনক্ষর ইংরাজও কখনও তাহার দেহ অনাবৃত রাখিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেহের ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিতে কিছু মাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। আবার যাঁহারা গার্হস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তম ও অধম উভয় অঙ্গই অনাবৃত রাখেন এবং আমাদের সমাজের চক্ষে, তাঁহাদিগের ঈদৃশ ব্যবহার অসভ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। উলঙ্গ তৈলঙ্গ স্বামীকে যুবতী স্ত্রী লোকেরাও অসঙ্কুচিতচিত্তে যাইয়া প্রণাম করিত। এবং উহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেরা কিংবা সমাজ কিছু মাত্র দূষ্য বিবেচনা করিত না। এক দিকে মিশমি, নাগা, কুকি, খন্দ উলঙ্গ, আর এক দিকে তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী উলঙ্গ। ইংলণ্ডে কার্ডিন্যাল নিউম্যান ভাস্করানন্দের ন্যায় যদি দিগম্বর-বেশ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উন্মাদ—আগারে রাখা হইত। ভাস্করানন্দ কিন্তু মিশমি নাগাও ছিলেন না কিংবা উন্মাদও ছিলেন না। যে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এদেশে আসিতেন, তিনি কাশী না গিয়া থাকিতেন না এবং কাশীতে গিয়া ভাস্করানন্দকে দর্শন করাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য হইত। ভূতপূর্ব্ব ভারত সেনাপতি লকহার্ট প্রভৃতি উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ভাস্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করা অতীব শ্লাঘাজনক বিবেচনা করিতেন। কদাচ ইংরাজ অনাবৃত হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিশমি নাগার ন্যায় অসভ্য বিবেচনা করিতেন না। সুতরাং সভ্যতাসভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, কেবল বস্ত্র ব্যবহার রীতি পর্য্যালোচনা করিলে, ভাস্করানন্দ মিশমি বা নাগার ন্যায় অসভ্য হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহাকে কিছুতেই অসভ্য বলা যায় না।

যখন মানব বস্ত্রধারণ প্রণালী জানিত না, তখন বৃক্ষবল্কল বা পশুচর্ম্ম দ্বারা দেহকে শীতাদি হইতে রক্ষা করিত, এবং ক্রমে বস্ত্রধারণ প্রণালী প্রথা অবগত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থেই বোধ হয় বস্ত্রাদি প্রথম ব্যবহৃত হয়। লজ্জা নিবারণ ও শরীরের সৌন্দর্য্য বিধান হেতু ও ক্রমে বস্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। শীত প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহ অপেক্ষা বস্ত্র ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং বহুকালের সংস্কার ও অভ্যাস হেতু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকিলেও শীত প্রধান দেশের লোকেরা তাহাদের দেশোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা কোন সমাজের সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত করা যায় না। আজ যদি সমস্ত মিশমি জাতিকে ইংরাজদিগের ন্যায় কোট প্যাণ্ট্ আদি পরিধান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কি উন্নত জাতি অপেক্ষা

অধিক সুসভ্য হইয়া পড়িবে? আমরা যদি ইংরাজ দিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞানাদিতে নিকৃষ্ট হই, তাহা হইলে কি কোট প্যাণ্টালুন পরিধান করিলেই সভ্যতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব, কিম্বা ঐ সব বিষয়ে আমরা যদি তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের দেহ অনাবৃত থাকে বলিয়াই কি আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িব? প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বস্ত্র দ্বারা কাহারও সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত হইত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মানুষের গুণ দেখিয়া সভ্য বা অসভ্য আখ্যা দিতেন, বস্ত্র দেখিয়া না। অধুনা বস্ত্রই হিন্দু সমাজের মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অতিকষ্টে চটি জুতা ও মোটা চাদর দিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর চলে না। কোট প্যাণ্টালুন না হইলে নানাবিধ ভাবে বিড়ম্বিত না হইয়া কাহারও পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আদালতের চাপড়াশি, কনেষ্টবল, রেলওয়ের গার্ড বা দ্বারবাণের নিকট কত ভদ্রলোকের যে কত অপমানিত হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। হিন্দু সমাজে বেশ বিন্যাসের এক মহাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর হিন্দু নর নারী তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন। কত রকম কোট, কামিজ, বডি কত কি যে হইতেছে, তাহার নামও মনে থাকে না। দেশের ধনবানেরা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, এবং দরিদ্রেরা তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। নিত্য নূতন ফ্যাসিয়ান আসিয়া সমগ্রদেশকে সভ্যতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। আমরা বস্ত্রাদি সম্বন্ধে কখন ইংরাজদিগের সমকক্ষত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগের সংসর্গে পড়িয়া তাহাদের মত চাল চলন করিতেছি, অথচ রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ধুতি চাদরও রাখিতে হয়, হ্যাট কোট ও রাখিতে হয় ফরাশও রাখিতে হয়। আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে আমাদের ইংরাজদিগের বিলাসিতা সাজে না।

---

## বঙ্গভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

---

বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ইহাদিগের বর্ণমালা। প্রত্যেক বর্ণই শব্দবিশেষের পরিচায়ক। ক, খ ইত্যাদির ন্যায় এক্টি একটি শব্দ প্রকাশ করিবার জন্য একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ ও দন্ত্য ন একইভাবে অর্থাৎ উভয় বর্ণই দন্ত্য ন এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। একই ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়াই; মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই দুই বিশেষণের দ্বারা উহাদের পার্থক্য সূচিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা যেরূপ র, ড় ও ঢ় এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিতকরিতে অশক্ত হইয়া র এ শুন্য র, ডএশূন্য র ঢ এ শুন্য র, বলিয়া সূচিত করেন, সমগ্র বঙ্গদেশে সেইরূপ মূর্দ্ধণ্য ও

ঙ, ন, ণ, বর্গীয় ব, অন্তস্থ ব, ও য, তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ, ও দন্ত্য স এর পার্থক্য শব্দ দ্বারা সূচিত না করিয়া উৎপত্তিস্থান উল্লেখ করিয়া সূচিত করেন। এক বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষেই এই সমুদায় বর্ণ পৃথক শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয়। বঙ্গদেশবাসী সংস্কৃতভাষা উচ্চারণ করিতে ও ঐ সমুদায় বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করেন না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বঙ্গদেশে শ, স ও ষ এই তিন বর্ণই শ এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। দন্ত্য স এর উচ্চারণ S এর ন্যায়, তালব্য শ এর Sh এর ন্যায় এবং ষ এর hh এর ন্যায়। স এর প্রকৃত-উচ্চারণ সৃষ্টি, স্রাব, স্থান ইত্যাদি স্থলে পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বর্ণই যদি এক তালব্য শ এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তিনটি বর্ণের প্রয়োজন কোথায়। ঐরূপ বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এই দুই বর্ণই বর্গীয় ব এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। বর্গীয় ব এর উচ্চারণ ইংরাজি b এর ন্যায় এবং অন্তস্থ ব এর ইংরাজি v এর ন্যায়, ভ এর উচ্চারণ ইংরাজি v এর ন্যায় নহে bh এর ন্যায়। অন্তস্থ ব যখন অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তখন উহার উচ্চারণ ইংরাজি V এর ন্যায়। বাঙ্গালা ভাষায় ব ফলা ও ম ফলা একই প্রকারে উচ্চারিত হয়। য ও যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহার দ্বিত্ব [illegible] হয় মাত্র। অর্থাৎ ক ও ক্য এর উচ্চারণের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না; [illegible] স্থানেই ক এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। [illegible] কালের গুরু মহাশয়েরা পড়াইতেন ক, ক, [illegible] কালের [illegible] স্কুলের শিক্ষিত-পণ্ডিত মহাশয়েরা পড়ান ক ক, ক্য, ক ক। য ও য় এর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের উচ্চারণই হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "য" কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা-য ও য়। য় স্থলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ রাখা হইয়াছে, কিন্তু য এর স্থলে উচ্চারণ উহাকে জ এর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাদব, যোগেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চারণ করিবার সময় আমরা 'জ' এর উচ্চারণই করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, উহারা ইয়াদব, ইয়োগেন্দ্র এইরূপ উল্লেখিত হয়। জ, য প্রভৃতির উচ্চারণগত প্রভেদ না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় এখনও তাহাদের আকারগত প্রভেদ আছে; কিন্তু বর্গীয় ব অন্তস্থ ব এর আকারগত প্রভেদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলা ভাষায় এই দুই বর্ণের আকারগত ও উচ্চারণগত দুই প্রভেদই ছিল। সেকালের গুরুমহাশয়েরা বর্ণমালা পড়াইবার সময় পেট-কাটা ব বলিয়া বর্গীয় বয়ের পরিচয় দিতেন ও অক্ষরের মধ্যস্থলে একটা সরল রেখা অঙ্কিত করাইতেন। প্রাচীন পুঁথিতেও বর্গীয় "ব" এর এরূপ আকার দৃষ্ট হয়। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ চাই একাকীই উচ্চারিত হউক, চাই অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হউক, উহার উচ্চারণ পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় উক্ত হইত। স্বামী(সোয়ামি) দ্বারিকা(দোয়ারিকা) দ্বার (দোয়ার) ইত্যাদি উচ্চরণ এখনও শুনা যায়। ন, ণ এর উচ্চারণ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এই উভয় বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ করি, তাহাতে ন এর উচ্চারণ হইয়া থাকে, ণ এর উচ্চারণ

কণ্ঠকটা ড় যে ৮ সংযুক্ত করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার। বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা না শুনিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা কঠিন। বিসর্গের উচ্চারণ বাঙ্গালাভাষায় আদৌ করা হয় না। তবে ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু বাঙ্গালাভাষায় পদান্ত বিসর্গের ব্যবহার বিরল। ক্ষ এর উচ্চারণও বঙ্গ ভাষায় আদৌ হয় না। উহার উচ্চারণ খ এর সহিত ষ সংযুক্ত করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, সেইরূপ করা হইয়া থাকে। ম পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয়, এবং স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয় না; যথা—জন্ম; বাল্মীকি প্রভৃতি স্থলে ম উচ্চারিত হয় এবং আত্মা, পদ্ম, রুক্মিণী প্রভৃতি স্থলে উচ্চারিত হয় না; কেবল যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, সেই বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় ম বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বত্রই উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঋকারের আদৌ স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, উহা রকারে ই বা ঈ যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে যেরূপ উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করা হয়। ঋষি ও রিষ্ট, ক্রূত ও ক্রীত ইত্যাদির ঋ ও র এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ করা হয় না। বস্তুতঃ ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক। ণ এর উচ্চারণে ন্যায় ঋএর উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞ এর প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণতঃ গ কে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণেরই স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালাভাষায় স্বরবর্ণের মধ্যে ই ঈ উ, ঊ ইত্যাদির উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ করা হয় না। যে বর্ণ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সাধারণতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি হয়। কোন্ স্থানে কোন্ স লাগিবে কোন্ ন লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ র লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ ষ লাগিবে, তাহা বালকদিগের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে অচল শব্দ লিখিতে বলিলে, তাহার কোন ভ্রম হইবে না, কেন না, অ, চ, ল এই তিন বর্ণই বিভিন্ন শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। কিন্তু মনে করুণ, এক বালককে বিস্মরণ লিখিতে বলা হইল। যে ভাবে আমরা বিস্মরণ উচ্চারণ করি, তাহাতে বালক যে কোন 'স' ও যে কোন "ন" লিখিতে পারে এবং ম ফলার পরিবর্ত্তে ব ফলা, য ফলা দিতে পারে, কিম্বা ঐরূপ কোন ফলা না দিয়া, যে কোন স দ্বিত্ব করিয়া লিখিতে পারে। কিন্তু ঐ কথাটি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থলে যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাতে কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী বালকের ঐ বর্ণাশুদ্ধি পরিহারের জন্য কোন্ ন, কোন স, ও কোন ফলা, ইহা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়। "কামিনী" কথা যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি, তাহা লিখিবার সময় ম এ এবং ন এ যে কোন ইক দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বালক এই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ প্রচলিত

থাকিলে, ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে কষ্ট পাইতে হয় না, এবং স্মৃতিশক্তিকেও অযথা কষ্ট দিতে হয় না।

সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন কালে উহার যথাযথ উচ্চারণ প্রবর্ত্তিত করা তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেই বর্ত্তমান দূষণীয় উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় স্কুল পরিদর্শনের সময় বালকদিগের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অতাল্প সময়েই এ দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। স্কুল কলেজ ও টোলাদির সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় সার্কুলার জারি করিলে এ দেশের উচ্চারণ শীঘ্রই তিরোহিত হইতে পারে।

বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু বিদ্যালয়াদিতে পড়িবার কালে বালকদিগকে প্রথম হইতেই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিলে কালে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা পরিবর্ত্তিত হওয়া যে উচিত, তাহা অস্মদ্দেশীয়-পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। অধুনা বাঙ্গালা ভাষার যরূপ উন্নতি ও প্রসার হইতেছে, তাহাতে উহার উচ্চারণের এরূপ দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্য-সভা, সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি যে সমস্ত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের এবং অস্মদ্দেশের সাহিত্য-সেবক ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার ভাষার উন্নতি সাধন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শ, ষ, স তিন বর্ণেরই উচ্চারণ শ এর ন্যায় হইলেও কোন কোন স্থলে শ এর উচ্চারণ স্থলে স এর উচ্চারণ প্রচলিত আছে, যথা—শৃঙ্গ শ্রী শ্রবণ ইত্যাদি। অর্থাৎ ত, থ, ন, র, ঋকারের সহিত যুক্ত হইলে স এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়, অন্য স্থলে শ এর মত উচ্চারণ হয়; এবং ঋকারও র সংযুক্ত হইলে শএর উচ্চারণ স এর ন্যায় হয়।

---

## শরীর-রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের-অনুষ্ঠান।

### পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং হাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাত্তৃণং। জ্যোতীংষ্যনিষ্টামেধ্যমশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেত। নচৈত্যধ্বজগুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ। ন ক্ষপাস্বমরসদন চৈত্যচত্বর চতুষ্পথোপবন শ্মশানায়তনান্যা-সেবেত। নৈকঃ শূন্যগৃহং নচাটবীমভ্যু-প্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রী মিত্র ভৃত্যান্ ভজেৎ। নোত্তমৈর্বিরুধ্যেৎ নাবরানুপাসীত। ন জিহ্মং রোচয়েৎ। নানার্য্যমাশ্রয়েৎ। ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগরস্নান পানাশনান্য-

সেবেত। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ ন দংষ্ট্রিণো ন বিষাণিনঃ। পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবতান্ জহ্যাৎ। কলিং নারভেত। ন স্নানখাট্যাং স্পৃশেন্নক্ত-মাঙ্গং। নাস্পৃষ্টা রত্নাজ্যপূজ্য মঙ্গল সুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্য মঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎনারত্নপাণির্নাস্নাতো নোপহতবাসা না জপিত্বা নাহুত্বা, দেবতাভ্যো গুরুভ্যঃ পিতৃভ্যোনা তিথিভ্যো নোপাশ্রিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো নামালী না প্রক্ষালিত পাণিপাদ বদনো নাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা নপাত্রীষ্মেধ্যাসু নাদেশে নাকালে, নাকীর্ণে না দত্বাগ্রে হগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈর্ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত। নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র • দধিমধুলবণসক্তুসর্পিভ্যঃ। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন সক্তূনেকানশ্নীয়াৎ নানৃজুঃ ক্ষুয়াৎ নাশ্নাৎ নশয়ীত। নবেগিতোঽন্যকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ন বায়্বগ্নি সলিলসোমার্কদ্বিজ গুরু প্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকা বর্চ্চোমূত্রাণ্যুৎসৃজেৎ। নপন্থানং অবমূত্রয়েৎ ন জনবতি নান্নকালে। ন জপ্য হোমাধ্যান বলি মঙ্গলক্রিয়াসু শ্লেষ্মসিঙ্ঘা ণকং মুঞ্চেৎ। ন স্ত্রিয়মবজানীত নাতি বিশ্রম্ভয়েৎ নাতি গুহ্যমনুপ্রবেশয়েৎ নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাপ্রশস্তাং নাকাম্যাং নাস্তকামাং নান্যস্ত্রিয়ং, বিমমশ্মশানায়তন সলিলৌষধ দ্বিজগুরু সুরালয়েষুন সন্ধ্যয়ো ন নিষিদ্ধতিথিষু নাশুচি র্না জগ্ধভেষজো নাশুপহিত প্রহর্ষো নাকুঞ্চিতান্ ন মুখোচ্চারপীড়িতোঽন্নম্ ব্যায়ামোপশান্ত ক্লমাদিহস্তো কামাং গচ্ছেৎ। ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ। না শুচিরভিচার কর্ম্ম পূজ্যাধ্যয়নমভিনির্ব্বর্ত্তয়েৎ। ন বিদ্যুৎসু ন ভূমিকম্পে নোল্কাপাতে ন নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়োর্ন মহোৎসবে না মুখাদ্গুরোর্নাতি মাত্রং নাতিক্রতং নাতিবিলম্বিতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। নাতি সময়ংজহ্যাৎ ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ। ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়ন স্ত্রী স্বপ্নসেবী স্যাৎ। ন বাল বৃদ্ধ লুব্ধ মূর্খ ক্লিষ্ট ক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্য দ্যূত বেশ্যা প্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। নগুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। নকঞ্চিদবজানীত। নাহংমানী স্যাৎ ন বৃদ্ধান্ নগুরূন্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ, ন চাতিক্রয়াৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী নসর্ব্বাভিশঙ্কী ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নচাতিদীর্ঘ সূত্রী স্যাৎ নক্রোধহর্ষাবনুবিদধ্যাৎ ন শোকমনুবিশেৎ। ন সিদ্ধাবৌৎসুক্যং গচ্ছেৎ নাসিদ্ধৌদৈন্যং।

মুখ বন্ধ করিয়া জৃম্ভা (হাই) ক্ষবতু (হাঁচি) ত্যাগ কিংবা হাস্য করিবে না, চরকে উক্ত আছে, "বায়ুর আধিক্য হইলে জৃম্ভা ও ক্ষবথু হয়।" সেই বায়ুকে নির্গমন করাই তাহার চিকিৎসা, সেই বায়ুকে নির্গমন হইতে না দিয়া যদি তাহার বেগরোধ করা যায়, তাহাহইলে, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক, (অর্দ্ধেক মাথা ধরা) কম্প, শরীরের শিথিলতা উৎপন্ন হয় চরকে উক্ত আছে যথা—

মন্তাস্তম্ভশিরঃশূলমর্দ্দিতার্দ্ধাভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃস্যাৎ
বিধারণাৎ।

যদি মুখ বন্ধ করিয়া ক্ষবথু এবং জৃম্ভা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কুপিত বায়ু নিঃশেষ রূপে বহির্গত না হওয়ার দরুণ, কুপিত বায়ু জন্ম শিরোরোগ প্রভৃতি ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই মুখ বন্ধ করিয়া জৃম্ভাদি পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নি এবং গ্রহাদি দর্শন করিবে না। (শ্মশানাদি স্থানের যে অগ্নি, ধূমকেতু প্রভৃতি যে গ্রহ, তাহাকেই অপবিত্র অগ্নি ও অপবিত্র গ্রহ বলে।) জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অমঙ্গলজনক গ্রহাদির দর্শন নিষেধ আছে: ধূমকেতু উদয় হইলে জগতের অমঙ্গল উপস্থিত হয়। যে অমঙ্গলময় তাহার দর্শনে যে লোকের অমঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই মহাত্মা শূদ্রক কবি মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ধূমকেতুকে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া উপমা দিয়াছেন যথা।

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ
গ্রহোঽয়মপরঃ পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥

মঙ্গল বিরোধী হইলে, বৃহস্পতি ক্ষীণবল হয়, তাহাতে পার্শ্বে আবার অপর ধূমকেতু উপস্থিত। ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণ অমঙ্গলজনক বলিয়াই ইহাদিগকে দর্শন করা নিষেধ। নাসিকা সংকোচ করিবে না।

চতুষ্পথস্থিত বৃক্ষ, গুরু এবং পূজ্যদিগের ছায়া অতিক্রম করিবে না। রাত্রিতে দেবমন্দির, উঠান, চতুষ্পথ, (চৌরাস্তা) উপবন ও শ্মশানে থাকিবে না, একাকী গৃহ মধ্যে থাকিবে না, এবং অরণ্যে গমন করিবে না। কারণ; একাকী গৃহে থাকিলে এবং একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিলে, যদি সহসা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা করা বড়ই কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে নির্জ্জনগৃহে শয়ন করিয়া মুখচাপা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সে সময় যদি কেহ নিকটবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে মুখচাপাগ্রস্তব্যক্তি মৃত প্রায় হয়: এই জন্যই একাকী নির্জ্জনগৃহে থাকা অনুচিত। পাপাসক্ত স্ত্রী, বন্ধু ভৃত্য পরিত্যাগ করিবে। সজ্জনের সহিত বিরোধ এবং নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না। নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিলে স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হয় না, বরং তৎসহবাসে সংসর্গজ দোষই হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন যখন, দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তোষার্থ ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, তখন দেববিরোধী মূকদানব অর্জ্জুনকে দেবতা মনে করিয়া শূকর বেশে নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহাদেব এই বিবরণ অবগত হইয়া ব্যাধ রূপ ধারণ করতঃ ঐ বরাহের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও ঠিক সেই সময় বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, উভয় বাণে বরাহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ব্যাধ-বেশধারী মহাদেবের চর ছদ্মবেশে বাণগ্রহণেচ্ছু অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার প্রভু কর্ত্তৃক তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে নতুবা বরাহ কর্ত্তৃক আজ তোমার জীবন বিনাশ হইত; তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার করা উচিত, প্রত্যুপকার স্বীকার করা

দূরে থাকুক ; তুমি আমার প্রভুর বাণ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

আমার প্রভুকে সামান্য লোক বিবেচনা করিও না। ইনি এই অরণ্যের একমাত্র অধীশ্বর। যদি তোমার বাণের নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রভুর সহিত মিত্রতা করিয়া যাচ্ঞা কর, যদি তুমি পৃথিবী প্রার্থনা কর, তাহাও তোমাকে অম্লানচিত্তে সমর্পণ করিবেন। তখন অর্জ্জুন ছদ্মবেশধারী দূতের "মিত্রতা কর" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে দূতকে বলিলেন যে, হে ব্যাধদূত! তোমার প্রভুর ন্যায় লোকের সহিত আমার ন্যায় ব্যক্তির মিত্রতা সম্ভব হয় না, কেন না—

যদা বিগৃহ্যাতি হতং তদাযশঃ
করোতিমৈত্রী মথ দূষিতা গুণাঃ ॥
স্থিতিং সমীক্ষ্যোভয়থা পরীক্ষকঃ
করোত্যবজ্ঞোপহতংপৃথগ্ জনং ॥

নীচ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিলে যশ নষ্ট হয়, মিত্রতা করিলেও স্বকীয় সমস্ত সদ্‌গুণ দূষিত হয়, অতএব বিবেচক ব্যক্তি উভয় কার্য্যেই দোষ বিবেচনা করিয়া হীন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা কিম্বা বিরোধ করেন না ; এই হেতুই নীচলোকের সহিত মিত্রতা করা বিধেয় নয়। খলের সহিত মিত্রতা করিবে না এবং দুর্জ্জনকে আশ্রয় করিবেনা। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি জলপান, অতি ভক্ষণ পরিত্যাগ বিধেয়। মোটের উপর সর্ব্ব-[illegible] বিপৎ-সঙ্কুল স্থানে অতি-[illegible] কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইতে পারে। অধিক নিদ্রাতুর হইলে অর্দ্ধাবভেদক ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভব। চরক এবং সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, অলস এবং নিদ্রা সুখরতব্যক্তিদের প্রমেহ হইয়া থাকে। অতিশয় জাগরণ করিলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তজ্জন্য উন্মাদাদি রোগ হইতে পারে। অধিক জলপান এবং অধিক ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে।

অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ
কালেপিসাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তং
অন্নং ন পাকং ভজতে জনস্য ॥
অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তিহি ॥

অধিক জলপান, বিষমাশন, (দধি মৎস্য একত্র ভোজন এবং অনিয়ত সময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই অজীর্ণ উপস্থিত হইলে যথা সময়ে যদি লঘু আহারও করা যায়, তাহাও পরিপাক হয় না। যাহারা পশুর ন্যায় অপরিমাণ আহার করে, তাহাদের সমস্ত রোগের কারণ ভূত অজীর্ণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঊর্দ্ধজানু হইয়া বসিবে না। মহিষ, হস্তি, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর নিকট গমন করিবে না। অতি রৌদ্র, অতি হিম, অতি রৌদ্র, অতি বায়ু সেবা পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক মুছিবে না, [illegible]

শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখাই স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিধানবস্ত্রের দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিলে; বস্ত্রে ময়লা মাথার যাওয়ার সম্ভব; সেই জন্যই পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করা বিধেয় নয়। স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে রত্ন, ঘৃত, পূজ্য, মঙ্গল-জনকপুষ্প স্পর্শ করিয়া গমন করিবে, পূজ্যাদিগকে এবং মঙ্গলকর দ্রব্যাদি বাম দিকে রাখিয়া গমন করিবেনা, অকালে অস্থানে, অপবিত্র পাত্রে আহার করিবেনা। দেবতা, গুরু, অতিথি এবং আশ্রিতদিগকে সৎকার করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ধৌত পূর্ব্বক মালাধারণ করতঃ স্বীয় অভীষ্ট দেবতার জপ করিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আহার করিবে, আহার কালে অন্যমনস্ক হইবে না। দধি, মধু, লবণ, ঘৃত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিবে না, রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে, না। সরলভাবে অবস্থ পরিত্যাগ করিবে। বক্রভাবে শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ রোধ করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবে না, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে, চরক বলিয়াছেন মল মূত্রের বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, বিষমাশন, অতি সাহস এই সমস্ত কারণে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বিজ, গুরু, ইহাদের সম্মুখে নিষ্ঠীবন ( মুখেরশ্লেষ্ম-ফেণা ) মল, মূত্র পরিত্যাগ করিবে না, পথে, লোকসঙ্কুলস্থানে এবং ভোজন-সময়ে মূত্র পরিত্যাগ করিবেনা। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবেনা এবং অতিশয় বিশ্বাসও করিবে না। স্ত্রীকে অতি গোপনীয় কথা কখনও বলিবে না এবং কোন কার্য্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করিবে না।

রজস্বলা, পীড়িতা, অপবিত্রা অন্য পুরুষা-সক্ত স্ত্রী গমন করিবে না। নিষিদ্ধ তিথিতে ( অমবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতিতে ) সন্ধ্যাকালে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, গুরু জনের নিন্দা করিবে না। অপবিত্রাবস্থায় পূজাদি কোন কার্য্য করিবে না। ভূমিকম্পে, বিদ্যুৎপাত সময়ে, নষ্টচন্দ্রায়, মহোৎসবে, সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করিবে না। অতি-দ্রুত অতিধীরে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। অনর্থক বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সন্ধ্যা-কালে ভোজন, অধ্যয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ, ক্লীব ইহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না। মদ্য, অক্ষক্রীড়া এবং বেশ্যাসক্ত হইবে না। অনর্থক অধিক কথা বলিবে না। একাকী সুখী হইবার ইচ্ছুক হইবে না, যাহাতে অন্যে সুখী হয় তাহাও চেষ্টা করিবে, দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময় কার্য্যাদি সমাধা করিবে। কোন কার্য্য সিদ্ধ হইলে অহ্লাদিত হইবে না এবং অসিদ্ধ হইলেও দুঃখিত হইবে না, ক্রোধ, হর্ষ শোকের বশীভূত হইবে না। ভগবান্‌ও গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি
ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌যঃ
স মে প্রিয়ঃ॥"
১২ অঃ ১৭ শ্লোক।

যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোকাকুল হন না, কোন

বন্ধন আকাঙ্খা করেন না, এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

( ক্রমশঃ )

কবিরাজ শ্রী মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম।

---

# পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দেহের উপাদানের সূক্ষ্মত্ব, স্থূলত্ব এবং নির্ম্মলত্ব ও মলিনত্ব হেতু জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ বা অবিকাশ হয়। সূর্য্য * হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ তেজ প্রধান উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিষ্টাত্রী পুরুষ ও তদংশভূত জীব সমূহ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় সূক্ষ্মদেহ ধারী, উহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর দেবতা হইতেছেন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষে তৈজস, দ্রবীয়, বাষ্পীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্মদেহধারী জীব সমূহ আছে। উহারা গুণ ভেদে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের সহিত তুলনায় উহাদিগের অধিকাংশই জীব পদ বাচ্য নহে, জীবাণুপদ বাচ্য। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আমাদের শরীরের ও কতকগুলি আমাদের মনের বড়ই অনিষ্ট কারক। যেমন বসন্ত বিসূচিকা বীজের মধ্যে অনিষ্ট কারক জীব বা জীবাণু আছে সেইরূপ, নিদানোক্ত দেবগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ পিশাচগ্রহ ইত্যাদি গ্রহজুষ্ট অনেক উন্মাদ রোগ আছে উহারা শরীর ও মনের অনিষ্ট কারক। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বা ভাবাংশ একত্রিত সম্মিলিত হইয়া এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থ একএকটী ভাবের আধার, পরমাণু যে অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ তাহাও ভাব শূন্য নহে, তবে পার্থিব অণু বা জড় পদার্থে চৈতন্যের বিকাশ না হওয়ায় তাহারা স্বয়ং কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারেনা। * পৃথিবীস্থ জল,

* সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে সবনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্যতে। ... মূল ত্রিমূর্ত্তির প্রধান মূর্ত্তি যে সূর্য্য ... ত্রিমূর্ত্তি শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের ... ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

টীকা * ইয়ুরোপীয় তার্কিকগণ একটি বৃহৎ কাচপাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ কাচ পরকলা দিয়া দুইটি কুটরীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কুটরির মধ্যে একটি জলাধারে কতকগুলি মৎস্য অন্য কুটরিতে মৎস্যভোজী একটা জীব ( ধাড়ে ) বদ্ধ করিয়া রাখায়, ঐ মৎস্য ভোজীজীব ঐ মৎস্য ধরিতে যাওয়ায়, বারম্বার ঐ পরকলায় বাধা প্রাপ্ত ও মস্তকে আঘাত লাগিয়া প্রতি নিবির্ত্ত হওয়া সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার ধরিতে আগত লাগিয়া প্রতি বিবির্ত্ত হয়। এইরূপে বহুবার আঘাতিত হইয়া অবশেষে সংস্কারের ন্যায় বাধা জনিত ভাবটি সামান্য উপলব্ধি হয়, ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নিম্নশ্রেণীর জাতির স্মৃতি ও ধৃতির বিকাশ অতি অল্প।

তেজ, বায়ুর মধ্যে বহুতর জৈবোপাদান আছে; এমন কি, একটী বৃক্ষপত্র বা কূপস্থ জল উৎকৃষ্টঅণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জীবাত্মাময় শত শত কীটের ন্যায় জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ঠা, গোময় হইতে বহুতর কীট উৎপন্ন হয়। এতাবতার সাব্যস্ত হইতেছে যে, জগতে জীব শূন্য স্থান নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিতত্ত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাভাসই আমি পদ বাচ্য জীবাত্মা। ঐ বুদ্ধিতে গুণ ক্ষোভ হেতু যে সকল বিকল্পাত্মক ভাবের স্ফুরণ হয়, ঐ সকল বিকল্পাত্মক ভাব রূপ তত্ত্বই ( Thinking Entity ) মন হইতেছে। যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জল দ্বারা ডাইলিউট করিলে ঔষধের গুণ ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ক্রমে ক্রমে বহু, শতবার বা বহু সহস্র বার ডাইলিউট করার পর ঔষধের গুণ লুপ্ত হইয়া শুদ্ধ জলে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাটমনের এক একটী চেতন ভাব তমগুণ কর্ত্তৃক ক্রমে সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইয়া চেতন ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেমন জল দ্বারা অনেক বার ডাইলিউট হেতু ঔষধের গুণ অপ্রকাশ হইলেও ঔষধের অতি সামান্য অণুপরমাণু অবশ্যই জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু প্রায় সমস্তই জলীয় অংশ হওয়ায় জলের গুণ দ্বারা ঔষধের গুণ আবরিত হইয়া যায়, সেইরূপ জড়ের স্বাভাবিক ( কেবল মাত্র তম ) গুণ দ্বারা তাহাতে রজ ও সত্ত্ব গুণ সম্পূর্ণ রূপে আবরিত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মাত্র রজ গুণের অতি-সামান্য ক্রিয়া ( অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধির ক্রিয়া মাত্র ) প্রকাশ পায়, যেমন কাচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত আরসুল্লা কীটের ( ভয় স্মৃতি দ্বারা ) ক্ষুদ্র অন্তর কাচপোকা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দেহ তদাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাট মনের চেতন ভাব মৃত্তিকা বা পর্ব্বত রূপে কল্পিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষিতি জাতীয় অণু হইতে স্থূলতম মৃত্তিকা বা পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। যেমন অক্সিজন, হাইড্রোজন দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প একটী কাচ-যন্ত্র বিশেষে পুরিয়া তন্মধ্যে যদি তড়িৎ পাস্ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্বয় সংমিশ্রিত হইয়া সামান্য বাষ্পীয় জ্যোতি অর্থাৎ এক একটী রেখার ন্যায় প্রকাশ হয়, পুনর্ব্বার উহাতে অন্য প্রকারে তড়িৎ পাস দ্বারা ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ জল অন্য যন্ত্র বিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফাকারে পরিণত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন সূক্ষ্ম হাইড্রজন্ ও অক্সিজন্ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ মহৎ ক্ষেত্রে কল্পিত সূক্ষ্ম মনোভাব ( তড়িৎ পাসের ন্যায় ) তম গুণের প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূলদৃশ্যজগতে পরিণত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত মত মৃৎপাষাণাদিতে যেমন আদৌ জীবত্বের বিকাশ নাই, সেইরূপ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে জীবত্বের ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইলেও স্বাধীনভাবে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। জড় পদার্থে যে সকল জড়ীয় প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া ( যথা, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, তাপের স্ফুরণ ) ইত্যাদি

আছে, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তীর্য্যগ্‌ জাতিতে (জীবত্বের স্ফুরণহেতু) ঐ সকল আকর্ষণ বিক্ষেপণ আদি রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পশ্বাদির বুদ্ধি ও মানবের সামান্য অঙ্কুর যাহা মস্তিষ্কে প্রকটিত হয়, তাহা ঐ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া তদাকার ধারণ করে, ঐ সকল প্রবৃত্তি পশ্বাদিকে যে ভাবে চালিত করে; উহারা সেই ভাবে চালিত হয়। পশুদিগের স্বাধীন বিবেক বা বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ায়, উহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সদসদ্‌ বিবেচনা করিতে পারেনা।

বস্তুত উহাদের অন্ধ প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি নাই। এবং উহাদের ধৃতি ও স্মৃতি শক্তি অতিঅল্পমাত্র বিকাশ হয়। মানবের সহিত তুলনায় ধৃতি ও স্মৃতিশক্তি উহাদের এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয় *। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন আমিত্বের অর্থাৎ স্বাধীন কল্পনাকারী মন ও নিশ্চয়কারী বুদ্ধির বিকাশ উহাদের হয় নাই। যেমন গর্ভস্থ-শুক্র ও শোণিত সংযোগে গর্ভেজীবসঞ্চার হয় এবং যত দিন ভ্রূণ গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার অস্তিত্বেই ভ্রূণের অস্তিত্ব, মাতার আহারের দ্বারায় ভ্রূণের শরীর পোষিত হয়, কিন্তু জীব প্রসূত হওয়ার পর স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হইলেও উহার স্বতন্ত্র আহারের প্রয়োজন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় সেইরূপ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, প্রকৃতি মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণসদৃশ। অর্থাৎ স্বাভাবিক লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির অস্তিত্বেই উহাদের অস্তিত্ব, স্বভাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনচিন্তা ও ন্যায়ান্যায় বিচার দ্বারা উহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি মাতার স্তন্যপায়ী শিশু পুত্র সদৃশ হইলেও (অর্থাৎ স্বভাবের অধীন হইলেও) স্বাধীনভাবে চিন্তা যুক্তি ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে সক্ষম। বর্ণিত আছে, মনু প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং মনুই মানবের আদি পুরুষ, যে হেতু মানবের মন বুদ্ধি সেই বিরাট মনের ভাব-বিশেষ, উহা এই পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিকাশিত হইয়াছে। শিশু মাতৃ গর্ভ—প্রসূত হইয়া যেমন প্রতিদিন দিবা ভাগে জাগরিত অবস্থায় পার্থিব অভিজ্ঞতা ও নানা ভাব শিক্ষা ও তাহা অন্তরে সঞ্চয় করিয়া নিশিতে নিদ্রা যায় এবং পর দিন নিদ্রোত্থিত হইলে ঐ পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ অস্পষ্ট সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন ভাব সঞ্চয়ের ভিত্তি স্বরূপে পরিণত হয় এবং ঐ প্রতিদিনের নূতন নূতন সংগৃহীত ভাব সমূহ তাহাতে যোগ করিয়া লওয়ায় ক্রমে ক্রমে নানাভাব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া মালার ন্যায় গ্রথিত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় নূতন নূতন ভাবে পরিণত হয়। সেইরূপ সূত্রাত্মা তাঁহার ত্রিগুণ-সূত্রে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারূপ এক একটী পুষ্প মালাকারে গ্রথন করিতে থাকে অর্থাৎ মানবাত্মা এক জন্মে যে অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ সঞ্চয়

* এই বাক্যের টীকা ভ্রমক্রমে ১২০ পৃষ্ঠায় লিখে দিয়াছে, উক্ত পৃষ্ঠার ৩৫ পংক্তিস্থিত * চিহ্ন উঠিয়া যাইবে (হিং সঃ)।

করে, পর জন্মে তাহার সারাংশ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া অভিজ্ঞতা ও নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। বালক যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় ও বয়প্রাপ্ত হইয়া মাতার স্তন্য ত্যাগ পূর্ব্বক মাতার প্রতিপালনাধীন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আবার অন্য বালকের পিতৃ স্থানীয় হয়, মানবও সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সাধনা দ্বারা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং মহাত্মা বা মহাপুরুষে পরিণত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র মনও বিরাট মনে পরিণত হয়।

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী (যাহাকে ইংরেজীতে descending এবং Ascending cycle কহে।) ও সংস্কৃতে কালের অবসর্পিণী ও উপসর্পিণী প্রণালী কহে) বুঝা আবশ্যক, ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ডাইলিউসন্ এবং অদৃশ্য বাষ্প বরফে পরিণতি ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরাটমনের এক একটী সূক্ষ্ম ভাব তমগুণাক্রান্ত হইয়া বা তামসিক অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে মৃৎ-পাষাণাদি স্থূল জড় পদার্থে কিরূপে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী যাহা কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পাঠকগণ কালের বা প্রকৃতির অবনয়ন প্রণালীর সামান্ত আভাস কিঞ্চিৎ পাইতে পারেন, তদ্ভিন্ন যথার্থ তত্ব উপলব্ধি করা ভয়ঙ্কর কঠিন। এক্ষণে উন্নয়ন প্রণালী যাহা কথিত হইতেছে তাহাও সহজ নহে। বেদান্তানভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রণালীই ভয়ঙ্কর কঠিন। তবে ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণ যাঁহারা ডার-উইনের সৃষ্টিবিবর্ত্তবাদ (Evolution therory) মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী অর্থাৎ ক্রমোন্নতির নিয়ম বুঝার কিছু সুবিধা হইতে পারে। মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিতে যে ক্রিয়া শক্তি আছে, তদ্বারা বহুকালে উহাদিগের অন্তরোপাদানের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কথঞ্চিৎ তেজের স্ফুরণ হয়, তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ উপাদান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শীল দ্রবীভূত হয়। ঐ দ্রবীভূত উপাদান সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট বা শ্লথ হইয়া উহাদের আভ্যন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে আকর্ষণ শক্তি কর্ত্তৃক যখন ঐ সকল অণু পুনঃসংশ্লিষ্ট হয়, তখন উহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় ঐ মৃত্তিকা প্রস্তরের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া ধাতবোপাদানে পরিণত হয়। কিন্তু উপাদান লৌহ, তাম্র, সীস প্রভৃতি আকরজ ধাতুতে পরিণত ও ঐ সকল ধাতুর সংমিশ্রণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, পিত্তল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার উক্ত আকরজ ধাতব ঔপাদানিক অংশ সহস্র সহস্র বর্ষে আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ হইতে দ্রবীভূত হইয়া তাহাতে উষ্মার বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে বিকৃত হইয়া উদ্ভিদ ও জৈবোপাদানে পরিণত হয় * চিকিৎসা ও রাসায়নিক শাস্ত্রে জীবে ও উদ্ভিদে যে লৌহ প্রভৃতি

টীকা * আভ্যন্তরীণ তেজ বিশেষ হইতে যে, জীবত্বের বিকাশ হয়, ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞান সম্মত।

ধাত্রব উপাদান আছে। ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে, আবার ঐ উদ্ভিদের উপাদানিক অংশ বিকৃত হইয়া তদ্দ্বারা যে কীটাদি জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা কেবল শাস্ত্রের প্রমাণ নহে, অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গলিত ও বিকৃত বৃক্ষ—পত্র—বিশেষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কীট ও ক্ষুদ্র চিঙ্গড়া মৎস্য প্রভৃতি কীট উৎপন্ন হয়, কাঁচোয়ায় যে তাম্র ভাগ অধিক ইহা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা এক ধাতুর সহিত পত্র বিশেষের রস সংযোগে অন্য ধাতু উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন জাতীয় ঔদ্ভিদ্য উপাদান দ্বারা আর এক জাতীয় উদ্ভিদ যে প্রস্তুত হইতে পারে ইহা পরীক্ষিত। যদিও অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকপণ্ডিতেরা ধাতব্য ঔদ্ভিদ্য উপাদানে কিম্বা কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদান দ্বারা স্বেদজজীব ব্যতীত পশু পক্ষ্যাদি জরায়ুজ বা অণ্ডজ বৃহৎ জীব নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই * কিন্তু উদ্ভিদও ধাতু বিশেষ দ্বারা সর্প দংশিত মৃত জীব যে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং জীবের মস্তিষ্ক রক্ত মেদ ও মাংস প্রভৃতিতে বহুতর ধাতু উদ্ভিদতত্ত্ব এবং অন্য জৈবোপাদান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জৈবনিক বা জীবাণু আছে। ইহা বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রানুমোদিত ও পরীক্ষিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য ক্যা-বেনিষ্টগণের মতে আবরজ ধাতব-উপাদান বিকৃত হইয়া উদ্ভিদে, ঔদ্ভিদ্য উপাদান বিকৃত হইয়া পতঙ্গ ও কীটাদির জৈবোপাদানে, ঐ কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদন বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পশু পক্ষীর জৈবোপাদানে বিবর্দ্ধিত এবং উচ্চতর জীবের অর্থাৎ বানর উল্লুক ও বন মানুষের জৈবোপাদান বিকৃত হইয়া মানবের দৈহিক জৈবোপাদানে পরিণত হয়। তদনন্তর মানবের জৈব ও মানসোপাদান * সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল বিশুদ্ধ দেবোপাদানে বিবর্দ্ধিত হয় এবং ঐ বিশুদ্ধ দেবোপাদান ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হয়। যথা Kabalistic aphorism runs "A stone becomes Plant, a plant a beast, the beast a man, a man Deva and Deva himself becomes God." পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পশু জগৎ পর্যান্ত প্রকৃতি

The caloric heat is as Heracletus widely taught the Primordial Principel of life, আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।

টীকা * কিন্তু প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব [illegible] শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, [illegible] অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত [illegible]।

* মানবের মানস সোপান উচ্চতর লোকস্থ দেবাংশ। কিন্তু দৈহিক জৈবোপাদান প্রস্তুত হইলে ঐ তৈজস দেবোপাদান আকর্ষিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্ব ও তাহাদের সার সংগ্রহ স্বরূপ মন ও বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয়। এ দেবোপাদান পঞ্চ ভূতের সত্বাংশ। তবে পার্থিব তম রজগুণের সহিত মিশিয়া তদনুরূপ হয়।

মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় বা ভ্রূণ সদৃশ। যেমন ৫ দিনের গর্ভস্থ বীর্য্যাপেক্ষা এক মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং তদপেক্ষা ৬। ৭। ৮ ৯। ১০ মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণের যেরূপ দেহ ও চেতনার ন্যূনাতিরেক প্রভেদ হয়, সেইরূপ উদ্ভিদাপেক্ষা কীটাদি ও কীটাপেক্ষা পশ্বাদির দেহ ও চেতনায় অধিকতর উন্নতি হওয়ায় উহাদের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। শক্তি-উপাধিধারি ব্রহ্মই স্বয়ং ঈশ্বর এবং কোষোপাধিধারীই জীব—যথা

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেববিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং
ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব
জীবতাম্।
পিতা পিতামহ শ্চৈকঃ পুত্র পৌত্রৌ
যথা প্রতি॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যেরছায়ায় শক্তি চেতনবৎপ্রকাশ হয়েন। শক্তি উপাধিধারি ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে ও কোষাপধারি ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত হন। পরব্রহ্মই পিতামহ তাঁহার পুত্র স্বরূপ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র (পরব্রহ্মের-পৌত্র) স্বরূপে জীব হইতেছেন। ইহার পর শ্লোকেই বর্ণিত আছে যে—

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তি কোষা-বিবক্ষণে॥

যেমন পুত্র ও পৌত্রাভাবে পিতা ও পিতামহ নাম থাকেনা, সেইরূপ শক্তি ও কোষাভাবে ঈশ্বর বা জীবের অভাব হওয়ায় পর ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অর্থাৎ কেবল তাঁহতেই তিনি থাকেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে সত্ত্বগুণ মলিন হওয়ায় ঐ মলিন সত্ত্বগুণই এক একটী ভাবের কারণ রূপে পরিণত হয়, উহাই জীবের কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরে আনন্দ প্রতিভাত হওয়ায় উহাকে আনন্দময় কোষ বলে, তদুপরি বুদ্ধিতত্ত্বকে বিজ্ঞানময় মনস্তত্ত্বকে মনোময় জৈবতত্ত্বকে প্রাণময় ও স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। যেমন গুটি পোকা স্বীয় লালা দ্বারা সূত্রের ন্যায় পদার্থ বাহির করিয়া তদ্দ্বারা কোষ রূপ গুঁটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, সেইরূপ সূত্রাত্মা স্বভাব হইতে ত্রিগুণ সূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পঞ্চ কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বদ্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে সদাত্মা বদ্ধ হন না। তাঁহার আভাস চৈতন্য স্বীয় ভাবে মগ্ন হইয়া কোষোপাধি জীব অভিমানী হন। ঐ আনন্দময় কোষকে কারণ দেহ বলে, যে হেতু শুদ্ধচিৎই আনন্দ এই জন্য কারণ দেহে আনন্দ মাত্র প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষকে সূক্ষ্ম দেহ বলে, যে হেতু, বিজ্ঞানময়কোষে বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপে অর্থাৎ আমিত্বকারে, মনোময় কোষে কল্পনা ও কামরূপ দেহাকারে এবং প্রাণময় কোষে বায়ুরূপ দেহাকারে আভাস চৈতন্য প্রতিভাত হয় এবং অন্নময় কোষকে স্থূল দেহ বলে। পূর্ব্ব বর্ণিত মত কালের অবনয়ন প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাব সমূহ তমগুণাক্রান্ত হইয়া যখন পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয় এবং তমগুণের প্রাধান্য হেতু মৃত্তিকা ও পাষাণাদিতে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃৎ পাষাণাদি স্থূল জড়তত্ত্ব ভেদ করিয়া

বুদ্ধি মন প্রাণ ইত্যাদির বিকাশ হয় না, কেবল রজ গুণের কিঞ্চিৎ মলিনাভাগ তমগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত আকর্ষণ বিয়োজনাদি জড় ধর্ম্মাক্রান্ত— কর্ম্ম সমূহ ঐ মৃৎ পাষাণাদির অন্তরোপাদানকে ধাতবোপাদানে এবং ধাতবোপাদানকে উদ্ভিদোপাদানে উদ্ভিদোপাদনকে জৈবোপাদানে পরিণত করে, তদনন্তর ঐ জৈবোপাদানে মধ্যে রজগুণ জনিত আন্তব-উষ্মা ( Animal magnetism উদ্দীপিত হইয়া ঐ জৈবোপাদান বা জীবাণু সকলকে পরস্পর সংযোগ করিয়া অন্নময় কোষ অর্থাৎ সপ্ত ধাতু ও জৈব যন্ত্র ( organs সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে, ঐ যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইলে শুদ্ধ সত্ব গুণের সামান্য কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র রজগুণাক্রান্ত হইয়া ঐ রজগুণের কিঞ্চিৎ সাহায্যকারি হওয়ায় রজগুণই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া জীবের প্রাণময় কোষ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, এই সম্মিলিত কোষদ্বয় অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ মনুর স্মৃতিতে ভূতাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছে ; ঐ ভূতাত্মাই তীর্যগ্ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদির আত্মা। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতির মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় উহাদের জীবাত্মার সম্যক বিকাশ হয় না। উহাদের জীবনান্তে প্রাণময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ কোষস্থ জীবাণু সকল ভূলোকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে অবশ্যই উক্ত জীবাণু সকলের মধ্যেও প্রাণময় কোষের অঙ্কুর আছে। যাহাহউক, উহাদের [illegible] রজতমগুণ জনিত রাগ বা আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া স্বজাতীয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যেও আনন্দ বিজ্ঞানও মনোময় কোষ আছে, তবে ঐ কোষত্রয় কুঞ্চিত থাকায়, পশ্বাদিতে আত্ম জ্যোতি বিকাশ হয় না। উহাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর ক্রমে ক্রমে উহাদের জৈবোপাদান সংস্কৃত ও তাহাতে সত্ব গুণের বিকাশ হয়, সত্ব গুণের বিকাশ হইলে ঐ জৈবোপাদানের মধ্যে উচ্চতর লোকস্থ সত্ব গুণময় দেবতত্বের স্ফুরণ হয় এবং তদ্বারা মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় ঐ মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হইলে বিজ্ঞানময় কোষের কিঞ্চিৎ বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষে আত্মাভাস প্রতিবিম্বিত হয় ঐ প্রতিবিম্ব মনোময় কোষে পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে এবং তদ্ গুণাক্রান্ত ও তদনুরূপ দেহেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া তাহাতে প্রতিভাত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আত্রেয় উপনিষদে প্রকাশ আছে "প্রজাপতি ব্রহ্ম প্রথমে কীট পতঙ্গ ; পরে ক্ষুদ্র পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন কিন্তু দেবতাগণ ঐ দেহ তাঁহাদের উপযোগী নহে বলিয়া প্রবেশ করিতে অস্বীকার করায় গবাশ্বাদি বৃহৎ পশু সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগের প্রতি পুনর্ব্বার ঐরূপ আদেশ করিলেন, দেবতাগণ ঐ পাশব দেহও অনুপযুক্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করায় প্রজাপতি মানব দেহ সৃষ্টি করিবা মাত্র অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আহ্লাদের সহিত

মানবেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেন দেবগণ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মহৎ সমভিব্যাহারী পুরুষ দ্রবীভূত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলেন”।

বেদান্তোক্ত মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই মনুর মহৎ সংজ্ঞক জীব। উহাই আত্মার সমভিব্যাহারী। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস মনোময় হইয়া ইহপরলোক গতায়াত পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে।

এ মহৎ সমভিব্যাহারী জীবাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া পরলোক গমন করেন।

তথায় উহা পরিপাক ও বুদ্ধি কোষে দ্রবীভূত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সংস্কার পরজন্মের বীজরূপে পরিণত হয়। পরজন্মে এ বীজ হইতে এ সকল প্রবৃত্তি ও বিষয় জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত হওয়ায়, তাহার সহিত নূতন নূতন ভাব ও অভিজ্ঞতা যতই সঞ্চিত হইতে থাকে বুদ্ধি কোষস্থ জ্ঞান মণ্ডল ততই বিস্তৃত হইতে থাকে, এ জ্ঞানালোকে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে প্রকৃত সুখের বা জ্ঞানানন্দের বিকাশ হয় এবং ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হইলে চিচ্ছক্তি বিদ্যা দেবীর বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষে বিলীন এবং আনন্দময় কোষ অবিদ্যার অঙ্গীভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানানন্দে পরিণত হয়। ... পূর্ণ ... বর্ণিত ... স্বরূপ জ্ঞানের চিদ্দর্পণ সদৃশ ঐশ্বরিক শক্তিই যে বিদ্যা তাহা বলা বাহুল্য অতএব অবিদ্যারাজ্য হইতে জীব মুক্ত হইলে বিদ্যা রাজ্যান্তর্গত হইয়া সর্ব্ব-শক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের অঙ্গীভূত হয়। তখন মুক্তাত্মা আর জীব বা জীবাত্মা পদ বাচ্য থাকে না। যে হেতু অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর বা চিত্ত এ কারণ শরীরস্থ চিদাভাসই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধি তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে তৈজস জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চিত্ত-দর্পণ মহৎ চিদ্দর্পণে পরিণত হইলে প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বা সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ পদে উন্নীত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের সমাঙ্গীভূত হন। ইহাই বেদান্ত মতের সার সংগ্রহ।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ, যাহা চিত্ত-দর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে অথবা মনু যাহাকে আত্মার সমভিব্যাহারী মহৎ সংজ্ঞক জীব বলিয়াছেন এ মহৎ এবং পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্রহ্ম সমষ্টি বুদ্ধিরূপ ঈশ্বরের চিদ্দর্পণ এক নহে। উক্ত মহদ্বুদ্ধি সমষ্টি ভাবাপন্ন অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য বা জ্ঞানের মহৎ চিদ্দর্পণ স্বরূপ। আমাদের বুদ্ধি ব্যষ্টি ভাবাপন্ন পৃথক ২ চিত্তের পৃথক ২ মলিন চিত্ত দর্পণ স্বরূপ। শেষোক্ত বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষকে মনের উচ্চ অঙ্গ বলিলে ভাল হয়। সঙ্করাচার্য্য “মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমান” শ্লোকে যে দর্পণের কথা বলিয়াছেন, উহা শেষোক্ত চিত্ত-দর্পণ।

## সামবেদীয়া
# কেনোপনিষৎ।
### প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ মূলম্ ]

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। ১
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্
বাচো হবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥ ২
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি
নবাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতা
দথো অবিদিতা দধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং
যেনস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩
যদ্ বাচা নভ্যুদিতং
যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৪
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি
যেন চক্ষূংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৬
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৭
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি
যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৮ ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ অনুবাদ ]

শিষ্য। প্রেরিত হইয়া কাঁহা কর্তৃক মানস
যায় নিজ বিষয়েতে? কার নিয়োজনে
প্রথম স্বরূপ প্রাণ হয় অগ্রসর?
কাহার ইচ্ছায় লোকে বাক্য উচ্চারয়?
কোন্ দেবতা বা চক্ষু কর্ণে নিয়োজয়? ১

আচার্য্য।
শ্রোত্রেরও শ্রোত্র তিনি, মনের ও মনঃ
বাক্যেরও বাক্য তিনি প্রাণের ও প্রাণ।
চক্ষুরও চক্ষু তিনি; এই জ্ঞানে ত্যজি
শ্রোত্রাদিতে আত্ম বোধ, সব ধীরগণ
এলোক হইতে যেয়ে লভে অমরণ। ২
চক্ষু কিম্বা বাক্যমন-গম্য তিনি নন;
জানি না তাঁহারে; পুনঃ তাঁর উপদেশ
কিরূপে অন্যেরে দেয় তাহাও না জানি।
"জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হ'তে ভিন্ন তিনি হন"
এরূপ কহেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ
যাঁহাদের উপদেশ করেছি শ্রবণ। ৩
নাহি হন প্রকাশিত বাক্যে যেই জন
কিন্তু বাক্য প্রকাশিত যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৪
না পারে করিতে যাঁরে মনেতে মনন
কিন্তু মন চিন্তা করে যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৫
না পারে করিতে যারে চক্ষুতে দর্শন
চক্ষের দর্শন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৬
নাহি পারে কর্ণে যাঁরে করিতে শ্রবণ
কর্ণের শ্রবণশক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৭
না পারে করিতে যাঁরে প্রাণেতে প্রাণন
প্রাণের প্রাণন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাঁহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৮

শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।)

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

## জাতিভেদ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—•:০:•—

### ৩। ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত-শ্লোক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়ন অল্প দিনে হয় নাই। ঋগ্বেদ-প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা মৎস্য পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারাই ঋক্ সমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।*

"ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশমমণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা অনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমদ। এই গৃৎসমদ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয়-মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ-মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব; পঞ্চম-মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি; ষষ্ঠ-মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ; সপ্তম-মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ; অষ্টম-মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম-মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত; ১০ম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।"†

যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা যেন সেই মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন। এই সূক্ত হইতেই তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, মানু-

* মৎস্যপুরাণ। ১:২ অধ্যায়।

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

জিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত: নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্তর্গত অংশ।

অনেকেই অবগত আছেন যে, অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদের তুলনায় তত প্রাচীন নহে। এই অথর্ব্ববেদে রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে রচিত অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিয়াছেন:—"আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—"যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষ ভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্যচর্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন; কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত—আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল। পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত।

এই সকল হইতেই বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থে—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহ কর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দীকাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্ব প্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষার বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিলনা—সেই প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। প্রথমতঃ শ্লোকগুলি শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিবার পর হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্য বশতঃ বা নিয়ত আবৃত্তি না থাকিবার জন্য তাহাদিগের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর, তিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি); এবং তিনি, যখন যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া তাহা সেই ঋগ্বেদের যুগের প্রাচীন [illegible] রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নবরচিত-

শ্লোক সমূহে নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব, অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষাও ভাব সেই হৃদয়ের অবিকৃত চিত্র।

আমরা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গ্রামে গ্রামে জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ লবণাম্বুরাশিবৎ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষমূলর, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোলব্রুক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আর তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু এবং মুয়ার সাহেবের মত ও ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' এই বিষয়ের একবার আলোচনাও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কেবল ভারতবর্ষে কেন, পাশ্চাত্য দেশেও এরূপ ঘটনা দুর্ল্লভ নহে। একবার খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকেও নাকি উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! তাহারই সমালোচনায় Distaeli সাহেব বলিতেছেন:—

"He (Sebastian castillion) said he could give the world a more classical version of the Bible and for this purpose introduces phrases and entire sentences from profane writers into the text of the holy writ. His whole style is finically quaint, overloaded with prettinesses and all the ornaments of false tastes. Of noble simplicity of the scripture he seems to have not had the remotest conception."* বলা বাহুল্য যে ফরাসি লেখক Pere Berrenyer ও একবার এই প্রকার উদ্যম করিয়াছিলেন, Disraili সাহেব তাঁহারও সমালোচনা করিয়াছেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজীরের শক্তি কিছু নাই—আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি।।

৪। পুরুষ সূক্তের ছায়া।†

ঋগ্বেদে চতুর্ব্বর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থূলতঃ তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দুর গ্রন্থ একখানি নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি মন্থন করিলে আরও অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে।

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৩১'

* "Curiosities of Literature"—Disraeli; Vol II.

† "In the Rigveda the caste system of later times is wholly unknow."
Elphinstone's History of India—Appendix VIII; p. 285.

শ্লোক পুরুষ সূক্তাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ-
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ং॥"

অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর লোক বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ-মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।" কিন্তু মনুসংহিতার তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য শ্লোক সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত ৩১ শ্লোকের সহিত তাহাদিগের সামঞ্জস্য নাই। বরং মুখ্য লিখিত ধর্মগ্রন্থের মানবসৃষ্টি প্রকরণের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত মানব-সৃষ্টি প্রকরণের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজসনেয় সংহিতা (৩১। ১৬) এবং অথর্ব্ববেদেও (১৯।৬।৬) আমরা এই পুরুষ সূক্তের ছায়া দেখিতে পাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় "পুরুষসূক্ত" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে "বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্র শিরা পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্ণবর্ণ-শূদ্র তাঁহার পদ।" অন্যত্র—

"বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মচার লক্ষণাঃ॥"*

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাইঃ—

"সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
... ... ... ... ... ... ...
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥
যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চতুর্ব্বর্ণাং মহাভাগ যজ্ঞ-সাধন মুত্তমম্॥"†

মহাভারতেও যে এই পুরুষসূক্তের আভাস আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।*

"বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বাবিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ"

প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানিতে পাইতেছি যে, হারিত সংহিতাতেও পুরুষসূক্তের ছায়া আছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে এমন আরও অনেক শ্লোক আছে, যাহা পুরুষ-সূক্তাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

কিন্তু ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তও যে প্রক্ষিপ্ত মধ্যে গণ্য, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই পুরুষসূক্তের ছায়া লইয়া পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকও জাতিভেদের প্রাচীনত্ব সমর্থন করিতে নিতান্ত অক্ষম। পুরুষসূক্ত আলোক—পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের রচিত শ্লোক তাহার ছায়া মাত্র। যদি আলোকই না থাকিল, তবে ছায়ার অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে?

## তৃতীয় অধ্যায়।

### প্রাচীন আর্য্যসমাজের জাতিগত পার্থক্য।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহার প্রমাণ

* শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ১৭। ১১
† শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ৫। ২

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।
† বিষ্ণুপুরাণ। ১। ৬

নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব, কারণ আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা অনেক দিনই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(১) "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥"*

অর্থাৎ বর্ণ-ভেদ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের প্রথা জাতিগত বা জন্মগত নহে—ইহা কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃই অভ্যুদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল পাঠ করিলেও কেবল "আর্য্য" ও "দস্যু" এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পূর্ব্বে একমাত্র জাতিই বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইতেই ক্ষত্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।"*

অর্থাৎ—অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।

বর্ত্তমান শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারাই বেদ বা স্মৃতির সামান্যও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে 'ব্রাহ্মণ' অর্থে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনিই ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাই "ব্রাহ্মণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে "ব্রহ্ম" শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হই থাকে যথা—

| | |
|---|---|
| ১। ঈশ্বর। | ৪। দেব। |
| ২। ব্রাহ্মণ জাতি | ৫। তপঃ। |
| ৩। বেদ মন্ত্র। | ৬। ব্রহ্মতেজ। |

ইত্যাদি।

ঋক্‌সংহিতায় ১।৮০।১; ১।১৬৪।৩৫; ২।৩৯।১; ২।১২।৬; ৫।১০।৮; ৯।১১৩।৬ প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তোতা বা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"উপরোক্ত ঋক্ সংহিতার প্রমাণ দ্বারা বোধ হইবে, যাঁহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষিগণই বেদ মন্ত্রের প্রকাশক ও স্তোতা, কাজেই ঋষি বা ঋষিপুত্রগণই ব্রাহ্মণ পদলাভ করেন। যখন নির্ম্মল চেতা আর্য্য ঋষিগণ শীতপ্রধান হিমালয় প্রদেশে সাত্ত্বিক ভাবে বনবাস করিতেন, যখন তাঁহাদের উপাস্য বা আরাধ্য দেবগণের স্তোত্র উচ্চারণই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল, যখন

---

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব। শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ এবং ১৮৯ অধ্যায়ে বর্ণভেদের আলোচনা আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। "ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

শাস্তাভিশযো তাঁহাদের শ্বেত-মূর্তি বিকৃত ভাব ধারণ করে নাই, যখন তাঁহাদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের জন্য শ্রেণীবিভাগরূপ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যে সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্তী অসভ্য বর্ব্বরদিগকে মানব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, সেই অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সম্ভবতঃ কেবল ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন ... ... ...।"*

বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। মনু বলিয়াছেন:—

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠ্যাৎ ব্রাহ্মণ শ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ—উত্তমাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদ মন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন, ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে..." প্রভৃতি শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি করা অসঙ্গত নহে।

(৩) "একএব পুরাবেদ প্রণব সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনাঙ্গ একাগ্নি বর্ণ এবচ॥*

(৪) "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥†"

(৫) "এক বর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।*
ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, গুণানুসারেও আবার বর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। এমন কি, গুণের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর লোকও উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিত।

(৬) যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন—যিনি ধর্ম্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিই আবার বলিতেছেন:—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥*

(৭) শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:—

নজাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা
ন শূদ্রো নচ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ।†

(৮) তিনিই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—,

জ্ঞান কর্ম্মোপাসনাভি দেবতারাধনে রতঃ
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ।†

(৯) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।*

(১০) ভট্ট মোক্ষমূলের ধূর্ত্ত বর্ণ সূত্র ঘটনে আমরা দেখিতে পাই:—

* বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"।
* শ্রীমদ্ভাগবত।
† পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড-২৫
* মহাভারত।
* মনু, ১০। ৬৫
† শুক্রনীতি।
* ভগবদ্গীতা।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।"

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি কঠিন বিধি বিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(১১) শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহ বর্ণনার পর আমরা দেখিতে পাই :—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ—"যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, অন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে।"

(১২) আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ সন্তান নহেন—ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তিনি স্বীয় তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"Gayatri itself, the most sacred symbol in the universe, is a verse in a hymn by an author not a Brahman by birth, but a Kshatriya, who is represented in later legends as extorting his admission into the Brahman caste"......*

(১১) "করূষাৎ মানবাৎ আসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ॥†"

মনুর পুত্র করূষ হইতে কারূষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারা ক্ষত্রজাতীয়। ইহারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল।

(১২) পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ। ... হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং ... জনমেজয়। শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নঃ॥*

পৃষধ্র রাজা গুরুর গো হত্যা করিয়া শাপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৩) "নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ-দ্বৌ-বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"* নাভাগারিষ্ট পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৪) ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্ম-তন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন †

(১৫) গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।*

(১৬) দুরিত ক্ষয়ের তিনটী পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।*

* Exphinstones Histroy of India—p. 282.

† শ্রীমদ্ভাগবত। ৯। ২

হরিবংশ। ... অধ্যায়।

* হরিবংশ। ...

* শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২। ...

* শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১। ...

(১৭) অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাতিথি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।*

(১৮) কক্ষিবান বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত।

(১৯) কবষ ঐলূষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। যে শূদ্রের বেদ প্রণয়ন দূরে থাকুক বেদ পাঠ শ্রবণের অধিকারও ছিল না, বলিয়া বর্ণিত আছে সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা।* এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(২০) প্রধান প্রধান পুরাণ মতে বিতথের পঞ্চ পুত্র—সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র কাশক ও রাজা গৃৎসমিত। এই গৃৎসমিতের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন।

(২১) একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম।†

(২২) মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে :—"শূদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র।"

(২৩) পরশুরামের সাহায্যে যে কেরল দেশীয় ধীবরগণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন।*

(২৪) মৌদগল্য ও কাথায়ণ গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্র সম্ভূত হইয়াছিল।†

(২৫) কর্ম্মদ্বারাই যে সঙ্কীর্ণ বর্ণ প্রকৃতিও বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে বশিষ্ট, ব্যাস, শুক, মন্দপাল, কণাদ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। ইঁহাদিগের মাতাগণ সকলেই নীচ জাতীয়—শূদ্র কুল সমুৎপন্না।

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্য জাতীয়—তাহার নাম উলকী। এই জন্যই কণাদ দর্শনের অপর নাম ঔলক্য দর্শন। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রী হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ রমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা। সত্যবতী পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করেন, তিনিই ক্ষমতা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানির গর্ভে

* ঐতরেয় এবং কৌষতকী ব্রাহ্মণ

† শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* স্কন্দপুরাণ

† শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১

যে দুইটী সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারত-বিখ্যাত-ক্ষত্রিয়-বংশের আদি পুরুষ।

(২৬) মনু তাঁহার গ্রন্থে সংকীর্ণ-বর্ণের উৎপত্তি অতিশয় বিকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনার শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—

"সঙ্কর জাতয় স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥*

অর্থাৎ—পিতা মাতার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সকল জাতি বলিলাম, যাহাদিগের পিতা মাতার নাম জানা যায় না, এরূপ গূঢ় কিম্বা প্রকাশ্য বর্ণের কর্ম্ম দ্বারা জাতির নির্ণয় করিবে।"

(২৭) আমরা মন্বাদি গ্রন্থ হইতে এতক্ষণ যাহা দেখাইতেছিলাম, ঋগ্বেদেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ঋগ্বেদে সরল ভাবে একজন ঋষি বলিতেছেনঃ—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। সেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ-কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন-কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

তাই রমেশ বাবু বলিতেছেন—"যাঁহারা বৈদিক-সময়ে জাতিভেদ-প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, এই পরিবারের পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য, এবং মাতা ময়দা ওয়ালী, তাঁহারা কোন্ জাতি ভুক্ত?"

(২৮) "ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ দৃষ্ট্বা সিদ্ধিস্ত কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যাথ্যেষধাঃ কৃষ্টপচ্যাস্ত জজ্ঞিরে।"*

ইত্যাদি

"ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভু তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগ্রহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয় নির্ভর করিয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকতুঃখ পরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।"

(২৯) "বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, কৃতযুগে বা সত্যযুগে অর্থাৎ বৈদিক-যুগে বর্ণভেদ ছিল না। পরে গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ব্রহ্মা বর্ণভেদ সৃষ্টি করেন। যাহাদের আদেশে সকলে চলিত, এবং যাঁহারা সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন, অপরকে রক্ষা করিতে পারিতেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করিলেন। যে সকল সত্যবাদী,

* মনু, ১০।৪০

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পূর্ব্বভাগ ।৮।১৫৪-১৬০ মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদাধ্যায়ী, নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের সহচর ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন। যে সকল দুর্বল ব্যক্তি কৃষি ও বাণিজ্যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা বৈশ্য হইল। যে সকল দুর্বল ব্যক্তিরা পরসেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহারা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল।"*

(৩০) "রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৭৪ম সর্গে লিখিত আছে 'কৃতযুগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিতেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়।' ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যেরা এক জাতি ভুক্ত ছিলেন, এবং সকলেরই আচার ব্যবহার একরূপ ছিল। দ্বিতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যেরা পৌরহিত্য ও রাজ্য শাসন কার্য্যে একাধিকার লাভ করিয়া আপনাদিগকে সাধারণ লোক হইতে, স্বতন্ত্র জাতিরূপে বন্ধনের চেষ্টা করেন।"*

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি এ।

(ক্রমশঃ)

---

# আহার।

## (পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যাহা হউক, পূর্ব্বেও এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ঋষিরা এত শপথ-বাক্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কোন একটী কার্য্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই সকল শপথ-বাক্যের দিকে চাহিলে আমাদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে—মনে হয়, বুঝি এ সমস্তই দেবতার নিষ্ঠুর অভিসম্পাত। আমরা আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। মন্ত্রবদ্ধ সর্পের মত আমাদিগের উন্নত গর্ব্ব-স্ফীত-মস্তক ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করে। এই সকল শপথ বাক্যও আবার এমন যে, তাহাদিগের অধিকাংশ ফলাফলেই মৃত্যুর পর সেই অন্ধকার অজ্ঞাত রাজ্যে গিয়া ভোগ করিতে হইবে—এজন্মে নহে। মৃত্যুর পর কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু মৃত্যুর পর জন্মান্তর বিশ্বাস করে—পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে, স্বর্গ বিশ্বাস করে—নরকও বিশ্বাস করে; সুতরাং পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মও তাহার নিকট প্রহেলিকাপূর্ণ-কল্পনা নহে—সরল সত্য। তাই সেই ভাবী জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিয়াই আর হিন্দু শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করে না।

যদি আজ আমরা বঙ্গ কুলললনাদিগকে বুঝাইতে চাহি যে, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে বলাদি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাতুল মনে করিবেন আর বলিবেন যে—"কৈ রোগ হয় না, অর্থ হানি হয়"। শত সহস্র চেষ্টা করিয়া লক্ষ লক্ষ যুক্তি দেখাইলেও তাহারা তাহা বুঝিবেন না—অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না এবং বিশ্বাসও করিবেন না। যখন এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও রমণী ছিল—তখনও তাহারাই সংসারের গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিত—তখনও তাহারা এই রূপেই বিশ্বাস করিত।

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

কেবল স্ত্রীলোক কেন, সাধারণ লোকেরও একরূপই বিশ্বাস যে, তিথি বিশেষে পটোল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি হয়, মূলা ভক্ষণে ধন-হানি হয়, ইত্যাদি। কুষ্মাণ্ড, মূলা প্রভৃতি তিথি বিশেষে ভক্ষণ না করা সম্বন্ধে ইহাই তাহাদিগের যুক্তি; আর এই সকল শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিলে পাছে প্রকৃতই ধনহানি বা পুত্রহানি হয়, এই জন্যই তিথি বিশেষে হিন্দু পটোল খায় না, বেগুণ খায় না, লাউ খায় না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই সকল শপথ-বাক্য বা শাসনের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে।

| নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম। | তিথির নাম। | উক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কি ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। | শপথ-বাক্য। |
|---|---|---|---|
| পূতিকা | দ্বাদশী | যক্ষাকাশ। | ব্রহ্মবধ তুল্য পাপ। |
| অলাবু | নবমী | বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া। | গোমাংস বৎ। |
| কলম্বী | দশমী | অম্লপিত্ত। | গোবধ তুল্য পাপ। |
| বৃহতী | দ্বিতীয়া | অর্ব্বুদ রোগ। | হরিস্মরণে অযোগ্য |
| মাংস | অমাবস্যা ও পূর্ণিমা | শোণিত পীড়া। | মহাপাপ। |
| নিম্বুক | ষষ্ঠী | জলব্যাধি (কোষবৃদ্ধি, গণ্ডমালা প্রভৃতি)। | পশুযোনি প্রাপ্ত হওয়া |
| বার্ত্তাকী | ত্রয়োদশী | কণ্ডুরোগ। | সুতহানি। |
| মাষকলায় | চতুর্দ্দশী | অতিসারাদি উদরাময়। | চিররোগী। |
| শিম্বী | একাদশী | জ্বর। | পাপকারী। |
| নারিকেল | অষ্টমী | অজীর্ণ। | মূর্খতা। |
| তাল | সপ্তমী | রক্তপিত্ত। | শরীর নাশ। |
| বিল্ব | পঞ্চমী | পিত্ত সম্বন্ধীয় পীড়া। | কলঙ্ক। |
| মূলক | চতুর্থী | আমব্যাধি | ধনহানি। |
| পটোল | তৃতীয়া | রক্তবাত. | বহুশত্রু। |
| কুষ্মাণ্ড | প্রতিপদ | নুণাদিক্লেদ রোগ। | অর্থহানি। |

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যে স্থানেই কোন কঠিন পীড়া হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থানেই শপথ বাক্যও তত গুরুতর। দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মাকাস হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মাকাস যে কি ভয়ানক ব্যাধি, তাহা আর বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তাই যাহাতে, আর্য্য-হিন্দু দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ না করে, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, দ্বাদশীতে পূতিকা ভোজনে ব্রহ্মবধ তুল্য পাপ হয়। হিন্দুমাত্রই এই কথা জানিলে শিহরিয়া উঠিবে। পূতিকা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, কেহ পূতিকার আঘ্রাণ পর্য্যন্তও লইবে না। নবমীতে অলাবু ভক্ষণে বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। তাই শপথ বাক্য আছে, অলাবু ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণ করা হইবে। ইহা শুনিয়া কোন্ হিন্দু নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইবে?

সকল তিথি সম্বন্ধেই এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে স্থানেই ব্যাধির কাঠিন্য, সেই স্থানেই শপথ-বাক্যও তত গুরুতর, আর যে স্থানে ব্যাধি তত কঠিন বা মারাত্মক নহে, সেই স্থানে শপথ বাক্যও তত গুরুতর নহে।

তবে "মূর্খতা" "শরীর-নাশ" বা "চির-রোগী" এই তিনটী শপথ বাক্য সম্বন্ধে অল্প কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে অজীর্ণ-রোগ জন্মে। অজীর্ণ-রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলেই অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে। ধারণা শক্তি কমিয়া যায়, চিন্তা করিবার ক্ষমতা যেমন থাকে না, ইহাকেই মূর্খতা বলা যাইতে পারে।

সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে রক্তপিত্ত ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। এই ব্যাধি হইলে ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় হইতে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুকে ডাকিয়া লইয়া আইসে। ইহাইত শরীর নাশ।

চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। পাকস্থলীর এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিলেইত ধীরে ধীরে সকল প্রকার ব্যাধিই জন্মিতে পারে। যাহাই ভোজন করা যায়, তাহাই যদি জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে শরীর সুস্থ এবং সবল হইতে পারে না, সেই ভুক্ত সামগ্রী শরীরের আরও প্রভূত অনিষ্ট ঘটায়, সেই জন্যই ব্যাধিও ছাড়িতে চাহে না, ভাঙ্গা শরীরে বাসা বাঁধে।

যে সকল শপথ-বাক্য প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, কয়েকটী মাত্র ভিন্ন তাহাদিগের ভিতর অধিকাংশ হিন্দু আর্য্যের নিকট বড় গুরুতর—বড় ভয়ঙ্কর। হিন্দু জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে—ধর্ম্ম দিতে পারে না, আহারের লোভে ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বড়ই ব্যাকুল। তাই এই শপথ-বাক্য লঙ্ঘন করিতে হিন্দু আর্য্য অশক্ত, শপথ মানিয়া চলিলেই শাস্ত্র নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ব্যবহার করাও হয় না। তাহা হইলেই শাস্ত্রকারদিগেরও উদ্দেশ্য সফল হইল। তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য—লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা, সমাজের মঙ্গল বিধান। হিন্দু-শপথ বাক্য লঙ্ঘন না করিলেই—এতদুভয় উদ্দেশ্যই সফল হইল, সকল দিক বজায় রহিল।

ইহা ভিন্ন শপথ বাক্যগুলির যে কোন বিশ্বাস সার্থকতা আছে, তাহা আমার বোধ হয় না, যদি প্রত্যেক দ্রব্য সম্বন্ধেই একই রকম শপথবাক্য দেওয়া হইত, তাহা হইলে শপথবাক্যের মূল্য কমিয়া যাইত, লোকে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিত না, সেই জন্যই এত ভিন্ন ভিন্ন শপথ-বাক্যের অবতারণা। সাধারণ লোকে এই শপথবাক্যগুলিকেই, তিথিভেদে নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ভক্ষণ না করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু শপথবাক্যের উদ্দেশ্য কেবল লোকের মনে, সমাজের মনে, একটা ভীতি উৎপাদন করা এবং ভীতি উৎপাদন করিয়া অন্যায় বা অনিষ্টকর কার্য্য হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখা।

ধর্ম্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। মানবজীবন ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য এবং জ্ঞান লাভের জন্য। আত্মার উন্নতিই জীবন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠফল। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না। তাই শরীর রক্ষা ধর্ম্ম্য—তাই স্বাস্থ্য রক্ষা জীবনযজ্ঞানুষ্ঠানের একটী অতি মহৎ, অতি পবিত্র, অতি গুরুতর অঙ্গ। সেই জন্যই আহার বিহার সম্বন্ধে এত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যখন ভারতে মুসলমান শাসন ছিল—যখন মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন, তখনও তাঁহারা যে সকল রাজবিধি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার হেতুবাদ সংযুক্ত হইত না। "আবুল ফজেল" পাঠ করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

রাজার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবার যো নাই। "কেন ইহা করিব" তাহাও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই—ক্ষমতা নাই। তাই সকলে সকলবিধিই মানিয়া চলিত। মুসলমান রাজাগণ হেতুবাদ দিতেন না আবার মুসলমানের "কোরাণে," খ্রীষ্টানের "বাইবেল" যত কথা লিখিত রহিয়াছে, তাহাদিগের কোনটীর সহিতই হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান, "কোরাণকে" ভক্তির সহিত মস্তকের উপর স্থাপন করে—হেতু জিজ্ঞাসা করে না পূর্ব্বেও করিত না।

এখন ইংরাজ-রাজত্বে যে বিধিই প্রচলিত হইতেছে, তাহার সহিত হেতুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ আমাদিগের রাজা। "কেন অমুক রাজাজ্ঞা মানিয়া চলিব" এ কথা আমরা কহিতে পারি না। রাজ-আজ্ঞা সর্ব্বদাই প্রতিপাল্য, তাই আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়—তাই আমরা সকল বিধিই মাথায় করিয়া বহিয়া থাকি।

পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুর রাজত্ব ছিল—ব্রাহ্মণ শাসন ছিল। তখনও কেহ হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। তাই যে কোনরূপ বিধির প্রচলন করিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহার হেতুবাদ দিবার আবশ্যক হইত না। রাজার আজ্ঞা—ধর্ম্মের আজ্ঞা——দেবতার আজ্ঞা বলিয়া সকলে তাহা মানিয়া চলিত। যে অবজ্ঞা করিত, সে শাসিত হইত। সমাজ তখনকার শাসন কর্ত্তা ছিল—রাজা তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

ওঁ তৎসৎ

# অথর্ব্ববেদীয়া।

## মুণ্ডকোপনিষৎ।

( মূলম্ )

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥১
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩
প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬
বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৯
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে
প্রথম খণ্ডঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ১
কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥২
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতি ব্রহ্ম ধাম॥৪
সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥৫
বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।৬
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥৭
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥৮
স যো হবৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥৯
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্॥১০
তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরম ঋষিভ্যো
নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ॥১১
ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ
ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

---

(অনুবাদ)

তৃতীয় মুণ্ডক-প্রথম খণ্ড।

সতত একত্র স্থায়ী, সখ্যভাবাপন্ন
দুই পক্ষী এক বৃক্ষ করেছে আশ্রয়;
তাহাদের এক জন খায় মিষ্ট ফল
অন্যে অনশনে থাকি দেখয়ে কেবল।১
একই বৃক্ষে নিমগন হইয়া পুরুষ,
মুহ্যমান হ'য়ে থাকে হীনতা বশতঃ
করে শোক; কিন্তু যবে সাধক সেবিত
দেখে সে ঈশ্বরে, আর মহিমা তাঁহার
তখন তাহার শোক নাহি র'য় আর।২
দ্রষ্টা যবে, জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা ও ঈশ্বর,—
ব্রহ্ম যোনি পুরুষেরে করে বিলোকন,
পুণ্য পাপ দূর করি বিদ্বান্ তখন
পরম সমতা লাভ হ'য়ে নিরঞ্জন॥৩
প্রাণ তিনি, যিনি, সর্ব্বভূতে প্রতিভাত
তাঁহারে জানেন যিনি, সে বিদ্বান্ জন
নাহি হ'ন অতিবাদী; আত্মক্রীড় আর
আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ হ'ন সেই জন
ব্রহ্মবিদ্গণ মাঝে শ্রেষ্ঠ তিনি হ'ন॥৪
এই আত্মা লভ্য সত্য তপস্যার বলে,
সম্যক্ জ্ঞানেতে; নিত্য ব্রহ্মচর্য্যে পুনঃ।
তাঁহারে নেহারে ক্ষীণ-দোষ যতিগণ
কায় মধ্যে, যিনি জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র হ'ন॥৫
সত্যেরই জয়লাভ, না হয় মিথ্যার;
সেই পথে আপ্তকাম ঋষিগণ যা'ন
সেথা, যথা সত্যের সে পরম নিধান,
সত্যেই বিস্তৃত সেই পথ দেবযান॥৬

সে দিব্য অচিন্ত্যরূপ হয়েন বৃহৎ
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তিনি পুনরায় ;
দূরে—অতি দূরে—পুনঃ নিকটেও স্থিত
হেথাও দর্শক হৃদে আছেন নিহিত ॥৭
চক্ষু কিম্বা বাক্য গ্রাহ্য নাহি হ'ন তিনি ;
অন্য অন্য ইন্দ্রিয়েও গ্রাহ্য তিনি ন'ন
তপস্যা বা কর্ম্মলভ্য নহেন কখন ;
হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানের প্রসাদে
সে নিষ্কলে দেখা যায় ধ্যান যোগে শুধু ॥৮
এই সূক্ষ্ম আত্মা বেদ্য জ্ঞানেতে কেবল
পঞ্চধা— প্রবিষ্ট যথা রহিয়াছে প্রাণ ;
প্রাণেতেই প্রাণি সর্ব্ব চিত্ত ব্যাপ্ত রয়
সে চিত্ত বিশুদ্ধ হ'লে আত্মা প্রকাশয় ॥৯
শুদ্ধ সত্ত্ব জন যে যে লোক মনে মনে
চিন্তা করে ; চাহে পুনঃ কামনা যে সব ;
পায় সেই সেই লোক, সে সব কামনা
করিবে, ইহালোভাই আত্মজ্ঞ অর্চ্চে ॥১০

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক
প্রথম খণ্ড

তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।

সে পরম ধাম ব্রহ্মে, আত্মজ্ঞ পুরুষ
জানেন, যাঁহাতে বিশ্বনিহিত থাকিয়া
প্রতিভাত শুভ্ররূপে ; যে ধীমদ্গণ—
অকাম হইয়া তাঁর করে উপাসনা—
তারা শুক্র অতিক্রমে ; তবে জনমে না ॥১
যেই জন চিন্তা করে কামাবস্থ চয়,
সে সব কামনা সহ জনমে যেখন
সে কাম ভোগোপযোগী তিন্নং লোকে ;
যে জন পর্য্যাপ্ত কাম আত্মবিৎ আর
হেথাই সকল কাম বিলীন তাহার ॥২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র জ্ঞানে লভ্য নয়,
এ আত্মা আপনি যারে করেন বরণ—
সে লভে ইঁহারে, ইনি সমীপে তাহার,
প্রকাশ করেন নিজে স্বরূপ আপনার ॥৩
বলহীন জন লভ্য নহে আত্মা এই,—
প্রমাদে বা অসন্ন্যাস জ্ঞানে লভ্য নয়।
এ সব উপায়ে যত্ন করে যে বিদ্বান
প্রবেশ করয়ে তার আত্মা ব্রহ্ম ধাম ॥৪
ইঁহারে পাইয়া জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণ
কৃত কৃত্য, বীতরাগ, প্রশান্ত হৃদয় ;
যুক্তাত্মা সে ধীরগণ সে সর্ব্বগামীরে
সর্ব্বতঃ পাইয়া তাহে করেন প্রবেশ ॥৫
বেদান্ত-বিজ্ঞান-অর্থে সুনিশ্চিত করি,
সন্ন্যাস যোগেতে শুদ্ধ সত্ত্ব যোগিগণ,—
লভিয়ে পরমামৃতে, পরমান্ত কালে,
সম্যক্ রূপেতে মুক্ত হয়েন সকলে ॥৬
পঞ্চদশ কলা যায় কারণে তাদের,
সকল ইন্দ্রিয় যায় নিজ নিজ দেবে ;
সমুদয় কর্ম্ম, আর আত্মা জ্ঞানময়,
সে শ্রেষ্ঠ অব্যয় সহ একীভূত হয় ॥৭
বহমান্ নদীচয় স্ব স্ব নাম রূপ—
ত্যজিয়া, সমুদ্রে যথা যায় মিশাইয়া,
তথা নামরূপ হ'তে বিমুক্ত বিদ্বান্
পরাৎপর পুরুষেতে যায় মিশাইয়া ॥৮
যে জন জানেন সেই পরম ব্রহ্মেরে
হয়েন ব্রহ্মই তিনি ; কুলেতে তাঁহার
ব্রহ্মজ্ঞান হীন কেহ নাহি হয় আর ;
হয়ে শোক পাপোত্তীর্ণ, হইয়া বিমুক্ত
হৃদয়ের গ্রন্থি হ'তে হয়েন অমৃত ॥৯
প্রকাশিত ঋকে ইহা——
ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ যাঁরা
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে নিজে করেন প্রদান
অগ্নিতে আহুতি ; আর বিধি অনুসারে

করেন যাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান,
তাঁহাদিগে ব্রহ্ম-বিদ্যা করিবে প্রদান ॥১০
এ সত্য, অঙ্গিরা ঋষি ক'ন পুরাকালে
এই গ্রন্থ পড়িবেনা কভু সেই জন,
করে নাই যেই জন ব্রত আচরণ,—
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার।
সে পরম ঋষিগণে করি নমস্কার ॥১১

ইতি তৃতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত—

শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।
বাবৈখালী (যশোহর)

---

# বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

## (বর্ণ ও জাতি শব্দ।)

বেদাদি প্রাচীন ও পুরাণাদি পরাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণ ও জাতি এই উভয় শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় পুস্তকের পর্য্যালোচনায় প্রতীত হয়, এই শব্দদ্বয় একার্থক। শব্দের প্রকৃতিগত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে ইহাদের অর্থ অভিন্ন, রূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। দৃষ্টান্ত স্বরূপে সিত, অসিত, লোহিত, পীত ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বর্ণ কোনও সময়ে সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগের কারণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্নবর্ণবিশিষ্টব্যক্তিগণ বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে, তাহা দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, বর্ণ-ভেদই তাৎকালিক শ্রেণীবিভাগের কারণ। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥৫॥

ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়ের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ ও শূদ্রের বর্ণ কৃষ্ণ। সুতরাং শারীরিক-বর্ণানুসারে যে কোনও কালে ব্রাহ্মণাদি বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল, বর্ণ শব্দের অর্থ শরীরের রঙ্।

অতঃপর জাতি শব্দ। জাতি শব্দ "জন" ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈয়াকরণ পদ্ধতি পরিত্যাগ না করিলে, জাতি বলা মাত্রই যেন জন্মের সহিত ইহার সম্পর্ক সমধিক সন্নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। জাতি শব্দে বিভিন্নভাবাপন্ন দার্শনিক মহোদয়েরা বিভিন্ন বস্তু বুঝিয়াছিলেন, সকল অর্থের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলেও, উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল কয়টী মত এ প্রসঙ্গে অল্লাধিক আলোচিত হইলে অসঙ্গত হইবে না, এই আশায় আবশ্যকীয় মতবাদ বিচার করা যাউক।

শব্দশাস্ত্রের পারদর্শনকারী প্রাচীন বৈয়াকরণকুল বলিতেন, "আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ।" তাঁহাদের লক্ষণ আরও বিস্তৃত, আমরা আবশ্যকানুরোধে এই অংশের আলোচনা করিব।

আকৃত্যা গ্রহণং যস্যাঃসা আকৃতিগ্রহণা, এইরূপ তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন। আকৃতির দ্বারা যাহার গ্রহণ অর্থাৎ প্রতীতি হয়, তাহাই জাতি। মনুষ্যাকৃতি দর্শন মাত্রেই ইহা মনুষ্য জাতি বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

আকার প্রকারের বিভিন্নতায় মানব জাতি গবাদি জাতি হইতে পৃথক্। তজ্জাতীয় আকৃতি দর্শনেই আমরা তজ্জাতির জ্ঞান লাভ করি। শাস্ত্রীয়-জাতিশব্দ বুঝিতে এই লক্ষণের আবশ্যকতা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। দার্শনিক সম্প্রদায় সমস্বরে ঘোষণা করেন, "মীমাংসকগণ জাতি শক্তিবাদী"। মীমাংসক গুরু আচার্য্য-চূড়ামণি মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন,—"আকৃতিঃ শব্দার্থঃ"। ইহাদ্বারা অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, আকৃতির সহিত জাতির সম্বন্ধ নিকট।

মীমাংসাদর্শনের প্রথমাধ্যায়চতুর্থপাদ-চতুর্বিংশতিতম সূত্র —"জাতিঃ"। ভাষ্যকার পরমপূজনীয় প্রজ্ঞাপুঞ্জ শবরস্বামী কণ্ঠতঃ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন "অগ্নি ব্রাহ্মণয়োরেকা জাতিঃ"। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের জাতি এক, এই কথা প্রতিপাদন প্রয়াসে তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল, এতৎপ্রমাণক একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সেই বাক্যের বিচার করিব। আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ, এই শ্রুতি বাক্যে আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণের স্তুতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত, ইহাই ঐ অধিকরণের রহস্য। আগ্নেয় শব্দ ব্রাহ্মণ-স্তুতি বুঝাইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ সূত্রে দেওয়া যাইতেছে। অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এক স্থানে, সুতরাং এক অপরের স্তাবক হইতে পারে। বস্তুতঃ এই সূত্রে ভাষ্যের আশয় যে, জাতি অর্থ জন্ম।

বেদবাক্য বিচারধুরীণ অশেষধিষণ আচার্য্য সায়ণ মাধব ও ন্যায়মালায় ঐ অধিকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া "অগ্নিব্রাহ্মণয়োর্মুখজন্যত্বং কস্মিংশ্চিদর্থবাদে সমাম্নায়তে" লিখিয়াছেন। তৎপরে ভাষ্যোদ্ধৃত অর্থবাদ বাক্যটীরও বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতেও ঐ সূত্রে জাতি অর্থে জন্মই বিবেচিত হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আমরা জাতি অর্থাৎ জন্মানুসারে সমাজের যে শ্রেণী-বিভাগ সমর্থিত হইয়াছিল, তাহাই জাতিভেদ বুঝিয়া রাখি। শব্দ শাস্ত্রের সাহায্য এইস্থলে বিশ্রাম লাভ করিল, অতঃপর আমরা বেদাদি শাস্ত্রের ভূয় আলোচনায় "শাস্ত্রীয় জাতিভেদ কি?" বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

( শাস্ত্রীয়-বর্ণভেদ )

জাতি শব্দ যৌগিক কি রূঢ়, তাহা বিচার করিবার অবসর আপাততঃ উপস্থিত হইয়াছে। যদি আমরা ব্রাহ্মণাদি জাতির জাতিতত্ত্ব জন্মের সহিত সংসৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতে পারি, তবে ঐ শব্দ যৌগিক শব্দ, ইহা সঙ্গত হইবে না। শব্দ শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এ প্রসঙ্গে অসম্ভব, সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে হইবে, যৌগিক শব্দের যোগার্থ চিরদিনই সমান, উহার প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ আবহমানকাল একভাবে চলিতেছে। রূঢ় শব্দের অর্থে একটু বিশেষত্ব আছে। যে গুণ বা ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদ্য পদার্থে রূঢ়শব্দ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইত, পরবর্ত্তী কালে সেই গুণ ক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় না বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য পদার্থে পূর্ব্বকার মত প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ব্যুৎপত্তি উহার মধ্যে আছে, আপাতত গৃহীত হয় না, এই জন্য নাম 'রূঢ়'। প্রত্যুত কোনও শব্দ ব্যুৎপত্তি শূন্য ভাবে কোনও বুদ্ধি

ব্যবহৃত হইত না, বা হয় না। জাতি শব্দ যৌগিক। বেদে এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদির জন্মের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি অর্থাৎ জন্ম বিভিন্ন, সুতরাং ইহারা ভিন্নজাতি। মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন দেখা যায়।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥৪

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য ভূত সঙ্ঘের বর্ণ সকল ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানারূপ লিখিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে সকলগুলির অল্লাধিক অনুশীলন করিব।

যজুর্ব্বেদ সংহিতার সপ্তমকাণ্ডে দেখা যাইতেছে। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ-সৃজেয়মিতি, স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতা অন্বসৃজ্যত, গায়ত্রীছন্দঃ, রথন্তরংসাম, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং অজঃপশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যাঃ মুখতোহি অসৃজ্যন্ত। উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত, তং ইন্দ্রো দেবতা অন্বসৃজ্যত। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যানাং অবিঃপশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তঃ বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত। উরুভ্যাং মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত, তং বিশ্বদেবা দেবতা অসৃজ্যন্ত, জগতীচ্ছন্দঃ বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যানাং গাবঃ পশূনাং ইত্যাদি। "প্রজা সৃজন করিব" মনে করিয়া প্রজাপতি মুখ হইতে ত্রিবৃৎস্তুম, অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, রথন্তর সাম, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ ও পশুর মধ্যে অজ এই গুলি নির্ম্মাণ করিলেন; এই অর্থবাদ বাক্যে উরু হইতে বৈশ্য ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদির ও উৎপত্তি কীর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। এই উৎপত্তিবাক্য অর্থবাদ, সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য বিশেষ বিবেচ্য; কিন্তু বেদশাস্ত্রে এই ভিন্ন প্রকার ভিন্ন স্থান হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তিত হওয়ায়, উহাদের জাতি অর্থাৎ জন্ম ভিন্ন, ঈদৃশ অভিপ্রায়েই প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণাদি ভিন্নজাতি বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ঐ শব্দে যাহাই কেন বুঝি না; প্রাচীন প্রতীতি ঐ প্রকার ছিল, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে "মুখং কিমস্যকৌ বাহূ?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽ জায়ত।" এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী ও পূর্ব্বতনটীকাকারগণ ঐ মন্ত্রে ও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম বুঝিয়াছিলেন। "মুখং কিমস্য" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, "প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে।" ইহা হইতে প্রতীত হয় সায়ণ ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উৎপত্তিই বুঝিয়াছেন। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং আসীৎ" এই টুকুর ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন "ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতি-বিশিষ্টপুরুষো মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্নঃ" ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বেলায় ও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের (অর্থবাদের) সহিত এক বাক্যতা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থ

উত্তর, উভয়ই ঐরূপে ব্যাখ্যা করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ মূলে "ব্যকল্পয়ন্" পদ আছে, তাহা দ্বারা কল্পনা করার কথাই বুঝা সঙ্গত। "মুখং কিং?" অর্থ "মুখ কি?" ভাষ্যকারের মতে "মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কি?" এরূপ শত শত নূতন অর্থ ভাষ্যকার শুনাইয়াছেন। "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই অংশের দিকে নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়াই ইঁহাদের এরূপ মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল," এই চতুর্থ পাদ এখানে বড় বিপজ্জনক ও ভ্রান্তি-নিদান। বাক্যশেষের অনুরোধে সকল স্থানে অন্যার্থ করা অপেক্ষা "বহূনাং অনুগ্রহো ন্যায়ঃ" এই ন্যায়ানুসারে "অজায়ত" পদের অন্যার্থ করাই সঙ্গত, এরূপ অনেক পণ্ডিতের অভিপ্রায়। এই সকল বাক্য অর্থবাদ। এই বাক্যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কথিত হইলেও তাহা দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে না। অর্থবাদ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পরে আলোচ্য। আপাতত বুঝা গেল, ভাষ্যকার সায়ণ-আচার্য্যের মতে ব্রহ্মার মুখ এবং বাহু প্রভৃতি ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন জাতি অর্থাৎ জন্ম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে ঐরূপ দেখা যায়। "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। উর্ব্বো বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত," ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু, ইঁহার উরু বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ শ্লোকে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ না বুঝিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। টীকাকার পরম-পণ্ডিত শ্রীধর স্বামী এই শ্লোক ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "বর্ণানাং তত উৎপত্তিং দর্শয়তি পুরুষস্যেতি" ৩৭ শ্লোকে মূলে আছে "যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।" মূলে কল্পনার কথা রহিল, টীকাকার পরার্দ্ধ অনুসারে পূর্ব্বার্দ্ধের 'উৎপত্তি'ই অর্থ করিয়াছেন। যাহাহউক, ঐ শ্লোকের যদি উৎপত্তিই অর্থ হয়, তাহাও অবসরে আন্দোলিত হইবে।

শ্রীধর স্বামী দ্বিতীয়স্কন্ধ ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি ঋক্ত্রয়স্যার্থঃ পূর্ব্বাধ্যায়ে এব দর্শিতঃ।" এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং পুরুষ সূক্তের অর্থ সায়ণাচার্য্যের মতই শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার সকলেই এমতের পোষক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে দেখিতে পাই, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টং উৎপাদিতং ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি শ্রুতেঃ।" চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির প্রমাণরূপে শঙ্করাচার্য্য ও পুরুষ সূক্তের "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। সায়ণাচার্য্য এবিষয়ে শঙ্করের সহিত একমত ই হইলেন।

মনুসংহিতায় "মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়োবহিঃ" এই শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে "মুখবাহূরু-পজ্জ" বলা হইয়াছে। মুখবাহূরুপদ্ভ্যঃ জায়ন্তে এই অর্থেই ঐরূপ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং প্রকারান্তরে মহর্ষি মনু ও ব্রাহ্মণ মুখজ অর্থাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন একথা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণান্তরে ও 'মুখতো

ব্রাহ্মণো মস্তে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট। উরুভ্যামুদ্ভুতো বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত।" ইত্যাদি প্রমাণ পাওয়া যায়। এতাবৎ বেদাদি পুরাণান্ত শাস্ত্রের সমালোচনায় বুঝা গেল, জাতি ভিন্ন হইবার তাৎপর্য্য জন্ম-বিভিন্নতা।

মন্বাদিসংহিতা শাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সে জাতি বৈচিত্রে জন্মবৈচিত্র একমাত্র কারণ-স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন।

লোকানাং তুবিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

লোক বৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি স্বীয় মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনু আরও বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং য পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারয়াম্।
ক্ষত্র শূদ্র বপুর্জন্তুরুগ্রোনামপ্রজায়তে॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তাচাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসুজায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
একান্তরেত্বানুলোমাদম্বষ্ঠোগ্রৌযথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যাপিজন্মনি॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতোনামজায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠ কন্যায়ামায়োগব্যাংতুধিগ্বণঃ॥
আয়োগবশ্চক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌক্ষত্রিয়াৎসূতএবতু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেপরেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যাভবতিপুক্কশঃ॥
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাং তু সবৈকুক্কুটকঃস্মৃতঃ।
ক্ষত্তুর্জ্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাকইতিকীর্ত্তিতঃ॥
বৈদেহকেনত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্ন বেণ উচ্যতে।
দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্॥
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতিবিনির্দ্দিশেৎ॥
ব্রাত্যাত্তুজায়তেবিপ্রাৎ পাপাত্মাভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ॥ [sic: printed] ঝল্লমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রসাত্বত এবচ।
সূতো বৈদেহিকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এবচ॥

হারীতসংহিতায় দেখা যায়—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়াঞ্জায়ত,
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যশূদ্রাস্তু মাহিষ্যোগ্রৌতু তৌ স্মৃতৌ।
শূদ্রাং বৈশ্যাত্তু করণ এত এবানুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্বৈদেহিক স্তথা
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যা ক্ষত্তাস্তু শূদ্রতঃ
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যোজনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যান্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে,
অসৎ সন্ততয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতি লোমজ বৈ জাতা গর্হিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে জাত্যুৎপত্তি প্রক্রিয়া যথা—
শূদ্রায়াং বৈশ্যতোহভ্যেত্য করণো নামসঙ্করঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽপ গান্ধি-
কোবণিক্।
কাংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ॥
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাৎ তস্যাং বভূবতুঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূব ভূবঙ্গো মাগধো গোপ এব চ।
ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমো-
দকৌ॥
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রকন্যায়াং বারুজীবী বভূবহ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে॥
বৈশ্যাত্তু দ্বিজকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলিতৈ-
লিকৌ।
বিংশতি সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব॥
উত্তমা সঙ্করা এতে মধ্যমাধমে শৃণু।
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ।
বৈশ্যায়াং গোপতোজাত আভীরতৈলকারকৌ।
গোপাৎ শূদ্রাগর্ভজাতৌ দীবরশৌণ্ডিকৌ।
মালাকারাৎসম্ভূতো নটঃ শাবক এবচ॥
মাগধাদপি শূদ্রায়াং শেখরজালিকৌ।
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা অন্ত্যজানপি মেশৃণু॥
বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারান্ মলেগ্রাহিরজায়ত।
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈশ্যপত্ন্যাং বভূবহ॥
শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।
আভীরাদ্গোপকন্যায়াং বরুড় সমজায়ত॥
তক্ষোঽভূদ্বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ।
ঘটজী বীতুরজকাদ্বৈশ্যায়াং সংবভূবহ॥
বৈশ্যায়াঞ্চ তৈলকারা দোলবাহী বভূবহ।
ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মল্লজাতির্বভূবহ॥
ইত্যাদয়ো হ্যন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃতাঃ
ষট্‌ত্রিংশজ্জাতকর্ম্মাণি সাধিকাঃ কথিতাস্তব।

* * * *

দেবলাদ্গণকোজাতো বৈশ্যায়াং বাদকোঽ-
পিচ।
বেণস্যাঙ্গাত্তু সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোধরঃ,
পুলিন্দঃ পুক্কশ শ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা।
শুক্ষ কম্বোজশবরাঃ খরশ্চৈতাদয়ঃ সুতাঃ।
বিংশতি সংহিতাকারের অন্যতম উশনা জাতি
সম্বন্ধে বলিতেছেন,—
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তবিধানকং
অনুলোম বিধানঞ্চ প্রতিলোম বিধিস্তথা।
সান্তরালক সংযুক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্য চোচ্যতে,
নৃপাদ্ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ
জাতঃ সূতেতি নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধের্দ্বিজঃ
বেদানর্হস্তথা চৈষাং ধর্ম্মানামনু বোধকঃ।
সূতাদ্বিজ প্রসূতায়াং সুতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতশ্চণ্ডাল উচ্যতে।
চণ্ডালাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতঃ শ্বপচ উচ্যতে।
নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ।
তস্যৈব নৃপকন্যায়াং জাতঃ সুণিক উচ্যতে,
সুণিকন্যা নৃপায়ান্তু জাতা উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ।
নৃপায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ পুলিন্দঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।
নৃপায়াং শূদ্র সংসর্গাজ্জাত পুক্কশ উচ্যতে॥
পুক্কশাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতো রজক উচ্যতে।
নৃপায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতোরজ্জুক উচ্যতে॥
বৈশ্যায়াং রজকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো
ভবেৎ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতো বৈদেহিকঃ
স্মৃতঃ॥
বৈদেহিকাত্তু বিপ্রায়াং জাতশ্চর্ম্মোপজীবিনঃ।

নৃপায়ামেব তস্যৈব স্বচিকঃ পাচকঃ স্মৃতঃ ।
বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতশ্চক্রী উচ্যতে ।
বিধিনা ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকম্ ॥
জাতঃ সুবর্ণইত্যুক্তঃ সানুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ ।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সংজাতোভিষকস্মৃতঃ
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপইতি স্মৃতঃ ।
নৃপায়াং নৃপসংর্গাৎ প্রমাদাদগূঢ়জাতকঃ ॥
সোঽপিক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকেচবর্জ্জিতঃ ।
অভিষেকং বিনা প্রাপ্য গোপ ইত্যভি-
ধায়কঃ ॥
বৈশ্যায়াং বিধিনাপ্রাপ্য বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ
উচ্যতে
বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃস উচ্যতে
কুলালবৃত্ত্যা জীবেৎ নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ ।
সূতকে প্রেতকে চাপি দীক্ষাকালেঽথবা-
পনম্ ॥
নাভেরুর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে ।
কায়স্থ ইতিজীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥
কাকাল্লৌল্যং যমাৎক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃ-
ন্তনম্ ।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থইতি কীর্ত্তিতঃ ॥
শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতঃ পারশবোমতঃ ।
তস্যাং বৈ চৈরশো বৃত্ত্যা নিষাদো জাত
উচ্যতে ।
নৃপাজ্জাতো২থ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা
সুতঃ ।
তস্যাং তৈক্ষ্ণব চৌরেণ মণিকারঃ প্রজায়তে,
শূদ্রস্য বিপ্রসংসর্গা জ্জাত উগ্রইতি স্মৃতঃ ।
তস্যৈবচাবসৎ বৃত্ত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে ।
শূদ্রায়াং বৈশ্যসংসার্গাদ্বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ ।
সূচকাদ্বিপ্রকন্যায়াং জাতস্তক্ষক উচ্যতে ।
নৃপায়ামেব চৈতস্য জাতো যো মৎস্যবন্ধকঃ ।
শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ ।
বশিষ্ঠ শাপাৎ ত্রেতায়াং কেচিৎ পারশবস্তথা ॥
বৈখানসেন কেচিত্তু কেচিদ্ভাগবতেন চ ।
বেদশাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥

পদ্ম পুরাণ মতে জাতির উৎপত্তি যথা,—

কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ ॥
অট্টালিকাকার বীর্য্যেণ কুম্ভকারস্যযোষিতঃ
বভূব কোটকঃসদ্য পতিতো গৃহকারকঃ ॥
কুম্ভকারস্য বীর্য্যেন সদ্যঃ কোটকযোষিতঃ ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটীলঃ পতিতোভুবি ॥
সদ্যঃক্ষত্রিয় বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্যযোষিতঃ ।
বভূব পতিতো দস্যু লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
লেটতীবরকন্যায়াং জনয়দষ্টজাতীন্ ।
মালং মল্লং মাতরশ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরং ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ ।
সদ্যোবভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ ॥
তীবরেণ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূবহ ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাৎ মাংসচ্ছেদী বভূবহ ।
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কোচস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কাণ্ডারঃপরিকীর্ত্তিতঃ ॥
সদ্যশ্চণ্ডাল কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক !
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি ডোমৌ
তথা ।
ক্রমেণ হড্ডি কন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডাল বীর্য্যতঃ ।
বভূবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে ।
লেটাত্তীবর কন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক !
বভূব সদ্যো জালানো গঙ্গা পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
গঙ্গা পুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ—
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াংসদ্য শুণ্ডী বভূবহ ।
শুণ্ডীযোষিতো বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূবহ ॥

ক্ষত্রাৎ করণ কন্যায়াং রাজপুত্রো বভূবহ।
রাজপুত্রাত্ত করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
কন্যৌ তীবর সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতোভুবি।
তীবর্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজকাং তীবরী চৈব কোদালীতি বভূবহ॥
নাপিতাদ গোপ কন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতঃ।

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।

(ক্রমশঃ)

---

# শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

## (পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

### চতুর্থ শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট।

———o———

কবিতাংবা (ন কাময়ে)—আমি কবিতাও চাই না। কবিতা মানুষের আর একটি বিশেষ ঐহিক প্রিয় বস্তু। রস বা প্রিয়তাই মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতির নিদান। এই জন্যই স্বয়ং ভগবানকেও শাস্ত্রে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আবার বাক্যই জীব-জগতে মানুষের সুবিশিষ্ট সম্পদ। মহাবাক্য স্বরূপ বেদই মানুষের "শব্দ ব্রহ্ম।" ইহাই বাক্যের বিশেষ গৌরব; যাহাহউক, সাধারণতঃ বাক্য ও রসের একত্র সমাবেশই কাব্য বা কবিতা। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" রসাত্মক যে বাক্য, তাহাই কাব্য। এই জন্যই কাব্য বা কবিতা মানুষের স্বতএব প্রিয়।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাব্যশাস্ত্র-রসাস্বাদনেই কালক্ষেপ করেন। অর্থাৎ যিনি কাব্যশাস্ত্রে উদাসীন, তিনি জগতের একটি সার রসে বঞ্চিত; সুতরাং তিনি সুবুদ্ধিমান জীব মানব হইয়াও এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন।

কাব্য এই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃত-ফল।
"সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে অত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

অর্থাৎ—

সংসার বিষের তরু; সুধা ফল দুটি তার।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদ, সুজন-সঙ্গম আর॥

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে কাব্যের এইরূপ অসাধারণ গৌরব প্রথিত আছে। স্বয়ং বেদই আদি কবি লোকপিতামহ ব্রহ্মার আদি কাব্য; অধিক কি, আজ বেদের মাত্র আধিভৌতিক অর্থেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসাধারণ কবিত্ব দেখিতেছেন! ভারতের সর্ব্ব শাস্ত্রেই কবিত্ব, সর্ব্ব শাস্ত্রেরই কথা কবিতা-সূত্রে গাঁথা। আমাদের ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে পাঠশালার "শিশুবোধ" পর্য্যন্ত কবিতাচ্ছন্দে গ্রথিত। মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত হইতে আমাদের মেয়েলী শিশুর সোহাগ পর্য্যন্ত কবিতাময়। ফলে কবিত্ব ভাব স্বভাবতই ভারতের চির-ধাতুগত বা মজ্জাগত বস্তু; সুতরাং ভারতবাসীর কবিত্বপ্রিয়তা একান্ত স্বাভাবিক।

সত্বাদি গুণত্রয়-ভেদে কবিতার ত্রিবিধা। কবিতাশ্রিত নয়টি রস যথাক্রমে ত্রিতয়রূপে এই ত্রিগুণ বিভাগে বিভক্ত। আদি, শান্ত, করুণ, এই তিন রসে সাত্বিকী কবিতা; বীর,

রৌদ্র, হাস্য, এই রসত্রয়ে রাজসী কবিতা; এবং ভয়, বিস্ময়, বীভৎস, এই ত্রি রসে তামসী কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে এ সম্বন্ধে বিচারগত মতভেদ আছে। আদিরস কিরূপে সাত্ত্বিক রস হইতে পারে, হাস্য ও ভয়ানক রসের কোন্‌টি রাজস, কোন্‌টি তামস, এ সব কথা লইয়া অনেক আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ও বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়।

যাহাহউক, কাব্য বা কবিতার আকর্ষণ, আমাদের সাধারণতঃ এক প্রধান আকর্ষণ, সন্দেহ নাই। ভোগের যত কিছু বাছা বাছা পার্থিব প্রলোভন আছে, সুকবির কবিতাও তাহার মধ্যে সুগণ্য; এমন কি, স্থলবিশেষে অগ্রগণ্য। একটি প্রাচীন ব্যক্তিগত রুচির ঐহিক ভোগ্য-তালিকা দেখুন।—

"কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ,
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এণ-মাংসমবলাচ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্ম জন্মনি॥"

অর্থাৎ—

কবিতা কালিদাসের, নবীন বয়স।
মহিষের দধি, আর চিনির পায়স॥
হরিণের মাংস, আর সুকুমারী নারী।
জনমে জনমে লাভ হউক্ আমারি॥

এই জাতীয় একটি মৌলিক বাঙ্গালা-পদ্য এইরূপ,—

"গব্য-কাব্য-নব্যকাল আর নব্যা নারী।
মরতে স্বরগ-সুখ সঞ্চারে এ চারি॥"

এ সব রুচির ভাব অবশ্য অনেকটা ব্যক্তিগত, কিন্তু কাব্য-কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই বিষাদভঞ্জিনী ও চিত্তরঞ্জিনী, সুতরাং একান্ত আকর্ষিণী, সন্দেহ নাই; অতএব ভক্ত বলিতেছেন,—হে জগদীশ! এমন যে সর্ব্বমানব মোহিনী কবিতা, তাহাও আমি চাই না। অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল কাব্য-রসপ্রিয়তার বশেই কবিতা-কামনা যেন আমার হয় না। তবে কি না, যে কবিতায় তোমার কথা, তাহা আমার হৃদয়ের স্তরে গাঁথা থাকুক্। তাহা ত কবিতা বলিয়াই আমার প্রিয় নয়, কিন্তু তাহা স্বয়ং আগম-নিগমের কবি শিব-ব্রহ্মার হৃদি-বাঞ্ছিত-নিধির কথা বলিয়া! বস্তুতঃ ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যতীত যদি শিব-ব্রহ্মার কথিতও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অন্যবিধ শাস্ত্র-পুরাণাদি থাকে, তবে তাহাতেও ভক্তের রতি-মতি যায় না।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণেবা হরিভক্তির্ন-দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

অর্থাৎ —

যে শাস্ত্রে বা পুরাণেতে হরিভক্তি নাহি র'ন॥
শুনিবেনা—মানিবেনা, যদি ব্রহ্মা নিজে ক'ন॥

তবে সুখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মাদি কেহই ফলিতার্থে হরি-কথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন নাই। তবে কোন কথাবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হরি-কথা, কোন কথাবা পরোক্ষ-পরম্পরাভাবে হরি-কথা। স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা ব্রহ্মর্ষি-সিদ্ধর্ষি-মহর্ষিনিকর, সকলেই ভগবদ্ভজনকেই মুখ্য লক্ষ্য করিয়া সকল শাস্ত্র কহিয়াছেন। যিনি যত দূরই আপাত-ঐহিক আলাপে অগ্রসর হইয়া থাকুন, সকলেরই বিষয়ের মূলগতি-পরিণতি স্থূলতঃ না হইলেও সূক্ষ্মতঃ ভগবদভিমুখিনী, সন্দেহ নাই। ফল-কথা, মর্ম্মগত ভাবে যে ভাগবতধর্ম্ম চায়,

সে সকল শাস্ত্রেই তাহার অনুকূলতা পায়; কারণ প্রায় ভারতীয় শাস্ত্র মাত্রই ভাগবত-ভিত্তিমূলে গঠিত বা গ্রথিত। তারপর ভক্তের আর কথা কি? তিনি হয়ত ভূগোল পড়িয়াও কাঁদেন; প্রাণীবিদ্যা 'উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পড়িয়াও ভাব-রসে ভাসেন; জ্যোতিষ পড়িয়াও ধ্যানানন্দে মজেন! তাঁহার হয়ত "টপ্পা" শুনিয়াও অশ্রু ঝরে; মাঝার 'সারী'তেও শরীর শিহরে! সুতরাং সেরূপ নিত্য ভাগবতী নেশায় বিভোর ভক্তের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আহা! তথাপি আমাদের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গের সুধাময় শিক্ষা-শ্লোক সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, কেবল কিঞ্চিৎ কাব্যরসপ্রিয়তার বশেই যেন সেই শিব-সেবা পরম রসে বঞ্চিত না হইতে হয়। তাই কেবল মাত্র অনিত্য কাব্য-রসের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-প্রার্থনা-বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে—"কবিতাং বা (ন) জগদীশ কাময়ে।"

তবে কামনা কি কিছুই নাই? আছে বৈ কি। যতক্ষণ আমিত্ব বা অহংতত্ত্ব, তত-ক্ষণই মনের অস্তিত্ব। মন কেবল ইচ্ছাত্মক চিত্তত্ব মাত্র। জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিই মন, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত; অতএব মন যতদিন, সঙ্কল্প-বিকল্পরূপা ইচ্ছা-অনিচ্ছাও ততদিন। তবে ভক্তের ইচ্ছা অনিচ্ছা কখনও বাহ্যতঃ ও স্থূলতঃ বিবিধ ঐহিকবিষয়িণী হইলেও মূলতঃ ও সূক্ষ্মতঃ সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই একান্ত অনুবর্ত্তিনী। ভক্তের এই ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তিতা একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিরই ফল। সুতরাং ভগবচ্চরণে অহৈ-তুকী ভক্তিই ভক্তের একমাত্র সাধনা ও কামনার বিষয়।

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভব-তাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

জগদীশ! আমার জন্মে ২ ঈশ্বরে,—অর্থাৎ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

অহৈতুকী ভক্তির মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। অহৈতুকী ভক্তিই ভক্তি। হৈতুকী ভক্তি ত বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। তবে যদি বলা যায় যে, হেতু অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কদাচ কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবেনা; আর অহৈতুকী ভক্তির ভগবদা-কর্ষিণী ক্রিয়া বা কার্য্যশক্তির ব্যাপারও অতি অসাধারণ, সন্দেহ নাই; অতএব এতবড়—এমন কি—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কার্য্যটীর কারণ বা হেতু নাই, ইহাও অসম্ভব। তদুত্তরে নিবেদন এই যে, যেখানে বিষয়ই ভগবদ্‌-ভজনের হেতু, সেখানে সেই ভজন শক্তিমূলা ভক্তিই হৈতুকী ভক্তি; আর যেখানে ভগবানই ভগবদ্ভজনের হেতু, সেইখানে সেই ভজন-শক্তিমূলা যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি।

অহৈতুকী ভক্তিই, প্রকৃত রাগানুগা ভক্তি—মুখ্যা ভক্তি—পরাভক্তি—নির্গুণা ভক্তি। আর হৈতুকী ভক্তিই "প্রবৃত্ত" সাধকের বৈধীভক্তি,—গৌণীভক্তি—সগুণা ভক্তি—ভক্ত্যাভাস মাত্র। যেখানে কেবল বিষয় আদায় করিবার জন্যই ভগবানকে ভজন, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিকে 'ভক্তি' না বলিয়া তোষামোদবিশেষ বলিলেও বলা যায়। যেখানে ভগবান কেবল 'মারফৎদার' অথবা আরও প্রগল্‌ভ-ভাষায় বলিলে বলা যায়, "মুটে-মজুর"—সেখানে ভক্তির ভজন-ধর্ম্মের নমনীয়তা আর থাকিল কৈ? কেবল পরমধনকে খাটাইয়া—তাঁহার দ্বারা পরি-

বেশন করাইয়া, বিষয়-ভোজে বসা গেল মাত্র! যেন কোহীনুর বিনিময়ে কাচক্রয় হইল; যেন সোণার থালে ছাই ভক্ষণ হইল! যেখানে ভজনের কোন ঐহিক হেতু বর্ত্তমান, সেখানে সেই ভজনের ভক্তিই (ভক্তি ভিন্ন ভজন হয় না) হৈতুকী ভক্তি, এবং ঐহিক হেতু-পরিশূন্য ভজনের যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই চারিভাগে ভজনাধিকারী ভক্তের বিভাগ বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্তই হৈতুকভক্তিমান। আর শেষোক্ত 'জ্ঞানী' ভক্তই অহৈতুকভক্তিমান।

"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, সকলি বিষেরি ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়,
মিছে মায়ায় ঘুরে মরে, নানাযোনি ভ্রমণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"

জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ যে সব ভীষণ নিন্দা, ইহা কোন্ জ্ঞান ও কর্ম্মের? শ্রীভগবানের মুখপদ্ম-মধুচক্র শ্রীগীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। অতএব উহা অবশ্য সেই ভগবদভিনন্দিত জ্ঞান-কর্ম্ম হইতে পারে না। যে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিশূন্য শুষ্ক তত্ত্বপ্রতীতি-মূলক ও অস্থায়ী ফলাভিসন্ধায়ী, তাহাই বস্তুতঃ উক্ত নিন্দার লক্ষিত জ্ঞান-কর্ম্ম। "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" পূর্ব্বক কেবল "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম" যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই গীতার আদর্শ কর্ম্ম, এবং উহারই ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপিণী যে ভক্তি, তাহা অবশ্য অহৈতুকী ভক্তি; সুতরাং তাহা "বিষের ভাণ্ড" না হইয়া দেব-দুর্লভ অমৃতভাণ্ডই বটে। সত্যের ধ্রুব-প্রহ্লাদ, পরে ক্রমে জনকাদি হইতে কলির রায় রামানন্দ পর্য্যন্ত সংসার-ধর্ম্মী হইয়াও অনাসক্ত, সুতরাং ভগবানের গীতোক্ত প্রিয় কর্ম্মী ভক্ত। ইঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মী হইয়া গীতার চতুর্দ্ধা-বিভক্ত উপাসকের মধ্যে "জ্ঞানী ভক্ত" বিভাগেরই জাজ্বল্য আদর্শ। খুব সোঝা কথায় বলা যায়, জ্ঞান অর্থে জানা। গীতোক্ত এই 'জ্ঞানী' ভক্ত কি জানেন? তিনি জানেন,—ভগবানই সর্ব্বস্ব। ভগবানই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা। ভাষা আর কি বলিবে? ভাষা সে ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া যায়!

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"
সে যে তার কি যে ধন,
যে যাহার প্রিয় জন!

ভগবান যে ভক্তের কাছে কি, তাহা অপূর্ণ মানুষের ভাষা আর কি বুঝাইবে? তবে আমাদের স্থূল নিম্নাধিকারের উপযোগী-ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, জীবের যদি কিছু সাধ্য থাকে, প্রাপ্য থাকে বা ভোগ্য থাকে, তাহা কৃষ্ণ-দাস্য; অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ; ইহা জানাই গীতোক্ত ঐ জ্ঞানী ভক্তের জ্ঞানের 'জ্ঞা' ধাতুর সার্থকতা। ইহা জানিলে, ভগবদ্ভক্তে যে ভজনা-সক্তি-প্রবাহ সতত স্বতঃপ্রসারিত হয়, ঐহিক হেতুর একান্ত অভাব থাকায়, উহাই অহৈতুকী ভক্তি। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভজন-শক্তিরূপিণী যে ভক্তি, তাহা হৈতুকী। পদ্মানদীর তুফানে পড়িয়া যখন ভগবানকে "পরিত্রাহি" ডাকিতেছি, তখন আমি "আর্ত্ত" উপাসক হইয়াছি। কিন্তু মন বলিতেছে, "এই উপাসনার গুণেই এই উপাসনার

বিদ্যুৎ-ত্রস্ত হস্ত হইতে নিস্তার পাইলে বাঁচি! এই দুর্গানাম-জপ ও "ত্রাহি মধুসূদন" রব, মা দুর্গা ও মধুসূদনের কৃপায় শীঘ্র শেষ করিয়া, খালে নৌকা নিয়া, একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি" ইত্যাদি। কালী-দুর্গা-মনসার জন্য হয়ত অনেক 'পাঁঠা মানসা' হইল। হরিরও অনেকগুলি বাতাসা পাওনা হইল। কিন্তু ইহাও উপাসনা। ইহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ ভক্তি আছে এবং সে ভক্তিরও উপাসকের অভীষ্ট-প্রদায়িনী শক্তি আছে। সাধারণ সংসারী মাত্রকেই এই রোগ-শোক-দুঃখ-দুর্ভোগ ও বিবিধ বিঘ্নবিপদ-সঙ্কুল সংসারে অনেক সময়েই "আর্ত্ত" ভক্ত হইতে হয়। বিপন্ন বিলাতী নাস্তিকও বলেন—"O God! Save me, if there is any God." দয়াময়ের কি বিধান, বিপদে ফেলিয়াও আস্তিকতা ও আর্ত্ত উপাসকতা দান করেন! যাহাহউক, আর্ত্ত উপাসকের এই ভক্তি বিপদ্মুক্তিরূপ হেতুমূলকতায় হৈতুকী। আর দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যিনি সাধনা করিতেছেন, তিনি 'জিজ্ঞাসু' উপাসক। সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গীয় তপস্বীদের সাধন এই জাতীয়। এই সাধনের ভাব-শক্তিরূপিণী ভক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ হেতুবশে হৈতুকী। অপর, ধন-জন-পুত্র-বিত্তাদি কামনায় যিনি ভগবদারাধনাপরায়ণ, তিনি "অর্থার্থী" উপাসক। ঐহিক স্বার্থের হেতুত্ব-বশে তৎক্রিয়াশক্তিরূপিণী ভক্তিও হৈতুকী। ফলে চরম-পরমার্থ-প্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তির ভাগ্যবান অধিকারী শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত সেই 'জ্ঞানী'-ভক্ত। তাঁহার ভগবদ্গত চিত্তের বিশুদ্ধ বিষয়বৈরাগ্য জন্য ঐহিক হেতুত্ব অভাবে বা একমাত্র ভগবত্তত্ত্বগত হেতুত্ব-প্রভাবে তাঁহার ভক্তি সাধন-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তিনি সেই মন-চোরা ধনের পায়ে প্রেম-ডোরের বাঁধন দিয়া হৃৎকারাগারে রাখিতে সমর্থা। অধ্যাত্মলীলায় তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়া 'সমর্থা।' মহাভাবময়ী হইয়া তিনিই রাধাতত্ত্বে পরিণতা! যদি বিষয়-বিতৃষ্ণ উপাসকের কোন তৃষ্ণা থাকে, তবে সে এই অহৈতুকী ভক্তির তৃষ্ণা। যদি নিষ্কাম-সাধকের কোন কামনা থাকে, তবে এই অহৈতুকী ভক্তির কামনা। তাই শিক্ষা-শ্লোকোক্ত ভক্ত সংসারের সর্ব্বপ্রধান কামনা-কলাপে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল সেই "কামনা-সাগর" কৃষ্ণের কৃপা-সাগরে অহৈতুকী-ভক্তি রত্নেরই ভিখারী হইয়াছেন।

এই ভক্তির লক্ষণ-বর্ণনে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দস্বরূপা চ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"

অর্থাৎ—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকারিণী।
সুদুর্লভা নিত্যানন্দা কৃষ্ণ-আকর্ষিণী॥

শুদ্ধ ভক্তির সুশীতল ছায়ায় ক্লেশের প্রবল তাপও পরাস্ত। ভক্ত সেই ভক্তির শক্তিতেই অক্লেশে ক্লেশজয়ী। অহৈতুক ভক্ত ঐহিক সুখ-দুঃখের কোন ধারই ধারেন না। ভজনেই তাঁহার সুখ; ভজন-ভঙ্গেই তাঁহার দুঃখ। এমন কি, বরং দুঃখে ভগবানকে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকা যায় ভাবিয়া কোন ভক্ত বা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই প্রার্থী! আহা! সেই তুলসী-বিলাসীর প্রিয় দাস তুলসীদাসজী বলিয়াছেন'—

"সুখ-শের্ মে বাজ্ পঁড়ুহো,
দুখে বলিহার্ যাই।
আসা দুখ্ আঁওয়ে যো,
ঘড়ী ২ (হরি) নাম সোঁরাই॥"

অর্থাৎ—

বজ্রাঘাত হ'ক্ সুখের মাথায়,
দুঃখে বলিহারি যাই।
হেন দুঃখ মোর হউক্, যাহায়—
ঘড়ী ২ 'হরি'বলে' চেঁচাই॥

দেখুন অহৈতুকী ভক্তির ক্লেশনাশিনী শক্তির কি চারু চিত্র! তারপর, অশুভের লেশ থাকিতে যে ভক্তির উদয়ই হয় না, সে ভক্তি যে 'শুভদা,' তাহা বলাই বাহুল্য। আর সে ভক্তি যে 'মোক্ষলঘুতাকৃৎ', তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, "ভক্তস্য পদপদ্মস্য মুক্তির্হি মধু-লুব্ধিকা"—

অর্থাৎ—

ভক্ত-পাদ-পদ্ম-মধু আশা করি।
লালায়িতা সদা মুক্তি-মধুকরী॥

ইহার উপরে আর কথা কি? অতএব এ হেন ভক্তি যে 'সুদুর্ল্লভা'—বহুসুকৃতি-সাধন-সম্ভবা, তাহা বুঝাইতে আর বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। অপর, সুখের প্রতিশব্দ সাধারণতঃ "আনন্দ" হইতে পারে; কিন্তু সুখ-দুঃখ ত পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং সুখ-দুঃখের অতীত যে আনন্দ, তাহাই 'সান্দ্রানন্দ'; ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির ফল এই সান্দ্রানন্দ; কেননা, এই ভক্তির ভগবদ্বিজয়িনী মহাশক্তিতেই আনন্দময় ভগবান্ অবশে আকৃষ্ট! তাই ইহা "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।" কৃষ্ণোক্তিতে কবি গাহিতেছেন,—

"অখিল আকৃষ্ট করি নাম মোর 'কৃষ্ণ,'
ভক্তি-আকর্ষণে আমি আপনি আকৃষ্ট!
'কৃষ্' আকর্ষণ-অর্থে আমি শুধু কৃষ্ণ।
আমারে আকর্ষি মোর ভক্ত কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।"

হৈতুকভক্তের ভক্তি বা অনুরক্তি বিষয়ে। তবে "মায়ফৎদারী" সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিধানকর্ত্তা ঈশ্বর যেটুকু ভালবাসা পাইতে পারেন, তাই পান। ভক্তি দর্শন শাণ্ডিল্য-সূত্রের "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" সূত্রে যে ভালবাসা সূচিত হয়, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি বা ভালবাসা। হৈতুক ভক্তের প্রকৃত পরানুরক্তি বিষয়ে; আর ভগবানে সেই পরানুরক্তির অনুরোধেই বড় জোর অনুরক্তি; এবং উহা কেবল কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বুদ্ধি-সঞ্জাত। অনন্যমমতা ভিন্ন অহৈতুকী ভালবাসা হইতেই পারে না।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অহৈতুক ভক্তগণ ভগবানে প্রেমসঙ্গতা অনন্যমমতাকেই ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবানে অনন্যমমতাযুক্ত অন্যাভিলাষিতামুক্ত ভক্ত কেবল তাঁহারই সেবার্থ তাঁহাকে ভজেন; তাঁহারই রূপ-গুণে তাঁহাতে মজেন! ভগবান্ ঠিক যেন অহৈতুক ভক্তের "কৃপণের ধন!" সুতরাং সে ধন ব্যয়ের বা বিনিময়ের জন্য নহে; কেবল হৃদয়-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত রাখার ধন। "কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে" ভক্তের প্রার্থনাই এই।

কোন বঙ্গ-কবি বলিয়াছেন, "ভালবাসার অর্থ ভাল বাস।" বাঞ্ছিত ধনকে হৃদয়-

মধ্যে ভাল বাসা—অর্থাৎ উত্তম বাসস্থল না দিয়া লাঞ্ছিত করা প্রেমের ধর্ম্ম নহে।

ভালবাসা দেও যারে, দেও তারে ভাল বাসা।
ভাল যার হৃদাগার, তারি সার ভালবাসা॥"

কামনা-কর্দ্দম-ক্লেদিত, আকাঙ্ক্ষার আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত, বিষয়-বিষজীর্ণ, মোহ-মলাকীর্ণ হৃদয়ে প্রেমাস্পদকে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রীত হইতে পারে? যে পারে, সে প্রেমিক নহে—কামুক মাত্র। আমাদের মানসাগার সাধারণতঃ দুর্গন্ধ অন্ধকূপতুল্য। অহৈতুকতার আলোক-বিস্তার ও স্বার্থশূন্যতার সমীর-সঞ্চার ভিন্ন তাহা 'ভাল বাসা' বা ভালবাসার যোগ্যতা পায় না। কোন ভক্ত ভগবদুদ্দেশে বলিতেছেন,—

"ক্ষীর-সারমপহৃত্য শঙ্কয়া
যদি পলায়নং স্বীকৃতং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ত-তামসে,
নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে॥"

অর্থাৎ—

হরি ক্ষীর-ননী, শঙ্কা মনে গণি,
পলাইতে যদি চাও,
নন্দসুত! মম চিত অন্ধতম,
তাহে কেন না লুকাও?

ইহা কেবল ভক্তের ভাব-বিকাশ ও দৈন্য-প্রকাশ মাত্র। বাস্তবিক উক্ত ভক্ত হৃদয় অবশ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন নহে; বরং ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভালবাসার গোলোকীয় আলোকে উহা সতত সমুদ্ভাসিত। সুতরাং উহাই ভাল বাসা এবং উহাতে যাঁহার বাসা, সর্ব্ব ভালবাসার সারই তাঁহাকে ভাল বাসা!

সতীস্ত্রীর পতি-প্রেম অহৈতুকী ভালবাসার একটি অলৌকিক লৌকিক উদাহরণ। পতিব্রতার প্রেমে কোন ঐহিক স্বার্থের হেতু নাই। যাঁহার স্বার্থেরই সার্থকতা নাই, যাঁহার পরার্থই পরম স্বার্থ, সেই উৎসর্গিতাত্মিকা রমণীমণির প্রেমের খনি হেতুর কলঙ্কপরিশূন্য। আহা! একটি মধু হইতে মধুর "নিধুর টপ্পা" বা প্রেম-সঙ্গীত মনে পড়িল। উহাতে পরম পদার্থ 'পিরীতি'র অমিয়-অহৈতুকতার কি চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে! গানটি পুরাতন ও বহুজন-বিদিত বটে, কিন্তু ভাবোৎকর্ষে উহা নিত্য নূতন ও রসাস্বাদ-বহুলো অনেকের আদৃত।

"ভালবাসিবে বলে' তোমায় ভালবাসিনে॥
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥
বাস বা নাবাস ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল;
তোমার ভালই আমার ভাল;
(আমি) অন্য ভাল বুঝিনে॥" (ইত্যাদি)

বলিতে কি, ইহার তুলনা কোন ভাষার কোন সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহ। বুঝি এই এক গানেই বঙ্গ সঙ্গীত-সাহিত্য ধন্য! আজ্ কাল্‌কার প্রেমসঙ্গীতে "আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমায়, তুমি অবসর মত বাসিও'—এই সব গানেরই বড় বাহার; কিন্তু উহার কাছে ইহা কোথায় লাগে? উহাতে 'বাসিও' নাই—কেবল 'বাসিব'! সুতরাং উহার কাছে ইহা চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্র-ভাতিবৎ অভিভূত। আসলের কাছে নকল যেমন, ওস্তাদের কাছে সাক্‌রেদ্ যেমন, পাকার কাছে কাঁচা যেমন, উহার কাছে

ইহা তেমন। আহা! কি মাহেন্দ্রক্ষণেই নিধু বাবুর মধুময়ী লেখনী এই অমিয়-ধারাটি উদ্গীরণ করিয়াছিল! এই ভাবের আর একটি আধুনিক গানও অতি উপদেয় লাগিয়াছিল। এই গীতিদ্বয় প্রায় পরস্পর জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়।

"হায়রে হায়! প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে—নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা!
প্রেম চায় ভালবাসি, পরাব না,—পর্‌ব ফাঁসি;
চায়না প্রেম কেনা-বেচা;
ভালবেসেই পুরাব আশা।" (ইত্যাদি)

যে বঙ্গে শত-সহস্র সতী অলৌকিক প্রেম-রঙ্গে পতির চিতার জ্বলন্ত অনল-তরঙ্গে জীবন্ত দেহ আহুতি দিয়াছেন, সে বঙ্গের কবি-কল্পনায় অহৈতুকা প্রীতির এরূপ আলোক-চিত্র বিচিত্র কি? অহৈতুক প্রেম প্রেমের "রাজ সংস্করণ।" ইহা নিখুঁত, নির্ম্মুক্ত, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ। ইহাতে প্রতিদানের প্রতীক্ষা নাই। ইহাতে কেবল দান—প্রেমিকের আত্মসর্ব্বস্ব দান; আর সেই দানই ইহার প্রাণ। অপর পক্ষে, হৈতুক প্রেম সাধারণ 'বাজার-চল' প্রেম। ইহা সংকীর্ণ, স্বার্থসীমাবদ্ধ, সমল ও সাপেক্ষ। প্রতিদানে ইহার পরমায়ু। ইহা প্রেমের বেণেগিরি বা দোকানদারী। সংসার-সম্বন্ধে এই সকাম প্রেমের প্রায় একাধিপত্য। ভগবৎসম্বন্ধেও পৃথিবীতে ইহারই প্রবল প্রসার। তবে ইহার অবশ্য উন্নয়ন (Promotion) আছে; সে কথা পরে বলিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, ভারতে অহৈতুকী প্রেম-ভক্তির পূর্ণ পরিণতি ও প্রকৃত পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে বা ব্রজলীলায়।

"নিহেতু ব্রজের-প্রেম—ব্রজেই উপমা।
অনুপমা রীতি সে আপনি আত্মসমা॥
যে ভজেছে, সেই বুঝেছে, বুঝাবে কে কারে?
যে বুঝেছে, সেই মজেছে ব্রজ প্রেম-পাথারে!"

বাস্তবিক সে প্রেম অতুলা। তাহার অতুলতাকে ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ব্রজধামের প্রেমের উপমা ধরাধামে নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, এ ত্রিধামেই নাই; বুঝি বৈকুণ্ঠধামেও নাই! বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-প্রেম, আর ভৌমগোলোক-বৃন্দাবনে মাধুর্য্য-প্রেম। মাধুর্য্য-প্রেমেই অহৈতুকতার পূর্ণ পরিণতি। তাই বুঝি ব্রজরসাস্বাদমগ্ন অহৈতুক ভক্ত তুলসীদাস ব্রজ-গৌরব-ভাবে 'গর গর' হইয়া গাহিয়াছিলেন,—

"বৃন্দাবন ঔর বৈকুণ্ঠকো তোলে তুলসীদাস।
ভারি যো, সো ভূতল্ বৈঠে হাল্কা চঢ় আকাশ!"

চমৎকার! বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠকে তুলসীদাস তোল করিয়া দেখিলেন, ভারি যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৃন্দাবন) ভূতলে পড়িলেন; আর হাল্কা যিনি, তিনি (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ) কাজেই আকাশে চড়িলেন! প্রেম-গৌরবেই ব্রজের এ গৌরব।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাত্মিকা গোপিকারা কৃষ্ণসুখেই সুখিনী! কৃষ্ণ সুখেচ্ছা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া গোপ যুবতী সাজিয়াছেন!

"আত্মসুখে ভুঞ্জে রতি, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই কৃষ্ণরস-জীবিকা গোপিকার যথাসর্ব্বস্ব। তাই

তাঁহারাই ভূলোকে ও গোলোকে অহৈতুক প্রেমের একাধীশ্বরী। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলা বিলাসে গোপিকার বিষম বিরহ-বিকার; তাহাও তত্ত্বতঃ কৃষ্ণসুখেচ্ছাবৃত্তির বিরোধী নয়; কেন না সে যে অপূর্ব্ব বিরহ, তাহা এক ভাবে আবার মিলনের চূড়ান্ত! এ চূড়ান্তত্ব কিন্তু সে চূড়াধারীর পক্ষেও বটে; শুধু কেবল গোপীপক্ষেই নয়; আর গোপীদের তাহা অবিদিতও নয়। গোপীকান্তের গুপ্ত মর্ম্ম গোপীর ন্যায় আর কে জানিবে? যে বিরহে বিরহের মহাপ্রলয়—ত্রিভুবন তন্ময়, সে বিরহ কি মহামিলনময়!

"সঙ্গম বিরহ-বিকল্পে,
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা,
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থাৎ—

মিলন-বিরহ, এই উভয় মাঝারে,
বিরহই শ্রেষ্ঠতর বিহিত বিচারে;
যেহেতু মিলনে মাত্র মিলে একজন,
বিরহেতে ত্রিভুবন তন্ময়দর্শন!

মিলনের কৃষ্ণ কিরূপ? না—কৃষ্ণ যখন সম্মুখে; তখন আর পশ্চাতে নহেন। কৃষ্ণ যখন গুরুজন-বেষ্টিত গৃহ-প্রকোষ্ঠে, তখন আর সখাগণ-সম্মিলিত গোচারণ-গোষ্ঠে নহেন। কৃষ্ণ যখন নন্দের বক্ষে, তখন আর যশোদার কক্ষে নহেন। আর যখন কৃষ্ণধন শ্রীমতীর হৃদে, তখন আর শ্রীদামের কাঁধে নহেন। মিলনের এক কৃষ্ণ এইরূপ; কিন্তু বিরহের অনন্ত কৃষ্ণ যুগপৎ দূরে—অদূরে, অন্তরে—বাহিরে; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে! যুগপৎ কক্ষে, বক্ষে, গোষ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, হৃদে, কাঁধে, সর্ব্বত্র! তাই "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

প্রেম যেখানে অহৈতুক, সেখানে বিরহেও স্থূল মিলনাধিক সূক্ষ্ম সুখ। কারণ তখন বাহ্যিক সসীম বিরহে আন্তরিক অসীম মিলন। কিন্তু হৈতুকতার সীমার মধ্যে এ অধিকার একান্তই অসম্ভব। হৈতুক প্রেমের বিরহে স্বার্থহানি-জন্য এক আপাত-তীব্র রাজস দুঃখ। আর অহৈতুক প্রেমের বিরহে সমাধিময় সাত্ত্বিক শোকেও সাক্ষাৎ-সূক্ষ্ম স্মরণানন্দ! কিন্তু তাহা চিনিবার জহুরী এ জগতে বড় কম।

"যে জন চিনিতে জানে, বিষ হতে সুধা আনে,
শীতের সন্ধ্যায় আনে শরতের শতদল।
মরুভূমি হতে আনে নিদাঘ মধ্যাহ্নে জল!
খোদিয়া অঙ্গার-খনি, লভে সে হীরক-মণি,
মহানিম্বে মধুবস্তু—দ্রবত্ব পাষাণে!
নন্দনের পারিজাত পায় সে শ্মশানে!"

ব্রজগোপমণ্ডলে ঘরে পরে নারী-নরে অন্তরে বাহিরে এই অপূর্ব্ব অধিকার। তাই বিচ্ছেদে আচ্ছাদিত বিরাট মিলন!

( ক্রমশঃ )

———

শ্রীহরিঃ।
( ১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রীকৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

| ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা, |
|---|---|---|

## শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

"শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজজনের সম-সুখ-দুঃখতার যে আপাত-বিরোধ এই মাথুর বিরহে প্রতীয়মান হয়, সেই অপূর্ব্ব রসময় দুর্ভেদ্য রহস্যটির আর এক প্রকার পরিস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন। কবি বলিতেছেন,—

"ব্রজের নিহেতু-প্রেম কৃষ্ণ-সুখে সুখী;
সুখী কৃষ্ণ মথুরায়,—ব্রজ কেন দুখী?
হৃষ্ট মধুপুর কৃষ্ণ-অভিষেক-ধূমে;
হাহাকার—অশ্রুধার সার ব্রজভূমে!
কৃষ্ণানন্দে মথুরায় মহামহোৎসব।
নিরানন্দ বৃন্দাবনে সব যেন শব!
সুখে সুখ দুখে দুখ পিরীতের রীত;
হাসে কৃষ্ণ, কাঁদে ব্রজ, একি বিপরীত!
আনন্দিত বাসুদেব বসুদেব-কোলে;
পিতা নন্দ কেঁদে অন্ধ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে!
শ্রীঅধরে রাজভোগ দেন দেবকিনী;
মূর্চ্ছাগতা মা যশোদা হাতে লয়ে ননী!
কুব্জাপানে চেয়ে বঁধু মৃদু মধু হাসে;
ব্রজ-বধূ-নেত্র-নীরে যমুনা উচ্ছ্বাসে।
মথুরা-মোহিনী-মোহে কৃষ্ণ কুতূহলী;
'হরি' স্মরি করে সখী রাধা-অন্তর্জলী!
নব সখা সহ শ্যাম সুখ-সম্মিলিত;
শ্রীদাম সুদাম হায় ধূলায় লুণ্ঠিত!
অশ্ব-গজে এবে পশু-পালন-বিলাস;
শ্যামলী ধবলী ত্যজে অন্ন-জল-ঘাস!
সুখী কৃষ্ণ সূত-বন্দী-স্তুতি-গীতিকায়;
ব্রজে শুক-পিক-অলি মূক—মৃতপ্রায়!
সিংহাসনে কুব্জা-কান্ত বিলাসে বিলীন;
কাঁদেরে কদম্ব তলা—কালিন্দী-পুলিন!"

কবির এই বিস্ময় আপাততঃ কাব্য-শোভায় সুন্দর; কিন্তু অহৈতুক-ব্রজ-প্রেম-রস-রহস্যবিৎ ভক্ত ইহাতে বিস্মিত হন না। কে বলে ব্রজ-বিরহী কৃষ্ণ মথুরায় সুখী? শ্রীমতী রাধা, মা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপ-সখা-সখীবৃন্দ, কাহারই সে বিশ্বাস নাই। কৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্তু

তিনি যে ব্রজের হৃদয়-রাজ্যের রাজা। সেই মধুর রাজত্বে তাঁর যে সুখ, মাথুর রাজত্বে কি সেই সুখ? আত্মসমর্পণ-ঢালা অহৈতুকী কৃষ্ণসেবার মর্ম্ম মথুরায় কে জানে? হউক্ তাঁহার ষোড়শোপচার-সজ্জিত রাজভোগ, কিন্তু মা যশোদার সেই "ক্ষীর-নবনী" সে চাঁদবদনে তেমন করিয়া আর কে দিবে? থাকুক্ তাঁহার জরী-জহরৎ-জড়িত জামা-যোড়া, কিন্তু মা যশোদার স্বহস্তের সাধের সজ্জা সেই পীত-ধড়া-মোহন চূড়া ভিন্ন সে অঙ্গ কি সাজিবে? আহা! সঙ্কেত-কুঞ্জে নব-কিশলয়-কুসুম-পুঞ্জে বিরচিত সেই বিলাস-শয্যায় রসিক-শেখরের যে রসোল্লাস, তাহা কি রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ-পালঙ্কের দুগ্ধফেণনিভ শয়নে সম্ভবে? আবার শ্রীদাম সুবলের কাঁধে চড়িয়া রাখাল-রাজের যে আনন্দ, গজ-বাজি-বাহনে বা চতুর্দ্দোলে স্যন্দনে সে নন্দনন্দনের সে আনন্দ কি মিলিবে? অধিক কি, প্রাণনাথকে পায়ে ধরাইয়াও যে রাধা কৃষ্ণসেবার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, কংস-দাসী দিবানিশ বুকে বাঁধিয়াও কি তাহা পারিবে? আহা! বিলাস-বিহ্বল প্রেম টল-টল গোপাল কৃষ্ণের যে সুধাস্বাদন, শত বিষয় চিন্তা-বিধ্বস্ত ব্যতিব্যস্ত ভূপাল-কৃষ্ণের বুঝি তাহা নিশার স্বপন! তাই কৃষ্ণ সুখে নাই। ক্রূর অক্রূর তাঁহাকে ভুলাইয়া নিয়া, কংস বধিয়া, রাজ্যভার ঘটাইয়া, বাপ্-মা যোটাইয়া, নানা বাধায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; তাই ব্রজের জীবন কৃষ্ণ মথুরার রাজ-ভবনেও ব্রজবনের জন্য ব্যাকুল, গোকুলের বিচ্ছেদে আকুল! কে বলে কৃষ্ণ সুখী? এখন ব্রজের ধনকে আবার ব্রজে আনিতে পারিলে, সেই ধনেরই সুখ-সাধন হয়; আর তাতেই ব্রজের সর্ব্বসুখোদয়। কৃষ্ণ-সুখে সুখভাগী অহৈতুক কৃষ্ণানুরাগী ব্রজের এই ভাব, এই বিশ্বাস। তবে কৃষ্ণ যে রথ-যাত্রাকালে বিধুমুখে মধুর হাসি হাসিয়া "আবার আসিব" বলিয়া গিয়াছেন, এই বিরহ-বিষাদ-রাশি বহিয়াও ব্রজবাসীর কথঞ্চিৎ জীবনধারণের সেই একমাত্র আশ্বাস। এস্থলে অবিকল এই ভাবের দীনদাসের একটি পদ-গীতিকার ভক্ত পাঠকের করকমলে উপহার দিতেছি।—

"কি হ'ল! ব্রজে কি হ'ল!
কাষ্ঠ হাঁস মুখে, কষ্ট চেপে বুকে,
কৃষ্ণ মথুরায় গেল!

বধি ব্রজপুর, ক্রূর সে অক্রূর
হরিল ব্রজ জীবনে।
ঐশ্বর্য্যে রঞ্জিত, মাধুর্য্যে বঞ্চিত,
করিল সে হরি-ধনে।

কৃষ্ণ যে রতন, তাহার যতন
যতন কেইবা জানে?
হায়! কৃষ্ণ-সেবা- মর্ম্ম জানে কেবা
নির্ম্মম মথুরাধামে?

ষোড়শোপচারে রাজভোগাহারে
হয় কি কৃষ্ণের সুখ?
মা যশোমতীর ননী-সর ক্ষীর
চায় যে সে চাঁদ-মুখ!

কেলি-কুঞ্জ-বনে কুসুম-শয়নে,
কি সুখে যামিনী যায়!
ভূপতি-ভবনে পালঙ্ক-শয়নে,
নয়নে কি ঘুম পায়?

হৃদপদ্মাসন যাহার আসন,
সিংহাসন তার সয় কি?
সেই সকৌতুক কাঁধে-চড়া-সুখ,
গজ-বাজি-রথে হয় কি?
সে পীতধড়ায় কি শোভা ছড়ায়!
জামায় যোড়ায় সাজে কি?
নয়ন জুড়ায় মোহন চূড়ায়,
কনক-কিরীটে কাজ কি?
মানের দায়েতে প্রিয়ার পায়েতে,
কেঁদেও কত না সুখ!
এবে রাজপদে শত প্রজা পদে;
তাতে সুখ কতটুক?
'গোপাল—ভূপাল। কি জোর-কপাল!'
ভাবে ভাবহীন ভ্রান্ত।
দীনদাস কহে, ব্রজের বিরহে
দীনহীন ব্রজকান্ত॥"

সোজা বুদ্ধিতে কিন্তু এ রহস্য বোঝা একটু কঠিন। সোজা বুদ্ধি সোজা ভাষায় বলে—"কৃষ্ণ রাজা হয়েছেন, রাজভোগে রয়েছেন, সোনার থালে খাচ্ছেন, ছাপর খাটে শুচ্ছেন, জামাযোড়া পরছেন, হাতী-ঘোড়া চড়ছেন, শত সেবা ধরে থবে, শত দাস দাসী যোড়করে! এত সুখ কি ব্রজে ছিল? বরং ব্রজে কত কষ্ট পেয়েছেন, কত বিপদ-বিভ্রাট সয়েছেন। কতবার কত সঙ্কট হয়েছে; প্রাণ যেতে যেতে রয়েছে! আর কাজটাই বা কি ছিল? গরু চরাতে যেতেন, এঁটো ফল খেতেন, কদম গাছে ঝুলতেন, লুকোচুরী খেলতেন, যমুনার জল ঘোলাতেন, আর যুবতীর মন ভোলাতেন! অবস্থাই বা কি ছিল? ননী চুরী করে, নন্দরাণীর কাছে মার খেয়েছেন, নিশি-শেষে কুঞ্জে এসে বৃন্দা-দূতীর কাছে গাল খেয়েছেন! নন্দের বাধা মাথায় করে মোহন চূড়া খসে গিয়েছে; গোয়ালার মেয়ের পায়ে ধরে চাঁদ-বদন ভেসে গিয়েছে! এই ত দশা! তবু বলিবে মথুরায় কৃষ্ণ সুখী নহেন? হয় ব্রজবাসী বড় বোকা, নয় বড় স্বার্থপর; নচেৎ আজ কৃষ্ণের এত সুখে ব্রজবাসী কেঁদে মরে! প্রচলিত প্রবাদের সুরে বলা যায়, আজ "কৃষ্ণের জ্যৈষ্ঠ মাস, ব্রজবাসীর সর্ব্বনাশ!" 'সোজা বাঙ্গালী'র সোজা সমালোচনা এই রকম বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেভাবে ব্রজের এ ভাব, তাহা পূর্ব্বোক্ত দীনদাসের পদ্যগীতির ভাবেই পরিব্যক্ত। আমরা অধিক আর কি বলিব? বলিবার অধিকারইবা কোথায়? বৈষ্ণব-জগতে "মাথুর" যে কি বস্তু, কি যে তাহার সুগূঢ় রস-রহস্যতত্ত্ব, তাহা ভাগ্যবান রাগানুগ বা অহৈতুকভক্তেরই ভোগ্য; কিন্তু অস্মদ্‌দৃশ ভাগ্যহীন ভক্তিহীন ভজন-বিহীন অভাজন তদাস্বাদনের একান্তই অযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমানুষী অন্ত্য-লীলা এই মাথুরভাবেরই মহোন্মাদিনী শক্তিতে সুপ্রকাশিত। প্রকৃত অহৈতুক প্রেমের বিরহ কিরূপ, তাহা মধুপুরগত-মাধব-বিরহহত ব্রজের দশায়, এবং পরে গৌরাঙ্গ প্রভুর চরম লীলায় পরম পরাকাষ্ঠায় পরিব্যক্ত। গৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার মধ্যলীলায় অর্থাৎ গার্হস্থ্যলীলার সময়েও নিজ নবদ্বীপ-ধামে ভক্তমণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, একদিন মাথুর-বিরহ-বিকলা শ্রীরাধার ভাবাবেশভরে

গদগদশ্রু-লোচনে গদগদবচনে বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ আমার কত যতনের ধন। মথুরা স্বার্থপর স্থান; সেখানে তাঁহার যত্ন হইবেনা। আমার কৃষ্ণের মনটি ভালবাসার গড়া, ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় তিনি মর্ম্মাহত হইবেন।" (অমিয় নিমাই-চরিত) অতএব মহামাথুর বিরহেও কৃষ্ণসেবা-সর্ব্বস্ব ব্রজের অপূর্ব্ব অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম-রহস্য স্বয়ং রাধা-ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখেই সুব্যক্ত।

অতঃপর আর একটি তত্ত্ব একটু বিচার্য্য। ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজেই থাকিলে আর বিরহ কি? "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" এই যে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক উক্তিটি বৈষ্ণব-সমাজে অনেক সময়েই আলোচিত হইয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য-বিচারে অনেক বিতর্ক চলে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইবনা; তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র নিবেদন যে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই দুই ভাবের মধ্যে বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভাব এবং গোলোকে কৃষ্ণরূপে মাধুর্য্য-প্রধান ভাব। ব্রজলীলায় মাধুর্য্যই মুখ্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্য গৌণ। আর মথুরা-লীলা ও দ্বারকা-লীলায় ঐশ্বর্য্য-ভাবই মুখ্য, মাধুর্য্য গৌণ। এখন যমুনা-জীবনে ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ ধারণ অথবা নন্দ-নিকেতনে যুগল কৃষ্ণের একীভবন বা একই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-গত রূপ, লীলা ও ধাম-ভেদে দ্বিধা-বিভাজন, ইত্যাদি যে সব পৌরাণিক জটিল বিতর্ক-বিচার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে, আমাদের তাহার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, অধিকারও নাই। আমরা দেখিতে পাই, বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলা বর্ণনেও তাঁহাকে গোলোকেশ্বর বলা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে মাধুর্য্য-লীলা-বর্ণনেও,(এমন কি, মাধুর্য্য-লীলার সারাৎসার রাস বর্ণনেও) তাঁহাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফলে এ সব লইয়া খুঁটিনাটি কেবল আসল কাজ মাটি করা মাত্র। যাঁর গোলোক, তাঁরই বৈকুণ্ঠ; যাঁর মাধুর্য্য, তাঁরই ঐশ্বর্য্য; তবে লীলা-ভেদে লোক-ভেদ এবং উপাসনা-ভেদে নাম-রূপ অর্থাৎ ধ্যান-মন্ত্রাদির ভেদ অবশ্য শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু মূলে সেই "অবতারাবলীবীজং" এক ভগবৎতত্ত্ব! তবে স্থূলতঃ যার যে ভজন, অধিকারানুসারে তার তাই উত্তম। অনধিকার-চর্চ্চায় হয়ত স্বাধিকারও হারাইতে হয়, হয়ত হাতের—পাতের, দুইই যায়। বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিযোগে ঐশ্বর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার ক্রম-সাধনোন্নয়নে উত্তীর্ণ হইলে, পরে শনৈঃ শনৈঃ রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তিযোগে মাধুর্য্যতত্ত্বে ভগবদ্ভজনের অধিকার জন্মে। শনৈঃ শনৈঃ জন্ম-জন্মান্তর-ক্রমে এই অধিকার পুষ্ট হইতে থাকে। যতদিন গোপ্যানুগত্য লাভে মধুরভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনানন্দের অনুমাত্র আস্বাদনও ভাগ্যে না ঘটে, ততদিন স্বয়ং ভগবানের হ্লাদিনীশক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রজের মাধুর্য্য-ভজনে এই হ্লাদিনী শক্ত্যাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ পরিণতিই স্বয়ং তত্ত্বতঃ "মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী"; সুতরাং যেখানে

মহাভাবস্বরূপা রাধা, সেইখানেই রসরাজরূপী কৃষ্ণ। কাজেই তত্ত্বতঃ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি' এ বাক্য সিদ্ধ! "রসরাজ মহাভাব দুয়ে একরূপ"—শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনরূপ এই যে যুগলরূপ দর্শন-বর্ণন, ইহা উক্ত তত্ত্বেরই সুমহান্ সাক্ষ্য। বস্তুতঃ অহৈতুকী প্রীতির প্রকৃত পূর্ণ স্বরূপই রাধা-তত্ত্ব, তাহা কৃষ্ণ-তত্ত্ব সহ চিরঅবিচ্ছিন্ন; তবে লীলার যে বিরহ, তাহা কেবল রস-পুষ্টির নিমিত্ত মাত্র। গোমুখী-মুখ-মুক্ত গঙ্গার পূত প্রবাহ যদ্রূপ প্রচণ্ড শিলাখণ্ড-বাধায় বাহত হইয়া, উদ্বর্দ্ধিত বেগে উচ্ছ্বসিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিমুখিনী অহৈতুকী ব্রজ-প্রীতির ভুবন-পাবন প্রবাহ 'জটিলা' 'কুটিলা', লজ্জা, ভয়, মান, বিরহ প্রভৃতি বহু শিলাখণ্ডে বাহত হইয়া উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সাধন-জগৎ প্লাবিত করিয়াছে! ফলে বিরহ প্রেম লীলার প্রধান সহায়, প্রধান উপকরণ ও প্রধান পোষণ। পরমার্থতঃ গোলোক-মিলনে বিরহ নাই, কিন্তু লীলার্থতঃ ব্রজ-মিলনে বিরহ আছে। অতএব ব্রজের যাহা গোলোকত্ব, তদবলম্বনেই "পাদমেকং ন গচ্ছতি" শ্লোকের প্রতিষ্ঠত্ব।

শাস্ত্র, সংস্কার ও অন্তস্তত্ত্ব-সমাচার, এই সর্ব্ব বিষয়েই ভক্ত বৈষ্ণবের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বরূপী! রসাস্বাদন-ভেদে তাই তাঁহাতে রাধা-কৃষ্ণ উভয় ভাবেরই বিকাশ! রাধার ভাব-কান্তি-বিলাসরূপী শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ হইলেও, তত্ত্বতঃ তিনি রাধা ছাড়া নহেন। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরূপা"। কৃষ্ণের প্রেমরূপা হ্লাদিনী শক্তিই মহাভাবময়ী রাধারূপে মূর্ত্তিমতী! অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-বৃন্দাবনে যেমন 'পাদমেকং ন গচ্ছতি'ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব থাকিলেও, তাহাতে লীলারস পোষণ ও প্রসারণ জন্য উৎকট কৃষ্ণবিরহ, তজ্জনিত দিব্যোন্মাদ ও পর্য্যায়ক্রমে দশ দশারই অলৌকিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পূর্ণ-মাধুর্য্য-লীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে "পাদমেকং ন গচ্ছতি"ভাবে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, লীলারসের পোষণ-প্রসারণার্থই এই মহামাথুর-বিরহ! অতএব লীলার্থতঃ প্রভাসে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন হইলেও, পরমার্থতঃ উহা মাধুর্য্য-কৃষ্ণের সহিত ঐশ্বর্য্য-কৃষ্ণের পূর্ণমিলন মাত্র! কৃষ্ণ-হৃদয়ে রাধার অন্তর্ধান এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যান মাত্র! সে যাহা হউক, অহৈতুকী ভক্তি ভিন্ন আর কোন মতেই স্বয়ং কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-সেবিত এই অতুলামৃত ব্রজলীলা-রসের কণিকাস্বাদনেও অধিকার হয় না। এই জন্যই এই শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে কেবল সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপিণী অহৈতুকী ভক্তিরই ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

এক্ষণে ব্রজের অহৈতুক প্রেমের দু-চারিটি উদাহরণ নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে উপনীত হইব। যাহা আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে কেবল কষ্ট দেওয়া মাত্র, তাহাও ব্রজের স্বাভাবিকী কৃষ্ণসুখৈক-পরায়ণতায় কেবল অহৈতুক প্রেমের কার্য্য মাত্র। মনে করুন, ছার একটুকু ননীর জন্যে হয়ত যশোদা কৃষ্ণকে কখনও তাড়ন-পীড়ন, কখনও বা ভৎ‌র্সন-বন্ধনও করিতেছেন, কিন্তু তাহাও বাৎসল্য-প্রেমে

ডগমগ হইয়া! যশোদা জানেন, 'কৃষ্ণ আমার চুরী করে খেতে ভালবাসে; সাধা-ননী অপেক্ষা যেন চোরা-ননী কৃষ্ণের বেশী ভাল লাগে।" ভর্ৎসন-বন্ধনাদিতে যে সে চৌর্য্যের পর্য্যবসান হইবে, নন্দরাণীর অবশ্য সে আশা ছিল না; কারণ শ্রীমান তেমন ছেলেই নয়! তবে তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চৌর্য্য-চাতুর্য্য—সাবধান-সঙ্গোপন আরো বাড়িবে, এবং তল্লব্ধ নবনীত কৃষ্ণকে বেশী প্রীত করিবে, এ বিশ্বাস থাকায়, নন্দরাণীর কৃষ্ণ বন্ধনাদি কৃষ্ণতার্থে কৃষ্ণসুখান্বেষী অহৈতুক স্নেহেরই লীলা-বিলাস! কৃষ্ণও তাই চোর-চূড়ামণি! ননী-চুরী, বসন-চুরী, সঙ্গে সঙ্গে মন-চুরী! চুরী কৃষ্ণের ব্যবসায়! আহা! ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণের এই মন-চুরী বর্ণনে কি মন-চোরা গানই গাহিয়াছেন!—

"( ও তার )
বাঁশীটি না সিঁধ-কাঠি!
নারীর বুকে সিঁধ কাটি,
সরমের গাঁটি কাটি,
নিয়েছে সব লুটিপাটি "

'কৃষ্ণ" নামের "কৃষ্" ধাতুর অর্থই আকর্ষণ; তবে আকর্ষণটি একটু গোপনে হয়, কাজেই চুরী! বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও কৃষ্ণ চুরী স্বভাব ছাড়িতে পারেন নাই; "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! যাহা হউক, আমরা মূল প্রসঙ্গ হইতে একটু অধিক আসিয়াছি। তবে কিনা, কৃষ্ণকথার 'ফাও' দিতেও সুখ, নিতেও সুখ।

তারপর, নন্দের একটি কার্য্য দেখুন। কৃষ্ণের মস্তকে নিজের "বাধা" (পাদুকা-বিশেষ) বহাইতেন। কৃষ্ণ নিজেই জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইতে পিতৃবাধা মাথায় বহিতেন। নন্দ সে বাধা-বহনে বাধা দিতেন না। নন্দ জানিতেন যে, তাঁর প্রাণ-নন্দন কৃষ্ণ তাঁহার বাধা-বহনে বড়ই আনন্দিত; সুতরাং সে আনন্দে নন্দের আনন্দ শত-ধারায় উছলিত। অতএব কৃষ্ণানন্দপরায়ণতাই মূল বলিয়া, অহৈতুক-কৃষ্ণ-বাৎসল্য-বিভোর নন্দের এ কার্য্য নিন্দনীয় নহে; বরং ব্রজভজন ভক্তের সানন্দ-বন্দনীয়।

আবার শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণ-সখা ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতেন, কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন কৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া ঝগ্‌ড়ি, রগ্‌ড়া রগ্‌ড়ি, হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি করিতেন। সৌভাগ্য আর কাহাকে বলে?

"কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে প্রেম-রণ
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥"

ফলে এ সমস্তই কেবল কৃষ্ণ-সুখাভি সন্ধিমূলক অহৈতুক সখ্য-প্রেমের ফল কৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া ব্রজবালকেরা অতুল নন্দে অমৃতাভিষিক্ত হইত; কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকে না দিয়া কোন আনন্দ ভো করিতে পারে না। কৃষ্ণের অনাস্বাদি আনন্দ তাহাদের পক্ষে নিরানন্দ মাত্র তাই শ্রীর অধিক ভাগ্যধর শ্রীদামা ভাবিত, "কাঁধে চড়ার সুখ ত কৃষ্ণ দিলাম, কিন্তু কাঁধে চড়াইয়া যে সু সে অতুল্য সুখ কি ভাই কানাইকে দি না? অতএব চড় কানাইর কাঁধে!" আ

উচ্ছিষ্ট ফল কি সাধে খাওয়ায়? মিষ্ট লাগিলে যে আর মুখে যায় না! আর কৃষ্ণকে না দিয়া নিজেদের খাওয়া চলে না।

"বড় সুমিষ্ট ফল, খাওরে কৃষ্ণ!
আমরা খেয়েছি॥
মধুর পেয়ে, আর না খেয়ে,
(বড়ায়) বেঁধে এনেছি॥"
(ইত্যাদি।)

আর একটি গানে আছে,—

"(ও ফল) খেতে খেতে যখন মিঠে লাগে,
বলে আর খাবনা, কানাই খাবে।"

আহা! এই সব গান যেন ব্রজের অহৈতুক সখ্যপ্রেমের মধুর 'মোরব্বা'!

ভক্ত পাঠক! তবে একবার "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পালায় আসুন! মান বস্তুটি কি? প্রেমের মান অবশ্য লৌকিক সম্ভ্রমার্থক মান নহে। উহা প্রেম-সিন্ধুরই তরঙ্গ-রঙ্গ বিশেষ। রসশাস্ত্র বলেন,—

"কার্য্যকারণতান্যোন্যমতঃ প্রণয়মানয়োঃ"

অর্থাৎ প্রণয় ও মান, উভয়ই উভয়ের কারণ ও কার্য্য। প্রণয়েই মানের আবির্ভাব, আবার মানেই প্রণয়ের প্রভাব! তাই শ্রীমতীর সেই মানও শুধু শ্রীকৃষ্ণসুখৈষণা বৃত্তিরই ফল। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সেবার মর্ম্ম জানেনা। তাহার 'সাধারণী' নারীর ন্যায় নির্দ্দয় কৃষ্ণ সম্ভোগ শ্রীরাধার অসহ্য। 'রাধ্' ধাতুর মূর্ত্তিমতী অর্থরূপিণী রাধা ভিন্ন সেই জগদারাধ্য কৃষ্ণধনের আরাধনা বা সেবা জগতে আর কে জানে? তাই ব্রজ-সখাগণ রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়াই কৃতার্থ। যুগল-সেবার ভজনেই তাঁহারা চরমচরিতার্থ। তাই কৃষ্ণসেবাস্বরূপিণী কৃষ্ণার্থিকা রাধিকা মহামাথুর বিরহে মরিতে যাইয়াও যেন সাহস করিয়া মরিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—"মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব"। অমনি তখনি আবার ভাবিতেছেন "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?" তবে যদি এই অসহ্য বিরহ-বিষে নিতান্তই মরণ হয়, তবু কৃষ্ণ-সেবার এই অদ্বিতীয় উপাদান রাধা-অঙ্গ যেন নষ্ট না হয়। তাই সখীদিগকে উপদেশ করিতেছেন—

"না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥"

অর্থাৎ এ কুঞ্জে তমালতরুই শ্যামসুন্দরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ তাই অন্ততঃ শ্যামানুকৃতি-তনু শ্যামল তমাল-ডালেই শ্যাম সোহাগিনীর শ্যামসেবাঙ্গ বাঁধিয়া রাখার অনুরোধ। আর একটি আশাও আছে। সেটি কৃষ্ণের আসার আশা।

"যদি কভু পিয়া মোর আসে বৃন্দাবনে।
মৃতদেহে প্রাণ পাব পিয়া-পরশনে॥"

ইহার আর ব্যাখ্যায় কাজ নাই; রসভঙ্গ হইবে। কেবল নয়ন-নীরে নীরব আস্বাদনই এখানে প্রার্থনীয়। যাহাহউক, এহেন রাধার যে কৃষ্ণসেবা, চন্দ্রা তাহা কোথায় পাইবে? তাই হয়ত চন্দ্রার স্বসুখগন্ধী কৃষ্ণসেবায় বা সম্ভোগে কৃষ্ণসুখৈক প্রাণা রাধার এই প্রণয়-কোপ বা মান। তদ্ভিন্ন রাধার প্রেম-পাথারে হয়ত আরও কত ভাব-পবনোচ্ছ্বাসে যে এই মান-তুফান উঠিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহ, পুনর্ম্মিলন, এসব প্রেম-তরঙ্গেরই বিচিত্র রঙ্গ ভঙ্গ মাত্র। এই

জন্যই শাস্ত্র বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ" অর্থাৎ প্রেমের গতি-রঙ্গ ভুজঙ্গবৎ। অতএব এই মান প্রেমের একটি মোহন অঙ্গভঙ্গি। কষ্টার্জ্জিত বস্তু বড় প্রিয়; সুতরাং মানভঞ্জনার্জ্জিত মিলনে কৃষ্ণের বড় লোভ। ক্ষুধায় খাওয়া, গ্রীষ্মে হাওয়া, পিপাসায় পান, আর দীনতায় দান, বড় প্রিয়—বড় প্রাণারাম; তদ্রূপ প্রিয়-সুখৈক-পরায়ণা প্রিয়ার "স্মরগরল-খণ্ডন" চারু চরণ ধারণেও মান-ভঞ্জনান্ত-মিলন প্রেমিকের পরমানন্দ-প্রস্রবণ; আর সেই লোভেই বুঝি রাধার নব নটবর প্রেমিক নাগর কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রার মন্দিরে নৈশ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ! অতএব কৃষ্ণসুখৈষণা-সঞ্জাত রাধার মানও অহৈতুক প্রেমের এক মহার্হ দান। উহা কৃষ্ণের পক্ষে বাহিরে প্রচণ্ড দণ্ডবিধান হইলেও, অন্তরে অখণ্ড আনন্দ-নিদান! ফলে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ব্রজলীলা কেবল মাধুর্য্যরসের মেলা—অহৈতুক প্রেমের খেলা! ব্রজভূমির প্রত্যেক অণু-পরমাণুও বুঝি অহৈতুক প্রেমমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত! আহা! স্বয়ং অহৈতুক প্রেমের অতল অনন্ত উচ্ছ্বসিত সিন্ধু জীবের বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে কৃপা করিয়া ব্রজ-রসাস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্যই এই শিক্ষা-শ্লোকে সেই দেব-দুর্লভা অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনীয়তা শিখাইয়াছেন।

আমাদের পক্ষে এই শিক্ষা-শ্লোকের শিক্ষা হৃদয়ের সম্মুখে উচ্চতম ও পূর্ণতম আদর্শরূপে রাখিয়া ভজনপথে অগ্রসর হওয়ার উপায় বটে; কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক সাধনাধিকার-সম্ভাবনা প্রথমতঃ বৈধী বা হৈতুকী ভক্তিমার্গে। শাস্ত্র বলেন,—

"বৈধী ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
তত্রঃ শাস্ত্রং তথাতর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥"

অর্থাৎ—

ভাব-আবির্ভাবাবধি বৈধীভক্তি-অধিকার।
শাস্ত্র আর অনুকূল তর্কের অপেক্ষা যার॥

অতএব অনুকূল শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয়ে ভাবের আবির্ভাবনা করা বৈধী বা হৈতুকী ভক্তির অধিকার। ভাবোদয়ে রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তির স্বতঃসঞ্চার। অধিকারের ক্রমোন্নতি অবশ্য অব্যাহত সাধনগতিতে শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধ হয়। ফলে কাহারই নিরাশ হইবার কথা নহে। দুরাশাই নিরাশার জননী। স্বাধিকারগত গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিলে, আর অনধিকার-চর্চ্চামূলক দুরাশার ভয় থাকেনা; গুরু-কৃপায়, আজ যাহা দুরাশা, কাল তাহা সুআশায় পরিণত হইতে পারে। হৈতুকী ভক্তি হইতেই ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি লাভ। পূর্ব্বনিবেদিত ধ্রুবচরিত্রের উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হৈতুকী ভক্তিযোগে কোন ফলাভিসন্ধিমূলক সকাম কৃষ্ণভজন করিলেও, কৃষ্ণ স্বয়ং কৃপা করিয়া ক্রমে সেই উপাসককে নিষ্কাম ভজনাধিকারী করিয়া অহৈতুক-ভক্তি-ধন দানে কৃতার্থ করেন। শ্রীভাগবতে কৃষ্ণকৃপাময়ের সেইরূপ কৃপা-ভরসা স্পষ্ট পরিব্যক্ত; যথা—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্।"

আমরা আর এ শ্লোকের অবিকল

পদ্যানুবাদ কবিরাজ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ইহার ভাষারূপে যে মধুর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
সুধা ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

কাম—অর্থাৎকামনা ছাড়িতে পারিলেই কৃষ্ণ-দাস্যপ্রদায়িনী অহৈতুকী ভক্তি লাভের অধিকার হয়। তাই আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকে প্রধান পার্থিব কামনায় বিষয় ধন-জন-সুন্দরী-কবিত্ব প্রভৃতির নিষ্কামনা বা নিবৃত্তি জানাইয়া, ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐরূপ ভক্তিপ্রার্থীর কাছে কি আর প্রয়োজনীয় ধন-জনাদি আসিবেনা? তাহা আসিবার বাধা কি? বরং অবাধে আসিবে। ভগবান নিজে তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় বহন করিবেন। গীতায় ভগবান স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন;—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ—

যারা মোরে ভজে নিত্য একচিত্তে রহি।
সে নিত্যযোগীর বিত্ত নিজে আমি বহি॥

ইহার উপর আর কথা কি? ধান পাওয়ার আশা পাইলে আর নাড়ার ভাবনা ভাবে কে? নাড়ার জন্য কেহত ধান বোনে না; ধানের জন্যই ধান বোনে। তথাপি প্রয়োজনানুরূপ নাড়া অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই পাওয়া যায়। অতএব অহৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজিতে হইবে। বিষয়বাঞ্ছা না থাকিলেও, প্রয়োজনীয় বিষয়-সিদ্ধি ভগবদ্বিধানেই স্বভাবতঃ সম্পন্ন হইবে। অতএব যে দিক দিয়াই দেখুন, যে ভাবেই বিচার করুন, বুঝিতে হইবে যে, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র সাধনীয় ও প্রার্থনীয়। যতদিন সকাম ভজনা, ততদিনই হৈতুকী ভক্তির ক্রিয়া। ক্রমে যখন ভক্তি মাত্র থাকেন, কিন্তু কামনা উড়িয়া যায়, তখনই সেই ভক্তি অহৈতুকী হন। একটা অতি স্থূল লৌকিক উদাহরণ দেখুন। যেমন, কেহ কাশ, বাত, শূল বা উদরাময় প্রভৃতি রোগের রোগা কামনায় আফিং খায়, এবং ক্রমে রোগ হয়ত সংপূর্ণ সারিয়া যায়; কিন্তু আফিং আর সে ছাড়িতে পারে না। তখন সে আফিঙ্গের নেশায় পড়িয়া আফিঙ্গের জন্যই আফিং খায়। তদ্রূপ সাধক বিষয়-কামনায় হৈতুকী ভক্তিযোগে ভগবানকে ভজিলেও, ভগবানেরই কৃপা-বিধানে সে বিষয়-কামনা তিরোহিত হয়; কিন্তু সে ভজনের নেশা লাগিয়া যায়; ভজন আর সে ছাড়িতে পারে না। বিষয়ের জন্য যে ভগবানকে ভজিত, সেই তখন ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভজে। ভগবানকে না ভজিয়া তখন আর সে থাকিতে পারেনা। ভগবান ভিন্ন তাঁহার তখন অন্য কিছুই ভাল লাগে না। কোন বিবিধ

বিষয়-বিলাস-বেষ্টিত ভোগী ভোগকামনা-মূলক হৈতুক ভজন করিতে করিতে ক্রমে ভগবৎ কৃপায় অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া, তাঁহার সকল বিলাসই তখন সেই ব্রজবিলাসী হরিতে বিলসিত বা পরিণামিত দেখিতেন! তাই অকতরে বলিয়াছিলেন,—

"হরি মেরা ধনদৌলৎ, হরি মেরা জান।
হরি মেরা তাম্বাকু, হরি মেরা পান॥
হরি মেরা গোলাব-পাশ, হরি আতরদান।
হরি মেরা নক্সত্ ঔর্ সঙ্গীত্ কি তান্॥"

অনুবাদ অনাবশ্যক। ফলে হরিতে মন মজিলে, জগতের আর কোন্ মজাই সাধককে মজাইতে পারে না। অথবা সকল মজাই সে হরিতে পায়। সংসারের সারাৎসার 'আসল মজাদার' জিনিস পাইলে তাকে মজার আর কে মজে? একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই সেই আসল মজার আস্বাদন লাভ হয়। অতএব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু হরির চরণে জীবের যদি কোন বাঞ্ছা নিবেদন করিবার থাকে, তবে বিষয়-বাঞ্ছা বর্জ্জনেই সেই বাঞ্ছা,—আর অহৈতুকী ভক্তিযোগে সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন অর্জ্জনেই বাঞ্ছা। বলিয়াছি ত, যতদিন জীবের আমিত্বধর্ম্ম থাকে, ততদিন বাঞ্ছারও অস্তিত্ব থাকে; অতএব আমিত্বধর্ম্মী জীবের সর্ব্ব-বাঞ্ছার সারনিষ্কর্ষ বা চরমোৎকর্ষ যাহা হইতে পারে বা হওয়া উচিত, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত এই চতুর্থ শিক্ষা-শ্লোকে চিত্রিত। কিন্তু কেবল ভগবানে বাঞ্ছা নিবেদন করিয়া রাখিলেই হইবেনা; জীবেরও [illegible] একটি অপরবাধিই কর্ত্তব্য আছে, সেই ভগবন্নাম-গ্রহণ। নামই জীবের অহৈতুকী ভক্তি-লাভের পুরুষের ঐকান্তিক উপায়—বিশেষতঃ কলির জীবের একমাত্র উপায়। তাই সন্দর্ভ-শেষে ভক্তপাঠককে একটি ভগবন্নাম-কীর্ত্তন উপহার দিয়া এবারের মত সাভিবাদন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(কীর্ত্তন-গীত)

"হরে কৃষ্ণ হরি বল্‌রে ভাই।
হরিনাম বিনে আর গতি নাই॥
যদি অহৈতুকী ভক্তি-লতার
বীজ দিলেন গুরু গোসাঁই;
(দিয়ে) নয়ন-আসার, হরিনাম-সার,
আর দেখি তায় ফুল ফুটাই॥
ও তায় উৎকৃষ্ট ফল কৃষ্ণ-সেবার
মিষ্টতার তুলনা নাই॥
হরি বল্‌রে—
(হরিনামে প্রেমে যুগল-মিলন!)
হরি বল্‌রে—
(আহা!) হ-কারে শ্রীমতী রাধা,
রি-কারে শ্রীকৃষ্ণ পাই॥
(ওরে) আর কিছু ত লাগ্‌বেনারে ভাই!
(নিলে) নামটি শুধু, পরাণ-বঁধু
পারে দিবেন ঠাঁই।
(ও সেই ভবার্ণবের)
নারে দিবেন ঠাঁই।
(জীবের) দুঃখ দেখে, গোলোক থেকে
নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(হরি) নাম এনেছেন গৌর-নিতাই॥
(ঐ) দেও হরিবোল, দেও হরিবোল,
হরিনাম-বোল গাও সবাই॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ মিত্র।
(কুলগাছিয়া)

# বেদান্ত-সূত্র।

( পূর্বানুবৃত্তি। )

---

## প্রথম অধ্যায়।

### চতুর্থ-পাদ।

প্রথমাধ্যায়ের এই চতুর্থ পাদে ২৮টী সূত্র আছে। ইহার প্রথম সপ্তসূত্র-রচিত একটি অধিকরণে কঠোপনিষদুক্ত "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" অথবা "সূক্ষ্মশরীর" সূচিত হয়, তাহাই বিচারিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী তিন সূত্রে ( ৮ম হইতে ১০ম ) দ্বিতীয় অধিকরণ গঠিত। তাহাতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত "অজা" পদে যে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে বুঝায়না, পরন্তু ব্রাহ্মীশক্তি অথবা আদি-কারণ-শক্তিকেই যে বুঝায়, তাহা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। তৎপর আর তিন সূত্রে—অর্থাৎ ১১শ হইতে ১৩শ সূত্রে তৃতীয় অধিকরণ অধিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "পঞ্চ-পঞ্চজন" শব্দে যে সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না, এই অধিকরণে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণটি ১৪শ ও ১৫শ, এই সূত্রদ্বয়গত। এই অধিকরণের বিচারিত বিষয়, ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতাই যে বিশ্বের কারণস্বরূপ, এ তত্ত্বে সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্তই অবি-সংবাদে সমর্থিত। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ সূত্র-সংগঠিত পঞ্চম অধিকরণে ইহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে, কৌশিতকী উপনি-ষদের কতিপয় শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয়, কিন্তু প্রাণবায়ু বা জীবাত্মা নহে। ১৯শ হইতে ২২শ সূত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধিকরণ; তাহাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্বই বিজ্ঞেয়, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে, ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত। তৎপর ২৩শ সূত্র হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত সপ্তম অধিকরণ কল্পিত; তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেবল মাত্র "নিমিত্ত কারণ" নহেন, কিন্তু "উপাদান কারণ"ও বটে। অবশেষে ২৮শ সূত্রাত্মক অষ্টম অধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংখ্যমতের খণ্ডন বিশ্ব-সৃষ্টির মূলকারণনির্ণায়ক অপর মতবাদের প্রতিও প্রযোজ্য, যথা পরমাণুবাদ।

বৈদান্তিকগণের সহিত সাংখ্যমতবাদি-গণের অবিশ্রান্ত বিচারসংগ্রাম চলিয়া-ছিল। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ কেবল সাংখ্যদর্শনের 'প্রধান'বাদের খণ্ডনেই প্রায় পর্য্যবসিত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, বিশ্বের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা; পরন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে বিশ্বের কারণ বলিয়া উপনিষৎ অর্থাৎ বেদান্তের কুত্রাপি কোন শ্রুতিতে স্বীকৃত বা বিবৃত হয় নাই। ফলে সাংখ্যোক্ত প্রধানই বেদান্তোক্ত ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়ারূপে বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। তবে পার্থক্য এই যে, বৈদান্তিক-গণের মতে ঐ মায়া ব্রহ্মের শক্তি বিধায়, উহা শক্তিমান ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অধীন, কিন্তু সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্তে জড়রূপের প্রধানই চেতনানিরপেক্ষ স্বাধীন ও সর্ব্ব-কর্ত্তা। জড়জগতের হেতু যে মায়া, তাহা বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন, কিন্তু উহা ব্রহ্মের শক্তি মাত্র জানিয়া, উহাকে অচে-

ক্রম করিয়া, তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন। পক্ষান্তরে, সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে অতিক্রম করেন না; পরন্তু সৃষ্টিমূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উহাতেই উপসংহৃত হন।

বাস্তবিক কতিপয় উপনিষদে এই উভয় মতেরই সমীকরণ দৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্বমতদার্ঢ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে সমাগত যে, কোন উপনিষদের কোন শ্রুতির কুত্রাপি সাংখ্যোক্ত 'প্রধান-বাদ' প্রশ্রয় পায় নাই। ফলে যেখানে যেখানে যে কোন উপনিষদী শ্রুতির যে কোন উক্তিতে সাংখ্যমত সমর্থনের সন্দেহ হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহারা সেই শ্রুতির সেই উক্তির বেদান্ত-মতানুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতের ষড়দর্শন প্রকৃত সম্যক্‌হিতভাবে অধীত ও আধ্যাত্মিকধীষণা সহযোগে সূক্ষ্মভাবে বিচারিত হইলে, তাহাদের স্ব স্ব মতসিদ্ধান্তে পরস্পর কোন বিরোধ বা বিসম্বাদিতা দৃষ্ট হইবে না। বাস্তবিক ছয়টি দর্শন যেন একটি সোপানেরই ছয়টি পদ্ধতি বা ধাপ। ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন যেন তাহার সর্বোচ্চ বা শেষ ধাপ। ক্রমশঃ পদ্ধতি-পরম্পরায় এই সোপান অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-সৌধে সমারোহণ করা যায়। একেবারেই কেহ সর্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া সৌধপ্রবেশে সমর্থ হয়না; সুতরাং [illegible] [illegible] অভিমতে [illegible] পরস্পরে অবিরোধী। এই মূল [illegible] [illegible] উপেক্ষিত হইলে, আমরা [illegible] [illegible] [illegible]

ঘুরিব; কদাচ [illegible] সারসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বাধ্যায়ের প্রকৃত সুফললাভে সমর্থ হইব না; অথবা কোন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের মৌলিকত্ব অনুভবে অধিকারী হইতে পারিবনা।

কোন একটি সত্য হইতে অধিকার-ক্রমানুসারে উচ্চতর সত্যে আরোহণ স্বাভাবিক নিয়ম; অতএব নিম্নস্থ সত্য 'সত্যই নহে,' অথবা উচ্চতর সত্যের অস্তিত্বই নাই, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দার্শনিক বিচারে স্বতই অনুপপন্ন ও অস-ঙ্গত। যাহাহউক, এক্ষণে বেদান্তসূত্রের চতুর্থপাদের সূত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১ম। আনুমানিক মধ্যে কেষা-মিতি চেন্ন শরীররূপক বিন্যস্ত গৃহীতে দর্শয়তি চ।

২য়। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

৩য়। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

৪র্থ। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

৫ম। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ।

৬ষ্ঠ। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাস প্রশ্নশ্চ।

৭ম। মহদ্বচ্চ।

৮ম। চমসবৎ বিশেষাৎ।

৯ম। জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা [illegible] অধীয়ত [illegible]

১০ম। [illegible]কল্পনোপদেশাচ্চ [illegible] দিবদবিরোধঃ।

(অধ্যায়ানুবাদ)

১। কতিপয় ঔপনিষদী শ্রুতিদ্বারা যে সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ ; যেহেতু আপাততঃ প্রধান-লক্ষণ-প্রতিপাদক শ্রৌত বাক্য যে প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম শরীরের রূপক রূপেই বিন্যস্ত; তাহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

২। লক্ষণের উপযোগিতা হেতু "অব্যক্ত" শব্দে সূক্ষ্ম শরীরই সূচিত হইতেছে, কিন্তু "প্রধান" নহে।

৩। শাস্ত্র-যুক্তিমতে অব্যক্ততত্ত্ব ব্রহ্মের অধীন বিধায়, তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বাধীন "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৪। অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব শাস্ত্রে উক্ত না হওয়ায় "অব্যক্ত" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

৫। সাংখ্যোক্ত "প্রধান" অপ্রাজ্ঞ বিধায়, শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হয় না ; পরন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রতিপাদিত হন।

৬। প্রশ্নানুসারে তিনটি তত্ত্বমাত্রের উপন্যাস হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে অব্যক্ত রূপে প্রধান সূচিত হয়নাই।

৭। "অব্যক্ত" পদ "মহৎ" পদের ন্যায় প্রযুক্ত হওয়াতে, তদ্দ্বারা প্রধান পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

৮। "চমস" পদের প্রয়োগবৎ, "অজা" [illegible] রূপকার্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রধান প্রতিপাদিত হইতে পারে না। [illegible]

[illegible] স্বরূপ [illegible] "অজা" পদের অধীত হওয়ায়, "অজা" পদে "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

১০। শ্রুতিবিশেষে রূপকভাবে "মধু" শব্দে সূর্য্য সূচিত হওয়ায়, এবং শাস্ত্রে ঐরূপ আরও রূপকোক্তি থাকায়, ছাগী অর্থ-প্রকাশক "অজা" শব্দ দ্বারাও রূপক রূপে সৃষ্টির মূল ভৌতিক কারণত্ব অভিধেয়ীভাবেই সূচিত হইয়াছে ; কিন্তু তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত "প্রধান" সূচিত হয় নাই।

বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যমতের কোন বেদানুমোদিত প্রামাণিকতা নাই। এতৎপ্রতিবাদে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কঠোপনিষদুক্ত (১-৩।১১) একটি শ্রুতি নির্দ্দেশ করেন, যথা—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ। সাংখ্যশাস্ত্রেও এই ত্রিতত্ত্ব স্বীকৃত ; সুতরাং উক্ত ঔপনিষদী শ্রুতি দ্বারা সাংখ্যমতের মূলতত্ত্ব বেদ-প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই সাংখ্য-বাদিগণের সিদ্ধান্ত। মূল জ্ঞানতত্ত্ব বা অনুভূতিই মহৎ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতত্ত্বই অব্যক্ত। এই অব্যক্তস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই মূলতঃ ও মূলতঃ সর্ব্বজগতের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী ; আর পুরুষ জীবাত্মা। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। বেদান্তবাদীরা বলেন, "সাংখ্যবাদীরা শ্রৌতবাক্যের সহিত কেবল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কতিপয় শব্দসাম্য পাইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত প্রকৃত অর্থসামঞ্জস্য পান নাই। ফলে ঐ [illegible] [illegible]

করিতে হইলে, মূল আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং সমগ্র উপনিষদ খানি অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রকরণ ও উপক্রম-উপসংহার বিচার করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু শুধু এখানকার ওখানকার দুচারিটা ছুটা ছুটা উক্তির শাব্দিক অর্থের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আলোচ্য শ্রুতিটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একটি রূপকোক্তির শ্রুতি দৃষ্ট হয়। উহাতে আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলা হইয়াছে, ইত্যাদি। শ্রুতিটি এই,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ—

আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥
ইন্দ্রিয়েরা অশ্ব তার বিষয়ের পথে।
দেহ-মনযুক্ত আত্মা 'ভোক্তা' জ্ঞানী-মতে॥

তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক ইন্দ্রিয়-সংযম-সিদ্ধ, সে-ই সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব পরমাত্ম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে অধিকারী। শ্রুতি যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

[illegible] অর্থাৎ—

[illegible]
[illegible] বুদ্ধি, বুদ্ধি হ'তে [illegible]॥
মহৎ-পরে অব্যক্ত, পুরুষ অব্যক্তের পার।
সেই কাষ্ঠা, পরাগতি, তারপর নাহি আর॥

আমরা পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত-বাক্যটির ন্যায় পরোক্ত শ্রৌত-বাক্যটিতেও ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পাইলাম। আবার পরোক্ত বাক্যটিতে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় 'আত্মা' শব্দটিও পাইলাম। কিন্তু পার্থক্য মাত্র এই যে, প্রথমোক্ত বাক্যটির আত্মা জীবাত্মা ও পরবর্ত্তী বাক্যোক্ত আত্মা পরমাত্মা। ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে পরমার্থতঃ অভিন্ন এ সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে কেবলমাত্র প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয় বাক্যটিতে শরীরের উল্লেখ নাই। অতএব ইহার সমাধান এই যে, দ্বিতীয় উক্তির "অব্যক্ত" পদেই প্রথমোক্তিস্থ 'শরীর' সূচিত হইতেছে। সুতরাং এ স্থলে অব্যক্ত পদে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিশ্ব-মূল-কারণরূপে প্রধানকে বুঝায় না। তবে কি প্রকারে এই স্থূল সুব্যক্ত ভৌতিক শরীর "অব্যক্ত" শব্দে সূচিত হইতে পারে? তদুত্তরে (২য় সূত্রে) বলা যায় যে, উক্ত বাক্যে "কারণ-শরীর" বা "লিঙ্গশরীর"কে বুঝাইতেছে। এই 'লিঙ্গশরীর' হইতেই ভৌতিক স্থূলদেহ সঞ্জাত। কখন কখন কারণবাচক শব্দ কার্য্যবাচকরূপে গৃহীত হয়। যথা স্বয়ং বেদে ( [illegible] ) বলিতেছেন,—"গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং"—অর্থাৎ গরু সহিত সোম মিশাও। এস্থলে 'গরু' অর্থে গরুর দুগ্ধ। ফলে দুগ্ধ সহ সোমমিশ্রণেরই বিধি। অতএব "অব্যক্ত" শব্দ প্রয়োগে ভৌতিক স্থূল শরীর [illegible] বাধা কি? [illegible] (ক্রমশঃ।)

বলেন,—"তদ্বেদম্ তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি।" অর্থাৎ এ সব কিছুই ছিল না; সমস্ত অব্যক্ত ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নামরূপউপাধিযুক্ত বহুভেদ-বিশিষ্ট সুব্যক্ত জগৎকেও অব্যক্ত বলা যায়; যেহেতু ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাদির সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য হইয়া বীজশক্তিরূপে অবস্থিত ছিল। অতএব যেমন এই সুব্যক্ত জড়-জগতের একটি অব্যক্ত বীজীভূত অবস্থা আছে, তদ্রূপ এই সুব্যক্ত স্থূল শরীরেরও একটি অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ-শরীর আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, (৩য় সূত্র জগতের অব্যক্ত কারণাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান কিনা? ইহাতে সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে, "হে বৈদান্তিকগণ! নাম-রূপ-উপাধি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে যে এই জগতের অব্যক্তাবস্থা ছিল, তাহা তোমরা স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা আমাদেরই মত সমর্থন করা হয়।" তদুত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, "না, তাহা নহে। যদি আমরা জগতের আদি অব্যক্ত অবস্থাকে ব্যক্ত জগতের স্বাধীন কারণ-রূপে স্বীকার করিতাম, তবে তোমাদের মত সমর্থন করা হইত বটে, নচেৎ নহে।" বাস্তবিক বৈদান্তিকেরা জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত কারণাবস্থা স্বীকার করিলেও, সেই অব্যক্ত তত্ত্বকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মেরই অধীন বলেন। [illegible] যদি এই ভৌতিক জগতের [illegible] একটা পূর্ব্ববর্ত্তী বীজীভূত [illegible] স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বর [illegible] বলিয়াই প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বরের কোন কার্য্যই থাকে না; সুতরাং কার্য্যের কারণরূপিণী বীজশক্তির অভাবে কার্য্য-রূপ সৃষ্টিও থাকেনা। অতএব ঐ কারণ-রূপা বীজশক্তিই বৈদান্তিকগণের মতে মায়া। 'আকাশ' 'অক্ষর' এবং ঐরূপ সমতাৎপর্য্যবোধক শব্দেও মায়াই সূচিত হইয়া থাকে। "এতস্মিন্ন খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ।" (বৃঃ উঃ ৩।৮।২) অর্থাৎ—হে গার্গি! এই অক্ষরে নিশ্চয় আকাশ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে থাকে, ইহাই বেদবাক্য। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুঃ উঃ, ২—১।২) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (শ্বেঃ উঃ—৪।১০) অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি জানিবে এবং মায়া যাঁহার, তাঁহাকেই মহেশ্বর জানিবে। কঠোপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির 'মহৎ' শব্দে যদি জীবাত্মা বুঝায়, তবে "অব্যক্ত" শব্দেও বেদান্তদর্শনের "মায়া" বুঝাইবে। অতএব "অব্যক্ত" শব্দের অর্থ যেরূপই গৃহীত হউক; অর্থাৎ উক্ত শব্দে জীবের সূক্ষ্ম কারণ-দেহকেই বুঝাউক্ বা এই স্থূল ভৌতিক জগতের বীজীভূত সূক্ষ্ম কারণাবস্থাই বুঝাউক্, ফলে তদ্দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত, জগতের স্বাধীন আদিকারণরূপে কল্পিত প্রধানকে কখনও বুঝাইবেনা।

৪র্থ সূত্র।—কঠোপনিষদুক্ত ঐ 'অব্যক্ত' পদে সাংখ্যদর্শনের "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কঠ শ্রুতির "[illegible]" [illegible] [illegible]

বা শ্রেণিরূপে উক্ত হয় নাই; অতএব এই "অব্যক্ত" ও সাংখ্যের প্রকৃতি বা "প্রধান" কদাচ এক তত্ত্ব হইতে পারে না।

৫ম সূত্র।—এক্ষণে সাংখ্যপক্ষ এক নবতর্কে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, "প্রধান" জ্ঞানবিষয়ীভূত" বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, সাংখ্যপক্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তিতে প্রধান সূচিত হয় নাই; পরন্তু পরমাত্মাই সূচিত হইয়াছেন।

সাংখ্য পক্ষীয় সেই প্রামাণ্য শ্রুতিটি এই, যথা কঠোপনিষদ্ (১১—৩। ১৫)—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃপরংধ্রুবং
নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ—

অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপঅব্যয়।
অরস-অগন্ধ-নিত্যসত্ত্বময়॥
অনাদ্যন্ত-ধ্রুব মহতের পর।
যাঁরে জেনে মৃত্যু-মুখ-মুক্ত নর॥

সাংখ্য পক্ষীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এই শ্রুতি তাঁহাদের "প্রধান"কে প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু বেদান্তপক্ষীয়েরা বলেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু সমগ্র অধ্যায়টির মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব, সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া প্রধানকে বুঝিলে, স্পষ্টতঃ বিষয়বিপর্য্যয় দোষ ঘটে; অতএব [illegible] আরব্ধ বিষয় ত্যক্ত [illegible], [illegible] বিষয়ের অবতারণা হইয়া [illegible] সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই প্রতি-[illegible] হইতেছে যে, মানব ব্রহ্মকে জানি-লেই—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হয়; কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র-মতে কেবল প্রধানকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয় না, পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত 'পুরুষ'কেও জানিতে হইবে; অর্থাৎ পুরুষের আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্ভাবিত নহে। বৈদান্তিক মতে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরমার্থতঃ এক; যেহেতু আত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক; মায়া-মুক্তাবস্থায় সেই একত্বানুভূতি এবং একত্ব পরিণতিই মুক্তি।

৬ষ্ঠ সূত্র।—এ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য "অব্যক্ত" পদে কদাচ "প্রধান" ব্যক্ত হইতে পারে না। যেহেতু কঠো-পনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে, যম নাচি-কেতাকে মাত্র তিনটি তত্ত্বের বিষয় বলি-য়াছেন, যথা—অগ্নিচয়ন, জীবাত্মা ও পর-মাত্মা। নাচিকেতা কর্তৃক "প্রধান" সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন উত্তরও সম্ভাবিত নহে; অতএব 'অব্যক্ত' কদাচ 'প্রধান' হইতে পারেনা। তদুত্তরে সাংখ্যপক্ষ বলেন যে, নাচিকেতা প্রকৃত পক্ষে অগ্নিচয়ন, এবং আত্মা, এই দুই বিষয়ে মাত্র প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তোমরা বেদান্তপক্ষীয়েরাই স্বীকার করিতেছ যে, যম তিনটি তত্ত্ব বলিয়াছিলেন; সুতরাং নাচিকেতা কর্তৃক প্রধানতত্ত্ব জিজ্ঞাসিত না হইলেও, যম-কথিত ঐ অতিরিক্ত তত্ত্বটিকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে বাধা কি? [illegible] প্রত্যুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যদিও জীবাত্ম ও পরমাত্মা, এই দুইটি বিষয়ই যম কর্তৃক কথিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে

যে, উহা আপাততঃ গণনায় দুইটি বিষয় হইলেও, ফলিতার্থে একটি বিষয়ই বটে; কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ এক বা অভিন্ন।

৭ম সূত্র।—সাংখ্যদর্শনে 'মহৎ' পদটি যে অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষায় তাহা তদর্থে গৃহীত বা প্রযুক্ত হয় নাই। সাংখ্যমতে 'মহৎ' বুদ্ধি বা জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম বিকাশ; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য; যথা—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর" (কঃ উঃ ১—৩।১০) অর্থাৎ মহৎ আত্মা বা পরমাত্মা বুদ্ধিতত্ত্বের অতীত তত্ত্ব। 'মহান্তং বিভুমাত্মানং'। (কঃ উঃ ১—২।২৩) সর্বব্যাপী আত্মাই মহৎআত্মা। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ উঃ, ৩।৮) অর্থাৎ এই মহৎ পুরুষ কিনা পরম পুরুষ পরমাত্মাকে আমি জানি; ইত্যাদি। যাহাহউক, "মহৎ" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; এবং তদ্রূপ "অব্যক্ত" শব্দের তাৎপর্য্য সাংখ্যে যেরূপ, বেদান্তে তাহাহইতে ভিন্নরূপ; সুতরাং বেদান্ত-মতে "অব্যক্ত" পদে কদাচ সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদিত হইতে পারেনা।

৮ম সূত্র।—যে শ্রুতিটি মূল আলোচ্য বিষয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহা এই,—

অজামেকা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং।
বহ্বীপ্রজাং সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ॥
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে।
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

অর্থাৎ—

এক অজা রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
স্ব-রূপ বিবিধ প্রজা প্রসব সে করে॥
এক অজ ভালবেসে তার পাশে থাকে।
অন্য অজ উপভোগি ত্যাগ ক'রে তাকে॥

এই আপাতপ্রতীয়মান রূপকরূপী শ্রৌতবাক্যটির শাব্দিক অর্থ অবশ্য পরিষ্কার, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্যার্থের রহস্য-ব্যাখ্যায় সাংখ্য-সম্প্রদায় বলেন যে, 'অজা' পদে প্রধানই প্রতিপাদ্য; যেহেতু ইহাই জগতের আদিকারণ। লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই তিন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রধানের রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব গুণের লক্ষণ। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধানের স্বরূপ। ইহা হইতে ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি। আর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পুরুষ (তত্ত্বতঃ এক হইয়াও) দ্বিবিধ। ইহাই দুই অজ। প্রকৃতিও স্বয়ম্ভূতা বলিয়া অজা এবং এই আত্মারূপী পুরুষও স্বয়ম্ভূত বা স্বয়ম্ভূ, সুতরাং অজ। এই দুয়ের মধ্যে বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির প্রেমাধীন হইয়া প্রকৃতিতেই লাগিয়া থাকে; সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। আর মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ করে। বদ্ধজীব তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আপনার স্বরূপ চিনিতে না পারিয়া প্রকৃতির ভোগে ভুলিয়া থাকে; আর তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ আত্মতত্ত্ব লাভে অভ্রান্ত ও বলবন্ত হইয়া, প্রকৃতির প্রেমজাল ছিন্ন করিয়া, অব্যয় মোক্ষপদের যোগ্য হয়। এতাবতা সাংখ্যবাদীদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 'অজা' পদে প্রকৃতি বা প্রধানই পরিব্যক্ত।

বৈদান্তিকগণ এতদুত্তরে বলেন যে, একটি মন্ত্র আছে, যথা—"অর্বাগ্‌বিলস্ চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন" অর্থাৎ অধোমুখ ঊর্দ্ধতল একটি চমস (হাতা বা বাটীর ন্যায় যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ) আছে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক এতদ্দ্বারা কি বস্তু বুঝাইতেছে, তাহা জানা যায় না। তদ্রূপ আলোচ্য মন্ত্রের কেবল ঐ 'অজা' শব্দের দ্বারা উহাকে "প্রধান" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমুচিত নহে। "চমস" শব্দে উক্ত মন্ত্রেরই পরবর্ত্তী একটি শ্রুতিতে মুণ্ডক বা মস্তককে বুঝায়। 'চমস' সম্বন্ধে যেমন, 'অজা' সম্বন্ধেও তদ্রূপ যদি আর একটি পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্য পাওয়া যায়, তবে উক্ত 'অজা' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতীত হইতে পারে। কঠোপনিষদে একটি শাখায় বলা হইয়াছে যে, জ্বলন্ত স্থূল অগ্নির রক্তবর্ণই মৌলিক তেজের বর্ণ। আর স্থূল অগ্নির শ্বেতবর্ণই মৌলিক রসভূতের বর্ণ; এবং স্থূল অগ্নির কৃষ্ণবর্ণ মৌলিক ক্ষিতির বর্ণ। বেদান্তবাদিগণ বলেন যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্রৌত বাক্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় এই ক্ষিত্যপতেজ-তত্ত্ব। উক্ত উপনিষদেই স্থলান্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা ব্রহ্মের শক্তিরূপিণী মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, মূল মীমাংসিতব্য বিষয় অনুসারে আলোচ্য মন্ত্রটিতে সেই ব্রহ্মশক্তিই সূচিত হইতেছেন, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শ্রৌত বাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাই সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বীজ বা কারণ-তত্ত্ব এবং ক্ষিত্যপ্‌তেজের জনয়িত্রীত্ব হেতু উহাকেই ত্রিবর্ণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে ইঁহাকে "ছাগী" অর্থে গ্রহণ করিব না কেন? অজা শব্দের দুটি অর্থ; ছাগী এবং যাহা জন্মে নাই। "ক্ষিত্যপ্‌তেজ" ভৌতিক পদার্থ। "ভূত" শব্দের অর্থই জাত; অতএব উহা কদাপি অভূত বা অজাত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, উক্ত "অজা" শব্দটি আলোচ্যস্থলে রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইতে পারে। উপনিষদে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যকে এইরূপ রূপকভাবে "মধু" বলা হইয়াছে; আবার তদ্রূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাণীকে "গাভী" বলা হইয়াছে। অতএব আলোচ্য-স্থলেও যদিও জগতের মূল ভৌতিকতত্ত্ব ছাগী নহে, তথাপি ঐরূপ রূপক-ভাবেই "অজা" অর্থাৎ ছাগী বলা হইয়াছে।

যাহাহউক, এই সমস্ত বিতর্ক-বিচারের বৈদান্তিক সারনিষ্কর্ষ বা সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও সচরাচর বেদান্ত-শাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত "প্রধান" বৎ একটি তত্ত্ববিশেষ সূচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাংখ্যের সেই স্বপ্রধান স্বাধীন প্রধান নহে; তাহা "মায়া" অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি; তাহা ব্রহ্ম-সাপেক্ষ; সুতরাং স্বপ্রধানা বা স্বাধীনা নহে। কিন্তু নিরপেক্ষ-বিশ্ব-বিধাতৃত্বহেতু সাংখ্যের "প্রধান" বাস্তবিকই প্রধান; উহা স্বাধীন, স্বসাপেক্ষ ও স্বয়ম্ভূতত্ত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রে কোন ভাবেই উহা ব্রহ্মের অধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীশঃ——

# কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ।

মহাপ্রাণতার সুন্দর সুস্পষ্ট সুচিত্রিত মহান্ আদর্শ সমগ্রজগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা বিবেকানন্দ মরসংসারের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আকর্ষণ সম্পূর্ণ ছেদ করিয়া, মহাসমাধি-সোপানের সাহায্যে মহাশান্তি-ধামে গমন করিয়াছেন। স্থূলদর্শীর জন্য তাঁহার স্থূলদেহের কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানীর নয়নে এক বিরাট্ বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানময় মহাসত্তা অনন্তকালের জন্য অবিকৃতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার বিজয়ভেরীর ধীরগম্ভীররবে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, প্রত্যেক অণু সাকাঙ্ক্ষকর্ণে সেই মন্ত্রমধুর সঞ্জীবনশব্দ শ্রবণ করিতেছে, নবজগৎ নববিজয়ের জন্য তাঁহাকে নবপ্রীতিপূর্ণবচনে বারম্বার আহ্বান করিতেছে, এদিকে পাপতাপহারিতরঙ্গরঙ্গবিলাসিনী সুরধনীর পবিত্র প্রবাহের অনতিদূরে অবস্থিত সেই মহাপুরুষের মস্তকে শতধা উচ্ছলিত জননীর শতধার স্নেহের ন্যায় মহাকালের মাঙ্গল্য আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। পবিত্রতাময়ী জন্মভূমি জননীর সুস্নিগ্ধ-অঙ্কে নিরাতঙ্ক-মনে মহাত্মা পরমশান্তি-লাভের জন্য মহানিদ্রার্থে প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিলেন। উজ্জ্বল মধুর মহিমান্বিত-আলোক স্থূল-দৃষ্টির দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। মহাপুরুষ বিবেকানন্দের কর্ম্ম জীবন তীব্রতার আবর্ত্ত সঙ্কুল বহুলজটিলতাময় ঝটিকাপ্রবাহ স্বরূপ নানাভাবপূর্ণ হইলেও, চরম বড় স্থির, বড় গভীর, বড় সামঞ্জস্যযুক্ত, বড় মধুরিমাময়, বড় আনন্দময়, বড় নিরাবিল। মৃত্যু সংসারের সুখদবিশ্রাম। মৃত্যু বাধা বিপত্তি ঘাত প্রতিঘাতময়বিশৃঙ্খলজীবনের একমাত্র সুব্যবস্থা। অজ্ঞজনের মস্তকতাড়ন বক্ষোবিদারণের কারণ হইলেও বিজ্ঞের নিকট উহাতে বেশ সামঞ্জস্য আছে। কোনও স্বদেশপ্রাণ পরহিতরত মহাত্মার মরণে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার, বৃদ্ধি ব্যতীত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়না। স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মৃত্যুর পরই স্বদেশবৎসল বলিয়া পরিচিত হন। কেবল ফল দ্বারাই কর্ম্মের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অন্য কোনও রূপে উহার মর্ম্মবোধ হয় না। মহাপুরুষ বিবেকানন্দ যে কর্ম্ম আপনার প্রতিভূরূপে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বীজভাব অতিক্রম করে নাই। সময়ে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব অমৃতফল প্রসব করিবে। যাহাতে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমকিত বিস্মিত এবং অলৌকিক স্বাধীনতাপূর্ণকার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত আশ্বস্ত, আর স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া আনন্দে গৌরবে প্রাণ পুলকিত ও প্রেমে ভক্তিতে হৃদয় বিগলিত হয়। বিবেকানন্দ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তপরিবারের সন্তান হইলেও শিক্ষার সম্পদে তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। জাতীয়ধর্ম্মভাবেরপ্রবল প্রবাহ তাঁহার প্রাণের উপর ভাগীরথীর পূর্ণ

ধারার ন্যায় বহিতেছিল, জাতীয়ভাবের সাগর-সঙ্গমে তাঁহার প্রাণটীও সেই তরঙ্গে আপন রঙ্গে অপার আনন্দে ছুটিল। ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্তগমনে গন্তব্য-সমীপে উপস্থিত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা বিরাট্ ভারতবর্ষের প্রতি স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পৃথক্ নামে পরিচিত হইয়া পদচারী গৈরিকধারী কম্বলসম্বল বিবেকানন্দ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ভারতের সকলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূল-ভিত্তি কি? ভারতীয়-ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন-সত্য কি? এই বিষম-সমস্যার বিপুল-গবেষণায় তিনি যে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসমিতিতে সমগ্র সভ্য-জগৎ তাহার সুচারু-পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত-ভিত্তির নিকট অপর সকল দেশের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিই অদৃঢ় অমার্জ্জিত এবং অল্প মূল্য ইহা সভ্য-জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের জীবনে ইহাই প্রথম সাধনা এবং বর্ত্তমান ভারতের ইহাই প্রধান সাধনা। ঈশ্বর বিশ্বাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ছিল না। উত্তুঙ্গ-পর্ব্বতের তুহিনসঙ্কুল-স্থল হইতে যেমন নানাদিকে নানা নদ নদী প্রবাহ ছুটিতে থাকে, অথচ কাহারও বিরোধ নাই, সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ একই মহাপুরুষের নিকট হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ সত্যগুলি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইত, অথচ পরস্পর বিরোধ সম্পর্ক নাই, স্ব স্ব অধিকারে সকলেরই সমান মূল্য, সকলেরই লক্ষ্যস্থির, সকলের মধ্যেই যেন এক অলক্ষ্য সামঞ্জস্য বিরাজমান। তাঁহার অনেক বক্তব্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও নিপুণ-পর্য্যালোচনায় বিশেষচিন্তায় উহার অভ্যন্তরে যৌক্তিকতা এবং মৌলিক একতা দর্শন করিয়া অনেক পাশ্চাত্যদেশীয় বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেন। বিবেকানন্দ কখনও কপোলকল্পিত যুক্তি-জাল ও কূটতর্করাশির সমাবেশ করিয়া স্বমত পোষণ করিতেন না। তিনি বিরুদ্ধ-বাদীর যুক্তিতর্ক বা বিশ্বাস সিংহবেগে আক্রমণ করিতেন, যখন পরাজিত প্রতি-দ্বন্দ্বী স্বপক্ষরক্ষণে অক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক উপদেশ প্রার্থনা করিত, তখন উপনিষদের গভীর রহস্য বেদান্তের অমূল্য-তত্ত্ব বলিয়া দিতেন, ইহাপেক্ষা অন্যরূপ ধর্ম্ম উপদেশ বা শিক্ষা তাঁহার নিকট পাওয়া যাইত না। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি পুণ্য-পুঞ্জ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রাণের প্রিয় পরমপবিত্র উপনিষদের মহাসত্য ব্যতীত আর কিছু শিখি নাই বা জানি না।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মে—এদেশের বা এজাতির অধিকার স্বাভাবিক। যদি পাশ্চাত্য-দেশের সহিত এই প্রাচ্যভূখণ্ডের কোনওরূপ ধর্ম্মবিষয়ক সম্বন্ধ কখনও থাকে, তবে তাহা এই, ভারত আচার্য্য পাশ্চাত্যদেশ শিষ্য, ভারত আদর্শ পাশ্চাত্যদেশ অনুকারী, ভারত

শিক্ষক, পাশ্চাত্যদেশ শিশিক্ষু, ভারত সেবা পাশ্চাত্য-দেশ সেবক।" ভারতবাসীর ইহাই সান্ত্বনা, মহাত্মা বিবেকানন্দের জীবনেই ঐ সকল দৈববাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। ভারতের উন্নতি ধর্ম্মে "এই কথা তাঁহার মুখে সকলেই শুনিতেন। তিনি বলিতেন "ভারত পশুবলে বলীয়ান্ ছিলনা, ধর্ম্মবলই ভারতের চিরসম্বল, ভারত কখনও পাশ্চাত্যের স্থূল-উন্নতির অনু-করণে শান্তি পাইবে না, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের অক্ষয়কবচ উহাই ভারতের চরম আশ্রয়।" চপলাবার্ত্তায় কি বাষ্পীয়-যন্ত্রে ভারত উন্নত বা আদর্শ হইতে পারে না, ধর্ম্মবলেই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রকৃত উন্নতির ভাজন হইতে পারে। অকৃতকার্য্যতা কি, তাহা তিনি নিজ জীবনে কোন সঙ্কীর্ণ-মুহূর্ত্তেও কোনও প্রসঙ্গে উপলব্ধি করিয়া যান নাই। শঙ্কা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পরাধীনতার কদর্থনা কিরূপ, তাহা তিনি অণুমাত্রও মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় বন্ধুগণ প্রতি-পদেই লক্ষ্য করিতে পারিতেন যে, সত্য-প্রচারে তিনি রাজশক্তির নিকটও ক্ষণ-কালের জন্য মস্তক অবনত করেন নাই। জাতি, কুল, পাণ্ডিত্য এবং ধন-গৌরবের প্রতি তিনি কখনও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কর্ত্তব্যপালনে তিনি এতই নিবিষ্ট হইতেন যে, তাঁহার বিদেশীয় স্নেহাস্পদ-শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি ও সহানুভূতিপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিদেশীয়-ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহার স্বদেশ স্বধর্ম্ম প্রেমের প্রবলতার পক্ষপাতে তীব্র অপ্রিয়-ভাবে সমালোচিত হইয়া মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হইত, কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য-প্রতিভার নিকট আপনা হইতেই নত-মস্তক হইয়া যেন কোনও অনিবার্য্য অনির্দ্দেশ্য-কারণে সকল ভুলিয়া যাইত। স্বদেশের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতিবশে তিনি বিদেশীয়ের গুণ গৌরব অপেক্ষা স্বদেশীয়ের দোষ বা অসম্পূর্ণতাকে ও উচ্চাসন প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষ জগতের কোনও অংশে ন্যূন বা অনুন্নত এ ধারণা তাঁহার মনের শত হস্ত দূরে স্থান পাইত না। পাশ্চাত্যদেশের এমন অনেক মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা বিবেকানন্দের অতুল গরিমায় অসীম মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় রাজোপচারে, আজীবন সেই দেশে রাখিয়া সেবা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা বিবেকানন্দের হৃদয়ে স্বদেশের কোটী কোটী ভ্রাতার দুঃখদারিদ্র্য অনুন্নতির বিষমচিন্তার প্রবল-তুফান বহিতেছিল তিনি পাশ্চাত্যের বিলাস-ঝটিকার কুসুম-সুবাসে মৃদুমধুর-মলয়-হিল্লোলে বিমল নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় নীরবে নিরাবিলচিত্তে কাল কাটাইতে পারিলেন না। জন্মভূমি-জননীর কোটী কণ্ঠের ক্রন্দন অসীম আর্ত্তনাদ অনবরত তাঁহার হৃদয়ের তারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভাগীরথী তীরে বেলুড়মঠে অরণ্যচরতির্য্যগ্‌জাতি প্রতিবেশী লইয়া সহকারিগণও এবং শিষ্যদল সঙ্গে লইয়া স্বদেশের ভবিষ্যত চিন্তা এবং শিষ্য-

মণ্ডলীর পরিণতি বিবেচনায় তিনি প্রায় শেষ জীবনের পঞ্চমবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন। বিদেশের স্বদেশের বহু প্রাজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার সহিত ও উপদেশ প্রার্থনায় আগমন করিতেন। নানা প্রসঙ্গে নানা ভাব-তরঙ্গে সকলেই বিভোর হইতেন, সকলেই যেন এক ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-বলে আত্মহারা হইতেন। আনন্দের প্রবাহ, প্রীতির পরাকাষ্ঠা তৃপ্তির প্লাবন দেখাদিত। বহির্ভাব পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তর-ভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইত, স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে সেই পুরাতনস্বদেশের ভবিষ্যতসমস্যা ভিন্ন আর কোনও উদ্বেগ-ভাব নাই। তাঁহার চিন্তা যেখানে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহাতে তিনি দেখিতেন, "ভারতের ভবিষ্যগগন স্ফুরৎ আলোকময় সজ্জিত। ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলময় আনন্দময়।" তিনি বলিতেন, "ভারত কাহারও নিকট প্রত্যাশা বা প্রার্থনা করে না। ভারতের জাতীয়-জীবন আপনা আপনি অসংখ্য-বাধা অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রবলতা লাভপূর্ব্বক মহানদীর ন্যায় সাগর সঙ্গম প্রাপ্ত হইবে। যদি কোনও বিদেশীয়-জাতি ভারতের হিতার্থে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন, তবে সে অযাচিত-দান তাঁহাদেরই মহত্ত্বের পরিচয়, ভারত জগতের কাছে সহানুভূতি চায় না।" বিবেকানন্দ ভারতীয়-ভাবের সমষ্টি ছিলেন। বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মগধ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ কর্ণাট, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র যে প্রদেশে যখন তিনি যাইতেন, সে প্রদেশবাসীরা তাঁহাকে সেই প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত। যদি ভারতের সকল বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও সংস্কার এক শরীরে একত্রিত করিয়া সঞ্জীবন-মন্ত্র-বলে জীবিত করা যায়, তবে বোধ হয় বিবেকানন্দের প্রতিরূপ পাওয়া যায়। সকল প্রদেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার বা ধারণার প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। বঙ্গীয়ভাবের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার সার্ব্বভৌমত্বার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। স্বার্থ ত্যাগের আদর্শস্তরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন "ত্যাগই সার্ব্বজনীন-উন্নতির উপায়। বুদ্ধদেবের ত্যাগ শিক্ষায় সহস্রাধিকবর্ষ মধ্যে সমগ্র ভারত এক বিশাল-সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। ত্যাগ সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। আশা-কশাঘাতে কামনার চঞ্চল-অঞ্চল ধরিয়া ছুঁটাছুঁটি করিয়া কেহ কখনও শান্তির অধিকারী হইতে পারে নাই। ত্যাগই শান্তি, ত্যাগই বিশ্রাম।" এই সত্য এই মহাত্মার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যশের আশা তাঁহার সম্মুখে যাইতেও লজ্জিত হইত। তিনি আত্ম-প্রশংসারূপ পঙ্ক স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। অন্যান্য গুরুভাইদের অপেক্ষা তাঁহার শক্তি সামর্থ যে বিন্দুমাত্র ও বেশী ছিল, একথা স্বপ্নেও তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় নাই। তিনি পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুর শিক্ষা দীক্ষায় লক্ষ্য স্থাপন করিয়া তিনিও পবিত্র জীবনোপভোগ করিয়া গিয়াছেন। শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট সময় সময় বলিতেন 'কামিনী

কাঞ্চনের প্রবঞ্চনা এড়াইয়া যশের আশা-শূন্য হইয়া যেন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের পথে পদচারণ করিয়া মরিতে পারি।” যে সময় তিনি জগতীতলে অবতীর্ণ হন, সে দিন ভারতের বড় দুর্দ্দিন। ভারতের হতভাগ্য-সন্তানগণ যে দিন সঞ্চিত অমূল্য পৈতৃক-ধনে অতুল বেদ বেদান্ত-জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া পথভ্রমে বিড়ম্বনার বিলাস-বনে উপনীত হইতে ছিলেন, সেই সময় বিবেকানন্দ প্রাচীন পবিত্র আদর্শ আনিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন, ভারতের জাতীয়-জীবন তখন খণ্ডশঃ বিভক্ত হইতে ছিল দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। ধৈর্য্য, ত্যাগ, কর্ত্তব্য পরতার উচ্চ আদর্শ তাঁহার অন্তঃকরণে নিহিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য এবং তাঁহার উপদেশ পরিচালিত কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ বঙ্গের আর এক অতুল-গৌরব-প্রদীপ্ত-প্রতিভার অনুকারী ছিলেন আমরা স্বর্গীয় গুণসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট-লাট মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও সেই স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশীয়-বেশ সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করিয়াই গমন করিতেন। তাহাতে কদাচিৎ অসুবিধার কারণ হইলে বলিয়াছিলেন “আমাকে ডাকিলে আমি এই ভাবেই আসিব; এভাবে অসুবিধাবোধ হইলে আমাকে ডাকা কেন?” বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য-দেশের সুসভ্য কুবেরকুলের নিকট নিজের গৈরিক-বসনে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোনও সময় ঐ প্রকার প্রত্যুত্তর দিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্য সমূহের মধ্যে ভারতীয় ভাব প্রচলনে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন “যদি তোমরা ভারতকে ভাল বাসিতে চাও, ভারত যেমন আছে, তাহাকে তেমনি রাখিয়া ভালবাসিতে হইবে। ভারতকে হ্যাট কোট পরাইয়া কাঁটা চামচ ধরাইয়া টুল টেবিলে বসাইয়া বিদেশীয়-বেশে বিদেশীয়-ব্যবহারে বিকৃত সাজাইয়া ভালবাসিতে চাও, তবে তোমরা প্রকৃত পক্ষে ভারতকে ভালবাসিতে চাওনা।” তাঁহার বিদেশীয় ভক্তগণ পশ্চিমতে ভারতের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার উপদেশের অতুল সম্মান। ভারতের অনুন্নত সাধারণের উন্নয়ন বিবেকানন্দের জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী হিতৈষণাস-কল্পই তাঁহাকে ঐরূপ মহদুদ্দেশ্যের সন্নিহিত করিয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার সহকারী সতীর্থ সম্প্রদায়ের সমবেত যত্নের ফল শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ঐ উদ্দেশ্যেই কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে সমদর্শিতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহার একটী প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। একদা আমেরিকার কোনও প্রখ্যাতনামা ধনীর ভবনে বিবেকানন্দ অতিথি হয়েন, ভারতের নয়নে বিবেকানন্দের প্রতিভাপূর্ণ-মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হইলে ও আমেরিকা সেই ধনি-সন্তানের নিকট তিনি নিগ্রোরূপে বিবেচিত হন। নিগ্রোকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিতে সভ্যতা ও অভিজাত্যাভি-

মানী ধনিসুত সঙ্কুচিত হইলেন। নিগ্রো-ভ্রমে বিবেকানন্দের আতিথ্য প্রত্যাখ্যাত হইল। তিনি যথেচ্ছ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিন পরে ঐ ব্যক্তি বিবেকানন্দের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া সযত্নে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আমি যখন ভ্রমক্রমে আপনাকে নিগ্রো বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তখন আপনি কেন বলিলেন না যে, আমি নিগ্রো নহি।" বিবেকানন্দের সরস সুহাস সুপ্রকাশ বদনে ধ্বনিত হইল "ঐরূপ বলিলে যে আমার নিগ্রোভ্রাতাকে অস্বীকার করা হয়না। পাঠক মহোদয়। আমি নিগ্রো নহি বলিলে সর্ব্বজন ভ্রাতৃভাব সর্ব্বত্র আমিত্বের সুপ্রসার ও সঙ্কীর্ণ হয়, নিগ্রোভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়না ইহাই বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। নিগ্রোকেও যদি ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন না করা যায়, তবে সাম্য বৈষম্যে পরিণত হয়, ইহাতে মহাপুরুষ প্রকৃতই ব্যথিত হইতেন। ইহাপেক্ষা সার্ব্বজনীন সমদর্শনের দৃষ্টান্ত আর সুলভে মিলিবে কি? বিবেকানন্দের মুখে সর্ব্বদা বিষ্ণু, শিব, হরি, কালী, নারায়ণ মধুসূদন ইত্যাদি দেবনাম এবং শঙ্কর বুদ্ধ নানক গুরুগোবিন্দ ইত্যাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম শুনা যাইত। বিবেকানন্দ ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের সর্ব্ববিধ আচার ব্যবহারই বেশ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং প্রত্যেকটীরই সম্মান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার নিকট অতি উচ্চ পূজা পাইত। একদা কোনও সাহেব তাঁহার নিকট হিন্দুর পুরাণ প্রসঙ্গের নিন্দা করেন, প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ বাইবেলের বহুল গলদ উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিষদন্ত বেশ সুকৌশলে বাধিত করেন। পক্ষান্তরে বেদ এবং উপনিষদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, যদি সহস্র সহস্র বৎসর দোষানুসন্ধান ও অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলেও এই মূল্যবান্ বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র স্থান চ্যুত হইবে না যে, বেদ উপনিষদের সহিত বাইবেলের তুলনাই হইতে পারে না। বেদ উপনিষদের উচ্চভাব ধারণা করিতে পারিলে বাইবেলের উপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইতে বাধ্য হইবেন। পুরাণের পবিত্রতা এবং মৌলিকতাসম্বন্ধেও তিনি অশেষবিধ আবশ্যকীয় উপদেশদ্বারা সাহেবের গর্ব্বজাত বর্ব্বরতার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকে দেববাণী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। সংস্কৃতের আলোচনায় অধ্যাপনায় তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, চরম দিনেও তিনি ৩ ঘণ্টা পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অতীতের সাক্ষ্যদিতে জগতের বিশালকুক্ষিতে তাঁহার অতুল কার্য্যাবলী সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি জীবনে স্বাধীন শান্ত পবিত্র ছিলেন, মরণেও সেইভাবে দেদীপ্যমান! ভারত-সন্তান! তোমার অগ্রগামী উন্নতিকামী বিবেকানন্দ তোমাকে যাহা দিয়া গেলেন, তুমি কি তাহার সদ্ব্যবহার করিবে না? তুমি কি গুণের আদর, জ্ঞানের মর্ম্ম, ধর্ম্মের মহিমা, কর্ম্মের গরিমা বুঝিবে না? তুমি স্বর্গগত-বিবেকানন্দের পূত-দেহের পবিত্র-ভস্ম বিভূতিরূপে

ললাটে লেপন কর, আর তাঁহার পরিত্যক্ত গৈরিকবসনে জাতীয় নিশান নির্ম্মাণ করিয়া সাদরে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হও। আলস্য ঔদাস্য করিলে বুঝিব, তুমি বিবেকানন্দের সহোদর হইবার অযোগ্য এবং অজ্ঞ। বিবেকানন্দের প্রতি সমাজ-সাধারণের স্নেহ বা সহানুভূতি সমান ছিল না, থাকিতেও পারে না। গীতাপ্রবর্ত্তক জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের আলোক সকলের হৃদয়ে সমান প্রতিবিম্বিত হয় নাই। শঙ্করাবতার শঙ্করদেবের চারুচরিত্রচিত্র সকলের নিকট সমানরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। মহাযোগী মহেশ্বরকেও কেহ পিশাচ, কেহ পাগল, কেহ লম্পট, কেহ কপট, কেহ বা সত্যশিবসুন্দর বলিয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, পাগলামীতে ও শিবত্বে বেশ সুন্দর স্বাভাবিক-সামঞ্জস্য আছে। যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও আমরা সেরূপ সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব দেখি না। নিন্দুকের নির্দ্দয়-আক্রমণ, সহৃদয়ের সহজ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষীর অশেষ শুভশংসন কিছুতেই তাঁহার স্বরূপের বিরূপতা ঘটিবেনা। বিবেকানন্দের অসাধারণত্ব ধারণা করিতে পারিলে এবং অলৌকিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, কেহই বোধ হয় তাঁহার প্রতি প্রবলতর পক্ষপাত-পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ—বিবেকানন্দ সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন। যে যৌবনে কদর্য্যবাসনায় জীবমাত্রকেই কদর্থিত করে, সেই নব যৌবনের ললিত লাবণ্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় যাঁহার সকল শরীরে তরঙ্গায়িত, যৌবনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিলাসপিপাসা ক্রমশঃ পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে.; বিদ্যা, বয়স, রূপ, যাঁহার নিকট সম্মিলিত হইয়াছে, কামিনী-কাঞ্চন-যশঃ যাহার করতলগত, সেই যুবক ভোগসঙ্গ-রঙ্গ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া, খ্যাতি প্রতিপত্তি-প্রত্যাশা বিদায় দিয়া, সন্ন্যাসাবলম্বন করিলেন, ইহা কি অসাধারণতা নহে? এ সন্ন্যাস, কদর্য্য স্বার্থবশে নহে, কুকার্য্য-গোপনমানসে নহে, তাড়নায় বিড়ম্বনায় নহে, জরাজীর্ণ-দেহে নহে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে—ধর্ম্মপ্রাণতায়; ইহাও কি উন্নত আদর্শ নহে? দ্বিতীয়তঃ--বাল্যাবধি স্নেহের ক্রোড়ে লালিত, এমন কি পথ-কষ্ট পর্য্যন্তও অনুভব না করিয়া, সন্ন্যাসের পর হিমাচলের গুহামন্দিরে, বিশাল প্রান্তরে, মরুভূমির অভ্যন্তরে নিঃসম্বল অবস্থান এবং পাদচারে সমগ্র-ভারত পর্য্যটন ও এই ভ্রমণ সময়ে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মের মৌলিকতা অনুসন্ধান, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র-পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন, এ সকল কি কিছুই অসাধারণতার পরিচয় নয়? তৃতীয়তঃ—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহামেলায় সমস্ত দেশের সকল ধর্ম্মপ্রতিনিধির সমাগম সত্ত্বেও, যে ভারত জড়োপাসকজ্ঞানে অবজ্ঞাত হইয়াছিল এবং আহূতও হয় নাই, সেই ভারতের কৃষ্ণকায় অজ্ঞাতনামা অশ্রুতকীর্ত্তি গৈরিকধারী যুবক সন্ন্যাসী, চিকাগো-মেলায় প্রাণপণ-পরিশ্রমপ্রাপ্ত দশ মিনিট বক্তৃতাসময়ে

জগৎ বিচলিত করিতে পারিয়াছিলেন! যেন কোনও মহাসত্তা তাঁহাকে বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি এবং সহস্র বদনের কথন-শক্তি এক মুখে প্রদান করিয়াছিলেন! কেবল যে সে বক্তৃতা চপলা-চমকের মত একবার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া গেল, তাহা নহে, এখনও তাহা সমগ্র সভ্য-জগতে পূজিত হইতেছে! ইঁহাকে কি মহাপুরুষ বলিব না? "বিগতগর্ব্ব হীনসর্ব্বস্ব দুর্ব্বল ভারত কেবল এক ধর্ম্মবলেই জগতে অতুলনীয় জগতের গুরু;" নব্যসভ্যতার শীর্ষস্থানীয় মার্কিণে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে যে ব্যক্তি ইহা দেখাইয়া দিলেন, তিনি কি শ্রদ্ধার অযোগ্যপাত্র? চিকাগো-মেলায় ভারতীয় মুটে মুজুর মিঠাইওয়ালাও যাঁহার তেজস্বিতায়, আমেরিকার অভিজাত গণ্য মান্যগণের নিকট আদর ও একত্র ভোজনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি কি স্বদেশবৎসল মহাত্মা নহেন? সভ্যতাভিমানী মার্কিণজন যাঁহার মাহাত্ম্যে উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া ভূমিতে বসিয়া, হস্তদ্বারা, ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নিরামিষ-ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, ভারতের শিষ্যত্ব প্রচার করিতেছে, সেই মহাত্মা কি অসাধারণ নহেন? প্রার্থনা করিতে যিনি জানিতেন না, তাঁহার চরিত্রও কি জাতীয়-আদর্শরূপে গৃহীত হইবার অযোগ্য? ভারতের হিতকল্পে, ভারত জগতে গণ্য হউক, এই আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যে মহাত্মা উহা অনেকাংশে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার কালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-মঠে সহকারি সন্ন্যাসিগণ এখনও ভারত আমেরিকার ধর্ম্মগুরু হইবার যোগ্য, এই সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, তিনি কি ভারতের প্রত্যেকের মাননীয় নহেন? ভাবিলে মনে হয়—'যেন বিবেকানন্দের জীবনই ভারতের ভবিষ্যবেদ!" বিবেকানন্দ কর্ম্মবীর ছিলেন; কর্ম্মেই তাঁহার পর্য্যবসান, ফলের ভার ভগবানের হাতে। আমরা অভাবের অভাবনীয়-পীড়নে দণ্ডিত হইয়া সন্তপ্ত-প্রাণে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, যেন বিবেকানন্দের পবিত্র আত্মা পরম শান্তি-সরোবরের রাজহংসরূপে বিরাজ করিতে পারেন। ওঁ শান্তিঃ॥

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভারতী।

---

# অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন বিরচিতম্)

(১)

ত্বৎপাদকিঙ্করসমোহস্ত্যমরোহপি নিত্যং
যৎ সর্ব্বশংকৃতিগুণৈ স্ত্বয়ি শঙ্করীত্বম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের মঙ্গল কর সকল সময়,
তাই মা! শঙ্করী-নামে তব পরিচয়!
একারণ ত্রিসংসারে যত দেবগণ
তোমার শ্রীপদে নিত্য ভৃত্যের মতন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—

কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা !

( ২ )

সৃষ্ট্যাদিকালসমবস্থতয়া ত্বমাদ্যা
ত্বাং মাতরং জগুরতোঽপি পিতামহাদ্যাঃ।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কিবা সৃষ্টি স্থিতি, কিবা প্রলয়ের কালে
সমভাবে থাক তুমি এই ভূমণ্ডলে।
তাই মা গো! বিধি-বিষ্ণু-আদি দেবগণ
"মা" বলিয়া তোমাকেই করে সম্বোধন।
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা—
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

( ৩ )

ঈশোঽপি যৎ তব করাম্বুজভোজনার্থী
ব্যক্তির্ন তৎ ত্বদপরা ক্বচিদন্নদাত্রী।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

জীবের জীবন রক্ষা করিবার তরে
তোমা বিনা অন্নদাত্রী কে আছে সংসারে?
তুমি নিজ হস্তে দিলে আহার তুলিয়া
তবেই শিবের তৃপ্তি আহার করিয়া!
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

( ৪ )

কৈলাসমুজ্ঝিতবতী বসসীহ নিত্যং
দীনেষু যৎ তব সদৈব দয়ার্দ্রচিত্তম্।
কৃত্বা কৃপাময়ি কৃপাং জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

এ সংসারে যেই জন দীন-হীন অতি!
তোমার পরম কৃপা সদা তার প্রতি।
এ কারণ তুমি মা গো! ছাড়িয়া কৈলাস
পুণ্যময় কাশীধামে থাক বার মাস!
তুমি কৃপাময়ী, তুমি ত্রিলোক-শরণ,
তাই ওমা অন্নপূর্ণে! এই নিবেদন,—
কৃপা করি এ দাসের মনের বাসনা
পূর্ণ করি দাও তুমি, ইহাই প্রার্থনা!

( ৫ )

আকীটমাশিবমশেষজনেষু শক্তি—
র্যাসৌ ত্বমেব তব এব সদা সভক্তি।
আরাধয়ন্ত্যপি সুরা জগতাং শরণ্যে
পূর্ণং কুরুষ্ব মম বাঞ্ছিতমন্নপূর্ণে॥

কীট হ'তে মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলে
তোমারি শক্তিতে শক্তি ধরে ভূমণ্ডলে!
তাই মা গো! ভক্তি ভরে দেবতা সকল
আরাধনা করে তব চরণ-কমল!
ওমা অন্নপূর্ণে! তুমি ত্রিলোক-শরণ,
এ দাসের মনোবাঞ্ছা কর মা পূরণ!

( ৬ )

ইচ্ছামি নাপরপদং ন চ কল্পবৃক্ষং
সংকাময়ে জননি তাবকপাদযুগ্মম্।
নিঃশ্রেয়সান্তকফলানি চতুর্বিধানি
শ্রীপাদপাদপগতস্য ন দুর্লভানি॥

কিবা অন্য পদ, কিবা কল্পতরু আর,
কিছুই না চাই মা গো! কভু একবার।
একমাত্র সেই তব চরণ-কমল,
আমার আরাধ্য বস্তু, জানি অবিরল।
তোমার শ্রীপাদ-তরু-তলে যেই জন

আশ্রয় লইয়া মা গো! রহে সর্ব্বক্ষণ,
অতি ভাগ্যবান্ ভবে সে জন কেবল,
মুষ্টির ভিতর তার চতুর্ব্বর্গ-ফল!

( ৭ )

হে মাতরস্তরুদিতান্যখিলস্য যানি
সর্ব্বাণি সন্তি চ ভবদ্বিদিতানি তানি।
অভ্যাসদোষবশগেন কৃতার্থনায়াং
বাচালতৈতদপরাধমুমে ক্ষমস্ব॥

হৃদয়ের ব্যথা যত হৃদয়ে রাখিয়া
ক্রন্দন করুক জীব গোপন করিয়া,
তোমার নিকট কিছু নহে অগোচর,
সকলি জানিছ মা গো! তুমি নিরন্তর।
যা কিছু বাচালতা-ভাবে করিনু প্রার্থনা,
সেই বাচালতা-দোষ কর মা মার্জ্জনা!

( ৮ )

গায়ন্তি কেচন জনা গিরিরাজপুত্রীং
দক্ষোদ্ভবাঞ্চ ভবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্।
রাখালদাস ইদমেব চ বেত্তি তত্ত্বং
মাতা ত্বমেব জগতাং জগদীশ্বরী ত্বম্॥

একমাত্র তুমি ভব-দুঃখ-বিনাশিনী,
কত লোক কত কথা কিন্তু বলে শুনি,—
কেহ বলে তুমি মাগো! হিমালয় সুতা,
কেহ বলে তুমি মাগো! দক্ষের দুহিতা।
অজ্ঞান রাখালদাস সন্তান তোমার,
মনে বুঝিয়াছে কিন্তু এই কথা সার,—
তুমিই ত্রিলোক-মাতা, ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
এ তত্ত্ব পরম সত্য চিরদিন ধরি!

( ৯ )

চক্রুশ্চ যে বহুষু জন্মসু যোগযুক্তা
ভক্ত্যা চ ভুক্তিরহিতা শুভ সাধনানি।
হে সর্ব্বশক্তিময়ি! বালামনোজ্ঞমূর্ত্তিং
ধৃত্বা স্বয়ং সমকরোস্তদভীষ্টপূর্ত্তিম্

ত্রিলোক ঈশ্বরী তুমি ত্রিলোকের মাতা,
তোঁরে না সম্ভবে মাগো! গর্ভবাস-ব্যথা!
ভোগসুখ বিসর্জ্জিয়া বহু জন্ম ধ'রে
যেবা কন্যারূপে পেতে আরাধনা করে,
মধুর-মনোজ্ঞ-রূপে বালিকা সাজিয়া
ভোলাও তাহার মন "মা" ব'লে ডাকিয়া।
পূরাও ভক্তের মনে অভিলাষ যেবা,
সর্ব্বশক্তিময়ি! তোর অসম্ভব কিবা?

( ১০ )

হে সর্ব্বগে শতসমাঃ সততং তপোভি—
র্যা নির্ম্মলত্বমগমৎ ত্বয়ি সানুরাগা।
তদ্গর্ভদর্পণ নিজ প্রতিবিম্ব মাত্রং
সন্দর্শ্য মাতরখিলস্য কৃতার্থিতা সা॥

শত শত জন্ম ধ'রে আরাধি সতত
চির তরে মলিনতা যার অপগত,
তুমি তার গর্ভ-রূপ-দর্পণ মাঝারে
নিজ প্রতিবিম্ব দিয়া ধন্য কর তারে।
হে সর্ব্বগে! সর্ব্বভূতে বিহার তোমার,
গর্ভে নেহারিলে তোরে কি বৈচিত্র্য তার?

( ১১ )

যঙ্কে বিরিঞ্চিমুখদেববরাঃ শিরঃস্থে
বৃত্তার্দ্ধমুদ্রিতদৃশস্তব সাধনানি।
কুর্ব্বন্তু কিন্তু গতিহীনসুতে জনন্যা
নিত্যং কৃপাস্থিতিরিতি প্রণতিং গৃহাণ॥

বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর মস্তক উপরি
ধরি তব সিংহাসন রাজরাজেশ্বরি!
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে করেন সাধন,
আমি কিন্তু মূঢ়মতি, অতি অভাজন।

তা ব'লে নিগ্রহ যেন না হয় তোমার,
গতিহীন সুতে সদা করুণা মাতার!
দাসের প্রণতি মাগো! করহ গ্রহণ,
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন!

( ১২ )

স্মৃত্বা সমাধিসুরথাচরিতং ভবত্যাঃ
শ্রীপাদপঙ্কজযুগং ত্রিজগৎসুসারম্।
নিশ্চিত্য মাতরধুনা শরণাগতোঽস্মি
ত্বৎকিঙ্করস্য তু কুরুষ তবোচিতং যৎ॥

সমাধি সুরথ আদি যত ভক্ত জন,
সে সবার ইতিহাস করে আলোচন,
জননি গো! এই জ্ঞান হ'য়েছে আমার
শ্রীপাদ-পঙ্কজ তব জগতের সার।
সেই পাদ-পদ্ম তব করেছি শরণ,
যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি কর মা! এখন।

( ১৩ )

ত্বয্যেব বিশ্বজননি ত্রিজগৎ প্রভুত্বং
ভৃত্যা বয়ন্তু ভবদঙ্ঘ্রিযুগস্য নিত্যম্।
ইত্থং চিরাবগতি খণ্ডনপণ্ডিতানাং
নাদ্বৈতবাদগহনং বয়মাশ্রয়ামঃ॥

ত্রিলোক-জননি তুমি ত্রিলোক-ঈশ্বরী—
আর সবে তব পদে কিঙ্কর কিঙ্করী।
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি জানে দাস,
জন্মে জন্মে থাক্ এই পবিত্র-বিশ্বাস।
"সবাই পরম ব্রহ্ম" এ পাপ কথন
"অদ্বৈত বচনে" ঘোষে যে পণ্ডিত জন,
তাঁদের সে তর্ক-রূপ-গহন ভিতরে
যেন মা! জীবাত্মা মোর কভু না বিচরে!

( ১৪ )

চিরং ধ্যাত্বা ধাত্রাদিকতনুমংশৈবরবয়বৈ—
র্ভক্তে কল্যাণং তব তু করুণৈবাস্তু তকরী।
ত্বদঙ্গানাং পীঠস্থলগকিয়দংশার্চ্চনবশা—
দসীমং ক্ষেমং স্যাৎ সকলমনুজে দক্ষ-
তনুজে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেবা আছে আর,
পরম কঠিন মা গো! সেবা সে সবার।
মনে মনে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া গঠন,
সুন্দর সাজায়ে তাঁরে শাস্ত্রের মতন,
বহুকাল সেইরূপ করে যদি ধ্যান,
তবে ত পাইবে লোক অশেষ কল্যাণ
কিন্তু কি কল্যাণময়ী তুমি, ওগো উমা,
বিচিত্র নেহারি ভবে তোমার মহিমা!
পুণ্যময় কত শত শত পীঠস্থানে
মা! তোর অঙ্গুলি নখ যা আছে যেখানে,
সেই ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র করিলে অর্চ্চন
কি মঙ্গল নাহি লভে ভবে ভক্ত জন?

( ১৫ )

গীতো যঃ প্রথয়াঽক্ষপাদ ইতি যঃ খ্যাতঃ
কণাদাখ্যয়া
যুঞ্জানেন চ হৃদ্বয়েন মুনিনা জীবাত্মনাং
ব্রহ্মণা।
পার্থক্যং প্রতিপাদিতং স্ববচনৈর্বেদাবিরু-
দ্ধার্থকৈ—
র্মাতস্ত্বৎপদদাসতা ময়ি ততঃ সিদ্ধেতি
তৃপ্তং মনঃ॥

মহাযোগী,—যোগবলে এই ত্রিভুবন
তন্ন তন্ন করি যাঁরা করিত দর্শন,
বেদের বিরুদ্ধ বাণী মুখে না আনিত,
নাহি ছিল ভ্রান্তি, নাহি লোকে প্রতারিত,
সে সর্ব্বজ্ঞ অক্ষপাদ, সর্ব্বজ্ঞ কণাদ,
ঘুচায়ে দিয়াছে মা গো! দাসের বিষাদ.

দার্শনিক-ঋষি-বাক্যে বুঝেছি মা! বেদ,
জীবাত্মা পরাত্মা দোঁহে আছয়ে প্রভেদ।
করুক যতই তর্ক তর্কপটু জন,
প্রভূ ভৃত্য এক বস্তু হয় না কখন্?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,
২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার। কলিকাতা।

---

## এস মা!

(দুর্গোৎসবে—"আগমনী")

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

---

বর্ষা-বারি-স্নাত শরৎ আগত,
সাজায়ে কুসুম সাজীতে।
ওমা দুর্গে! তব শ্রীপদ-পল্লব
মনসাধে পুন পূজিতে।
তবে—
এস দুর্গে! এস, শ্রীমণ্ডপে বস,
"দশভুজা" রূপ ধরি।
আজি বর্ষ-পরে, সাজি হর্ষভরে,
ও রূপ দর্শন করি।
দশ হস্তে কিবা দশ অস্ত্র বিভা!
ঝলমল দশদিশি!
বাণী বামপাশে, দক্ষিণে শ্রী হাসে;
ধনে জ্ঞানে মিশামিশি!
গুহ-গজানন দুদিকে দুজন,
সিদ্ধি ও শূরত্ব সাজে।
বল-নিদর্শন শ্রীপদ-বাহন
চতুষ্পদরাজ রাজে।
অসুর সুশাক্ত, শত্রুরূপী ভক্ত,
শক্তি-শেল সহে বুকে;
দেবী-পদস্পর্শে হিয়া হাসে হর্ষে,
বাহিরে ভ্রুকুটি মুখে।
অপরূপ রূপে— দশভুজা-রূপে
সর্ব্বরূপ সুবিকীর্ণ।
সেবিতে সে রূপ, ভাবে ভব-ভূপ
সিংহরূপে অবতীর্ণ!
মতান্তরে বলে, শক্তি-পদতলে
মহাবিষ্ণু হন হরি;
বিচিত্র কি তা'তে? পঞ্চ-ঈশ-মাথে
রাজে রাজরাজেশ্বরী!
পুরুষে প্রকৃতি গুণ-ক্রিয়াবতী,
পুরুষ অগুণাক্রিয়;
অতএব হন পুরুষ পরম
শক্তির বাহন স্বীয়।
ষড়্‌দরশন— শুভসম্মিলন
দশভুজা-রূপে হয়,—
শ্রুতি-স্মৃতি-বিধি, তন্ত্র-পুরাণাদি—
সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়!
সর্ব্বতত্ত্ব-সার রূপে মা তোমার,
সর্ব্ব-দৃষ্টি সমাকৃষ্ট।
সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বশুভোদয়,
সর্ব্বসিদ্ধি সমাবিষ্ট!
কিবা!
বাণী-বীণা-তানে শুভ বেদ-গানে,
বিমোহিত বিশ্বসৃষ্টি!

সুসম্পদরাশি বৃষ্টি করে হাসি
কমলার কৃপাবৃষ্টি!
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি, গুহ গোত্র-বৃদ্ধি-
বিধান-নিদান হন।
আপনি শঙ্কর সর্ব্বশুভঙ্কর,
স্বরূপে অরূপে র'ন!
এ রূপ সেবনে ভজনে স্তবনে,
সর্ব্বদেব সুকৃতার্থ।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, যক্ষ-বিদ্যাধর,
নাগ নর চরিতার্থ!
হেন আয়োজন, লীলা-প্রয়োজনে,
এস লীলাময়ী মাগো!
নিদ্রাভঙ্গে রঙ্গে, সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গে
বঙ্গের বোধনে জাগো।
হেন আয়োজনে, ভক্তি-নিমন্ত্রণে,
মহাশক্তি! এস তবে।
ভক্ত একজন মর্ত্ত্যে যদি র'ন,
তবু মা! আসিতে হবে।
মোরা কুসন্তান, নাই ভক্তি-জ্ঞান;
তাই হেন শক্তিহীন।
শোকে দুঃখে রোগে, দুর্ভিক্ষে দুর্ভোগে,
ধ্বংসপুর-সম্মুখীন!
দুর্গোৎসব যার সর্ব্বোৎসব-সার,
তবু এ দুর্গতি তার!
ভক্তি-বহির্মুখ ভজন-হুজুক
ভস্মে ঘৃতাহুতি সার।
তাই মা কাতরে, আজি বর্ষ-পরে,
যাচি পুন পদার্পণ।
চাবনা এবার শ্রীপদে তোমার,
ভক্তি ভিন্ন অন্য ধন।
দুঃখ-রোগ-শোক যত হয় হোক্,
পাই যদি ভক্তি-বিন্দু,

পুন সব হবে, সব দুঃখ যাবে,
উথলিবে সুখসিন্ধু।
এ শব উৎসব পাবে প্রাণ নব,
শক্তি-ভক্তি-সমুদ্ভবে;
সংস্রাব্দ পরে পুনঃ বঙ্গ-ঘরে
সত্য দুর্গোৎসব হবে!

ওমা!

হয়োনা কৃপণা সে অমৃত-কণা
দিতে মৃত সুতগণে।
কুপুত্রই হয়, কুমাতা ত নয়,
জানে মা! জগৎ-জনে।
কৃপা যদি কর, কি না দিতে পার?
নিজে যে মা! তুমি শক্তি।
স্বর্গ-মোক্ষ ছার! কৃপায় তোমার
লভে জীবে কৃষ্ণভক্তি।
তোমারি সাধনে, লভি কৃষ্ণধনে,
গোপী পিয়ে প্রেমামৃত।
তোমারেই ভজি, হরি-প্রেমে মজি,
হর হরি-সম্মিলিত!
সর্ব্বসিদ্ধি-শক্তি— পেতে তব ভক্তি,
যে প্রার্থনা প্রাণগতা,
অপূর্ণ কি রবে? তুমি যে মা! ভবে
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পলতা!
এস গো মা! তবে এ মনোমণ্ডপে,
বস মা! করুণাভরে।
করিতে পূজন, কিছু আয়োজন
নাই মা! এ শূন্য ঘরে।
নাহি সাজ সজ্জা, নাহি তাহে লজ্জা;
সজ্জা পায় লজ্জা রূপে!
ও রূপ-কিরণে, নিরূপকরণে,
পদে দিব প্রাণ সঁপে।

এস মা! এবার সম্বল সেবার—
কেবল নয়ন-বারি;
কিছু নাই আর, এস মা! এবার—
জলে জলে পূজা সারি।
যে ছেলে আদরে যা দেয় মা তোরে,
তাই যে মা! তুই নিস্।
যা'ই মা যাহার আশার আহার,
তাই মা! তাহারে দিস্!
মাগো!
তাই আশাভরে, কাতরে মা তোরে
চাই দেখা দিন তিন।
এ ত্রিদিন স্মরি, কত কষ্টে হরি
তিনশ বাষট্টি দিন।
বিষাদ-বিকারে, থাকি অন্ধকারে,
সারাটি বছর ভবে'।
ত্রিদিন পুলকে রহি মা আলোকে,
ও পদ নখেন্দু-করে!
দুঃখে বক্ষ ফাটে, কত কষ্টে কাটে
ঊনদিনত্রয় বর্ষ।
তব শুভোদয়ে, এ সুদিনত্রয়ে,
ধরায় ধরেনা হর্ষ!
এবার আবার কি ভাগ্য অপার!
তিনদিনে চারিদিন!*
পেলাম প্রশ্রয়, বুঝি পদাশ্রয়
পাবে নিরাশ্রয় দীন।
তাই মা! আহ্লাদি, উর হর-রাণি!
পূর অবনীর আশ।
এ সুখ-শরতে, এস মা ভারতে,
মরতের মহোল্লাস!
এস মা শঙ্করি! সর্ব্বশুভঙ্করি!
কিঙ্করে করুণা করি।
এস জগদম্বে! জগদবলম্বে!
অবিলম্বে অবতরি।
অকৃতী সন্তানে মাতৃস্নেহ দানে
মাতৃভক্তি দেহ শিক্ষা।
এস মা! অন্তরে, থেকনা অন্তরে,
অন্তরের এই ভিক্ষা॥

শ্রীশঃ—

* তিথিরহস্য বশে এবার এই ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, আশ্বিনের ২২ শে, ২৩ শে, ২৪শে, ও ২৫ শে, এই চারিদিন দুর্গোৎসব। (হিং সঃ)

——:•:——

( ১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

## জাতিভেদ।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

(৩১) "মহাভারতেও জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক সদ্বিচার দৃষ্ট হয়। শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ভোগাবিলাসী, তেজস্বী, ক্রোধী, হঠকারী, বৈদিক আচারভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইল। লোহিত বর্ণ দ্বিজেরা গোচারণ ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ এবং বৈদিক আচার পরিত্যাগ করাতে বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত হইল। কৃষ্ণবর্ণ, অশুচি, মিথ্যাবাদী ও ক্রূরস্বভাব লোভী দ্বিজেরা নীচ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; তাহারা শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত হইল। এইরূপে গুণানুসারে জাতিভেদ হওয়াতে, দ্বিজেরা নানা জাতিভুক্ত হইলেন। মহাভারতের সময়ে কয়েক জন পুরোহিত ও রাজন্য ভিন্ন অপর সকলেই এক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। কায়স্থ, বৈদ্য, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তৈলিক, তাম্বুলি প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি ছিলনা, এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরা সকলেই বেদপাঠ, ও স্বহস্তে যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং গৃহাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিত। পুরোহিতদের বেদে একাধিপত্য এবং বৈশ্যদের নানা জাতিতে বিভাগ, এই সকল আধুনিক পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি।"*

(৩২) 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ( ১। ১৬ এবং ২। ১৭ ) যে অব্রাহ্মণোক্ত ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ নয়, এমন ব্যক্তি ) যাজন করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের অপর অংশে ( ৭। ২৯ ) দেখাযাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। সি, আই, ই।

ব্রাহ্মণ-গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহসমর্থ, সোম-পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদ্বংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, এবং রাজাকে কর প্রদান করিত, এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত, তবে তাহার সন্তানেরা শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র-শ্রেণীর যোগ্য হইত।**

(৩৩) বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ্-তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে জনক কহিলেন "আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি, আমাকে তাহা প্রদান করুন।" তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।†

(৩৪) ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও অনেকে বিদ্যাবলে এবং যশঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনক তাহার একটী অন্যতম উদাহরণ। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞ-কার্য্যে দীক্ষিত হইবে'—এই বলিয়া ঋষিগণ ইলুষের পুত্র কাকষকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাকষও দেবতাদিগকে জানিতেন; তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।*

(৩৫) পূর্ব্বকালে, সত্যপ্রিয়তা ও বিদ্যাবত্তার উপরেই যে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ অনেকাংশে নির্ভর করিত, তাহা সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান হইতেই জানিতে পারা যায়। এই উপাখ্যানটী অতিশয় চিত্তরঞ্জক; তাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।*

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে কহিল "মা! আমি ব্রহ্মচারী হইব। কোন্ বংশে আমার জন্ম?" মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন "আমি তোমায় গর্ভে ধরিয়া, যৌবনেই দাসীরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম; কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম, তাহা আমি জানি না। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি এখন হইতে "সত্যকাম জাবাল" বলিয়া আত্মপরিচয় দিও।"

সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার বাসনা জানাইল; কিন্তু গৌতমকর্ত্তৃক বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া, সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্যনিষ্ঠায় হরিদ্রুমত গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। সি, আই, ই।
† শতপথ ব্রাহ্মণ।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
* ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৪র্থঅধ্যায়, ৪।৫।৬।৭।৮।৯খণ্ড।

"তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা" ........." ইত্যাদি।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব।" সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল।

(৩৬) ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। এক স্থানে আছে,—"এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশ লোপ পাইবে।*

(৩৭) অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—"এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে সিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও সৈবের জন্ম। গার্গ্য ও সৈবেরা ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।†

(৩৮) গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র—ত্রয়ারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।†

(৩৯) আমরা মৎস্য পুরাণে ৯১জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে "এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই [illegible] ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা ঋষিকদিগের সন্তান; ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিদিগের সন্তান। শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তলন্দশ্চৈব বন্দাশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেক নবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ॥"*

(৪০) অণু পুরুর ভ্রাতা। অণুর বংশেই বলির জন্ম। মৎস্য পুরাণে এবং বায়ু পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বলি রাজাই সর্ব্বপ্রথমে চারি জাতি বা চারি বর্ণের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। হরিবংশের ৩১ অধ্যায়েও এই কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৪১) এক বর্ণভুক্ত ব্যক্তির বর্ণান্তরপ্রাপ্তির প্রমাণাদি পূর্ব্বেও একবার প্রদত্ত হইয়াছে।

"শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥"†

ব্রাহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(৪২) "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"*

* বিষ্ণুপুরাণ।
† বিষ্ণুপুরাণ।

* মৎস্যপুরাণ।
† মহাভারত।
* মনুসংহিতা।

যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

(৪৩) ক্ষত্রিয় হইতে অপর বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। আমরা তাহার দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

'ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।'*

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(৪৪) রাজা অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর ক্ষত্রিয়—অথচ অঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা হয়।†

(৪৫) আমরা নিম্নে বিনা অনুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান সংক্ষেপে দিতেছি:—

বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতা কর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলায়ন করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতর্দ্দন তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন 'এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই।' প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন।

(৪৬) ভগবান মনুর দৌহিত্র পুরূরবা। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পঞ্চ পুত্র মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র। শুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে চতুর্ব্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক জন্ম গ্রহণ করেন।

'পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥'*

(৪৭) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে লিখিত আছে, গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনক হইতে শৌনিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতি জন্মিয়াছিল।

(৪৮) 'বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেহঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেহথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।'

বৎস হইতে বৎসভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস-পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

(৪৯) পুরাণাদির মতে আয়ুর পুত্র রাজা নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তাঁহার পুত্র অণু। অণু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ

* শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।১৭

† বিষ্ণুপুরাণ ৪।২

* হরিবংশ। ২৯ অধ্যায়

বলি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, এই বলির পত্নীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। ইঁহারা বালেয় ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণের মতে সেই রাজা বলি হইতেই চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়।

পৌরাণিক শাস্ত্র হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে চাহিনা, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ স্থানও নাই। তবে এইরূপ উদাহরণের সীমা নাই। পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।*

(৫০) যদিও মনুর পূর্ব্বে আমরা সংকীর্ণ বর্ণের আর তেমন উল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু পুরাকালে 'পঞ্চমগণ'ও যে শিক্ষা, চরিত্র, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির জন্য যথারীতি পূজিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে—

'There is evidence to show, that in early times there were Panchamas distinguished for their genius, learning and piety, and their names are venerated by the Hindus up to the present day. If tradition may be believed, Valmiki, the author of the Ramayana, which is considered to be the first and certainly one of the finest epic poems in Sanskrit, is said to have been a Panchama. This tradition is supported by the

* হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

Padma purana and Jnana Vasishtha, both of which are regarded as words of authority by learned Brahmins. The immortal author of Kural, known as Tiruvalluvar and Tiruppanlyalwar, one of the twelve saints worshipped by the Vaishnava community, are both supposed to have been men of Panchama origin. Marnar Numbiyar, a disciple of Yamunacharya, one of the greatest Vaishnava scholar saints of antiquity, though a Panchama by birth, received all the high funeral honors of a Brahman saint on his death.'*

(৫১) 'Neither birth, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood; character alone constitutes it.†

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি, এ।

* "The condition of low castes"—by K. Ramanu achari. Esq M. A, B. L., Principal, Maharaja s college. Vizianagram.

† মহাভারত বনপর্ব্ব, ৩১৩ ১০৮

e. f. মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়।

---

# ৺স্বামী বিবেকানন্দ।

বঙ্গের সুকীর্ত্তিমান সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সেই নবোদীয়মান মূর্ত্তিমান প্রতিভা আজ অকাল-অস্তমিত

স্বামী বিবেকানন্দের এই অকাল-কাল-প্রাপ্তিতে আজ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শোক-স্পৃষ্ট। ফলে "অকালমৃত্যু" কথাটা লৌকিক বিচারের কথা মাত্র। যে কোন কালের মৃত্যুই সেই মৃতের পক্ষে কাল-মৃত্যু। অকালে মহাসংহারিণী সাংঘাতিকতাও অনায়াসে অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু কালে অতি দুর্লক্ষ্য সামান্য সূত্রেও অলক্ষ্যে জীবন-সূত্র ছিন্ন হয়।

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

অর্থাৎ—

অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে॥

কে ভাবিয়াছিল যে, এত শীঘ্র এই পৃথিবী-প্রখ্যাত নবকীর্ত্তিমান ধর্ম্মপ্রচারক পরলোকপ্রাপ্ত হইবেন? কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা জন-রঞ্জন অভিনয় করিতেং যদি অকস্মাৎ কোন অপরিহার্য্য কারণে সূত্রধার কর্ত্তৃক নেপথ্যে আহূত হন, তবে সেই আকস্মিক অভিনয়-ভঙ্গের অনিবার্য্য-হেতুত্ব-বোধাভাবে দর্শকমণ্ডলীতে যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দের এই আকস্মিক তিরোধানে অস্মদ্দেশে অনেকের অন্তরে সম্ভবতঃ সেই ভাব লাগিয়াছে। অবশ্য পরলোকগত স্বামীজীর সম্বন্ধে সকলের অভিমত সমান নহে; আর তাহা হওয়াও অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিন্দকের অভাব নাই। আজ যাঁহার গীতার সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে জগদ্ব্যাপী গৌরব, তাঁহারই সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী মহালীলা বিষয়ে আজিও এই ভারতেই শত মতভেদ বর্ত্তমান। এ হেন পরম-প্রেমাবতার অকলঙ্ক চন্দ্র গৌরচন্দ্রের চরিত্র-চন্দ্রিকাও অনেকের হৃদয়ান্ধকূপে প্রবিষ্ট হইতেছে না! তবে বিবেকানন্দ আর কোন্ ছার? অতএব বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সহস্র মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে অন্ততঃ একজন সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক ও সুপ্রতিভাবান শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। পাশ্চাত্য ভূমে তাঁহার ন্যায় সুগৌরব-সমাদর লাভ অতি অল্প ভারতবাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেন ইউরোপে 'বাঙ্গালী' নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের—বিশেষতঃ বেদান্তবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব তত্ত্বব্যাখ্যায় যুগপৎ ইউরোপ ও আমেরিকাকে এরূপ বিস্মিত ও বিমোহিত করিতে বিবেকানন্দের ন্যায় কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আজ নিত্য-নবোন্নতি-বিলাসী—সর্ব্বোন্নতিগ্রাসাভিলাষী মার্কিন-সমাজে আমাদের দরিদ্র বিবেকানন্দ বেদান্ত-তত্ত্ব চর্চ্চার তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া, নবধর্ম্মোন্নতির যে উদাম উৎসারিত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তাহা কাল-ক্রোড়-পোষণে কালে কি আকার ধারণ করিবে, কে জানে? সে তরঙ্গ আজ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক তরঙ্গায়িত করিতেছে।

চিকাগোর সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমালোচনী মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই পাশ্চাত্য-চিত্ত-চমৎকারিণী বক্তৃতা আমরা মুদ্রিত পুস্তিকায় পাঠ করিয়াছি; তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব মৌলিকতাময়ী, অথচ সাকুল্য

শাস্ত্রানুসারিণী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানানুরাগিগণের বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহিণী। তারপর ইংলণ্ড এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় ছিল। অপর, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যল্প কাল মধ্যে যে কতিপয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহারই অভিভাবকতায় উদ্ভূত ও পরিচালিত "উদ্বোধন" নামক সাময়িক পত্রটিও বেশ চলিয়াছিল। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিত সতীর্থ ও সহকারিগণের সম্যক্ সাত্ত্বিক যত্ন থাকিলে, এখনও উহা ভাল চলিতে পারিবে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই প্রতিভা ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত "রামকৃষ্ণ মিসন্" এখনও আমাদিগের আশাস্থল। আশা করি, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত অথচ সমুজ্জ্বল জীবনের সুমহান্ উদ্দেশ্যের অনুসরণেই রামকৃষ্ণ-মিসনের কার্য্য চলিবে।

আমাদের বোধহয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, ভারতের সেই লুপ্ত গুপ্ত প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও প্রচারণ; দ্বিতীয়, উন্নততম আধ্যাত্মিক আদর্শে ভারতীয় জাতিসাধারণের সমুন্নয়ন; এবং তৃতীয়, পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের ধর্ম্ম-গুরুত্ব প্রতিষ্ঠাপন। বেদান্ত—বেদের অন্ত, বেদের শেষভাগ; অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বা সার ভাগ। "বেদোঽখিল ধর্ম্মমূলম্।" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। এই মূলেরই সর্ব্বশেষ-পরিণতি বেদান্তামৃত-ফল। যে বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার বলে ভারত একদিন জগৎ-গুরুত্ব পদ লাভ করিয়াছিল; যে ব্রহ্ম-বিদ্যার অবনয়নে আজ ভারতের এই অত্যবনতি; এবং যে ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুন্নয়নেই কেবল ভারতের পুনরুন্নয়নের আশা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্তবিদ্যার পুনঃসঞ্জীবন সুসাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্যই হউক, বিবেকানন্দের জীবন তৎসঙ্কল্পেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

তারপর, বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচারের একদেশদর্শিতার পরিবর্ত্তে স্বাধিকারানুযায়ী সর্ব্বসাধারণে তৎপ্রচারই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, অনেকে হয়ত তাঁহাকে হিন্দুসমাজ-বিপ্লাবক ভাবিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সামাজিক বিপ্লব না ঘটাইয়া, ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর ভাবে যেরূপ সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন সমাজোন্নয়নার্থ আবশ্যক, তাহাই তাঁহার উদ্দিষ্ট ও কর্ত্তব্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি অংশ্য জগদাচার্য্য ব্রাহ্মণ জাতির অবনয়ন-অভিলাষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ আপন অধিকারে উন্নতই থাকুন, বরং আত্মসংস্কার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবনতির প্রতীকার করুন; শূদ্রত্ব ও পাতিত্য হইতে আত্মরক্ষা করুন; আর সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে আত্মগঠন পূর্ব্বক উন্নত হউন; বিবেকানন্দের তাহাই আশা। গুণ, জ্ঞান, সদাচার, এই তিন লইয়াই সভ্যতা। অতএব

সভ্যতাই মনুষ্যত্বের মূলধন। এই মূলধন কেবল কতিপয় "ভদ্র" আখ্যাধারী সম্প্রদায়-বিশেষে চিরনিবদ্ধ না থাকিয়া, অধিকার-ভেদে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি-সাধারণেতেই বিস্তারিত হউক, ইহাই বিবেকানন্দের উদার উদ্দেশ্য বা অভিমত।

সৃষ্টি ক্রমোন্নতিশীল; মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী। অতএব অবনতের উন্নয়ন বিপ্লবের কারণ নহে; উহা স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতের অবনয়নই জগতের সর্ব্ব-বিপ্লবের হেতু। অতীতসাক্ষী ইতিহাসের কুক্ষিতে ইহার শত উদাহরণ সুরক্ষিত। যাহাহউক, সাধারণতঃ লৌকিক নিয়মেও দেখা যায় যে, অজ্ঞান জ্ঞানী হইলে, দারিদ্র ধনী হইলে বা রোগী সুস্থ হইলে, তাহাতে কোন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না; কিন্তু ধনী দারিদ্র হইয়া পড়িলে, জ্ঞানী জ্ঞানভ্রষ্ট বা সুস্থ রোগগ্রস্ত হইলেই যত বিপদ-বিপ্লব-বিড়ম্বনা ঘটে। ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে অবনত হইলেই সমাজের অনিষ্ট; কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নত হইলে, তাহাতে সমাজের বিশিষ্ট ইষ্টই হইবার কথা। অতএব ব্রাহ্মণাদি স্বপদে স্বপদে থাকুন, শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণাদির আদর্শে আত্মোন্নয়ন সাধনে যত্নবান হউন; এই নীতিসূত্রই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের নিয়ামক।

তারপর, আমাদের এই গতগৌরব হত-সর্ব্ব অধঃপতিত ভারত আজ জগতের চক্ষে অপর সমস্ত বিষয়ে দীন হীন হইলেও, তথাপি একটি বিষয়ে ইহা আজিও ভূতলে অতুল। সেটি ইহার আধ্যাত্মিকতা রূপ অমূল্য সম্পদ। সাধারণ গ্রাম্য প্রবাদ-কথায় বলে "রাজার হাতী মলেও লাক্ টাকা। এ বিষয়ে সেই প্রবাদ প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত। ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতির শিক্ষা-গুরুত্বের অধিকারী। এই অধিকার পৃথিবীর এই নবযুগে আবার পরিজ্ঞাত, প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হউক, এতদিচ্ছাই বিবেকানন্দের সর্ব্বোদ্দেশ্যের সারতম তৃতীয় উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্যের জন্মদাত্রী। অধুনা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতের অনেক ঐহিকশিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্ভিন্ন ভারতের এই নব-যুগানুসারী পুনরুন্নয়ন একান্তই অসম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যভূমি ভারতকে আর তুচ্ছ না করিয়া, পরন্তু গুরু-গৌরবের চক্ষে দেখিলেই তাহার নিকট হইতে সে গুরু-দক্ষিণা অনায়াস-লভ্য হইতে পারে। এই জন্যই দারিদ্র বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিদ্যালোকিত ক্ষুদ্র জীবনে বিশাল ও বিপুল আয়োজনের আশা জাগিয়াছিল। এই জন্যই চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভার সু-যোগ বুঝিয়া, সুযোগ্য বিবেকানন্দের ছুটিয়া আমেরিকায় গমন এবং ভগবৎকৃপায় তথায় আশাতীত সুকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁহার সেই মুমহদুদ্দেশ্যের শুভ বীজবপন। এই জন্যই তাঁহার ইউরোপ-পরিভ্রমণ; ভারতের তীর্থপর্য্যটন; হিমালয়ের সাধু-সিদ্ধ-নিষেবিত দুর্গম প্রদেশ পরিদর্শন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যত্রয় সাধনার্থ তিনি ভারতে আবার সেই শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালী কালোপযোগীভাবে বেদান্ত-বিদ্যার বিস্তার ও তদর্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় সু

বিধান সন্ন্যাসীমণ্ডলী-মণ্ডিত মঠস্থাপনাদি-রূপ কার্য্যক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমিত উৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বুঝি এই অভিশপ্ত দেশেরই দুর্ভাগ্য-দোষে এহেন ধর্ম্ম-বীর ও কর্ম্ম-বীরের আকস্মিক তিরোধান হইল। আর তাইবা বলি কেন? প্রকৃতির রীতিই যেন এই। তৃণের জ্বলন বা ওষধির ফলনের ন্যায় যাহার প্রতিভার শীঘ্র শীঘ্র অতি অভ্যুদয় হয়, তাহার শীঘ্র শীঘ্র অবসানও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমাদেরই যুগযুগান্তরের পরীক্ষাপূত "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই যেন পৃথিবীর অত্যল্পকালস্থায়ী অতিথি। যেন তাঁহারা পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া, আবার শীঘ্রই সে ভ্রম সংশোধন করেন! সেই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি হইতে আধুনিক রামকৃষ্ণ, কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অন্ততঃ এ দেশে ত প্রকৃতির এই নিয়মই দেখিতেছি। ভগবদিচ্ছায় আমাদের বিবেকানন্দও একটু অসাধারণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, অতএব তিনিই বা কিরূপে সে নিয়মের বহির্ভূত রহিবেন?

চিকাগোর সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পূর্ব্বে আমাদের সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই বিবেকানন্দত্ব কলিকাতার কোন্ কোণে কয়জনে জানিত? কিন্তু চিকাগোর সেই কাণ্ডের পরে, এমন একজন শক্তিশালী বাঙ্গালী যে এতদিন স্বদেশে লুক্কায়িতপ্রায় থাকিয়া অকস্মাৎ ঐ দূরাতিদূর বিদেশে উদিত হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ অনেকেরই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। বিবেকানন্দকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে; তাঁহার শিক্ষা-সঙ্গ পাইতে অনেকেরই অন্তরে ঔৎসুক্যের উৎস ছুটিয়াছিল। তারপর, সেই বিবেকানন্দ দেশে ফিরিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মহালোকারণ্যের কৌতূহল-কোলাহলময়ী যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, সে সমারোহ স্বচক্ষে দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্বাসিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে সেই বৃহচ্চক্ষু-বিভাসিত প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি এত শীঘ্র কাল-যবনিকার অন্তরালে লুকাইবে। ফলে ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে আর আক্ষেপের অপেক্ষা কি? তবে আমরা নাকি সংসার-মোহের দাস, তাই শোক-দুঃখ, দুরাশা-নিরাশা, সব আমাদেরই চিত্তের নিত্য ভোগ্য দণ্ড। বিবেকানন্দ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সতীর্থ, সঙ্গী, সহকারী ও শিষ্যবর্গ; এবং তাঁহার সমর্থক, সহানুভাবক ও সাহায্যকারকগণ ঈশ্বরেচ্ছা জানিয়াও নিরাশা ও নিরানন্দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যাহাহউক, আশা করি, ভগবৎকৃপায় ক্রমে তাঁহাদের শোক-ভগ্ন ও নিরাশা-নিমগ্ন হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে; ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বর্গগত প্রিয় অধিনায়কের প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা ও সহৃদয়তার বলে অথ-

লিত পাদক্ষেপে পুনরগ্রসর হইতে পারিবেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুযোগ্য, সুবিদ্বান, সুপ্রতিভান্বিত ও সুধী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা বিবেকানন্দকে হারাইয়াও তাঁহাদের দিকে আশ্বাসিত চক্ষে চাহিতেছি।

আমাদের পরমধামগত পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বলিয়াই বিবেকানন্দ পরিচিত। ফলে তিনি উক্ত পরমহংসদেবের নিকট রীতিমত কোন ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য বা সাধারণতঃ কৃপাশ্রিত জ্ঞানোপদিষ্ট শিষ্য, তাহা আমরা অবগত নহি; আর তদবগতির বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। তবে যুবক বিবেকানন্দ যখন বালক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তখনই তিনি পরমহংসদেবের বিশেষ স্নেহাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার বালক-কৃপাশ্রিতগণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই নাকি অগ্রগণ্য ছিলেন। যাহাহউক, উক্ত মহাপুরুষের মহাশীর্ব্বাদ ও মহতী কৃপাশক্তি যে নরেন্দ্রনাথের এই বিবেকানন্দত্ব লাভের অন্ততঃ বিশিষ্ট হেতু, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। "মহৎ-কৃপা-লেশ" ভিন্ন সাধারণতঃ কেহই কোনরূপ অসাধারণতা লাভে অধিকারী হয় না। যাহাহউক, বুঝি গুরু রামকৃষ্ণের বিরহ অধিক দিন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরকুমার-জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ও আরব্ধ প্রিয় কার্য্যনিচয় অসমাপ্ত ফেলিয়াই গুরু-চরণানুসরণ করিলেন। অতএব আমরা আশা করি, পরলোকে সেই গুরুকৃপা-বলেই আমাদের বিবেকানন্দের আত্মা বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের শ্রীপদাশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করুন।

শ্রীশঃ—

## জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বয়। *

গীতাতে দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা এক; আর বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মনিষ্ঠা এক। ফলাভিসন্ধি সহিত যে কর্ম্মনিষ্ঠা, তাহা ঐ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধী। তাহা ভিন্নপথবাহী। আর ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান যে চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম, তাহাই ঐ ব্রহ্মবর্ত্মবাহী; কেননা, তাহা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা ও জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। কর্ম্মসন্ন্যাসী আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত ও

* বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এত দিন দ্বারবঙ্গ রাজের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাকায়, ইদানীং সাহিত্য-সেবা-কার্য্যে কিছু অনবসরযুক্ত ছিলেন; অধুনা পেন্সিয়ন গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব এই অবসর-সুযোগে আমরা তাঁহার নিকট তাঁহার মহার্হ চিন্তা উপহার যথাসম্ভব পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা করি। যদিও এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অবশ্য জ্ঞান-বৃদ্ধও বটেন; সুতরাং সেই প্রাচীন পাকা-হাতের সমীচীন দান অধিকতর উপাদেয় ও উপকারী হইবে, সন্দেহ নাই। বিষয়-কার্য্যে অবসর গ্রহণের পর এই প্রথমেই তিনি হিন্দু-পত্রিকায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-রত্নটি উপহার দিয়াছেন। আমরা সাদরে উহা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, হিন্দু পত্রিকার প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর এই সানুগ্রহ অভিভাবকতা অব্যাহত থাকিবে।

(হিঃ পঃ সঃ)

লোক-সংগ্রহচিকীর্ষু হইয়া কর্ম্ম করিবেন। তাদৃশ জ্ঞানীর কর্ম্মনিষ্ঠাও কেবল মাত্র জ্ঞানপরতা-হেতু ঐ একই ব্রহ্মপথ-বাহী। এই উভয় ফলত্যাগস্থলে কর্ম্ম মৃত, জ্ঞানই জীবিত। সুতরাং মৃত, জীবিত সমুচ্চিত অভিপ্রেত নহে।

এস্থলে অনেক ছিদ্র আছে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। যদি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আর হৃদয়ে ফলকামনা না থাকে, তবেই তো ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম করা যাইতে পারে; এবং তাহা হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে। আর আত্মজ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহ-চিকীর্ষু হইয়া ঐরূপ ক্রিয়া করিতে পারেন। তাদৃশ উভয় অধিকারীরই মোক্ষ নিশ্চয়। কিন্তু ফলকামনা নাই, এমন লোক তো প্রায় দৃষ্ট হয় না। বরং ফলকামনা আছে, ঈশ্বরে ও দেবতাতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক অনেক। আবার ক্রিয়া মানেনা, দেবতা মানেনা, প্রার্থনা মানেনা, অথচ এক নিরাকার ঈশ্বর মানে, এমন লোকও আছে। এই উভয় শ্রেণী পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক ফল লাভের যত্ন করেন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে মানেন, প্রার্থনার ঔচিত্য স্বীকার করেন এবং হৃদয়ে ফলকামনাও অপার। স্বর্গ-লাভের কারণ প্রায় নহে; সাংসারিক সুবিধার কামনাই সব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট সেই সব ফল চান। তজ্জন্য বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া প্রার্থনা করেন। আর কেহবা অপেক্ষাকৃত সদ্বিবেচনা সহকারে ঈশ্বরের নিকট ফল চাওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করেন না। কিন্তু ফল অবশ্য চাই। অতএব তল্লাভ জন্য কেবল পুরুষকার অবলম্বন করেন। সার কথা এই যে, স্বর্গ-কামনাই হউক, সগুণ মুক্তির কামনাই হউক, সাংসারিক বিপদ, আপৎ হইতে উদ্ধারের কামনাই হউক, এবং আপনার ও সন্তানাদি পরিবার বর্গের ও আত্মীয় স্বজনের আয়ু, আরোগ্য, বল, বৃত্তি, সুখ, শান্তির কামনাই হউক,—এই সকল সুসিদ্ধির নিমিত্তই বৈদিক প্রবৃত্তিধর্ম্ম-বিধি কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয়। এ সমস্ত সত্ত্বে বিধিবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভব নহে। পুরুষকার-ফলে বঞ্চিত হইলেই সাধক দেবের ও দৈবানুষ্ঠানের শরণাপন্ন হন। যদি তাদৃশ পুরুষকার-বঞ্চিত ব্যক্তি, বেদবিহিত দেবতা ও দৈব-ক্রিয়া না মানেন, কিন্তু কেবল একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, আর কেবল সেই ঈশ্বরের নিকট ফল চান, তবে তাদৃশ ঈশ্বর সেস্থলে কেবল ফলদাতা দেবতামাত্র। তথা ক্রিয়ার সহিত এবং বিধিবিহিত নামের সহিত প্রার্থনা হইল না, এই প্রভেদ। সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এবং আমন্ত্রিত দেবতা সমূহকে একমাত্র ঈশ্বরের সহ অভেদ জ্ঞান করিয়া, ফল অথবা সগুণ মুক্তি প্রার্থনা করিবেন। আর ফলের ইচ্ছা না থাকে তো লোক-সংগ্রহার্থ তাহাতে যোগ দিবেন।

সম্পদে বিপদে ঈশ্বর-স্মরণই মনুষ্যত্ব। মঙ্গল লাভে সেই মঙ্গলময়ের পূজা দেওয়া সমস্ত গৃহীর কর্ত্তব্য। বিপদ ও সঙ্কট

হইতে ত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারই পূজা উচিত। যিনি ভগবানের ভক্ত ও শরণাগত, ঐ সমস্ত অবস্থায় তিনি তাঁহারই সকাশে স্তবন ও যাচন পরায়ণ হন। কিন্তু সেই সকল কাম্য পূজা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী আচরিত হওয়া প্রয়োজন। যে যে দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ক্রিয়াচরণের বিধি আছে, তৎসাধনের যে সমস্ত পদ্ধতি আছে, তাহারই অনুষ্ঠান উপাদেয়। কেননা নামের ভেদে অর্চ্চনার মূলতত্ত্ব-ভেদ হয় না। কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, শিব, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি সর্ব্ব দেবতার নাম ও রূপ, সেই রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ভগবানেতে সমন্বিত। অতএব ভগবৎভক্ত সাধু গৃহস্থ দেব-দেবীর পূজার সহ ঈশ্বরোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিবেন। তাঁহার গৃহের মঙ্গলার্থে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার সহিত মহামায়ার পূজা দিবেন। ভদ্রাসনের শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি যত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন, এবং স্বকীয় পরকীয় কল্যাণার্থে তত্তৎ যজ্ঞোপলক্ষিত বাসরে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে অন্নদান করিবেন।

গৃহপতি যদি নিষ্কাম হইয়া থাকেন, তথাপি সকামী পরিবারের অধিকার পূরণার্থে এইরূপ কাম্য এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম সকল করিবেন এবং করাইবেন। তাহাতে স্বয়ং ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিবেন। অতএব আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক হইলেও প্রকৃতিবর্গের অধিকারতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষের সহ কাহারো বিরোধ সম্ভবে না। আর যদি ফলকামনা পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে সেইব কাম্য কর্ম্মই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম। ফলে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যোগরূপ প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম, ঈশ্বর-স্মরণহীন প্রবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা উপাদেয়। কেননা একমাত্র ঈশ্বরের স্মরণই নির্ম্মলচিত্ততা ও বৈরাগ্য লাভের হেতু।

অতএব একমাত্র ঈশ্বরে সমন্বিত দেবোদ্দিষ্ট ব্যতীত ক্রিয়া করিবেনা; এবং ক্রিয়াবিহীন ঈশ্বর স্মরণ, দেবাবাহন, এবং মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট হইবে না। এই সমস্ত স্থলে দেবজ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিহিত। কিন্তু মোক্ষ স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা কর্ম্মবন্ধনের বিরোধী বিধায়, তাহার সহ কর্ম্মের সমুচ্চয়াভাব। তাদৃশ আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ ফলকামনা শূন্য বিধায়, তত্ত্বতঃ পরস্পর সমন্বিত এবং উভয়ই মোক্ষপথবাহী। আর প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ফলজনকত্ব হেতু বন্ধনপর। ফলে সে বন্ধন আমরা দেখিতে পাই না; কেননা তাহাই 'অদৃষ্ট'। অদৃষ্ট শুভাশুভ উভয়রূপী শুভ আপাততঃ যত রুচির ও প্রার্থনীয় হউক, কিন্তু বন্ধন মাত্র। ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত— আত্মজ্ঞান ব্যতীত সে মায়া তিরোহিত হয় না।

শ্রীচঃ শেঃ বঃ।

# বর্ণভেদ-তত্ত্ব।

## ( বর্ণ ও জাতিশব্দ )

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ক্ষত্রাদ্ বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ।
তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্বভূবুর্দস্যবঃ সদা।
ব্রাহ্মণ্যাং ঋষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কুবরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ।
সদ্যঃ কোটীক সংসর্গাদধমো জগতীতলে।
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
আকারেণ তথা বাচা হ্যতীতঃ ক্ষত্রিয়ং যতঃ,
তেন জাত্যা সপুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ নির্ভয়া রণদুর্জ্জয়াঃ।
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং সরাকঃ পরি-
কীর্ত্তিতঃ।
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চবিপ্রযোষিতঃ।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবু র্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতয়ঃ শূদ্রাস্তেব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥
বিপ্রস্য জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥
লোভীবিপ্রশ্চ শূদ্রানামগ্রে দানংগৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥
কিঞ্চিৎপুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ডাৎসমন্বিতঃ।
সসূতো ধর্ম্মবক্তাচ মৎ পূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ॥
পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মাকৃপানিধিঃ।
পুরাণপ্রবক্তাশ্চৈব স যজ্ঞকুণ্ডসম্ভবঃ॥
বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদুকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥"

মতান্তরে কয়টী জাতির উৎপত্তি-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

"পট্টিকারশ্চ মালিন্যাং স্থপতিশ্চ বভূব হ।
স্থপতেরপি গন্ধিকায়াং চিত্রকারোঽপ্যজায়ত॥
গোপালিন্যাং চিত্রকারাৎপ্রতিমাগঠকঃ স্মৃতঃ।
প্রতিমাগঠাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ॥
সূত্রধারস্য সম্ভবঃ সোপন গৃহকারকঃ॥
করণস্ত্রিয়াঞ্চ মাহিষ্যাদ্ রথকারস্য সম্ভবঃ।
সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ॥
স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।
তত গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শুণ্ডিকাঃ॥
শৌণ্ডিক্যাং শরাকাজ্জাতো রজকো মল-
নাশকঃ।
শৌণ্ডিক্যাং রজকাজ্জাতো নটো গরুড় এবচ॥
গরুড়ান্নটকন্যায়াং শৃঙ্গকারস্য সম্ভবঃ।
শৃঙ্গকার্য্যাং নটাজ্জাতো গণিদ্রামীতি
বিশ্রুতঃ॥
তস্য পুত্রাৎ শৃঙ্গকার্য্যাং ভূমিমালীতি বিশ্রুতঃ॥
অনয়োর্হ্যভবৎ পুত্রঃ পুণ্ডকশ্চ তথৈবচ॥
বন্ধকারাঙ্গকাকার কাচকারকচক্রিকঃ
এতে বৈ পুণ্ডকাজ্জাতাঃ কন্যায়াং নাপি-
তস্য চ॥
চক্রিকাং গাঙ্গপুত্রোঽপি কন্যায়াং পুণ্ডকস্য চ
গঙ্গাপুত্রাৎ পুণ্ডজীবী নটকন্যায়া সম্ভবঃ॥
পুণ্ডজীবাদ্ গণ্ডকারো রজককন্যা সম্ভবঃ।
গণ্ডকারাদ্ বাদ্যকার বর্দ্ধকানাঞ্চ সম্ভবঃ॥

পুণ্ড্রজীবাদ্ ভড় জাতির্নট্যা বৈ শববাহকঃ।
ভড়াত্তু চূর্ণকারো বৈ জাদরস্তীবরস্তথা,
কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুরাব সরবৌ তথা,
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দো মল্লস্তথাবকঃ।
কুন্দকারঃ কর্ণিকারো ভোগলোহমৃতপস্তথা,
এতে বৈ তীবরাজ্জাতা কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাদেব চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ,
চত্বারিংশৎ পঞ্চমাসু জাতাঃ পুত্রা বিলোমজাঃ॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ ও স্মৃতিসংহিতায় আরও বহুবিধ জাত্যুৎপত্তি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলগুলির স্থান সঙ্কুলন হইলেও, আবশ্যক হইবে না ভয়ে, এ প্রসঙ্গে উহা যথোচিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দেখান সম্ভব হইল না।

বিভিন্ন পুরাণমতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিভিন্নভাবে সমর্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে সমান রীতির অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল শ্লোকের যথাবৎ অনুবাদ প্রবন্ধ-কলেবরে স্থান পাইবেনা বলিয়া আপাততঃ বিরত হইলাম। বস্তুতঃ এই সকল শাস্ত্রবাক্য দৃষ্টে বুঝা যায়,—অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ ও ব্যভিচার দোষ বশতঃ জাত সন্তানেরাই চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত সমস্ত জাতির প্রবর্ত্তক। যাহাদের জন্ম একরূপ, তাহারা এক জাতি। শূদ্র-সংসর্গে ব্রাহ্মণীর গর্ভোদ্ভূত সন্তান 'চণ্ডাল' নামধারী। এইরূপ সংসর্গবশে যত সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা এই চণ্ডাল জাতি। অন্যবিধ সংসর্গজাত সন্তানের জাতি অন্য। শাস্ত্র-প্রমাণ-বলে বুঝিতে হয়, জাতি জন্মের অধীন।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় দ্বিজ, দ্বিজাতি, দ্বিজন্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়; ইহার অর্থ, তাহাদের দুই প্রকার বা দুইবার জন্ম আছে। মাতৃগর্ভ হইতে এক জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয়বার জন্ম। বৈদিক "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উপনয়নের সময় মৃগচর্ম্মের উপর গর্ভবাসী শিশুর মত ভাবে ব্রহ্মচারীর উপবেশনের কথা আছে। ঐ ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা আবৃত করা হইত। পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণাজিনের স্থানে বস্ত্রব্যবহার নিয়ম হইয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মচারী ঐ কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদন হইতে প্রসূত হইতেন; তখন তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের চিহ্নস্বরূপ মৃগচর্ম্ম-তন্ত্রী তাঁহার গলায় দেওয়া হইত। উহাকে (যজ্ঞোপবীতকে) বেদে নাড়ীস্বরূপ বলা হইয়াছে। মৃগচর্ম্ম অধুনাও ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞোপবীত বিষয়ের বেদবাক্য (ব্রাহ্মণ-বাক্য) বিস্তারভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ফলতঃ দ্বিজন্মা ও দ্বিজাতি একার্থক হইলে, জাতি-জন্মের সম্বন্ধ বড় কাছাকাছি। শাস্ত্রান্তরে দেখাযায়—"জন্মনা ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" জন্ম দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই সন্তান ব্রাহ্মণ হয়। এই অভিপ্রায়ানুসারেই "ব্রাহ্মণীভূতমাতাপিত্রোরুৎপদ্যমানত্বং ব্রাহ্মণত্বং" এই লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। সুতরাং জন্মানুসারে জাতি হইবে, এই পর্য্যন্ত অনুশীলনে বুঝা গেল। এ সকল শাস্ত্রতত্ত্বের যৌক্তিকতা পরে বিবেচিত হইবে।

বর্ণপ্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত যে বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও মূলে জন্মতত্ত্ব বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ,

ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য কি, দেখা যাউক্। স্বাস্থ্য, আহার, বিহার, দেশের প্রকৃতিগত শীতাতপের ন্যূনাধিক্য অনেক সময়ে শারীরিক বর্ণবিভেদের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু উহাই বর্ণভেদের মুখ্য কারণ নহে; শুক্র-শোণিতই বর্ণভেদের প্রকৃষ্ট কারণ। আমাদের দেশে আমাদের চক্ষে শ্যাম, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণের লোক থাকিলেও, বস্তুতঃ আমাদের জাতীয়বর্ণ শ্বেতাভ-কৃষ্ণ। এক পিতার সন্তান একজন শ্যাম ও অপর গৌরবর্ণ দেখা যায়; ইহারা এক মাতারই গর্ভজাত সন্তান। যমজ সন্তানেরও বর্ণভেদ হয়; কিন্তু এই বর্ণভেদ ইহুদী ও কাফ্রিজাতির বর্ণভেদের মত নহে। জগতের ইতিহাসে একজাতি একবর্ণের অধিকারী। অপর জাতীয় লোক অপর দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিলে, বা আহার-পরিচ্ছদাদির নিয়ম তদ্দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে পালন করিলে, তাহার বর্ণের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহাও সহোদরদ্বয়ের শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হইবার মত। শ্বেতদ্বীপে বহুবর্ষ পুরুষানুক্রমে বাস করিলেও শোণিতসম্বন্ধ ব্যতীত কাফ্রীজাতি তদ্দেশীয়ের ন্যায় বর্ণলাভ করিতে পারিবে না। শোণিতসম্বন্ধেও বহুপুরুষ পরে আনুপাতিক অল্পতালাভ করিয়া, ক্রমে পূর্ব্ববর্ণ অদৃশ্য হয়। বিভিন্ন শোণিতসম্বন্ধে আপাততঃ এক অভিনব বর্ণ উৎপন্ন হয়; পরে তজ্জাতীয় শোণিত বহুপুরুষ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংসৃষ্ট হইলে, বর্ণান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্বর্ণপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। বর্তমান ভারতীয় সমাজে আর্য্য ও অনার্য্য-শোণিতের বহুকালবর্ত্তী সংমিশ্রণের ফলে শ্বেতাভ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, পরে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ জন্ম অর্থাৎ শুক্রশোণিতসম্বন্ধই বর্ণপার্থক্যের কারণ; দেশ, কাল, আহার, পরিচ্ছদাদি সহকারী মাত্র। এতাবৎকাল আমরা জন্মানুসারে জাতিব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি অন্যবিধ আন্দোলনে অগ্রসর হইতে হইবে।

গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ শাস্ত্রের বিষম রহস্য। এই রহস্যের গভীর তলদেশ দর্শন অসম্ভব হইলেও, উহাই জাতিতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক, গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ কেবল চতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধেই পাওয়া যায়।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"
(গীতা ৪।১৩।)

গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি; ইহা শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের উক্তি। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই অংশই এখানকার সংশয়-তরঙ্গমালার একমাত্র নিদান।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন "গুণকর্ম্ম-বিভাগাভ্যাং সহ"। তাঁহাদের মতের তাৎপর্য্য গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ নহে। ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি গুণকর্ম্মবিভাগের সহিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। কেবল বর্ণ সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হই নাই, তাহাদের গুণ ও কর্ম্মবিভাগও আমি করিয়াছি।" ইহাতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি যেমন হউক্ না কেন, ভগবান্ তাঁহার গুণ-কর্ম্ম নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। অন্ত বর্ণ ব্রাহ্মণের গুণ পাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, এইরূপ বুঝা যায়। আমরা এ ব্যাখ্যায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ পক্ষ।

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে বলেন, "গুণবিভাগ-কর্ম্মবিভাগশশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বগুণপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি; সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্যাতেজ-প্রভৃতীনি; তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি; রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম, ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" সত্ত্বগুণ, ও শম-দম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। এই গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে জাতিবিভাগ; অর্থাৎ এতাদৃশ গুণ ও কর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণজাতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ইত্যাকার অর্থ অনেকাংশে সঙ্গত; যেহেতু শাস্ত্রান্তরে "কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং" অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কে কীদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহা আলোচিত হইবে। এখন টীকাকারগণের মত পর্য্যালোচনা করা যাউক। শ্রীমৎ আনন্দগিরি বলেন, "গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগস্তেন।" গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহাদের পার্থক্য অনুসারে যে কর্ম্মের (শম-দম, যুদ্ধ, কৃষি প্রভৃতির) পার্থক্য, তদ্দ্বারা চারিজাতি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, এইরূপ গিরিমহাশয়ের মতের অর্থ। অনেক বচনের সংহিত একবাক্যতা হয়, এইরূপ গিরির ব্যাখ্যা সমধিক সঙ্গত বোধ হয়।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাও শঙ্করের মতের অভিন্ন। গিরি শঙ্করের ভাষ্যের টীকাকার। স্বামী মূলের টীকা করিলেও, ভাষ্য ও গিরিকৃত টীকা পর্য্যালোচনা করিয়াই যে তিনি টীকা করিয়াছেন, একথা তাঁহার নিজোক্তিতেই জানা যায়; অতএব গুণানুযায়ী কর্ম্মঅনুসারে বিভিন্ন জাতিচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইঁহাদের সকলেই এই মতের সমর্থক। পরে যুক্তির চর্চ্চা করা যাইবে। গুণ তিনটী; সত্ত্ব, রজ ও তম। মানব কেন, জগতের যাবতীয় বস্তুজাতই এই ত্রিগুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরই তিন গুণের সংযোগে উৎপন্ন। প্রত্যেক শরীরেই তিনগুণ আছে, তবে যে দেহে যে গুণের আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি তদ্গুণাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হয়। মহর্ষি মনু বলেন,—

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।

সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানব সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইবে; আবার রজঃপ্রকৃতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলে রাজস হইবে। অধুনা দেখা যাউক, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের লক্ষণ কি? সত্ত্বগুণের পরিচয় পাইব কি উপায়ে?

মহামান্য মনুসংহিতায় দেখা যাইতেছে—
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্।
১২। ৩১

যৎসর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্‌।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্‌॥
১২।৩৭২

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্যাপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্‌॥১২৩

যেনাস্মিন্‌ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্‌। যচ্চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্‌॥১২।৩৬

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্‌॥ ১২।৩৩

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্‌ ১২।৩৫

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্‌॥১২।৩৮

মানবীয় সত্ত্বগুণের লক্ষণ, বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্ম্মকার্য্য, আত্মচিন্তা ইত্যাদি। রাজসগুণলক্ষণ—আরম্ভপ্রিয়তা, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ, সর্ব্বদা বিষয়সেবা, খ্যাতিজনক কর্ম্মানুষ্ঠান ও দৈন্যাবস্থায় শোকপ্রকাশ ইত্যাদি। তমোগুণের লক্ষণ—লোভ, স্বপ্ন, অধৈর্য্য, নাস্তিকতা, অনধিকারকার্য্য করা, যাচ্ঞাশীলতা, প্রমাদ, লজ্জাকরকর্ম্ম করা ইত্যাদি। প্রধানতঃ ধর্ম্মই সত্ত্বগুণের লক্ষণ, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ; এবং কাম বা কামনাই তমোগুণের লক্ষণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

---

# কাল্যপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রম্‌।

( শঙ্করাচার্য্য-কৃতম্‌। )

( ১ )

প্রাগেদেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতং নার্চ্চিতং মে,
তেনাহং দুঃখবর্গৈর্জঠরজননজৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
নীত্বা জন্মান্তরং মে পুনরিহ ভবিতা কাশ্রয়ো নেতি জানে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

পূর্ব্ব জন্মে কখনই তব শ্রীচরণ
আশ্রয় না করিয়াছি, অথবা অর্চ্চন।
তাই মাগো! মাতৃগর্ভে করিয়া প্রবেশ,
জঠর-যন্ত্রণা আমি সহিনু অশেষ।
পর জন্মে কোথা গিয়া লইব আশ্রয়,
তাহার কিছুই আমি না জানি নিশ্চয়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ২ )

বাল্যে বালাভিলাষৈর্জড়িত জড়মতির্বাললীলাপ্রসক্তো,
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্‌।
নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বাল্যকালে বাল্যকাল-সুলভ-ইচ্ছায়
জড়িত হইয়া ছিনু জড়বুদ্ধি হায়!
কলি-পাপ-হরা ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী
তোমারে না চিনিলাম কভু গো জননি!
আমার আচার নাই, পূজাও না রয়,
পূজার কথাও কভু মনে নাহি হয়।
শাস্ত্রজ্ঞান কিছু নাহি জন্মিল আমার,
সেবাও না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৩ )

প্রাপ্তোঽহং যৌবনং তৎ বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো,
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী-পরধন-হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

যৌবন সময়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গ
দংশন করিল মাগো! এই মোর অঙ্গ;
অমনি চৈতন্য মোর পাইল বিনাশ,
পরস্ত্রীতে পরধনে হ'ল অভিলাষ।
হায়রে শ্রীপাদপদ্ম যুগল তোমার
স্মরণ না করিলাম কভু একবার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৪ )

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টৈঃ,
ক প্রাপ্স্যামি ক যামীত্যনিশমহরহদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

প্রৌঢ়কালে পুত্র-কন্যা-ভার্য্যার কারণ,
অন্ন বস্ত্র হেতু মোর ব্যস্ত ছিল মন
কোথা যাব, কোথা পাব, ভাবি নিরন্তর,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গেল মোর কলেবর।
চিন্তা নাহি করিলাম বারেক তোমার,
চিন্তা করিতেও শ্রদ্ধা না ছিল আমার।
না করিনু কভু হায় তোমার ভজন,
না করিনু কভু তব নাম-সংকীর্ত্তন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি।

( ৫ )

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃশবিবশতনুঃ শ্বাসকাশাতিসারৈঃ,
কর্ণঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যোয়মন্ত্রং ন চান্যৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া যুটিল কাশ-শ্বাস-অতিসার।
অবশ হইল অঙ্গ, হলো অতি শীর্ণ,
হইলাম চক্ষু-কর্ণ-ঘ্রাণ-শক্তিহীন।
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল।
অনুতাপানল শেষে দহিল আমায়,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৬ )

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ ক্বচিদপি সলিলং
নাহৃতং নৈব পুষ্পং,
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা ক্বচিদপি চ কৃতা
নৈব ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং
নাপি চর্চ্চা কৃতা তে।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

প্রাতঃকালে করি স্নান তোমায় কখন
পুষ্প-জল দিয়া নাহি করিনু অর্চ্চন।
নৈবেদ্যাদি সংগ্রহেও নাহি ছিল মতি,
না ছিল সাত্ত্বিক ভাব, না ছিল ভকতি।
কিবা ন্যাস, কিবা পূজা, গুণ-সঙ্কীর্ত্তন
কোনরূপ চর্চ্চা নাহি করিনু কখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৭ )

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্ব্ব
সিদ্ধিপ্রদাত্রীং,
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্য-
লীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো
দুঃখসংঘৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাত্রী ভব-ভয়-বিনাশিনী,
বেদ-সারভূতা নিত্য-আনন্দ-দায়িনী।
নিরন্তর লীলাময়ী করুণা-শালিনী।
চিনিতে না পারিলাম তোমায় জননি!
দিন দিন বৃথা কার্য্যে সঁপে দিয়া মন,
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে আমি পড়িনু এখন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৮ )

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গ-
মুণ্ডাভিরামা,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী
দীর্ঘনেত্রা।
সংসারসৌকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা
ভাবনাভিঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

শ্যামল-জলদ-সম-শ্যামাঙ্গ-ধারিণী,
মুক্তকেশী, খড়্গ-মুণ্ডে-মানস-মোহিনী,
ভক্ত-ভয় বিনাশিনী, ইষ্ট-বিধায়িনী,
দুর্জ্জয়-রাক্ষসগণ-মস্তক-মালিনী,
ত্রিসংসার-সারভূতা, আয়ত লোচনা,
চিন্তিতে তোমারে নাহি জন্মিল বাসনা।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

( ৯ )

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদা-
ম্ভোজযুগ্মং,
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং
ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ
কামুকস্ত্বাং প্রযাচে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

কিবা ব্রহ্মা, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর,
তব পাদ-পদ্ম-যুগ সেবনে তৎপর।
পরম দুর্ভাগা আমি, তাই গো জননি!
তব পাদ-পদ্ম নাহি পূজিনু কখনি।

লোভ-মোহ-বশে আমি থাকিয়া সদাই,
হইনু বিকৃতবুদ্ধি,—তাই ভিক্ষা চাই,—
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১০)

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামভোগ-
প্রলুব্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌল-
সংঘৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানন্তে ক্ব চর্চ্চা ক্ব চ মনুজপনং নৈব
কিঞ্চিৎ কৃতং মে;
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

রাগ-দ্বেষে মত্ত, পাপ-পূর্ণ কলেবর,
নানা কাম্য-বস্তু ভোগে লুব্ধ নিরন্তর।
হিতাহিত-বিচারের না আছে শকতি,
তন্ত্রোক্ত আচার নাই, নাই তায় মতি।
কিবা ধ্যান, কিবা পূজা, মন্ত্রজপ আর,
কিছুই না করিলাম কদাপি তোমার।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১১)

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ
পাপচেতা
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা
ব্যাকুলাত্মা।
কিং তে পূজাবিধানং ক্ব চ মনুজপনং
ক্বানুরাগঃ ক্ব চাস্য,
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

কিসে তব পূজা করি, মন্ত্র জপি আর,
কিসে বা অনুরাগ দেখাই তোমার!
করিতে তোমার কার্য্য মন নাহি সরে,
ছট্ ফট্ করে প্রাণ উদরের তরে!
রোগী দুঃখী পরাধীন অবোধ নির্ধন,
পাপিষ্ঠ কুমনা নিদ্রালস্য-পরায়ণ!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১২)

মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশ-
সংঘাবৃতস্য,
ক্ষুন্নিদ্রাম্বিতস্য স্মরণবিরহিণঃ পাপকর্ম্ম-
প্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্র্যস্য ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ ভজনবিধিঃ ক্ব
স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে;
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

মিথ্যা মোহ-অনুরাগে মুগ্ধ মোর মন,
নানাবিধ ক্লেশে আমি ক্লিষ্ট অনুক্ষণ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ল'য়ে ব্যাপৃত সদাই,
তত্ত্ব-কথা-শ্রবণেও শ্রদ্ধা মোর নাই।
পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত আমি, পরম নির্ধন,
ভজনেতে সাধুসঙ্গে ধর্ম্মে নাহি মন।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননিজঠরগস্তাবদাগত্য
দেহ-
স্ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্ম-
হেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বামৃতে
নাস্তি মাতঃ।
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

পিতার শরীর হতে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।

তার পর তথা হ'তে দেখিনু সংসার;
তুমিই স্বয়ং কর, করাও আবার!
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-হেতু-স্বরূপিণী,
তুমিই স্বয়ং বুদ্ধি-চিত্ত নিবাসিনী।
তোমা বিনা মাগো! এই অনন্ত ভুবন
থাকিতে না পারে হায় কিছুতে কখন!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৪)

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহো-
গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকা-
হহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী
ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

তুমি ভূমি, তুমি জল, তুমিই অনল,
তুমি বায়ু, তুমি পুনঃ আকাশ-মণ্ডল,
তুমিই মহৎতত্ত্ব, তুমিই প্রকৃতি,
তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি অহঙ্কৃতি।
তুমিই সংসারে মাগো! একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৫)

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী
ভৈরবী ত্বং,
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ
শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা
হিঙ্গুলাখ্যা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

তুমি কালী তারা দুর্গা ভৈরবী সুন্দরী,
তুমি লক্ষ্মী ছিন্নমস্তা ত্রিভুবনেশ্বরী,
তুমি গিরিসুতা ধূমা শিবানী বগলা,
তুমিই মাতঙ্গী তুমি মঙ্গলা হিঙ্গুলা।
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
ক্ষমা কর অপরাধ আমার জননি!

(১৬)

স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ
সদা ভক্তিযুক্তো,
দুষ্কীর্ত্তিং দুর্গমং বৎ পরিভবতি সদা বিঘ্নতা-
নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ
সর্ব্বদা সাপরাধঃ
সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ
পুত্রবুদ্ধ্যা॥

ভক্তিভরে এই স্তব পঠি মনে মনে,
যে জন প্রণাম করে দেবীর চরণে,
দুর্গতি দুষ্কর্ম্ম তার সব দূরে যায়,
যত কিছু বিঘ্ন তার সকলি পলায়।
আধি ব্যাধি কিছু তার না থাকে কখন;
যদিও তাহার দোষ রহে সর্ব্বক্ষণ,
তবু সেই কামরূপা ত্রিলোক-জননী
তার প্রতি তুষ্ট থাকি দিবস-যামিনী,
আপনার পুত্র বলি ভাবিয়া তাহায়,
মার্জ্জনা করেন তার দোষ সমুদায়।

(১৭)

জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্জ্ঞান-
শীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাক্
ধার্ম্মিকশ্চ।

নিত্যানন্দো গুণাঢ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদ-পদ্মাবলম্বাৎ॥

পার্ব্বতীর পাদপদ্মে যে লয় আশ্রয়,
নিজবলে কবিগণে সেই করে জয়।
ধনবান্ জ্ঞানবান্ দয়াবান্ হয়,
পাপ নাহি থাকে তার, কলঙ্ক না রয়।
কুলাচার-যুত সদা, সত্য-পরায়ণ,
সুধার্ম্মিক, সদানন্দ, গুণ-নিকেতন।
মূর্খের সংসর্গে তার নাহি থাকে মতি,
নিরন্তর থাকে তার সাধুপথে গতি।
সংসার-সাগর এই অগাধ অপার,
অনায়াসে সেই জন হ'য়ে যায় পার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর
বি, এ,

---

# সামবেদ সংহিতা।

( পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অথ চতুর্থী।

( মনুঃ প্রার্থয়তে )

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২১ ২
অগ্নি রুক্‌থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩
ঋচয়ামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো
১ ২
বরেণ্যম্। ৪॥

উক্‌থে—স্তোত্রে শাস্ত্রাত্মকে—স্তবরূপ শাস্ত্রাত্মকে।

অধ্বরে—হিংসা রহিতে অস্মিন্ যজ্ঞে (১) অগ্নিঃ পুরোহিতঃ—যজ্ঞাৎ পুরস্তঃ উত্তর-বেদ্যাং ঋত্বিগ্‌ভির্নিহিতোভূৎ—যজ্ঞের সম্মুখে উত্তরবেদীতে ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছিলেন। (পুরোহিত অর্থ সম্মুখে স্থিত।)

---

(১) ভগবান্ সায়নাচার্য্য যজ্ঞ মাত্র হিংসারহিত, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। পশুহনন ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়না এবং তজ্জন্যই "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" এই শ্রুতিবাক্য আছে। কিন্তু উহা রাজসী বৃত্তি—

"হিংসাচৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সন কর্ত্তব্যং যতস্তে সাত্ত্বিকামতাঃ॥"
বাচস্পত্যাভিধানধৃত (হিংসা শব্দ ব্যাখ্যানে)
বৃহন্নারদীয়ধৃত বচনং।

যদি হিংসা দোষ না হইত, তাহা হইলে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এরূপ শ্রুতি থাকিত না। যাজ্ঞিকদিগের বৈধহিংসা কর্ত্তব্য কিন্তু পশুবধ-জনিত পাপ ভোগ করিতে হয়; তৎপরে যজ্ঞকর্ম্ম জন্য কিছুদিন স্বর্গ ভোগ করেন। ইহা আমার পূজ্যপাদ বিবিধাস্তর্বাণি গুরুদেব স্বামীজীরও মত; কারণ তিনি যৎকালে রেওয়াঁ রাজ্যে মহারাজার অনুরোধ ক্রমে কিছু দিনের জন্য বাস করেন, তখন মহারাজ রঘুরাজ সিংহ যজ্ঞ কামনা করেন। স্বামীজী জানিতে পারিয়া, ভাবি হিংসা জন্য, রাজ্য হইতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া বাস করেন। মহারাজ জানিতে পারিয়া স্বামীজীর নিকট গিয়া রাজ্য-ত্যাগ-কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী কহেন "আমি বৈষ্ণব, আমার স্বর্গ-কামনা নাই"। মহারাজ কহেন "সভা-পণ্ডিতের আদেশ ক্রমে করিতেছি"। স্বামীজী কহেন—"আপনি স্বর্গ ভোগ করিবেন, কিন্তু প্রথমে পশু-হনন পাপ জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে; আরও এ যজ্ঞ

গ্রাবাণঃ—সোমাভিষবার্থং পুরতো নিহিত ইত্যর্থঃ—সোমে সিঞ্চিত করিবার জন্য অগ্রে রক্ষিত প্রস্তর সকল।

বর্হিশ্চ পুরতো নিহিতং আসাদিতং—দর্ভাসনও অগ্রে রক্ষিত হইয়াছে।

হে মরুতঃ—একোনপঞ্চাশন্মরুদ্‌গণাঃ!

হে ব্রহ্মণস্পতে—স্তোত্রস্য পালক।

হে দেবাঃ—দ্যোতনাদিগুণযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ!

বরেণ্যং—বরণীয়ং—ভজনীয়ম্।

অবঃ—রক্ষণম্।

ঋচা—স্তুক্তরূপয়া স্তুত্যা।

য়ামি—যাচামি (বর্ণলোপচ্ছান্দসঃ—ছন্দ জন্য বর্ণ লোপ করা হইয়াছে) প্রার্থনা করিতেছি।

স্তোত্র শাস্ত্রাত্মক, হিংসারহিত এই যজ্ঞে অগ্নিদেব পুরোহিত হইয়াছেন; সোম সিঞ্চন করিবার জন্য প্রস্তর সকল পুরোহিত হইয়াছে; দর্ভাসনও পুরোহিত হইয়াছে। হে মরুদ্‌গণ! হে স্তোত্রপালক! হে দ্যোতনাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমাদিগের নিকট স্তুক্তরূপ স্তুতিদ্বারা এই প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের এই সকল দ্রব্যগুলি এইরূপে রক্ষা কর, যাহাতে ভজনীয়ই থাকে। ৪॥

---

সম্পূর্ণ হইবে না"; পরিশেষে আচার্য্যকে কহেন যে "আপনি লোভে মহারাজকে পাপে প্রেরণা করিতেছেন, কিন্তু সেই পাপ আপনাকে ভোগ করিতে হইবে।" স্বামীজী পরদিন প্রত্যুষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রয়াগ গমন করেন। মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভ করেন—সাতলক্ষ মুদ্রা যজ্ঞে ব্যয় হয়; তন্মধ্যে তিনলক্ষ আচার্য্য প্রাপ্ত হন; কিন্তু যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। আচার্য্য যজ্ঞীয় অগ্নিশিখা-বেষ্টিত হইয়া দগ্ধ হন।

## অথ পঞ্চমী।

(সুদীতি ঋষিঃ পুরুমীঢ়ো বা)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
অগ্নি মীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীর শোচিষম্।
৩ ২   ৩ ১ ২   ৩২উ   ৩ ১
অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সুদীতয়ে ছর্দ্দিঃ। ৫॥

হে পুরুমীঢ়! (এক ঋষির নাম)।

অগ্নিং অবসে—অগ্নিং রক্ষণায়।

ঈড়িষ্ব—স্তুহি গাথাভিঃ ইতি শেষঃ—গাথাদ্বারা স্তব কর। (গাথা অর্থাৎ মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা)

শীর শোচিষং—শয়ন-স্বভাব রোচিষ্কং—শয়নস্বভাব প্রভাশালী, অর্থাৎ যে অগ্নির দীপ্তি উর্দ্ধদিকে না গিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে)

রায়ে—ধনায়। নরঃ—অন্যেঽপি যজমানাঃ স্তুবন্তি স্বার্থং।

সুদীতয়ে—মহ্যং—আমাকে।

অগ্নিঃ ত্বয়া অভিষ্টুতঃ সন্ ছর্দ্দিঃ গৃহং প্রযচ্ছতু।

হে পুরুমীঢ়! নিজের রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর; সেই শয়নস্বভাব প্রভাশালী অগ্নিকে ধনের জন্য স্তব কর। শুন, অন্যান্য যজমানগণ আপন স্বার্থের জন্য তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তজ্জন্য অগ্নি তোমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমাকে একটি গৃহ প্রদান করুন। ৫॥

## অথ ষষ্ঠী।

(প্রাকণ্বঋষিঃ)।

৩ ১ ২   ৩ ৩ ২ ৩ ১   ২ ৩ ১ ২
শ্রাধি শ্রুৎ কর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
আসীদন্তু বর্হিষে মিত্রো অর্য্যমা প্রাত-
১ ২ ৩ ২
র্য্যাবভিরধ্বরে ॥ ৬ ॥

হে শ্রুৎকর্ণ!—শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুত!

হে অগ্নে!

শ্রুধি—শৃণু। যঃ মিত্রঃ অর্য্যামা দেবশ্চ।

অগ্নৈঃ প্রাতর্য্যাবভিঃ—প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছদ্ভিঃ।

দেবৈঃ—সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ ইত্যর্থঃ।

সয়াবভিঃ—আহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমান গতিভিঃ।

বহ্নিভিঃ—অগ্নৈঃ বহ্নিভিঃ দেবৈশ্চ সহ।

অধ্বরে—ক্রতু নিমিত্তে ইত্যর্থঃ।

বর্হিষি—দর্ভে।

আসীদন্তু—উপবিশন্তু—উপবেশন করুন।

হে শ্রবণসমর্থ কর্ণযুক্ত অগ্নি! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। যাঁহারা প্রাতঃকালে দেবযজন-স্থানে গমন করিয়া থাকেন, সেই সকল দেবগণের সহিত ও তোমার সমান গতিশীল অন্যান্য বহ্নিগণ সহিত সূর্য্যদেব ও অর্যমাদেব আমাদের যজ্ঞ-নিমিত্ত রক্ষিত এই কুশাসনে উপবেশন করুন। ৬॥

## অথ সপ্তমী।

( সৌভিরি ঋষিঃ )

১র ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন
৩ ১ ২
মজ্‌মনা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
অনু মাতরং পৃথিবীং বিবাবৃতে তস্থৌ
২র ৩ ১ ২
নাকস্য শর্ম্মণি ॥ ৭॥

দেবঃ—দ্যোতমানঃ। ইন্দ্রঃ—পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ।

দৈবোদাসঃ—দিবোদাসেনাহূয়মানঃ অগ্নিঃ—দিবোদাস দ্বারা আহূয়মান অগ্নি।

মাতরং—সর্ব্বস্য লোকস্য ধারণাৎ পৃথিবীমাতা তাং পৃথিবীং অনু প্রবিবাবৃত্তে দেবান্ প্রতি হবির্বোঢ়ুং বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি—সমুদয় লোক ধারণ বশতঃ পৃথিবীমাতা—সেই পৃথিবীকে—ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিতে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

মজ্‌মনা—বলেন আজুহাব—বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন।

নাকস্য—স্বর্গস্য। শর্ম্মণি গৃহে স্বায়তন এব তস্থৌ—অতিষ্ঠৎ—ছিলেন।

দ্যোতমান পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দিবোদাস ঋষি ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট হবি বহন করিবার জন্য মাতা পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; দিবোদাস অগ্নিকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন; সুতরাং অগ্নি স্বর্গের কল্যাণ-গৃহে অথবা নিজ আয়তন স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছিলেন ॥৭॥

## অথ অষ্টমী।

( মেধাতিথি মেধ্যা তিথিশ্চ )।

২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩১র ২র
অধ জ্মো অধবা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
৩ ১ ২ ক২র ৩২উ ৩ ১ ২
অয়াবর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো
পৃণ ॥৮॥

হে ইন্দ্র!

অধ—অধুনা।

ক্ষ্মঃ—ক্ষমস্তি গন্ধস্ত্ব্যাসামিতি ক্ষ্মা পৃথিবী তস্যাঃ সকাশাৎ—পৃথিবী হইতে।

অথবা—অপিবা—কিম্বা।

দিবঃ—অন্তরিক্ষাৎ।

বৃহতঃ—মহতঃ।

রোচনাৎ—নক্ষত্রৈর্দীপ্যমানাৎ স্বর্গাৎ বা আগত্য—স্বর্গ হইতে।

অধি—পঞ্চম্যর্থানুবাদোঽয়ম্—অধিশব্দ পঞ্চমীর অর্থানুবাদ।

অয়া—অনয়া তন্বা—এই শরীর দ্বারা।

মম গিরা—মদীয়য়া বিস্তৃতয়া স্তুত্যা—আমার বিস্তৃত স্তুতি দ্বারা।

বর্দ্ধস্ব—বৃদ্ধো ভব—বর্দ্ধিত হও। (অগ্নি দুই প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; এক শরীর দ্বারা—অর্থাৎ বেদী মার্জ্জনাদি ক্রিয়া দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ স্তুতি দ্বারা।

হে সুক্রতো!—শোভন কর্ম্মবনিস্ত্র!

জাতা—জাতান্ অস্মদীয়ান্ জনান্—আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে পৃণ—অভিলষিতৈঃ ফলৈরাপূরয়—অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। হে মহৈশ্বর্য্যশালী অগ্নি! অধুনা তুমি পৃথিবী হইতে, অথবা মহৎ অন্তরিক্ষ হইতে, কিম্বা নক্ষত্র দ্বারা দীপ্তিমান স্বর্গ হইতে আগমন কর ও আমার শরীর দ্বারা ও বিস্তৃত স্তুতি-বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে শোভন কর্ম্মবান্! তুমি আমাদের হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণকে অভিলষিত ফল দ্বারা পূর্ণ কর। ৮॥

## অথ নবমী।

( বিশ্বামিত্র ঋষিঃ )

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২

কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৄরজগন্নপঃ।

বনা—বনানি—কাননানি।

কায়মানঃ—ভক্ষিতুং কাময়মানঃ—ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক।

যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ তানি বিহায়—যে কারণে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া।

মাতৄঃ—মাতৃভূতা অপঃ—মাতৃভূতজল।

অজগন্—অগমঃ—গতবানসি; অপ্সু প্রবিষ্টত্বাৎ শান্তো বর্ত্তসে—জলে প্রবেশ হেতু শান্ত হইয়াছ।

তৎ—তস্মাৎ। তে—তব।

নিবর্ত্তনং—নিতরাং তত্রৈব বর্ত্তনং—সর্ব্বদা তথায় থাকা।

ন প্রমৃষে—ন প্রমৃষ্যাতে—ন সহতে—সহ্য করিতে পারি না।

যৎ—যস্মাৎ কারণাৎ।

দূরে সন্—দূরে অদৃশ্যতয়া বর্ত্তমানস্ত্বং—অদৃশ্য বশতঃ দূরে থাকাতে।

ইহ—অস্মৎ সম্বন্ধিম্বরণী রূপেষু কাষ্ঠেষু—আমাদের অরণী কাষ্ঠে।

আভুবঃ—সমন্তাৎ ভবেঃ—মথনাৎ ক্ষণমাত্রেণাস্মাকং সমীপে ভবসি। মন্থন হেতু ক্ষণমাত্রেই আমাদের নিকটে হইয়াছ।

তস্মাৎ তব দূরতো বর্ত্তনং অস্মভ্যাং

১র ২র ৩ ১ ২

রোচতে—তজ্জন্য (ন তৎ তে অগ্নে! প্রমৃষে

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

নিবর্ত্তনং যদ্দূরে সন্নিহা ভুবঃ ৯।। তোমার দূরে থাকা আমাদের ভাল লাগে না।

হে অগ্নি! তুমি বন সকল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তথাপি ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূতজলে প্রবেশ

করিয়া শান্ত হইয়া আছ। (১) তোমার তথায় ঐরূপ থাকা সহ্য করিতে পারি না; যেহেতু দূরে থাকাতে তুমি অদৃশ্য হইয়াছ। অদৃশ্য ভাবে দূরে থাকা বশতঃ অরণি হইতে ঈষৎ আবির্ভূত হইয়াছ।'

অথ দশমী।

( কণ্ব ঋষিঃ )

নিত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতোয়ং
নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥১০॥

জ্যোতিঃ—প্রকাশরূপং—প্রকাশরূপ-জ্যোতিঃ।

শশ্বতে—বহু বিধায় যজমানায়।

মনুঃ—প্রজাপতিঃ।

নিদধে—দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্—দেব-যজনস্থলে রাখিয়াছেন।

ঋতজাতঃ—তেন ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্ত ভূতে-নোৎপন্নঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাক।

উক্ষিতঃ—হবির্ভিস্তৃপ্তঃ সন্—হবির্দ্বারা-তৃপ্ত হইয়া।

কণ্ব—এতন্নামকে মহর্ষৌ ময়ি—কণ্বনামে মহর্ষি-আমাতে।

দীদেথ—দীপ্তবানসি।

য়ং—অগ্নিং।

কৃষ্টয়ঃ—মনুষ্যাঃ।

নমস্যন্তি—নমস্কুর্ব্বন্তি। ( সম্বন্ধিতি পূর্ব্ব-ত্রান্বয়ঃ। )

ইতি সামবেদ সংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অগ্নি! (১) প্রজাপতি মনু বহুবিধ যজমানের জন্য তোমার জ্যোতি দেবযজন-স্থলে রাখিয়াছেন। তুমি যজ্ঞকার্য্যজন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তজ্জন্য এক্ষণ হবি-র্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া কণ্ব আমাতে দীপ্ত হও। তুমি সেই অগ্নি, যাহাকে মানবগণ নমস্কার করিয়া থাকে।

(পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) অগ্নি জলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? কারণ উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবান্; তজ্জন্য কারণাত্মক জল অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইবে। কারণাত্মক জলের বিষয় মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণে বিবৃত আছে, যথা—

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ
তমোনুদঃ ইত্যাদি"॥৬॥"

(১) অগ্নি শব্দে এখানে পঞ্চমহাভূতাত্মক অগ্নি অপেক্ষা "পরমাত্মা" অর্থ যুক্তিযুক্ত অগ্নি শব্দে পরমাত্মা, যথা—

"অঙ্গয়তি প্রাপয়তি, কর্ম্মণঃ ফলং ইতি অগ্নিঃ পরমাত্মা, প্রমাণং—বেদান্তদর্শনে ১ম অধ্যায়ে—২য় পাদে—২৮শ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ "অগ্নিশব্দোঽপ্য-গ্রণীত্বাদি যোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি।"

তদ্ভিন্ন সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা প্রথমবর্ষের—২ পৃষ্ঠায় অন্যান্য ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

# ঋগ্বেদ-৩য় মণ্ডল।

## ৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

পুরোভেদী জাত বসু ইন্দ্র-চিরশত্রু হিংসু
তেজে দাসগণে তিনি করিলেন জয়।
ব্রহ্মাকৃষ্ট ভূবিদাত্র প্রবর্দ্ধিত যাঁর গাত্র,
পূরিত তাঁহার দ্বারা রোদসী উভয় ॥ ১
হে ইন্দ্র! বলিন্ পূজিত! তোমায় করি ভূষিত,
অন্নাশায় তব স্তুতি করি উচ্চারণ।
মনুজাত মানুষের অথবা দৈব বিশের,
সকলের অগ্রে তুমি করহ গমন ॥ ২
হে ইন্দ্র! প্রবুদ্ধনীতি অবাতিগণের ভীতি
মায়াবীদিগকে তুমি করেছ সংহার।
বলে স্কন্দহীন করি বিনাশ করেছ অরি,
রামাগণ-ধেনু সব কৈলা আবিষ্কার ॥ ৩
দিবস সৃজন করি যুদ্ধার্থীর সহচরি
স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র সেনা করিলেন জয়।
দিবসের কেতু দীপ্ত করিলা মনু-নিমিত্ত,
হইল রণের জন্য জ্যোতির উদয় ॥ ৪
রণযোগ্য বহু ধন করিয়া ইন্দ্র গ্রহণ,
প্রবল শত্রুর সেনা করিলা প্রবেশ।
এই সব উষা হায় জাগ্রত হ'ল স্তোতায়,
তাঁহাদের শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পেল তেজ ॥ ৫
মহনীয় কর্ম্ম তাঁর সুকৃত অনেক আর,
মহান্—তাঁহাকে করে সকলে স্তবন।
বলিগণে বল দ্বারা চূর্ণ করিলেন পুরা
শক্রহা মায়ায় দস্যু করিলা নিধন ॥ ৬
দেবপতি, নরে যিনি বরপ্রদ ইন্দ্র তিনি,
[illegible] দেবগণে দিলা সব ধন।
তাই বিপ্র কবিগণে বিবস্বতের সদনে
উক্থ দ্বারা করিতেছ তাঁহার স্তবন ॥ ৭
সকলের বরণীয় বলপ্রদ সে স্বর্গীয়
জলাধিপ, স্বর্গাধিপ, জেতা সে ইন্দ্রের।
পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ যাঁর দান—স্তোতৃবর্গ
হৈলা আনন্দিত—সহ তাঁর আনন্দের ॥ ৮
তিনি দিয়াছেন অশ্ব, দিয়াছেন হরিদশ্ব
বহুলোক-উপভোগ্য তাঁহারই গোধন।
দিয়ে হিরণ্ময় ধন, করিয়ে দস্যুহনন,
করেছেন আর্য্যবর্ণে তিনিই পালন ॥ ৯
ওষধি ও বনস্পতি তাঁর দান—দিবা-ভাতি
প্রদত্ত এ অন্তরীক্ষ কর্তৃক তাঁহার।
তিনি করি মেঘ ভেদ, বিপক্ষ করি উচ্ছেদ,
করেছেন অগ্রগামী শত্রুর সংহার ॥ ১০
যুদ্ধোৎসাহে বলীয়ান্ অন্নবান্ ধনবান্
মঘবান্ যুদ্ধে শত্রু করেন হনন।
আমরা যে করি স্তব, শ্রবণ করেন সব;
[illegible]শয় পাইতে করি তাঁরে আবাহন ॥ ১১

এই সূক্তে ব্যবহৃত ৫টি শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনূদিত হইল। যথা—

১ম ঋক্—দাসং
২য় ঐ মানুষাণাং ক্ষিতিনাম (মনুজাত মানুষের)
ঐ ঐ দৈবানাং বিশাং (দৈব বিশের)
৭ম ঐ বিপ্রাঃ কবয়ঃ
৯ম ঐ আর্য্যং বর্ণং।

প্রথমোক্ত দাস শব্দ অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ ৯ম ঋকের দস্যু শব্দও অনার্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুষ্যত্ব সহকারে ক্ষেত্রের অধিপতিত্ব রক্ষার জন্য

যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষিতি ব'লত। এই ক্ষিতি শব্দ হইতে ক্ষেত্রী, ক্ষত্র ও ক্ষত্রিয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ জাতঃ" ইহা পৌরাণিক কল্পনা; পুরুষ সূক্তের প্রসিদ্ধ রূপক হইতে উদ্ভূত। যে কেহ পুরুষত্ব সহকারে ক্ষেত্রস্বামী হইবে, সেই ক্ষত্রিয়, ইহাই প্রকৃত বৈদিক মত। দৈববিশ্ শব্দে "Enlightened" বৈশ্য অর্থাৎ আর্য্য জাতীয় বৈশ্য, বুঝাইতেছে। ২য় ঋকে বলা হইতেছে, ক্ষিতি (ক্ষত্র) গণের ও বিশ্ বৈশ্যগণের অগ্রে অগ্রে ইন্দ্র চলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। ৭ম ঋকে বিপ্রকবিগণ অর্থাৎ মেধাবী স্তোতাগণ যে উক্থ দ্বারা ইন্দ্রের স্তবন করেন, তাহাতে যে পুরোহিত শ্রেণী লক্ষ্য করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, এই দাস, ক্ষিতি, বিশ্ ও বিপ্র শব্দ দ্বারা পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত ৪ জাতির লোক বুঝাইতেছে না; কেবল চারি শ্রেণীর লোক বুঝাইতেছে, এই মাত্র। তবে ৯ম ঋকে 'আর্য্যং বর্ণং' শব্দে শ্বেত বর্ণের লোকে কৃষ্ণবর্ণের লোকের বিরুদ্ধ ভাব স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে (২। ১২। ৪) ঋকে "দাসবর্ণ" শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং এই "আর্য্য-বর্ণ" ও "দাসবর্ণ" শব্দে মাত্র Fairskinned ও dark-skinned বুঝাইত। আমরা যেমন এক্ষণ জেতৃ ইংরেজকে শ্বেত ও জিত আমাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বলি, (হেম বাবু বলিয়াছেন "এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি এক দিন") "আর্য্য বর্ণ" ও "দাস বর্ণ" শব্দে ঠিক্ তাহাই বুঝাইত। এতদপেক্ষা জাতিত্বের অন্য কোন ভাব প্রকাশ করিত, এরূপ অনুভব হয় না। যখন বেদ রচনার বহুশত বর্ষ পরেও আর্য্যানার্য্যের পরিণয় ও তাহাদের পরস্পরের অন্ন-ব্যবহারের কথা পাই, তখন আর্য্যবর্ণ ও দাসবর্ণে দ্বিবিধ বর্ণের লোক বুঝাইলেও 'caste' বলিতে আমরা এক্ষণ যাহা বুঝি, অর্থাৎ আদান-প্রদান ও পরস্পর পানাহার বর্জ্জিত সম্প্রদায়, তাহা বুঝাইত না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

## বিল্বপত্রিকা-সমর্পণ-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্।)

(১)

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা॥

দর্শক-দর্শন-দৃশ্য,—এই পত্রত্রয়,
যে প্রথম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

(২)

কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা॥

কর্ত্তা ও করণ কার্য্য,—এই পত্রত্রয়,
যে দ্বিতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৩ )

ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্র-ত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা॥

ভোক্তা ও ভোজন, ভোজ্য,—এই পত্রত্রয়
যে তৃতীয় বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৪ )

ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা॥

ভূলোক ও স্বর্গ, ভুবর্লোক,—পত্রত্রয়
যে চতুর্থ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৫ )

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা॥

জাগ্রৎ-সুষুপ্তি-স্বপ্ন,—এই পত্রত্রয়
যে পঞ্চম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৬ )

স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, মহাসূক্ষ্ম—এই পত্রত্রয়
যেই ষষ্ঠ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৭ )

অবিদ্যা সংসৃতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা॥

অবিদ্যা, সংসার, জীব,—এই পত্রত্রয়
যে সপ্তম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৮ )

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে অষ্টমী বিল্বপত্রিকা॥

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়,—এই পত্রত্রয়
যে অষ্টম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ৯ )

সত্ত্ব রজস্তম ইতি গুণ-পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ,—এই পত্রত্রয়
যে নবম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে তাহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ১০ )

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—এই পত্রত্রয়
যে দশম বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়,
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ১১ )

ত্বমহন্তথা তত্ত্ব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা॥

ত্বং ও অহং, তৎ,—এই পত্রত্রয়
একাদশ বিল্বপত্রে অবস্থিত রয়;
ভক্তিভরে ইহা শিবে করিনু অর্পণ,
জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি যিনি করেন ধারণ!

( ১২ )

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাম্ভবো বিল্বপত্রিকাঃ
এতাভিরর্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥

একাদশ বিল্বপত্র শিবপূজা তরে
সর্ব্বদাই অনুকূল, জানিও সংসারে।
ইহা দিয়া শিব-পূজা যে করে সাধন,
শিব তারে সদ্যমুক্তি করেন অর্পণ!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,।

---

# বিজয়া-গীতি।

কেমনে বিদায় দিব মায়াময়ি! মা তোমায়?

( হেরি )

বিজয়ার বিসর্জ্জনে বিশ্ব বিসর্জ্জিত হায়!
যেন আর কিছু নাই!
ধূ ধূ শুধু সর্ব্ব ঠাঁই!
মা-হারা সংসার যেন 'সাহারা' মরুর প্রায়!

( ২ )

সত্য বটে সর্ব্বঘটে আছগো মা! সর্ব্বদায়;
আবাহন-বিসর্জ্জন সম্ভবেনা মা তোমায়।
কিন্তু মা সে ব্রহ্মজ্ঞান,
অজ্ঞানে না পায় স্থান;
তাই মাতৃশোকরাশি বাসি আজি বিজয়ায়।

( ৩ )

মৃণ্ময়ী ডুবিল জলে,
চিন্ময়ী ত জলে স্থলে;
অন্তরিক্ষে অন্তস্তলে অনন্তরূপিণী মায়—
দেখেনা এ ভ্রান্ত চিত, শান্ত নয় সান্ত্বনায়।
স্থূলে ভুলে ভোলা মন
সূক্ষ্মে না করে গমন;
আগমন-নির্গমন অনন্তের নাহি, হায়!
বুঝে না এ ভ্রান্ত চিত—"মা-হারা ছাঁ" বিজয়া";

( ৪ )

প্রতিমারি বিসর্জ্জন,
প্রতিমায় মা সদা র'ন,
প্রকৃতির প্রতি রূপে মা'রি প্রতিরূপ তায়!
রবিতে মা-রূপরাশি,
শশীতে মায়ের হাসি,
নদীতে মায়ের হৃদি-সুধা-ধারা ব'য়ে যায়!
পবন-প্রবাহময়
মায়েরি নিশ্বাস বয়;
বিশ্বাস-বিরহে মন আশ্বাস না লভে তায়।

( ৫ )

( যার )

লোম-কূপে বিশ্ব ডুবে, তারে কি ডুবানো যায়?
কারণ-বারিধি-বপু—
বারিতে ডোবে কি কভু?
প্রবোধ না মানে তবু অবোধ সন্তান তায়;
মাতৃশোক-বৃদ্ধি-ভয়ে অসিদ্ধেরা সিদ্ধি খায়!
সে দীন সন্তান সবে,
তোমারি কৃপায় ভবে,
বিজয়া-বিষাদে লভে প্রসাদ সে বিজয়ায়।

( ৬ )

মা তোমার বিজয়ার মহিমা কি মোহময়!
সহসা সবার যেন কি অপূর্ব্ব ভাবোদয়!
শত্রু-মিত্র-ভেদ ভুলি,
সবে করে কোলাকুলি!
প্রণিপাত—আশীর্ব্বাদ কেহ করে, কেহ পায়

সমানে সমানে আর—
নমস্কার—নমস্কার!
ঘরে ঘরে নারী-নরে নব সম্মিলন প্রায়!
কি যেন উচ্ছ্বাস রঙ্গে
তরঙ্গিত বঙ্গ-অঙ্গে!
কি যেন ভাবের ঢেউ লেগেছে সবের গায়!
দশমী দিবাবসানে,
কি যেন কি হয় প্রাণে;
হঠাৎ কি যেন সবে হারায়ে, কি যেন পায়!
তাই এত কোলাকুলি—গলাগলি বিজয়ায়॥

( ৭ )

ভুলি যদি ত্রিদিনের মহোৎসব মা তোমার,
ভুলিব না তব এই মহাভাব বিজয়ার।
ক্ষীরের মন্থনে যথা নবনীর আবির্ভাব,
দুর্গোৎসব-মন্থনেতে তথা বিজয়ার ভাব!
বিজয়া-বিজিত-চিত্ত
শিখে এ সুন্দর সত্য—
মা' হয়ে মা আছে নিত্য, মেয়ে হয়ে আসে
যায়!
তাই মা! বিদায় দিতে কি দায় এ বিজয়ায়!

( ৮ )

মেয়েরা বরণ করি,
আদরে গলাটি ধরি,
কাতরে কেঁদে বলে "মা! আবার আসিস্";
তাতে নাকি আঁখি-নীরে তুইও ভাসিস্!
দেখালি যা এ আঁখিতে,
আর কি প্রাণ থাকিতে—
ভুলিব চিন্ময়ী মূর্ত্তি মৃণ্ময়ীর প্রতিমায়?
মূর্ত্তিপূজা-মহাতত্ত্ব শিখালি মা! বিজয়ায়।

( ৯ )

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এ বাণী,
তোমারি 'চণ্ডী'তে শুনি চণ্ডিকে! ভবানি!
মেয়েদের কথা শুনো,
"এসগো মা! এস পুনঃ,
ভাসি পুন ভবে যেন সে ত্রিদিন-তরঙ্গায়;
তিনশ বাষট্টি ঢেউ ঠেলে ফেলে হাতে পায়!
পুন যেন নবমীতে হাসি-খেলি-নাচি-গাই;
দশমীতে দিয়ে জলে, আঁখিজলে ভেসে যাই!
সে ক্রন্দনানন্দরাশি,
সে অশ্রু-আবৃত হাসি
কে বুঝিবে, না বুঝিলে মা তোমারি করুণায়?
কিঞ্চিতে বঞ্চিত তাই করনি মা! বিজয়ায়।

( ১০ )

শুধু চিন্ময়রূপে পূজি চিন্ময়ীরূপিণী মায়,
নহে চিত তৃপ্ত শুধু আধ্যাত্মিকতায়।
মেটে মণ্ডপেতে মম,
মেটে মূর্ত্তি অনুপম!
স্বচ্ছ প্রাণে "ইহাগচ্ছ" আহ্বানে আগচ্ছ তায়।
"গচ্ছ গচ্ছ পরং ধাম" বিসর্জ্জনে বিজয়ায়;
"সম্বৎসরব্যতীতে চ,
পুনরাগমনায় চ"
দেখো মা! থেকনা ভুলে, মেগে মা! এ
প্রার্থনায়।
বিজয়া-প্রণতি গীতি ইতি সমর্পিত পায়॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

# প্রশ্নোত্তরম্।

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিৎ শ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষোভাব পরীবাদোঽসতামিব ॥৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষোভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব ॥৬॥

ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

যক্ষ প্রশ্ন করিলেন, কি প্রকারে শ্রোত্রিয় হয়, কি প্রকারে মহৎ দ্রব্য লাভ করা যায়; কি প্রকারে দ্বিতীয় হয় ও কি প্রকারে বুদ্ধিমান হয়? ১।

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন।—শ্রুতের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়; তপস্যা দ্বারা মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধৃতির দ্বারা দ্বিতীয়বান হয় ও বৃদ্ধ-সেবা দ্বারা বুদ্ধিমান হয়।

(জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেবচ॥ একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ)

যক্ষ কহিলেন।—ব্রাহ্মণদিগের দেবত্ব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুদিগের ন্যায়? ইঁহাদিগের মানুষ-ভাব কি? এবং অসতের ন্যায় ইঁহাদিগেরই বা কি কার্য্য? ৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ইঁহাদের দেবত্ব; তপস্যা ইঁহাদিগের সাধুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম; মরণ ইহঁাদের মানুষ-ভাব ও পরীবাদ ইহঁাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য।৪॥

যক্ষ কহিলেন,—ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি? কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের ন্যায়? ইঁহাদের মানুষ-ভাব কি ও অসৎ লোকের ন্যায় ইঁহাদের আচরণ কি?৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ধনুরূপ অস্ত্র ইঁহাদের দেবত্ব; যজ্ঞ ইঁহাদের সাধুদিগের ন্যায় আচরণ; ভয় ইঁহাদের মানুষ-ভাব এবং শরণাগত ব্যক্তির পরিত্যাগ ইঁহাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ।৬॥

শ্রীহরিঃ।

( ১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা.

## প্রশ্নোত্তরম্।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কাচৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৮॥

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞিয় সাম কোন্ পদার্থ? কোন্ বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে না?।৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ; একমাত্র ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করেন এবং যজ্ঞ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না।৮॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাপততাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিন্নিবপতাং বরম্।
কিং স্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাপততাং শ্রেষ্ঠং বীজন্নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্ ॥১০॥

যক্ষ কহিলেন, পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ও প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ কি? ৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৃষ্টি পতনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; বীজ নিবপনকারীদিগের শ্রেষ্ঠ; গো প্রতিষ্ঠমানদিগের শ্রেষ্ঠ এবং পুত্র প্রসবকারীদিগের শ্রেষ্ঠ।১০॥

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥১২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ গুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ:
কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিং স্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরা তৃণাৎ ॥১৪

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বুদ্ধিমান্ লোকপূজিত, সর্ব্বজীবের সম্মত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি অনুভব করিয়া ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও জীবিত নহেন? ১১

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—দেবতা, অথিতি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আপনার, এই পঞ্চজনের তৃপ্তি সাধন যে না করে, সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়াও মৃত। ১২

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ হইতে উচ্চতর কি? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? ও তৃণাপেক্ষা বহুতর কি? ১৩

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; আকাশ হইতে পিতা উচ্চতর; বায়ু অপেক্ষা মন শীঘ্রগামী; এবং চিন্তা তৃণ হইতেও বহুতরা॥ ১৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং নবেপতি।
কস্যাস্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে॥১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন বেপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥১৬

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতাং মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥১৮॥

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন করে না? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই ও বেগের দ্বারা কি বর্দ্ধিত হয়? ১৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইয়া চক্ষু নিমীলন করে না; অণ্ড জন্ম গ্রহণ করিয়া স্পন্দিত হয় না; প্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।১৬॥

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? পীড়িত ব্যক্তির মিত্র কে এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র কি? ১৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সার্থসঙ্গী; গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা; পীড়িতের

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্ব্বভূতানাং কিং স্বিদ্ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র কিং স্বিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্ব্বভূতানামগ্নিঃ সোমঃ গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্ম্মো বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ॥২০

---

মিত্র বৈদ্য ও মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তির মিত্র দান। গৃহীর মিত্র ভার্য্যা, যথা—

পুত্র-পৌত্র-বধূ-ভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যং সদৃশং মতম্॥

* * * *

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়ো ধর্ম্ম-সংগ্রহে॥

ভারতে শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মে ১৪৩ অধ্যায়ে)

তজ্জন্য দান শিক্ষার আদেশ দিয়াছেন—
এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং।

দানং দয়ামিতি। বৃহদারণ্যোকোপনিষদি ৫ অঃ ২ ব্রাহ্মণে ৩। অর্থদান অপেক্ষা জীবের জীবনদানকে শ্রেষ্ঠ দান কহিয়াছেন—
'দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং————"
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৯ অঃ ভূতদ্রোহরূপ দণ্ডের পরিত্যাগকে দান কহে; ধনদান নহে) ১৮॥

যক্ষ কহিলেন, সকল জীবের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র! অমৃত কি? ও এই জগৎ কি? ১৯॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নি র্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ॥২২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ।
কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্॥২৩॥

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি; গাভীর দুগ্ধ অমৃত; ঐ অমৃতই অমৃত-সমানধর্ম্ম; কারণ গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত, ঐ ঘৃত অগ্নিতে আহুত হইয়া চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গোদুগ্ধই চন্দ্র অর্থাৎ অমৃত ও মোক্ষের হেতু হওয়াতে উহাই সনাতন ধর্ম্ম; এবং বায়ুই এই সমুদায় জগৎ।২০॥

যক্ষ কহিলেন, একা কি বিচরণ করে? কোন্ বস্তু পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে? হিমের ঔষধ কি? ও কোন্ বস্তু মহৎ আবপন? ২১

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একা বিচরণ করেন; চন্দ্র পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন; অগ্নি হিমের ঔষধ এবং ভূমি মহৎ আবপন।২২।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি? এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? ২৩।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্।।২৪।।

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিং স্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীব্যং কিং স্বিদস্য কিং স্বিদস্য পরায়ণম্।।২৫।।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং পর্জ্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্।।২৬।।

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিং স্বিদ্ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।।২৭।।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়; দান একমাত্র যশের আশ্রয়; সত্য একমাত্র স্বর্গের আশ্রয় এবং শীল একমাত্র সুখের আশ্রয়।২৪।।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কি? দৈবকৃত সখা কে? ইহার উপজীবন কি? ও ইহার পরম আশ্রয় কি?২৫।।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা; ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, পর্জ্জন্য ইহার উপজীবন এবং দান ইহার আশ্রয়।২৬।।

যক্ষ কহিলেন, ধনের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি ও সুখের মধ্যে উত্তম কি?২৭।।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেষ্ঠমারোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা।২৮।।

যক্ষ উবাচ।

কশ্চধর্ম্মঃ পরোলোকে কশ্চধর্ম্মঃ সদা ফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চসন্ধির্নজীর্য্যতে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরোধর্ম্ম স্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্নজীর্য্যতে।৩০।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দক্ষতা ধন্যের মধ্যে উত্তম; শাস্ত্রজ্ঞান ধন সকলের মধ্যে উত্তম; লাভের মধ্যে আরোগ্য শ্রেষ্ঠ এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই শ্রেষ্ঠ।২৮।

যক্ষ কহিলেন, লোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলপ্রদ? কি দমন করিলে শোক করিতে হয় না ও কাহার সহিত সন্ধি করিলে জীর্ণ হয় না?২৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ত্রয়ী (অকার, উকার ও মকারবিশিষ্ট শব্দ-প্রণব) ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদাতা, মনকে সংযত করিলে শোকাবসন্ন থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে নষ্ট হয় না।

(অহিংসাধর্ম্ম যথা—অহিংসা পরমোধর্ম্মস্তথাহিংসা পরন্তপঃ। অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। (অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায় ২৫।) প্রণবমাহাত্ম্য যথা—সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মাব্রহ্ম-সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদি ২।

যক্ষ উবাচ।

কিন্নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিন্নু হিত্বা ন শোচতি।
কিন্নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিন্নু হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩১।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ। ৩২।

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু। ৩৩।

---

অন্যত্র যথা—যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।

মনু ২ অঃ ৮২।

যিনি প্রতিদিন আলস্যশূন্য হইয়া তিন বৎসর প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন ও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন, মনকে বশ করা ক্লেশ-সাধ্য।

চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

গীতা ৬অঃ ৩৪।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ ঐ ঐ ৩৫।

পাতঞ্জলিও কহেন—

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ১২॥

পাতঞ্জলদর্শনে-যোগপাদে।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

সাধু লোকের সহিত মিত্রতা যেরূপ শিলায় রেখা—

"উৎকৃষ্ট মধ্যম জঘন্য জনেষু মৈত্রী যদ্বচ্ছিলাসু শিকতাসু জলেষু রেখা।"

"সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ॥"

বন পর্ব্বণি ২৯৬অঃ ৪২॥

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গ সেবধি নৃণাং॥

শ্রীভাগবতে ১১স্কন্ধে ২অঃ ২৮।

সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচোদেবাঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্।

কল্কিপুরাণে ১৬অ ২১।

সাধূনাং বাপ্যসাধূনাং সন্ত এব সদা গতিঃ।

মৎস্যপুরাণে ২১০অঃ।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক করে না, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় ও কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়? । ৩১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না; কাম ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়। ৩২।

যক্ষ কহিলেন, কি জন্য ব্রাহ্মণকে দান করে, কি জন্য নট ও নর্ত্তককে দান করে,

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নট-নর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব রাজসু। ৩৪।

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি। ৩৫।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি। ৩৬।

---

কি জন্য ভৃত্যকে দান করে ও কি জন্য রাজাকে দান করে? ৩৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণকে দান করে; নট ও নর্ত্তককে যশের জন্য দান করে, ভরণার্থে ভৃত্যসকলকে ও ভয় জন্য রাজাকে দান করে। ৩৪।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু দ্বারা লোক আবৃত, কোন্ বস্তু দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, কি কারণে মিত্রগণ ত্যাগ করে ও কি কারণে স্বর্গগমন করে না? ৩৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞান দ্বারা লোক আবৃত থাকে; অন্ধকার দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় না, লোভবশতঃ মিত্রগণ ত্যাগ করে এবং সঙ্গবশতঃ স্বর্গগমন করে না। ৩৬।

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ। ৩৭।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।

---

যক্ষ কহিলেন, পুরুষ কি প্রকারে মৃত হয়, কি কারণে রাজ্য মৃত হয়, কি কারণে শ্রাদ্ধ মৃত হয় ও কি জন্য যজ্ঞ মৃত হয়? ৩৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষ মৃত, অরাজক রাজ্য মৃত, অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধ মৃত এবং যজ্ঞে দক্ষিণা দান না করিলে যজ্ঞ মৃত হয়। ৩৮।

( সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি।
মৃচ্ছকটিকে ১ অঙ্কে।)

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বামরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্।
মৃচ্ছকটিকে ১ অংকে।

রাজারক্ষণ—

মংস্তাস্তু প্রযত্নেন স্বরাষ্ট্রস্য চ রক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভাঃ পরেভ্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা। মৎস্য পুরাণে ২১৭ অঃ।

যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব।
কামন্দকী ১সর্গে। শুক্রনীতিসারে ১অং ৬৭

যক্ষ উবাচ।

কাদিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি——। ৩৯।

নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্র-মরাজকম্।
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৮ অঃ ১৮।

অরক্ষিতাত্মা যো রাজা প্রজাশ্চাপি ন রক্ষতি।
প্রজাশ্চ তস্য ক্ষীয়ন্তে ততঃ সোঽনুবিনশ্যতি।
রাজধর্ম্মে—শান্তি পর্ব্বণি ৯০অঃ

অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্লাত্যসৌ করান্।
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ ১অঃ ৩৩৩

শ্রাদ্ধে লক্ষণক্রান্ত ব্রাহ্মণ না হইলে শ্রাদ্ধ-ফল হয় না, তজ্জন্য শাস্ত্রে দোষিত ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়াছেন। দোষিত ব্রাহ্মণ যথা,—

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিন এবচ।
যথেষ্টাচারণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং।
আহ্নিকতত্ত্বে।

শ্রোত্রিয়-লক্ষণ যথা,—

একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈর-ধীত্য বা।
ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥
ব্যবহারতত্ত্বে দেবলধৃত বচনং।

শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব।
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বভূতহিতায় চ॥
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাং চ সংযমঃ।
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদ্দত্তং হি তদক্ষয়ং।
বৃহস্পতি-স্মৃতিঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা-বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ——। ৪০।

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিং লক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমাচ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরি-কীর্ত্তিতা। ৪১।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্। ৪২

বলিং প্রতি শ্রীভগবদ্ বাক্যং—
অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রত
মদক্ষিণং যজ্ঞমনর্ত্তিজাহুতম্।
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবি-
রেতে প্রদত্তাস্তব দৈত্যভাগাঃ॥
শ্রীহরিবংশে—ভবিষ্যপর্ব্বণি ৭২। ৪৭।

ন যজ্ঞা দক্ষিণাহীনাস্তারয়ন্তি কথঞ্চন।
শান্তি পর্ব্বণি ৭৯ অঃ ১১।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ দিক, কোন্ জল, কোন্ অন্ন, কি বিষ, শ্রাদ্ধের কাল কি? ৩৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধু সকল দিক্, আকাশই জল; ইন্দ্রিয়ই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল। ৪০।

যক্ষ কহিলেন, তপস্যার লক্ষণ কি, দম কাহাকে কহে, ক্ষমা কাহাকে কহে, এবং লজ্জা কাহাকে কহে? ৪১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকাকে তপস্যা কহে; মনের দমনকে

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিঞ্চার্জ্জবমুদাহৃতম্। ৪৩।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। ৪৪।

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ।৪৫।

---

দম কহে; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাকে ক্ষমা কহে এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে লজ্জা কহে। ৪২।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে কহে; শম কাহাকে কহে; দয়া কাহাকে কহে এবং আর্জ্জব কাহাকে কহে? ৪৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধকে জ্ঞান কহে; চিত্তের প্রশান্ততাকে শম কহে; সকলের সুখৈষী হওয়াকে দয়া এবং চিত্তের সমতাকে আর্জ্জব কহে।৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ।৪৬

---

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু কে? অনন্ত ব্যাধি কি? সাধু কাহাকে কহে এবং অসাধু কাহাকে কহে? ৪৫।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু; অনন্ত ব্যাধি লোভ; সর্ব্বভূতের হিতরত ব্যক্তিকে সাধু কহে ও নির্দ্দয় ব্যক্তিকে অসাধু কহে। ৪৬।

"ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাম্" পঞ্চরত্নে।

ষড়্‌দোষাঃ পুরুষেনেহ হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধং আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩২ অঃ ৮১।

লোভোঽপ্যস্তি গুণেনকিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ। ষড়রত্নে।

হন্যতে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিয়ং দেহমজরামৃত্যুনশ্চরম্॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ, ১০ অঃ ৯।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

(শ্রীম—কথিত।)

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইংরাজি ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল; বেলা আন্দাজ আটটা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে কক্ষ মধ্যে ছোট খাটটীর উপর উপবিষ্ট; মেঝেতে কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুর্য্যেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী, ম্যাকেঞ্জি লয়াল এবং কোং Exchange নামক নীলাম-ঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্ত-চর্চ্চায় তাঁহার বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় প্রীতি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে রোজ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকার সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপে নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। মাষ্টারকেও তুলিয়া লইয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার বলিলেন, "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে।" প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না, বলিলেন "আমায় নামাইয়া দাও, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব"। অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাষ্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

(অবতারবাদ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কৈমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে, হয়ত রোগ শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

"দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ কর্‌বার জন্যে বরাহ-অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপনা হ'য়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বল্‌লেন, একি হ'লো, ঠাকুর যে আর আস্‌তে চান না! তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটি নিবেদন কর্‌লেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজিদি কর্‌লেন। তিনি ছানাপনাদের মাই দিতে লাগ্‌লেন। তখন শিব ত্রিশূল

---

*প্রথম ভাগ ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা ১৩।২ গুরুদাস চৌধুরীর গলি, কলিকাতা।

এবং শরীরটা ত্যাগ ক'রলেন। ঠাকুর হি হি ক'রে হেসে তখন অধামে চ'লে গেলেন।"

প্রাণকৃষ্ণ। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! অনাহত শব্দটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনাহত শব্দ সর্ব্বদাই আপনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি, এই ধ্বনি পরব্রহ্ম থেকে আসছে। যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি নাভি থেকে একদিকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

(পরলোক।)

প্রাণকৃষ্ণ। মহাশয়, পরলোক কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনও ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ আবার জন্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে আর যেতে হয় না।

"কুমারের হাঁড়ী রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখনি? তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। গরু টরু চ'লে গেলে হাঁড়ী কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে, কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়; তার দ্বারায় আর কোন কাজ হয় না। পাকা হাঁড়ীর আর কুমোরের চাকে আসতে হয় না। কাঁচা হাঁড়ী ভাঙলে, কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ী তৈয়ারি হয়।

"তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান আর পুঁতলে কি হবে? তাতে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হ'য়ে যায়।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বেদান্ত ও অহঙ্কার।)

পুরাণ-মতে ভক্ত একটী, ভগবান একটী, আমি একটী, তুমি একটী; শরীর যেন সরা; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন জল; ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। এই শরীর-সরা মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ জল রয়েছে। আর ব্রহ্ম সূর্য্য-স্বরূপ, তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহংরূপ একটা লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে।

(মাষ্টারের প্রতি) এইটে শুনে যাও—অহং লাঠিটী তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। অহং লাঠিটী থাকলে, দুটো দেখায়। এ এক ভাগ জল, ও এক ভাগ জল; ব্রহ্ম-জ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়, তখন এই অহং পুঁছে যায়।"

"তবে লোক-শিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হ'য়েছি।

লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মত হ'য়ে যায়।

লোহার খড়্গো স্পর্শমণি-স্পর্শ ছোঁয়ান হয়, তখন খড়্গ সোণা হ'য়ে যায়। সোণার খড়্গো হিংসার কাজ হয় না। তবে বাহিরে হয়ত দেখায় যে রাগ আছে, কি অহংকার আছে; কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছুই থাকে না।"

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখ্‌লে বোধ হয় যে ঠিক এক গাছা দড়ি প'ড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার—অহংকারের আকার কেবল; কিন্তু সত্তিকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।"

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলা-ঘর ক'র্‌লে, কেউ হাত দেয়, ত ধেই ধেই ক'রে নেচে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেল্‌বে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, ব'ল্‌ছে "আমার বাবা দিয়েছে, দেবো না।" আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।"

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য। কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ি, ঘোঁড়া; আর সব ফেলে কাশী চ'লে যাবে।

(বেদান্ত ও অবস্থাত্রয় সাক্ষী।)

"বেদান্ত-মতে জাগরণ কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো "তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হ'য়েছিলুম, সাত ছেলের বাপ হ'য়ে ছিলুম। ছেলেরা সব লেখা পড়া, অস্ত্রবিদ্যা, সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'র্‌ছিলুম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি?" সে ব্যক্তি বল্‌লে "ও ত স্বপন, ওতে আর কি হ'য়েছে?" কাঠুরে বল্‌লে, "দূর তুই বুঝিস্‌না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্যি, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্যি। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য।"

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এই বারে ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন?

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। নেতি নেতি ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান কি, না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে, সে অজ্ঞান; যে দেখেছে, সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপ জানা হ'য়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে, তাঁর সহিত আলাপ; যেন তিনি পরম আত্মীয়; এর নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে নেতি নেতি কর্ত্তে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন, তিনি ইন্দ্রিয় নন, তিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার নন, তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। অর্থাৎ ছাতে উঠ্‌তে হবে। সব সিঁড়ী একে একে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। সিঁড়ী কিছু ছাত নয়। কিন্তু ছাতের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাত তৈয়ারী,—ইট, চুণ, সুরকি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম,

তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হ'য়েছেন। মাটী টাটী এত শক্ত কেন—যদি আত্মা থেকেই হ'য়েছে? তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত-শুক্র থেকে যে হাড়-মাস হচ্ছে। সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গৃহস্থ ও বিজ্ঞান।)

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব-জগৎ হ'য়েছেন। সংসার, তিনি ছাড়া নন। তাই রামচন্দ্র যখন জ্ঞান লাভের পর "সংসারে থাক্‌বো না" বল্লেন, দশরথ বশিষ্টকে তাঁর কাছে পাঠিয়েদিলেন, বোঝা-বার জন্যে। বশিষ্ট ব'ল্লেন "রাম! যদি সংসার, ঈশ্বর-ছাড়া হয়, ত তুমি ত্যাগ ক'র্‌তে পার।" রামচন্দ্র তখন চুপ্ করে রৈলেন। তিনি বেশ জানেন যে, ঈশ্বর-ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো না।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখনা কুমারী-পূজা। হাগা-মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্‌লাম—সাক্ষাৎ ভগবতী! এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর কর্‌ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়, সেই মনটী পেলে, সংসারেই ভগবান-দর্শন হয়। তবে সাধন চাই।

(গৃহস্থ ও "কামিনী")

সাধন চাই। এইটী জেনো যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তা[i] শীগ্‌গির পড়ে যায়। কিন্তু সংসারে থেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো একবার স্বদারায় গমন ক'র্‌লে।

(মাষ্টারের প্রতি)। মাষ্টার হাস্‌চো কেন?

মাষ্টার (স্বগত) সংসারী লোক একেবারে পেরে উঠ্‌বে না ব'লে ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিলেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

### হঠযোগীর প্রবেশ।

পঞ্চবটীতে একটী হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ আর আফিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। আফিংএর ও দুধের পয়সার অভাব হইয়াছিল। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, তখন হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলেন যে "পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।" ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কল্‌কাতার বাবুরা এলে ব'লে দেখ্‌বো।"

হঠযোগী। (ঠাকুরের প্রতি)। "আপ রাখালসে ক্যা বোলা থা"?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ব'লেছিলুম, দেখ্‌তে, যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কৈ, (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) তোমরা বুঝি এঁদের like কর না?" প্রাণ

কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। (হঠযোগীর প্রস্থান)।

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সত্য কথা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রাণকৃষ্ণ আদি ভক্তদের প্রতি) "আর সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথায় খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট তবু একটু কমছে। আগে ভারী আঁট ছিল। যদি ব'লতুম নাইবো। গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হ'লো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো, পুরো নাওয়া বুঝি হ'লোনা। অমুক জায়গায় হাগ্‌তে যাব, তো সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলাম, কল্‌কাতায়, ব'লে ফেলেছি রুটী খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে! কিন্তু রুটী খাবনা ব'লেছি, তখন মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

"এখন তবু একটু আঁট ক'মেছে। বাহ্যে পায় নাই, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে? রামকে* জিজ্ঞাসা ক'রলুম। সে ব'ল্লে, গিয়ে কাজ নাই, তখন বিচার ক'রলুম, ভাবলুম, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ, ওর কথাটাই বা না শুনি কেন?

"হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও ত নারায়ণ। মাহুত যেখানে ব'লছে, "হাতীর কাছে এসনা" সেখানে মাহুতের কথা না শুনি কেন?

"এই রকম বিচার ক'রে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীম-কথিত)

* ৺রাম চাটুর্য্যে, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি।

# আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

## দশম খণ্ড।

এই খণ্ডে দ্বিজত্বনিষ্পাদক উপনয়ন নামক শ্রৌতসংস্কার ব্যাখ্যাত হইতেছে। উপনয়ন শব্দের অর্থ, সমীপে লইয়া যাওয়া; বেদপাঠার্থী বালককে গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া ব্যাপার যে সংস্কার দ্বারা সংসাধিত হয়, তাহারই নাম উপনয়নসংস্কার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। আচার্য্য মনু বলেন "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।" দ্বিজাতি বা দ্বিজ শব্দের অর্থ যাহাদের দুইবার জন্ম হয়। একবার মাতৃগর্ভ-বিচ্যুতি প্রথম জন্ম, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম সমর্থিত হয়। উপনয়ন কালে, সন্তান যে ভাবে গর্ভে অবস্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে উপনয়নার্হ বালক পবিত্রকৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবিষ্ট হইবে এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিও কৃষ্ণসারচর্ম্ম আবৃত রহিবে। ইহাই দ্বিতীয়বার গর্ভবাস। পরে ঐ গর্ভনিষ্ক্রান্তি সংঘটিত হইবে, তখন দ্বিতীয়জন্মের চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণসারচর্ম্মনির্ম্মিত উত্তরীয় বা পবিত্র গলদেশে শোভমান থাকিবে; ইহাই প্রাচীনকালের উপনয়ন-প্রথায় দ্বিতীয়জন্ম এবং পবিত্ররহস্য। পরে সময়চক্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তনে ব্যবহার-ব্যতিক্রম

উপস্থিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনের অনুসার-সর্ব্বল শাস্ত্রও একটু এদিক্ ওদিক্ অনুকল্প বিকল্পের আভাসে আবৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচারী গর্ভস্থ শিশুর মত পবিত্র-কৃষ্ণসার-চর্ম্মাবৃত থাকিয়া, পরে প্রসূত হইবেন, এরূপ উক্তি দেখা যায়। অধুনাতন সমাজে ও উপনয়নকালে ব্রহ্মচারীকে বস্ত্রাবৃত থাকিতে দেখিতে পাই, আর কৃষ্ণসারচর্ম্ম একটুকরা পবিত্রে (পৈতায়) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্রোতস্বতীর বেগ মন্দীভূত হইলে বহুকাল পরেও তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় পাইতে নিদর্শন সহায়তা করে; আমাদের দেশে আর্য্যাচার বিষয়ে অনেক সময় এইরূপ জরৎকঙ্কাল নিদর্শন অস্পষ্ট পূর্ব্বাবস্থার একটা আব্ছায়া মত অনুস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই পবিত্র যজ্ঞোপবীত নামে পরিচিত।

অনেকে 'যজ্ঞোপবীত' নাম দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা যজ্ঞকালে ধারণ করা হইত, অন্য সময়ে গলে রাখা হইত না; বস্তুতঃ ইহা উপনয়ন সংস্কারের বা ব্রহ্মণ্যের পরিজ্ঞাপক অসাধারণ চিহ্ন, সুতরাং সততই ধারণ করা হইত বোধ হয়; বিশেষতঃ আর্য্যজীবন যজ্ঞময়; প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞগুলিও করিতে গেলে অত্যল্প অবসর মাত্র লাভ করা যায়; কাজেই যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের সময় তাঁহাদের মতেও দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণাজিন সর্ব্বদা সুলভ না হওয়ায়, আর্য্যগণ উপনিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক শিল্পোন্নতির ক্রমানুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গোভিলদেবের গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই, "যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাপি কুশরজ্জুমেব।" সূত্র, বস্ত্র, কুশরজ্জু যথাসম্ভব এবং সুবিধা অনুসারে যজ্ঞোপবীতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে কেবল সূত্র সকলগুলির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হয়ত সভ্যতাভিমানী সমাজ কুশরজ্জু বা বস্ত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অসুবিধা অনুভব করিয়াই সূত্রগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; তখন সূত্রই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞোপবীত মনে করা হইল এবং তদভাবে বস্ত্র বা কুশরজ্জু অগত্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইল। গোভিলাচার্য্যের সূত্রে প্রথমেই সূত্রের নাম থাকিবার বোধ হয় উদ্দেশ্য এইরূপ। সূত্র বা বস্ত্রব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইলে, পরে কুশরজ্জু স্থান পাইতে পারে, এরূপ মনে হয় না; পরন্তু সূত্র বা বস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেও আর্য্যস্থানে কুশরজ্জু বেমিল হইত না। আরও দেখা যায়, সমাজ ক্রমশঃ রুচির অনুগামী হইতে বাধ্য হয়। এতদ্বিৎকালে বুঝা গেল, চর্ম্ম, কুশরজ্জু, বস্ত্র, ক্রমশঃ বর্জ্জিত হইল এবং সূত্র পবিত্ররূপে ব্যবহৃত হইল। তখন যজ্ঞোপবীত 'যজ্ঞসূত্র' নাম ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিতীয়জন্ম সূচক অর্থাৎ দ্বিজত্বজ্ঞাপক বাহ্যচিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীতে এই সময় হইতে আধ্যাত্মিক ভাব অর্পিত হইল। তখন ইহা অনেকের নিকট 'ব্রহ্মসূত্র' নামে পরিচিত হইল। এই যুগ ভারতের দার্শনিকযুগ, এই সময়ে সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগের প্রাধান্য সঙ্কুচিত এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা প্রচারিত হইতেছিল। "ব্রহ্মসূত্র"

পরমপদ সূত্র সূচনা করে, এই সূত্র-মর্ম্ম যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ*" এই আধ্যাত্মিক ভাব ব্রহ্মোপনিষদে দেখা যায়।

এতদিনও 'সূত্র' উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর তিনসূত্র একত্র করিয়া একটী গ্রন্থি রচনা করিবার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে "ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তু ত্রয়মধো'মুখং ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকোগ্রন্থিরিষ্যতে" দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে তিনটীসূত্র একত্রিত করিয়া একটী ত্রিদণ্ডী বা গ্রন্থি প্রস্তত করিবার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি মনুও স্মৃতিশাস্ত্রে ত্রিবৃৎ যজ্ঞসূত্রের কথা বলিয়াছেন।

মহর্ষি দেবলের সময়ে এই সূত্র এক গাছি প্রস্তুত করিতে আবার নয়টী ক্ষুদ্র সূত্রের আবশ্যক হইয়া উঠিল। দেবল বলিয়াছেন "নয় গাছি তন্তু দ্বারা প্রস্তুত সূত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। ঐ সূত্র ব্রহ্মা উৎপন্ন করিয়াছেন, বিষ্ণু ত্রিগুণিত করিয়াছেন, শিব উহার গ্রন্থি রচনা করিয়াছেন এবং সাবিত্রী দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অগ্নি, শুক্র, সূর্য্য এবং সুরাচার্য্য, ইহারা নয়জনই নয় তন্তুর অধিষ্ঠাতা নব দেবতা।" এই সকল প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া স্মার্ত্তযুগে সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখন ত্রিদণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও, আরম্ভ হইয়াছিল। বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড, মনোদণ্ড, এই তিন দণ্ড থাকিলেই ত্রিদণ্ডী, এইরূপ কথা স্বয়ং মনুই বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেষলোমরচিত যজ্ঞোপবীত হইবে, এইরূপ পার্থক্য মনু উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্তার শঙ্কায় উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণের আরও অনেক রহস্য প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না।

দার্শনিকযুগে যজ্ঞোপবীত কেবল দ্বিজত্বের চিহ্নমাত্র রহিল না, উহার সহিত সুন্দর ধর্ম্মভাবের সংশ্রব হইল, এবং উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইল। ধর্ম্মভাবহীন সূত্রমাত্র পরিজ্ঞাপক না হওয়া উচিত। উপনয়নের উদ্দেশ্য, বেদাদি জ্ঞানবিকাশক শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিতে গুরুর নিকট গমন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযত, শিক্ষিত, তেজস্বী ব্রহ্মচারী নানাশাস্ত্রালোচন ও বহুজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক সমাজের—দেশের—অভাব মোচন করিয়া, জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন; এরূপ ব্যক্তির বাহ্য-চিহ্নের সহিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মধারণার সংমিশ্রণ বেশ 'সোনায় সোহাগা' হইয়াছিল। দার্শনিক মস্তিষ্কের বড়ই সম্মানিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ইহা সমাজের মধ্যে বেশ পবিত্রতা বা ধর্ম্মভাবের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল। কালের কুটিল গতিতে উপনয়ন কেবল

---

*সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদম্‌। তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ।
ব্রহ্মোপনিষদ্‌।

প্রচলন আজ্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। গুরু-গৃহ-বাস কেবল তিন রাত্রি চথ্ নক্ বুজিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া খোঁসগল্প করায় পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, শক্তিলাভ, সবই কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অধঃপতিত দেশে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধন চাই, বেদাধ্যয়ন (জ্ঞানশিক্ষা) অবিরত আবশ্যক। যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার ব্রহ্মণ্যের অসাধারণ নিদর্শনে পরিণত হওয়া দরকার; নচেৎ বৃথা অর্থব্যয়, বৃথা পরিশ্রম, ব্রত, উপবাস; জাতীয় ভাব কিছুতেই উদ্দীপিত হইবে না। কথাপ্রসঙ্গে আমরা বহু দূরে আসিয়াছি। এখানে বিরাম লাভ করা গেল।

আপস্তম্বের উপনয়নব্যাখ্যার প্রথমে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক সূত্র।

১। উপনয়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদে আমরা উপনয়ন সংস্কারের বিষয় বলিব।

উপনয়নের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে অর্থাৎ উপনয়নার্হ কুমারের বয়স সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রকারপ্রধান আপস্তম্বের মত,—

২। গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত।

৩। গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং॥

গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারকে উপনীত করাইবে। গর্ভএকাদশবর্ষে ক্ষত্রিয় এবং গর্ভদ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকুমারের উপনয়ন হওয়া উচিত। যে সময় প্রথমে সন্তান গর্ভস্থ হয়, সেই সময় হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন কাল উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গর্ভ হইতে গণনা করিয়া একাদশ এবং দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন কাল। এই কাল-নির্ণয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল। ক্ষত্রিয়ের কেহ দশ—এক'দশবর্ষ, বৈশ্যের কেহ একাদশ—দ্বাদশবর্ষ বলেন। তিন জাতির মধ্যে উপনয়ন-কালের পার্থক্য হওয়ার কারণ আছে। ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যাবধি ব্রাহ্মণসমাজে বাস করে, অনিচ্ছায় বা যদৃচ্ছায় তাহারা অনেক জ্ঞান লাভ করে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরাই অধ্যয়নের গুরু, অব্যাহত পঠন পাঠন তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত। সংসর্গজাত শিক্ষা এবং বাল্যাবধি অনিচ্ছাপ্রাপ্ত অনুশীলনের ফলে তাহারা সত্বর শিক্ষার্হ হয়; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা ব্রাহ্মণসমাজে ব্রাহ্মণকুমার বাধ্য হইয়া শিখিয়া ফেলে এবং সহজতঃ কষ্ট-সহিষ্ণু হয়। এরূপাবস্থায় তাহাকে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত অল্প বয়সে অধিকার দেওয়া যায়, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যসন্তানকে তত সত্বর দেওয়া হয় না। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সহিত ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ কিছু দূরবর্ত্তী, কাজেই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পূর্ব্বে অধিকারী। ব্রাহ্মণআচার্য্যের গৃহে বাস করিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অপেক্ষা আগে যোগ্য হইবে, কারণ ক্ষত্রিয়সন্তান বৈশ্য অপেক্ষা অনেক সময় অধিক ব্রাহ্মণসংসর্গ লাভ করে। রাজশক্তির অধিকারী হইয়াও ক্ষত্রিয়, কঠোরতায় শিক্ষায় এবং ব্রাহ্মণসংসৃষ্টঅভিজ্ঞতায়, বৈশ্যকে পশ্চাতে রাখিতে পারে। পূর্ব্বাপরতায় একমাত্র কারণ অধিকার-যোগ্যতা; ঐ যোগ্যতা যাহার যত

দিনে উৎপন্ন হইবে, সে তত দিনেই অধিকারী; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের, পরে রাজন্যের, অনন্তর বৈশ্যের অধিকার যুক্তিযুক্ত।

উপনয়নের সময় অর্থাৎ ঋতু-মাসাদির বিবেচনা করিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৪। বসন্তো গ্রীষ্মঃ শরদিত্যৃতবো বর্ণানুপূর্ব্যেণ।

ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়নকাল বসন্ত, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম এবং বৈশ্যের শরৎ। এই ঋতুভেদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ়রহস্য আছে, তবে অনভিজ্ঞ লেখকের সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান নাই। গ্রীষ্মকাল উগ্রতার নিদর্শন; গ্রীষ্মের বিভীষণভাব মনে চিন্তা করিলে, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। গ্রীষ্মে উগ্রতার অবতার ক্ষত্রিয়জাতি উপনীত হইবেন। সময়ের প্রকৃতি উগ্রতাময়ী; ঐ সময়ের সাধক-ব্রহ্মচারী উগ্রতেজা ক্ষত্রিয়কুমার। সন্তাপযুক্তকালে তেজস্বী সাধক তেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। বসন্ত মধুরতার নিদর্শন। প্রকৃতির জীর্ণ-পরিত্যাগের এবং নূতন পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধানের অবসর সুবসন্ত; সাধক ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী এই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর সময়ে নিজের শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি স্নিগ্ধগুণের উদ্বোধনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সময় ও উদ্দেশ্যে সাম্য চাই। ভীষণা রণরঙ্গিণী নৃমুণ্ডমালিনীর পূজার ব্যবস্থা অমানিশার নিবিড় অন্ধকার রজনীতে, আর ব্রজবিলাসিনী মধুরিমময়ী গোলোকেশ্বরী পূর্ণশক্তি রাধার পূজাকাল রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধবলা অমলযামিনী। কালে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। দ্বিপ্রহরের পক্ষে যে সঙ্গীত ভাবোদ্দীপক, প্রভাতের পক্ষে তাহা অরুচিকর। শরতে বৈশ্যের চিরসম্বল কৃষি ও বাণিজ্য, উভয়েরই অনুকূলতা আছে। যে সময় স্বশক্তির অনুকূল ও স্বজাতীয়জীবনের সমধর্ম্মা, সেই সময়ই জাতীয় শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রকৃষ্টকাল। এইরূপ ব্যাখ্যা একদা এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ত্যাগশীল মহোদয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম; যোগ্যতা বিচারের ভার সুযোগ্য পাঠকগণের উপর অর্পণ করিলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে উপনয়নের দিন হইবে—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও তারা-শুদ্ধি থাকিলে, শুক্লপক্ষে, স্বাধ্যায়দিনে, উত্তরায়নকালে; রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে, কালশুদ্ধিতে। ইহাতে হরিশয়ন, যুতবেধ, যামিত্রবেধ, দশযোগভঙ্গ ও গলগ্রহ প্রভৃতি দোষ না থাকে, এটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা এইরূপ ভাবের একটী জ্যোতিষের বচন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যথা,—

জীবার্কেন্দুবিশুদ্ধো হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্তরস্থে,
স্বাধ্যায়ে বেদবর্ণাধিপ ইহ শুভদে ক্ষৌরভে নাদিতোচ্চা।
শুক্রার্কেজ্যাঙ্কলগ্নে রবিমদনতিথিং প্রোজ্ঝ্য-ষষ্ঠাষ্টমেন্দুং
নোজ্ঝীবাস্বাতিচান্দ্রেংর্কসিতগুরুদিনে কালশুদ্ধৌ ব্রতং স্যাৎ॥

উপনয়নের ব্যাপারাদি কিরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আভাস দিতে গিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

৫। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো বাচয়িত্বা কুমারং ভোজয়িত্বা অনুবাকস্য প্রথমেন যজুষা আপঃ সংসৃজ্য উষ্ণাঃশীতা-স্বানীর উত্তরয়া শির উনত্তি।

ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাক্য উচ্চারণ করাইয়া, (পুণ্যাহ স্বস্তি ঋদ্ধি বাচনই বৃত্তি-কার হর দত্তের মতে আশীর্ব্বাক্য-উচ্চারণ,) অনন্তর উপনয়নযোগ্য কুমারকে ভোজন করাইবে। অনন্তর আচার্য্য উত্তর অনু-বাকের প্রথম যজুর্ম্মন্ত্র (উষ্ণেন বায়ো' ইত্যাদি) দ্বারা উষ্ণ এবং শীত জল সংগ্রহ করিবেন। উষ্ণজল শীত জলের পাত্রে আনিবেন, পরে ঐ মিশ্রিত জল দ্বারা কুমারের শিরঃ অর্থাৎ মাথার চুলগুলি ভিজাইয়া দিবেন, এই সময়ে "আপউন্দন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

কুমারকে উপনয়নের দিন প্রাতঃকালে ভোজন করাইবার কথা গৃহ্যসূত্রকার লিখিতেছেন, উপনয়নাদি কর্ম্মের পদ্ধতিতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা অনুষ্ঠিত হয় না। উপনয়নের পূর্ব্বদিন শেষরাত্রিতে কুমারকে দুগ্ধাদি প্রচুর ভোজন দিবার প্রথা দেখা যায়। ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রথা প্রচলিত নাই, ব্রাহ্মণী-ভোজন দৃষ্ট হয়। কুমারের শেষ রজনীতে দুগ্ধ দধ্যাদিযুক্ত ভোজন এবং রমণীগণের দধ্যাদিযুক্ত ভোজন-প্রদান কার্য্যকে 'দধিমঙ্গল' বলা হয়; ইহা বোধ হয় অনুকল্প ব্যবস্থা হইবে। ঐ সময়ে কুমারের কপালে দধিতিলক প্রদান করিতে দেখা যায়।

নান্দীশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ে সুদর্শনা-চার্য্যের মত "পূর্ব্বেদ্যুর্নান্দীশ্রাদ্ধং কুর্ব্বতঃ।" অর্থাৎ নান্দীশ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে করিতে হয়। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। হর দত্ত বলেন "শ্বোভূতে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশীর্ব্বাচয়তি।" অধুনাতন সমাজে পূর্ব্বদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে দেখা যায় না। সেই উপনয়ন-দিনেই প্রাতে ঐ শ্রাদ্ধ করা হয়। ব্যবহার, শাস্ত্রকে চিরদিন পশ্চাতে রাখিয়া থাকে। কুমার-ভোজনের পর হইতে আচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ।

চুল ভিজাইয়া, পরে যাহা করিতে হইবে, আপস্তম্ব তাহা বলিতেছেন।

৬ ত্রীংস্ত্রীন্ দর্ভানন্তর্ধায় উত্তরাভিশ্চতসৃভিঃ প্রতিমন্ত্রং প্রতিদিশং প্রবপতি।

প্রত্যেক দিকে তিনটী তিনটী কুশ মধ্যে রাখিয়া, এক এক মন্ত্রে এক এক দিকের কেশ ছেদ করিবেন। প্রথম কেশগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, আচার্য্য পূর্ব্ব দিকের কেশ মধ্যে তিনটী কুশ দিয়া "যেনাবপৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কএক গাছি কেশ ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবেন। অনন্তর বৃষগোময়-পরিপূর্ণ সন্নিহিত পাত্রে ঐ কেশ ও যব প্রক্ষেপ করিবেন। পরে জলস্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ দিকের কেশে কুশ দিয়া 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কএকটী কেশ ছেদ ও পূর্ব্ববৎ বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করি-বেন। পরে আচমনান্তর পশ্চিমদিকের কএকটি কেশ ঐভাবে "যেনভূয়ঃ" ইত্যাদি

মন্ত্রে বৃষগোময়ে রাখিবেন। তৎপরে উত্তর দিকের কএকটী কেশ ঐরূপে 'যেন পূষা' ইত্যাদি মন্ত্রে ছেদ করিয়া বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। প্রতিবারেই ঃর দিতে হইবে। এইরূপে আচার্য্য প্রত্যেক দিকের কয়টী কয়টী কেশ ছেদ করিলে, পরে নাপিত সমস্ত কেশ উত্তমরূপে মুণ্ডন করিবে। বপতি শব্দের অর্থ বপন করা। প্র শব্দের অর্থ আরম্ভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, আচার্য্য ক্ষুর দ্বারা বপনের আরম্ভ করিবেন, পশ্চাৎ নাপিত তাহা নিঃশেষরূপে সম্পাদন করিবে।

৭। বপন্তমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে।

নাপিত কেশ বপন করিবে, আর আচার্য্য তাহাকে 'যৎ ক্ষুরেণ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রিত করিবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, যখন আচার্য্য কুমারের কেশ ছেদ করিবেন, তখনই কুমারের দক্ষিণদিকে বসিয়া কুমারের মাতা বা অন্য কোনও ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অনুমন্ত্রিত করিবেন। অনুমন্ত্রণ নাপিত কর্তৃক বপনে নহে। হরদত্ত কিন্তু আচার্য্যের অনুমন্ত্রণের কথাই বলিয়াছেন। সুদর্শন বলেন, 'আয়ুর্মা প্রমোষী' ইত্যাদি অনুমন্ত্রণ-বাক্যে মধ্যম পুরুষলিঙ্গকতা রহিয়াছে। আচার্য্য বপনে ব্যাপৃত, সুতরাং অনুমন্ত্রণে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব নয়; অতএব মাতা বা অন্য ব্রহ্মচারী অনুমন্ত্রণ করিবেন। উভয় মতেই নিজক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ

যশোহর-বেদবিদ্যালয়স্থস্য—

---

ওঁ নমস্তত্ত্বেভ্যঃ।

# তত্ত্বসমাস।

যে মহাপুরুষের মহতী প্রতিভা সমগ্র-জগৎকে চমকৃত করিয়াছিল, যাঁহার হৃদয়ের ধন চতুর্বিংশতিতত্ত্ব উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্রাদি বিরাট্ হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল কলেবরে সুন্দররূপে খচিত রহিয়াছে; যিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন জন্মযোগী; বিপুল গৌরবময় স্বরে বেদ যাঁহার অগাধ-জ্ঞান ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" সেই আদিগুরু, জগতের সর্ব্বপ্রধান মনোবিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য কপিল আসুরি মহোদয়কে সর্ব্বপ্রথমে সংক্ষেপে যে পদার্থতত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম তত্ত্বসমাস।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবন্নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে মহর্ষি কপিল পঞ্চমাবতার, এরূপ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। "পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনিশ্চয়ং।" অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণের পঞ্চম অবতার কপিল নামক সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ আসুরিকে কাল-মহিমায় বিপ্লবপ্রাপ্ত তত্ত্বসমূহনিশ্চয়স্বরূপ সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বলিয়াছিলেন। এই বচনে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, কপিল যখন আসুরিকে সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লইয়া বড়ই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যদা যদাহি-

ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য এই কথা, তাহা নহে, চিরদিনই ভগবানের অবতীর্ণ হইবার কারণ ধর্ম্মবিপ্লব। আত্মজ্ঞানই মুক্তির সর্ব্বসম্মত উপায়। আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে, বস্তুতই সেই সময়ে অবতারের আবশ্যকতা।

সাংখ্য বলিলে সাধারণতঃ অনেকেই মনে করেন, কপিল-কথিত ষড়্দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ, কিন্তু ঐরূপ ধারণার মূলভিত্তি দৃঢ় নহে। আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদাই 'সাংখ্য' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই; বস্তুতঃ সর্ব্বত্র কপিলপ্রণীত শাস্ত্র লক্ষ্য হইতে পারেনা। বেদ বলিতেছেন "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং" এখানে বোধ হয় কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগদর্শনকে লক্ষ্য করা হয় নাই। আত্মজ্ঞান, বহুপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ চতুর্ম্মুখ দেবকে বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সেই আত্মজ্ঞান সময়বশে পঙ্কিল হইলে, সত্য প্রচারের জন্য কপিলদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রও প্রথমে ব্রহ্মা ব্যাখ্যা করেন। পুরাণে দেখা যায় "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" পরে ঐ যোগশাস্ত্র মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রকে 'যোগানুশাসন' বলে। কথিতের পুনঃকথন হইলে অনুকথন এবং শিষ্টের পুনঃশাসন হইলে অনুশাসন বলে; সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, পতঞ্জলি-রচিত চতুষ্পাদ গ্রন্থ মূল যোগোপদেশ নয় এবং কপিল-রচিত ষড়ধ্যায় বা তত্ত্বসমাস, কিছুই প্রকৃত সাংখ্য নহে। যুগযুগান্তব্যাপী মহাসত্য কপিলাবতারে জগৎ যেরূপ ভাবে সর্ব্বপ্রথমে শুনিয়াছিল, সেরূপ আর শুনে নাই বলিয়া, কপিলের চরণে প্রণত হয়। তার অনাদি যোগ—যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে যোগ—মহেশ্বরের চিরসম্বল, অধিক কি, শ্রীভগবান্ও যে যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, সেই জীবন্ত সত্য মহর্ষি পতঞ্জলির নিকট জীবজগৎ প্রথমে শুনিতে পায় বলিয়াই 'পাতঞ্জল' নামে তাহাদের হৃদয়ধমনী নাচিতে থাকে। খনির অন্ধকারে, পর্ব্বতের গহ্বরে আপনার আলোকে মণি যখন আপনি আলোকিত হয়, অথচ জগৎ তাহার সংবাদ পায় না, তখনও মণি যেরূপ মণিই, পরে ধনীর প্রাসাদে, অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে, দশ জনের নয়ন ঝলসাইয়া যখন বিরাজমান, তখনও মণি মণির অধিক কিছু নহে; কিন্তু সংস্কার উহার মহিমা বুঝিতে দেয়। যখন সাংখ্য (আত্মজ্ঞান) মলীমসভাবে আঁধারে আবৃত ছিল, সমাজ সে তত্ত্বে অন্ধ হইয়া ছিল, তখনও উহা সাংখ্য, পরে কপিলের অপূর্ব্ব-পরিচ্ছদে উহার সংস্কারশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, উহাই জগতের চক্ষু ঝলসাইয়াছিল। কোনও সত্য নবাগত নহে। সত্যসমুদ্র শ্রীভগবান্ হইতেই উহাদের আবির্ভাব; তবে অবতারে প্রচারিত হয় বলিয়াই অবতারের পদে জগৎ লুণ্ঠিত হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য এবং গীতাদি সমস্ত শাস্ত্রে "সাংখ্য" অর্থে আত্মজ্ঞান বুঝা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের নাম সাংখ্য আত্মজ্ঞান বিষয়ে কপিলই সর্ব্বপ্রথম

উপদেষ্টা। কপিল আদি বিদ্বান্, সুতরাং কপিলের আত্মজ্ঞানোপদেশ 'সাংখ্য' নামে জনসমাজে পরিচিত হইতে বাধা নাই। সাংখ্যসূত্র অর্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সূত্র। কপিল একটী নূতন নাম প্রচার করেন নাই। সাংখ্য বলিলে শাস্ত্রকারগণ জ্ঞানমার্গই বুঝিয়াছেন। কপিল নিজে দুইখানি সাংখ্যগ্রন্থ বলেন। একখানি অতিক্ষুদ্র, দ্বাবিংশতি সূত্রে সম্পূর্ণ, ইহারই নাম তত্ত্বসমাস; অপর খানি বিস্তৃত, নাম সাংখ্য প্রবচন। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু আসুরিকে এই তত্ত্বসমাস বলা হয়।

আসুরি আমাদের পরিচিত মহর্ষি। আমরা তর্পণকালে "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলের পরেই আসুরির নাম পাঠ করি। আসুরি কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই। তৎশিষ্য পঞ্চশিখ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পঞ্চশিখের কতকগুলি সূত্র এখনও দেখিতে পাই; অপর মহামূল্য গ্রন্থগুলি মহাকালের বিশাল কুক্ষিতে স্থান পাইয়াছে।

তত্ত্বসমাসে সংক্ষেপে কেবল মাত্র পদার্থতত্ত্ব ও পদার্থস্বরূপজ্ঞান লাভ করিলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় অর্থাৎ মুক্তি হয়, এই কথা বলা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্তগ্রন্থে বিচারবিবাদ-বিতর্কের উল্লেখ নাই। মতান্তর, যুক্তিবিস্তার, ঝগড়া ইত্যাদিও দেখা যায় না, যেহেতু জিজ্ঞাসু বিশ্বাসী জ্ঞানপিপাসু শিষ্য আসুরি বিচার দশা অতিক্রম করিয়া, কেবল মাত্র বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, উপদেশপ্রার্থনায় কপিলদেবের নিকট গিয়াছিলেন। কপিলদেব যে তত্ত্বসমাস কহিয়াছিলেন, তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণকুম্ভের মত নিস্তব্ধ ভাবেই তিনি উপদেশ গ্রহণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ বড় প্রতিভাবান্ ঋষি ছিলেন; তিনি উপদেশ গ্রহণের পর উহার বিস্তৃত আলোচনা বিচারাদি করেন; তাঁহার তর্ক-জালের বিচার বিভ্রাটের অনুরোধেই কপিলদেব দ্বিতীয়বার সাংখ্যপ্রবচন সূত্র রচনা করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তত্ত্বসমাসে যাহা বলেন, পরে মূলতঃ তাহাই প্রকৃষ্টরূপে যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির বলিয়া প্রতিপাদন করেন; কাজেই দ্বিতীয় খানির নাম হইল "প্রবচন"। ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করায়, ঐ গ্রন্থের আর এক নাম হইল ষষ্টিতন্ত্র।

সাংখ্যপ্রবচন যে কপিল-প্রণীত, ইহা আমরা ১৩০৮ সালের হিন্দু পত্রিকায় "সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এই প্রবন্ধে উহার ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদনপ্রণালী এবং সাংখ্যমত যে শ্রৌত, তাহা পরিশেষে দেখান যাইবে। কপিল রচিত এই প্রথম গ্রন্থ 'তত্ত্বসমাস' আমরা সম্প্রতি প্রকাশ করিব। কপিলের প্রথম সূত্র—

অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ ॥১॥

অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল, অধিকার, আনন্তর্য্য। এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল। সূত্রের অর্থ,—এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ববিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। এখানে তত্ত্বপ্রতিপাদনই লক্ষ্য বিষয়, কিন্তু সংক্ষেপ করাও তাহার বহির্ভূত নহে। "অধিকারশ্চ

আধিকোন আরম্ভঃ" অধিকার অর্থ প্রধান-ভাবে আরম্ভ করা। এই অধিকার প্রতিপাদনের ফলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থিতিতে অসঙ্গতি নিবারিত হয়। অথ শব্দের অর্থ 'অধিকার' এখানে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ অতঃশব্দই আরম্ভ সূচনা করিতেছে। শাস্ত্রে আছে, "মঙ্গলাদীনি প্রথয়িতব্যানি" সাংখ্যপ্রবচনে স্বয়ং কপিলাচার্য্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি" বলিয়াছেন, অতএব এখানে অথ শব্দের অর্থ মঙ্গল বলা যাইবে। অথশব্দ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রাহ্মণঃ পুরা কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।" ওঁকার এবং অথ শব্দ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এজন্য উহারা মাঙ্গলিক। এই শ্লোকের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যায়, অথ শব্দের উচ্চারণ মাঙ্গলিক। অথ শব্দ মঙ্গল সূচনা করিতেছে; সুতরাং আনন্তর্য্য অর্থও এখানে সঙ্গত নহে। যদিও শিষ্য আসুরি জিজ্ঞাসা করিলে, তদনন্তরই কপিলদেব বলিতে আরম্ভ করেন; বিশেষতঃ শাস্ত্রেও আছে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ" এই জন্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য ধর্ত্তব্য হয়; কিন্তু উহার কোনও দৃঢ়তা নাই। প্রশ্ন করিলে পর যে উত্তর দেওয়া হইতেছে, ইহা অনায়াসগম্য, এজন্য একটা অথ শব্দের আবশ্যকতা নাই। মিত্রভাবে বিনা জিজ্ঞাসায়ও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শিব ভাবে উহা একান্ত দুর্ঘট; অতএব "জিজ্ঞাসার পর" এরূপ অকিঞ্চিৎকর আনন্তর্য্য এখানে মূল্যবান্ নহে। আনন্তর্য্য পূর্ব্বাপর সঙ্গতির জন্য অনেক স্থানে দরকার হয়, এখানে জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে; উহা প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রযত্ন অনাবশ্যক।

'আর্য্যগণ সৎকার্য্যে প্রথমে মঙ্গলের অবতারণা করিতেন; ভবিষ্যতেও মঙ্গল হইবে, এইরূপ আশা তাঁহাদের প্রণোদনার কারণ। নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-পরিসমাপ্তি জন্য অনেক স্থানে মঙ্গলাচরণের কথা বলিতে দেখা যায়।

মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ; বাচিক, মানসিক এবং আনুষ্ঠানিক। "ওঁ", "অথ," "স্বস্তি" দেবতাবাচক, কুশলবাচক শব্দোচ্চারণ এবং শ্লোক দ্বারা দেবতা গুরু প্রভৃতির নমস্কার করাই বাচিক মঙ্গল। মানসিক মঙ্গল—মনে মনে পবিত্র মঙ্গলবাচক শব্দ, দেবতাদির রূপ ও মাঙ্গল্যদ্রব্যের চিন্তা করা। আনুষ্ঠানিক মঙ্গল—কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণকুম্ভস্থাপন, মালিকাবন্ধন, শঙ্খাদি বাদন, লাজবর্ষণ প্রভৃতি। প্রত্যেক ব্যাপারে সজাতীয় মঙ্গল করা আবশ্যক। কপিলদেব বাঙ্ময়সূত্র উপদেশ দিতে গিয়া, বাচিক মঙ্গল অথ শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন। বিষয়—তত্ত্বোপদেশ বাচিক, মঙ্গল—অথ শব্দোচ্চারণও বাচিক।

'অতঃ শব্দের অর্থ, এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া। তত্ত্ব কথাটীর অর্থ যথার্থবস্তু। কপিলদেব যে কয়টী পদার্থকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। পদার্থপ্রতিপাদন করিতে হইলে, পদার্থের উপযোগিতা, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও কার্য্য-প্রণালী

সম্বন্ধে বলা আবশ্যক হয়; ঐগুলি বলিতে হইলে যে সকল প্রমাণ, যুক্তি ও ক্রম আবশ্যক হয়, তাহাও একান্ত অপরিহার্য্য; সুতরাং এই সকল বিষয়ের বিবরণ দেওয়ারও দরকার হইয়াছে।

কপিলদেবের "তত্ত্ব" কথাটীর একটু রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার প্রচারিত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব এবং পুরুষ চৈতন্যতত্ত্ব, এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে কোনওটীকে তিনি আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ বা মরুমরীচিকা অথবা শুক্তি-রজতের মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, ইহার আভাসস্বরূপ তত্ত্বশব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সূত্রে তত্ত্বোপদেশ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়সূত্রেই প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

কথয়ামি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২

সূত্রার্থ,—আমি বলিতেছি—প্রকৃতি অষ্টপ্রকার। প্রকৃতি বলিলে, অনেকে বুঝেন 'স্বভাব', কিন্তু এখানে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কোনও স্বভাব-বিশেষকে প্রকৃতি বলা হইতেছে না। সমস্ত সংসার বিশ্লেষণ করিলে, দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, এক চেতন, অন্য জড়। এই জড়তত্ত্ব জগতের দৃশ্যমানমূর্ত্তি হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্তরে বিভক্ত হইতে পারে। বহুদূরে গিয়া ইহা দৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করে। আণবিক সংস্থান হইতে সেই জগৎ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ আমরা সেই জগতের ক্রিয়াপ্রণালী এরূপজ্ঞান লইয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের চক্ষু সে সূক্ষ্মজগতে যাইতে পারে না। আমাদের চক্ষুর শক্তি সামান্য, যন্ত্র-সাহায্যে এই সামান্য শক্তিরও উদ্বোধন হইতে পারে; এই চক্ষুরও শুদ্ধি ঘটিয়া সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু এরূপ যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া দরকার, যাহাতে সূক্ষ্মজগৎও দৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান, যেখানে সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রজগতের আরম্ভ, সেই পর্য্যন্ত অস্পষ্টরূপে কতক কতক দেখিতে পাইতেছেন, বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষি কপিল উহার অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন এবং অমোঘ সত্য দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মজগতের যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে 'তন্মাত্র' বলিয়া অভিহিত করা যায়। সূক্ষ্মজগৎ স্থূল জগতের কারণ অর্থাৎ পূর্ব্বতনঅবস্থা। তন্মাত্র-জগৎকে কপিল পাঁচভাগে বিভক্ত করেন, এবং ঐ তন্মাত্রজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, আরও তিনটী সূক্ষ্মতম স্তরের বর্ণনা করেন; শেষস্তরেই জড়তত্ত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করেন। ঐ স্তরকে কপিল 'অব্যক্ত' নাম দিয়াছেন। কপিলের শেষজড়তত্ত্ব দেখা যায় না, শুনা যায় না, শব্দস্পর্শরূপরসাদিশূন্য, আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনধিকৃত স্থানে। কেবল মাত্র কয়েকটী কারণ হইতে কপিল এরূপ পদার্থের অনুমান করিয়াছেন। এই 'অব্যক্ত' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অনেকে কপিলদেবকে অজ্ঞেয়বাদী বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। কপিল যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি 'অজ্ঞেয়' বলেন নাই। বেদান্তের মায়াদেবীর মত কপিলের প্রকৃতি অনির্ব্বাচ্য

নহে; তবে ব্যক্ত দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সাদৃশ্য অনেকাংশে অল্প। কতকগুলি ব্যক্ত, কতকগুলি অব্যক্ত, এই দুই ভাগে তিনি জড়ের বিভাগ করিয়াছেন। ব্যক্ত অর্থ স্থূল, অব্যক্ত অর্থ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে তাঁহার সূক্ষ্মজগৎ বা অব্যক্তজগৎ আরব্ধ হইয়া, চরমঅব্যক্তপ্রকৃতিতে উপনীত হইয়াছে। অব্যক্ত জগতের আটটী বিভাগের মধ্যে, পূর্ব্বতন সাতটী আমাদের নিকট অব্যক্ত হইলেও, মূল বা শেষঅব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, এই জন্য একমাত্র শেষতত্ত্বই 'অব্যক্ত' নাম পাইয়া থাকে। প্রথম সাতটীকে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মহাশয় 'প্রকৃতি বিকৃতি' এবং মূল অব্যক্তকে "মূল প্রকৃতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর-লক্ষ্য করিতে গেলে বলা যায়, বাহ্যস্থূল জগৎ বিকৃতি এবং সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা অব্যক্তজগৎ প্রকৃতি। প্রত্যেক অব্যক্ত পদার্থ মূলতত্ত্ব হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল, এজন্য প্রকৃতপক্ষে শেষতত্ত্বই প্রকৃতি শব্দের লক্ষ্য। এ সূত্রে অবশ্য কপিলদেব অব্যক্তজগৎকেই প্রকৃতি শব্দে বলিয়াছেন। জগন্নির্ম্মাণকারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্ত্বগুণাংশ যখন বেশ সাম্য অর্থাৎ পরম্পরাসম্বন্ধবিরহিত ভাবে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে সেই স্তরের নাম মূল প্রকৃতি।

পরে সম্মিলন, সংযোজন ও সংঘর্ষণের ফলে অবস্থান্তরিত হইলে নাম হয় প্রকৃতি বিকৃতি। এই নাম সাতটী স্তরের পর আর থাকে না। তখন শুধু বিকৃতি, প্রকৃতি বা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির নাম, অব্যক্তজগতে অপর সাতটী পদার্থের নাম যথাক্রমে স্থূলতা অনুসারে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এতক্ষণে কপিল অষ্ট প্রকৃতির কথা বলিয়া, অব্যক্তজগৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যক্তজগৎ ব্যাখ্যা-নিমিত্ত বিকারতত্ত্বের উল্লেখ করিতেছেন।

ষোড়শকন্তু বিকারঃ ॥৩

সূত্রার্থ—বিকার ষোড়শ প্রকার। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য বা ব্যতিক্রম বশতঃ প্রাপ্ত অবস্থা ষোড়শ প্রকার বিকার। চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও পঞ্চ স্থূলভূত, এই ষোলটীর নাম বিকার। মনের ক্রিয়া-গতি যদিও দুর্লক্ষ্য এবং মনের স্বরূপ যদিও বেশ সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা সমর্থিত হয়, তথাপি মন স্থূল এবং বিকার। মন অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য্য বা বিকৃতি, কিন্তু মন হইতে অন্য কোনও তত্ত্ব উৎপন্ন হয় নাই, এজন্য মন মাত্র বিকৃতি, প্রকৃতি নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতি আটটী অপেক্ষা মন নিশ্চয়ই স্থূল। ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও, উহাদের অধিষ্ঠান অর্থাৎ যে সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিকসিত হয়, তাহারা স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয় একভাবে স্থূল; বিশেষতঃ অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্য কোনও তত্ত্ব নহে। পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকা, ইহারা স্থূল; পরন্তু তন্মাত্রের স্থূল বিকাশই ইহাদের স্বরূপ। আমাদের পাঁচটীর অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, এজন্য এ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের অনুভূতির বিষয়ও পঞ্চভূত বা তাহার গুণ।

প্রকৃতির ব্যাখ্যায় রূপতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, ইত্যাদি নাম দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে ঐ গুলির অর্থ রূপ বা শব্দ গুণ। তন্মাত্র নামের অর্থ অমিশ্রতানিবন্ধন কেবল মাত্র সেই এক প্রকারের অণুসমাবেশ। ভূততন্মাত্র সকলের মধ্যে ভিন্ন ২ শ্রেণীর অণুসমূহের সম্মিলনজাত নানাগুণ সম্পন্ন মিশ্রস্থূল ভাবের পদার্থই ভূত। ভূত পদার্থে গুণের অনুভূতি আছে; তন্মাত্রের গুণ আমাদের অনুভবের অযোগ্য; তন্মাত্র সূক্ষ্ম-ভূত আর মহাভূত স্থূলভূত, এই টুকু রহস্য। এই ভূতপঞ্চকের দ্বারা কোনও নবতত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। অবয়বসংস্থানের ব্যতিক্রম-ভেদে কেবল নাম ও কার্য্যকারিতার বৈলক্ষণ্য হয় মাত্র, বস্তুতঃ পদার্থ একই থাকে। যেমন হার-বলয়-কেয়ূর কুণ্ডলে সুবর্ণ অভিন্ন, তেমনি।

এতাবৎ কাল জড় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মহর্ষি কপিল জড়ের পরিচালক চেতনতত্ত্বের কথা বলিতেছেন। জড়ের সংখ্যা অধিক, এজন্য তাহাই অগ্রে বলা হইয়াছে।

পুরুষঃ। ৪

সূত্রার্থ—অপর চেতনতত্ত্বের নাম পুরুষ। জড়ের কার্য্যকারিতা চেতনের অনুগ্রহাধীন। চেতন ব্যতীত জড়জগৎ যে কি এক অবাচ্য অননুভাব্য দশায় উপনীত হয়, তাহা বলা যায় না। চেতন অনুভবের মূলাধার; অনুভব ব্যতীত বিশ্বসংসারের অস্তিত্বের আর কোনও সাক্ষী নাই। 'আমি' এই কথার যাহা লক্ষ্য, তাহাকেই সাধারণতঃ চেতন বলা হয়; যদি 'আমি'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়, তবে নিরনুভব নিবিড় অন্ধকারের রাজ্য অগ্রসর হয়।

জগতের সমস্ত জড় পদার্থই যে এক সর্ব্বব্যাপী চেতন সত্তার অনুগ্রহে জীবিত আছে, তাহা এই হিন্দুদেশে বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ছন্দবিনির্ঘোষে বিঘোষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নবাভ্যুদিত পাশ্চাত্য দেশ এই অমূল্যতত্ত্ব, জড়াধিষ্ঠাতা সার্ব্বজনীন চেতনের সত্তা বিশ্বাস করিয়াছেন।

এই বিশ্ব চৈতন্যময়; এই বিশ্বের মূল উপাদান গুলিতে যখন চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি পায়, এই বহুধা বিভক্ত জড়জগতে যখন কার্য্যকারণ স্রোত উথলিয়া উঠে, তখনই জগৎ কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়; এই অমূল্য সত্য মহর্ষি কপিল এই সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

"পুরুষ" শব্দে সাধারণতঃ পুরুষ জাতি বুঝা হয়, এখানকার পুরুষ অর্থ চেতন সত্তা। পুর অর্থাৎ জড় শরীরে এ চেতন সত্তা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এজন্য উহার নাম পুরুষ, এরূপ কথা ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, কিন্তু বিশ্বের পিতা এবং মাতাস্থানীয়রূপে পুরুষ এবং প্রকৃতির রূপক-কল্পনাই চেতনকে পুরুষ বলিবার কারণ বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন। এবার এখানে বিশ্রাম। বারান্তরে তত্ত্বসমাসের অপরাপর সূত্র ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

কপিলসেবকস্য

কস্যচিৎ।

(যশোহর-বেদবিদ্যালয়।)

# শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

## পঞ্চম শ্লোকের আলোচনা।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

( অনুবাদ।)

অয়ি নন্দতনুজ! এ ভবাব্ধি বিষম,
হয়েছি পতিত তাহে আমি ভৃত্যাধম;
তব পদ-পঙ্কজের রেণু-কণা-প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ ( হরি ) পায়।

ভগবচ্চরণে ভগবচ্চরণ-প্রার্থনাই এই শ্লোকের সর্ব্বস্ব। পূর্ব্বালোচিত শিক্ষা-শ্লোকটিও প্রার্থনা-বাক্য মাত্র; কিন্তু তাহা বিষয়-বিষ-বিতৃষ্ণ ও অহৈতুক-ভক্তি সুধা-সুতৃষ্ণ উচ্চাধিকারী ভক্তের প্রার্থনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ব শ্লোকে উচ্চাধিকারের আদর্শ-প্রার্থনা সম্মুখে রাখিয়া, পরে এই শ্লোকে একেবারে সর্ব্বাধিকার-নির্ব্বিশিষ্ট,—অথচ নিম্নাধিকার-সুবিশিষ্ট এই প্রার্থনা-বাক্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাধারণ সংসারী জীবের ত কথাই নাই; সমুন্নত সাধকগণেরও চরম ও পরমসিদ্ধি লাভ পর্য্যন্ত সংসার-সিন্ধুর তরঙ্গ-তাড়ন অল্পাধিক ভোগ করিতেই হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চভূতের ফাঁদে—
ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে!"

বাস্তবিক এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-মন-প্রাণ লইয়া, এই মায়া-প্রপঞ্চ-রঞ্জিত ছায়া-বাজীর সংসারে কে না অল্পাধিক প্রহৃত, প্রবঞ্চিত বা বিড়ম্বিত হন? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেহালম্বী মাত্রই এই ভীম ভবাম্বুধির ভোগাধিগত। তবে কেহবা মজ্জিত, কেহ মজ্জমান, কেহবা সাধন-সন্তরণে ভাসমান। এক মাত্র ভগবচ্চরণাশ্রয় ভিন্ন এ ভব-নীরধি-নিরাশ্রয়ে আর উপায় কি? উপায় কেবল ও পায়! ওপায়ে স্থান না পেলেই একান্ত অনুপায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রশ্নোত্তর" সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে
নিমজ্জিতোঽহং শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈতৎ;
বিশ্বেশপাদাম্বুজ-দীর্ঘ নৌকা॥"

অর্থাৎ—

ডুবে মরি হায়! কি আছে আশ্রয়—
অপার সংসার-সমুদ্র-মধ্য?
কহ কৃপা করি গুরো! কৃপাময়!
মহাতরী হরি চরণ পদ্ম।

এ প্রশ্নের চিরকাল এ-ই উত্তর। তবে কিনা, এই প্রশ্নোত্তর চিরপুরাতন হইলেও আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে নিত্য নূতন।

"পেলে হরি-পদ-তরী,
হেলে ভব-সিন্ধু তরি।"

ইত্যাদি এই একই ভাবান্বিত—একই তত্ত্বাশ্রিত শত সহস্র বাক্যাবলী শত সহস্র গানে, কবিতায়, পুস্তকে, পত্রিকায়, সতত

পড়িতেছি, শুনিতেছি, গাহিতেছি, কহিতেছি; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব; বুকে শুধু ছাই ভস্ম! 'ভব-সিন্ধু' এবং "হরি-পদ-তরী" এ কথা ছুটা খুব জানা শুনা আছে; কিন্তু উক্ত বাক্যদ্বয় লক্ষিত বস্তু দুটি যে বাস্তবিক কি, তাহা বুঝা দূরে থাক্, বুঝিবার অন্ততঃ আবশ্যকতাও বুঝি না! আমরা যেন বেশ নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত আছি। কে জানে তোমার 'ভব-বারি'—কে জানে 'হরি-পদ-তরী'? আমরা যেন ও দুয়ের একটীরও ধার ধারি না। আমাদের কাছে ও সব কেবল যেন কবি-কল্পনা। লিখিতে ভাল, পড়িতে ভাল, বক্তৃতায় কহিতে ভাল, সংগীতে গাহিতে ভাল; তা ছাড়া বাস্তবতায় ভব-বারিতে বিশ্বাস ও পদ-তরীতে আশ্বাস আমাদের কোথায়? মূলতঃ ভব-বারির ভীষণতা-বোধ না থাকিলে, পদ-তরীর আবশ্যকতা-বোধইবা থাকিবে কেন? অতএব আমরা নিশ্চিন্ত—নিঃশঙ্কিত; সুতরাং নিশ্চেষ্ট—নিদ্রিত!

মনে করুন, নদী বাহিয়া একখান নৌকা যাইতেছে। আরোহী অভ্যন্তরে নেশার ঘোরে নিদ্রিত। বাতাস উঠিল, নদীতে তুফাণ ছুটিল, তরঙ্গ-তাড়নে তরী নাচিতে লাগিল। বাহ্য বিজ্ঞানহীন নিদ্রাবেশ-বিলীন আরোহীর তাহাতে বরং আরো যেন ঘুমের ঘোরে দোলার দোলনের ন্যায় আরাম বোধ হওয়ায়, নিদ্রা গাঢ়তর হইল। এ দিকে তরী ডুবুং! বাতাস উদ্ভ্রান্ত, নদী উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গ উন্মত্ত! তীব্র তাড়নে জীর্ণ তরী বিদীর্ণ প্রায়! প্রক্ষুব্ধ প্লাবনে ভগ্নতরী মগ্ন হয় হয়! আরোহী তথাপি ঘুম-ঘোরে অভিভূত; যেন কালনিদ্রায় কবলিত! ক্রমে তরীও সেই করালিনী কল্লোলিনীর কবলিত হইতে লাগিল! নৌকার 'ডহরা' ডুবাইয়া, 'পাটাতন' ভাসাইয়া জল যখন হতভাগ্য আরোহীর শয্যা ভিজাইল, শরীর ভিজাইল, কাণের কাছে 'কল কল' জল-কল্লোল গর্জ্জিল, তখন সে জাগিল। অকস্মাৎ চারিদিকে কৃতান্তের করাল গ্রাসের কাল-অন্ধকার দেখিল! তখন যে আতঙ্ক, আকুলতা, বিহ্বলতা; তখন যে উন্মাদনা ও উৎকট যাতনা, দুঃখ-জগতে তাহার তুলনা কোথায়? তারপর সেই অভাগ্য যাত্রী উন্মত্ত-নদী-বক্ষে ভাসিল! তখন তাহার যে অবস্থা, সে অবস্থার সংজ্ঞা আছে কি নাই! এই নাই, এই আছে! তখন যদি সেই 'আছে' ভারটুকুর সময়ে, চকিতে সম্মুখে একখানি সাক্ষাৎপরিত্রাণ-রূপিণী বিচিত্র-তরণী-দর্শন হয়, তবে তখন তাহার যে অপূর্ব্ব অতুল্য অসাধারণ আনন্দ, এই মায়া-মোহ, পাপ তাপ, রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি অনন্ত তরঙ্গ-তাড়ন-বিক্ষুব্ধ ভবাব্ধিতে পতিত জীর্ণ তরীর শীর্ণ আরোহী জীবের সেই 'অভয় পদ তরী' দর্শনের আনন্দ ততোধিক—ততোধিক!—অনির্ব্বচনীয় অধিক!!

(কিন্তু) হায়! অনির্ব্বচনীয় অধিকাধিক আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আমরা তাহা কিছুই বুঝি না। ব্যাপরটা কবি-কল্পনার থাতায় তুলিয়া, নির্ভাবনায় নিদ্রা দিতেছি! গায়ে এখনও জল লাগে নাই কি না, তাই ঘুমও ভাঙ্গে নাই। কিন্তু লাগিতেও বড় বাকি নাই। এ 'নবছিদ্রান্বিতা' তনু-তরী আর

কতক্ষণ ভাসিবে? মানবের পূর্ণায়ু একশ বিশ বর্ষও অনন্ত কাল সিন্ধুতে একশ বিশ বীচি-পলকেরও যোগ্য নহে! তারপর থাক্ 'একশ বিশ,'—ইদানীং একশ বিশের অর্দ্ধকাল ভাসিতে পারিলেও সে তরীর 'তাবিফ্' দিতে হয়। এ কালটুকুও যদি ঘুমে যায়, আর পিঠে জল লাগিলে তবে যদি জাগিতে হয়, তাহা হইলে সাবধান হওয়ার সময় বা উদ্ধার পাওয়ার উপায় আর থাকে কি? সমক্ষে একটা সাধন স্বরূপ বোঁচ্কা—বালিস্ বা বাঁশ—তক্তা, যা কিছু একটা অবলম্বন যোগাড় করার আর যো থাকে না। তখন কেবল হাবুডুবু—কেবল প্রাণ যায়। কেবল হায় হায়! যদি বল, 'পদ-তরী'ত সম্মুখেই আছেন, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু হায়! সকলের ভাগ্যে সে অভয়-আলম্ব-লাভ সহসা ঘটে কৈ? "প ৮-আনা বাড়ে উনিশ গণ্ডা'ই যে ডুবিতেছে! সে তরী আজও পর্য্যন্ত পেয়েছে কজনে?

"শুকো মুক্তো প্রহ্লাদো বা"

এই সুবিখ্যাত শাস্ত্রোক্তি আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে, অন্ততঃ বর্ত্তমান শ্রুতি-শাসিত যুগে এ যাবত্ অতি অল্প মনুষ্যই সে 'তরী' পাইয়া তরিয়াছে। তবে অবশ্য আশা আছে। যেহেতু "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সকলেই পরিত্রাণের অধিকারী। "অনন্ত নরক" হিন্দুশাস্ত্রে অদার্শনিক—অস্বাভাবিক, সুতরাং অযুক্ত। তবে কি না, ডুবিয়া আবার ভাসিতে হইবে। ঐরূপ জন্ম-জন্মান্তররূপ ডোবা-ভাসা "কল্পকোটি শতৈরপি"ও চলিতে পারে। ফলে একবার না একবারের ভাসায় পদ-তরী ধরিবার আলম্ব মিলিবে। ভক্তি-ভজনরূপ আলম্ব চাই। ব্যাকুল প্রাণে সেই অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিলে, আলম্ব অবশ্য মিলিবে। পদ-তরীর কাছে আরও বড় তুফাণ; 'আলম্ব' অবলম্বন ভিন্ন সে তরালাভ কেহ করিতে পারে নাই। কারণ ভগবানীর তাহাই বিধান। শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে "কৃপা-সিদ্ধ" বলা হইয়াছে, তাঁহারাও পূর্ব্বজন্মের সাধন-বলে ইহজন্মে যেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবেই কৃপা-সিদ্ধ হইয়া ভবাব্ধিতে অভয়তরী পাইলেন। যেন তিনি একেবারে "হৈল-ডুব" দিয়া তরীর কাছে ভাসিয়া উঠিলেন! অতএব সাধন চাই। তবে কিনা, তাঁহার কৃপা ভিন্ন যেখানে সব অসম্ভব, সেখানে সিদ্ধ মাত্রেই একরূপ 'কৃপা সিদ্ধ'—সন্দেহ কি? আলম্ব-লাভই তাঁহার পক্ষে প্রথম কৃপা-সিদ্ধি; পরে চরম ও পরম কৃপা-সিদ্ধি সেই চরণ-লাভ। ফলে এই আলম্ব লাভের জন্য ব্যাকুলতা চাই, ব্যাকুলতার জন্য ঘুম-ভাঙ্গা চাই; ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। তবে ঘুম ভাঙ্গা অবশ্য নিজের সাক্ষাৎ আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু না শোয়া অবশ্য অন্ততঃ 'আমিত্ব' যতদিন, ততদিন কল্পিত আয়ত্তাধীন। অতএব এ ঘোর তরঙ্গ-তুফাণে জীর্ণতরীর আরোহীর না শোয়া বা অতি অবসাদক বিষয়-বিষ মাদক না খাওয়া উচিত। তাহাই "প্রবৃত্ত" সাধকের প্রথম সাধন-পুরুষকার। তারপর ক্রমশঃ উপরের কৃপার সাহায্য আসিতে থাকে। তাহারই আধ্যাত্মিক আনুকূল্যে উপাসক অগ্রসর হইতে হইতে অচিরাৎ আলম্ব লাভ করেন। আলম্ব পাইলে, তরী-লাভের আশা আসিবার আর দেরি থাকে

না। কিন্তু হায়! আমরা ঘুমেই বিভোর! আকণ্ঠ মোহ-মদিরা পান করিয়া, আমরা যেন কলির কুম্ভকর্ণত্ব পাইয়া, নিঃসাড়ে নিদ্রাভূত রহিয়াছি! সংসারের রহস্য কিছুই যেন দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না!

"আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ
সংক্ষীয়তে জীবনম্।
ব্যাপারৈর্ বহু কার্য্য-কারণশতৈঃ
কালোঽপি ন জ্ঞায়তে॥
দৃষ্ট্বা জন্ম-জরা বিয়োগ-মরণং
ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পিত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরাং
মোহাভিভূতং জগৎ॥"

অর্থাৎ—

আদিত্যের অস্তোদয়- সহ অহরহ হায়!
এ জীব-জীবন ক্ষয় পায়।
বহুবিধ ব্যাপারেও, শত কার্য্য-কারণেও,
বোধ নাই—কাল কিসে যায়॥
দেখেও জনম-জরা, জীবের বিয়োগ-মরা,
চিত তাহে নহে ত্রাসযুত।
মোহ-মাদকতা পূরা, পিয়ে সে প্রমোদ-সুরা,
এ জগৎ মোহ অভিভূত॥

এটি জগতের জ্যোতি-চিত্র, সন্দেহ নাই। আমরা যদি দিনান্তেও একবার একান্তে আপন দশা ভাবিতে পারি, তাহা হইলেও ভগবৎ-কৃপায় দুর্দ্দশার অনেক প্রতীকার-পথ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আমরা মোহ-মদিরা পানে মহামোহাভিভূত। আমরা যেন মোহ মদিরার নেশার ঘোরে আমাদের সাধের সংসার-শয্যায় বিষয়-বালিস বুকে করিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়া আছি! আমাদিগকেই চেতাইবার জন্য ভক্ত তুলসী-দাস হাঁকিতেছেন,—

"শোতে ২ ক্যা করো ভাই! উঠ্ ভজ মুরার।
আ্যাসা দিনে আওতেহেঁ—লম্বা পা-পসার!"

অর্থাৎ—

শুয়ে শুয়ে কি কর ভাই!
ওঠ—ভজ হরি।
আস্‌ছে সে দিন, শোবে যে দিন
পা লম্বা করি!

আমাদের হুঁস নাই! মোহ নিদ্রার বশে সে মহানিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া আছি। হায়! সামান্য একটু কিছু বিপদ-সম্ভাবনা বুঝিয়াও লোক কত সতর্ক—কত ব্যস্ত হয়; ভগবানের কাছে কত কাতর হয়; কিন্তু মৃত্যু সম্ভাবনা নিশ্চয়াতিনিশ্চয়রূপে জেনেও আমরা নিশ্চিন্ত! মোহ-মদিরার এমনই মাদকতা।

ভবসিন্ধু তুফানে আমরা সকলেই হাবু ডুবু খাইতেছি। ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি; কিন্তু বাহ্যসংজ্ঞা-বিহীনতায় তাহার কিছুই যেন অনুভব নাই। বলিয়াছি ত, এই ভাসা-ডোবাই জীবের জন্ম জন্মান্তর। ঐ সমুদ্রে অনন্ত কর্ম্মাবর্ত্ত চক্রের পাকে পাকে পড়িয়া এইরূপ শত কোটি কল্পও ডোবা-ভাসা চলিতে পারে। তারপর ভগবৎকৃপায় যে বারের ভাসায় সংজ্ঞার উন্মেষ হয়, সেই বারই পারে যাইতে ও সেই 'পদ-তরী' পাইতে যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মে এবং গুরু-কৃপায় আলম্ব লাভও হয়। আলম্ব পাইলে, উদ্ধারের আর বড় বিলম্ব থাকে না। ভগবদ্ভজনই সেই আলম্ব। উহা প্রাণপণে ভক্তি-ভুজ-লতা-বন্ধনে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে

পারিলে তার ডুবিবার ভয় থাকে না। ভক্ত তখন আশানন্দে ভাসিতে ভাসিতে সেই ত্রাণ তরণীর দিকে আসিতে থাকে।

সংজ্ঞা যে আমাদের একেবারেই নাই, তাহাও নহে। যখন ভগবান "দুর্লভ মানব-জন্ম" দিয়াছেন, তখন মানুষের সেই অনন্য-সাধারণ মূলধন সেই সংজ্ঞা অবশ্য কিঞ্চিৎ আছেই; কিন্তু মোহাভিভূত বলিয়াই এ হেন বিপদেও ব্যাকুলতা নাই; সুতরাং ভগবদুদ্দেশে উদ্ধার-প্রার্থনাও নাই। ব্যাকুলতাই প্রার্থনার প্রাণ। আমাদের হয় ত মৌখিক প্রার্থনা—প্রার্থনার শব মাত্র। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিক্ষা-শ্লোকে জীবের ভব-নীরধি-নিমজ্জনরূপ বিষম বিপদ বুঝাইয়া, ভগবচ্চরণাশ্রয়-লাভের জীবন্ত প্রার্থনা জীবকে শিখাইয়াছেন।

এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে শ্লোকটিতে একটু অভিনব ভাব দিয়াছেন। জলমগ্নের উদ্ধারার্থ তরী বা তজ্জাতীয় আলম্বনবিশেষেরই আবশ্যকতা। আমরাও পূর্ব্বোদ্ধৃত শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক এবং সাধারণতঃ প্রচলিত সংস্কারগত ভাবেই ভবাব্ধি-মগ্ন জীবের ত্রাণার্থ ভগবচ্চরণ-তরীর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষা-শ্লোকে ভগবদুদ্দেশে তৎপদ-পঙ্কজের রেণুত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন, আপাততঃ ইহাতে একটু আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উপলব্ধি হয়। সমুদ্রে পদ্ম ফোটে না, এবং সমুদ্রে পতিত জনের পদ্মে স্থান পাইবারও সম্ভাবনা বা স্বাভাবিকতা কিছু নাই। এই জন্যই এই শ্লোকটির আলঙ্কারিক সঙ্গতি-সাধনার্থ "অতিশয়োক্তি"র কল্পনা। অর্থাৎ কোন অনন্য-সাধারণ ব্যাপার-বর্ণনে অসম্ভব-সম্ভাবনাই অতিশয়োক্তির লক্ষণ। সাধারণ সমুদ্রে সাধারণ পদ্ম ফোটে না বটে, কিন্তু ভব-সমুদ্রে ভগবৎপাদপদ্ম ফোটে। আর সাধারণ পদ্মের মূল জলের নীচে নিবদ্ধ থাকে, ফুল উপরে ফোটে; কিন্তু এ অসাধারণ পদ্মের মূল উপরে, ফুল নীচে! অথচ উৎফুল্ল জলের উপরে বটে। অর্থাৎ ভগবান যেন ভক্তের চক্ষে সাক্ষাৎ উদ্ধার-মূর্ত্তিতে ভব-বারিধি-বক্ষে বিরাজমান! এ অপূর্ব্ব কল্পনায় 'পদপঙ্কজ'ই শোভা পায়, "পদ-তরী" মানায় না। তবে কি না, জল-মগ্নের তরিবার জন্য তরীরই প্রয়োজন। একটি কীট হয় ত পদ্ম প্রভৃতি কোন জল-পুষ্প বা সামান্য একটি পল্লবাদির আশ্রয় পাইলেই তরিতে পারে, কিন্তু মানুষ পারেনা; তাই পদ-তরীর রূপকই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ত্রিভুবন স্থান পাইতেছে, মানুষ তাঁহার পক্ষে কীটাণু-কীটেরও অধম। অতএব মানব কীটাণু তাহার রেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ। আর জলাশয়ের আয়তন ও তদাশ্রিত পদ্মের আয়তন পার্থিব প্রকৃতিতে যেরূপ স্বাভাবিক, তাহারই আনুপাতিক বিচারানুমানে অনন্ত-প্রসারিত ভব-পারাবারে প্রজ্ঞান-পরিকল্পিত ত্রিজগতের আশ্রয়ীভূত ভগবৎপাদপদ্ম কি বিরাট আয়তনে বিশ্বোজ্জ্বল-বিভায় বিকসিত! তাই নৌকার রূপকেও শঙ্করাচার্য্য "দীর্ঘনৌকা" ("বিশ্বেশপাদাম্বুজ") বলিয়াছেন। 'অম্বুজ'—অর্থাৎ পদ্মও বলিয়াছেন, নৌকাও বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও মধু-মাধুর্য্য

হেতু পদ্মও যেন ভগবানের চরণের চিরসংলগ্ন! সুতরাং নৌকার রূপকেও ভগবানের ভাগাধব কিঙ্কর শঙ্করাচার্য্য 'পাদাম্বুজ' বলিতে ছাড়েন নাই। আর ভব-ত্রাণার্থী সর্ব্ব লোকের স্থান সঙ্কুলন-সুজ্ঞাপনার্থেই "দীর্ঘ নৌকা" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সে যাহাহউক, স্বয়ং সরস্বতী-পতিরূপে পূজিত শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ দেবের শ্রীমুখোক্ত শিক্ষা-শ্লোকে অবশ্য আলঙ্কারিক অসঙ্গতি অসম্ভব; এই জন্যই আমাদের বোধ হয় যে, উহা "অতিশয়োক্তি" অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াই এইরূপ দৃশ্য-শোভা প্রকাশ করিতেছে, যেন—অনন্ত বিস্তারিত দুস্তর ভীম ভবার্ণব তুমুল তরঙ্গ-রঙ্গের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে উথলিতেছে; আর কোটি ২ নিরাশ্রয় নর-কীটাণু সেই অকূলে আকুল ও অচেতন-প্রায় হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। অদূরে—অথচ যেন দূরাতিদূরে মূর্ত্তিমান-পরিত্রাণ ভবতারণ ভগবান সেই সংক্ষুব্ধ সিন্ধু-হৃদয়ে দীনবন্ধুরূপে দণ্ডায়মান! তাঁহার রাতুল চরণ-পদ্ম অতুল শোভায় তাহাতে ফুটিয়াছে! তদ্দর্শনে—স্পর্শনে সিন্ধু-হৃদয়ে প্রেমানন্দোদয়ে তুমুল তুফাণ উঠিয়াছে! আর তাহাই ভেদ করিয়া, সে দুস্তরে নিস্তার-প্রার্থী নর-কীট-নিকর নিরন্তর সেই দিকে ছুটিয়াছে! সকলেরই আশা, প্রযত্ন ও প্রার্থনা—সেই ভক্ত-হৃৎকমল-বিলাসী হরির মরণ হরণ-চরণ-কমলে শরণ-লাভ। মহাপ্রভুর এই শ্লোকের তত্ত্ব-স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলে, এই মহাদৃশ্যই মনোনয়নে প্রকটিত হয়!

তারপর আর একটি কথা। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলে রেণু-কণা হইয়া থাকিতেই ভক্তের অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষার। ইহাতে যেমন ভক্তি-বিনতি, তেমনি আত্ম-বিস্মৃতি। কোন জলমগ্ন স্থল-কীটাদি একটি পদ্মে আশ্রয় পাইলে বাঁচিতে পারে; তাহাতে হয়ত বাসা করিয়া কথঞ্চিৎ বাস করিতেও পারে; ফলে তাহাতে পদ্মের সহিত তাহার কোন স্থায়ী বা নিত্য সম্বন্ধ হয় না; কিন্তু রেণুর সহিত পদ্মের নিত্য সম্বন্ধ; রেণু পদ্মেরই অঙ্গীভূত। তাই ভক্তের আশা, তিনি ভবাব্ধিনিমগ্ন নর কীট হইলেও, ভগবৎপাদ-পদ্ম লাভে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবৎকৃপাতেই সেই পাদপদ্মের রেণুরূপে পরিণত হইবেন।

অপর, কীটাদির কিছু না কিছু অহম্বুদ্ধি আছেই; কিন্তু সহজ সিদ্ধান্তানুমোদিত জড়ত্ববশে ধূলী বা রেণু-কণাদির তাহা নাই। আর জলমজ্জমান কীটাদি জলপুষ্প-বিশেষের আশ্রয়ে আপাততঃ প্রাণ-ত্রাণ পাইলেও, ঐ জলপুষ্পই স্বভাবতঃ তাহার চরমাশ্রয় নহে। জল হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার জল-পুষ্পাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরে সেই পুষ্পাশ্রিত হইয়া, তখন আবার হয়ত সে তাহা ছাড়িয়া মৃত্তিকাশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং এই কীটোদ্ধার-উদাহরণ ঠিক ভক্তের পক্ষে খাটে না। ভক্ত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয় লাভে তাহাতেই তাঁহার জৈবস্বার্থানুসারিণী অহম্বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই 'আত্মনিবেদন'। ইহাই নবধা ভক্তির নবম, চরম ও পরম লক্ষণ। ভক্ত তাই ভগবৎ-পদারবিন্দের রেণু কণা হইবার প্রার্থী। রেণু যেরূপ পদ্মেরই একান্ত অধীন, অঙ্গীভূত ও চিরাশ্রিত, ভক্তও ভগবানের চরণ-পদ্মে সেইরূপে পরিণত হইবার প্রার্থী।

এস্থলে আর একটি নবভাব-রসাভিষিক্ত মধুর বিচার আছে। ভবসিন্ধু-ভাসমান ভক্ত ভগবানের সেই জগত্তারণ অভয় চরণকে

নৌকা রূপে কেন চাহিবে? এস্থলে কেবল অনিত্য লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীন রূপকের যৌক্তিকতা দেখিলেই চলিবে না; ইহার আমূলভাব-রস-রহস্যের-বিচার প্রয়োজন; যেহেতু বিষয়টি কেবল 'ভাবের বিষয়'। অথচ ইহাতে লৌকিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গতিও একেবারে অরক্ষিত নহে। মনে করুন, জলমগ্নের নৌকার প্রয়োজন কেবল পারের জন্যই। প্রথমতঃ জল হইতে নৌকার, পরে নৌকা হইতে পারেরই সে প্রার্থী। জলমগ্ন কীটাদির দৃষ্টান্তে পুষ্প-পত্রাদি যেমন, জলমগ্ন মানুষের দৃষ্টান্তে নৌকাদিই তদ্বৎ। কীট ফুল পেলেও কূল চায়; মানুষ তরণ পেলেও অবতরণ চায়; অথবা তরী পেলেও তীর চায়। শাস্ত্র বলেন,—

"নাবার্থীহি ভবেত্তাবদ্যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥"

অর্থাৎ—

তাবৎ নৌকার প্রয়োজন সার,
যাবৎ পারে না যায়।
হলে নদী পার, কে তখন আর,
নৌকায় থাকিতে চায়?

কিন্তু এ তরী ত সে তরী নয়; এ যে জীবের জন্য চির-শরণ চরণ-তরী! এ তরীকে ছাড়িয়া আবার তীর কে চায়? সিন্ধু-তরিতে তরীর প্রয়োজন; আবার তরী হইতে অবতরিতে তীরের প্রয়োজন। এ তরীতে সিন্ধু হইতে উত্তরণই জীবের স্বার্থ; কিন্তু এ তরী হইতে অবতরণ আর অসম্ভাবিত ও অপ্রার্থিত; যেহেতু ভগবচ্চরণই ভবত্রাণার্থীর চরমাতিচরম পরমতম আশ্রয়। "যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যাহা পাইলে জীবের আর পুনঃসংসারাবৃত্তি হয় না, তাহাই পরাৎপর ভগবানের পরমাধারতত্ত্ব। পায়ের উপরই জীবের দেহের সমস্ত ভর; এই সত্যের ঔপমিকসাম্যে বলা যায় যে, ভগবানের চরণই ভগবত্তত্ত্ব-আধার, তাহাই জীবের স্বার্থ সারাৎসার; তাহা পাইবার জন্যই জীবের যত সাধন-ভজন; আর তাহা পাইলেই জীবের পুনঃসংসারাবৃত্তির পূর্ণ-পরিমোচন। অতএব এই "চরণ-তরী" কথাটি সাধন-ভক্তি-সাহিত্যে সুচির-প্রসিদ্ধ রহিলেও, এই রূপকালঙ্কারে তরীর সহিত ভগবচ্চরণের অনুরূপ ঔপমিক সাম্য সম্ভাবিত নহে। এতাবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকটিতে ভবাব্ধি-মগ্নের ভগবৎ-পাদপদ্মের রেণুত্ব-প্রার্থনায় একভাবে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অবিরোধিতাই রক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গাস্তবে একটি আলঙ্কারিক ভুল এই ধরিয়াছিলেন যে, দিগ্বিজয়ী গঙ্গাকে "শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপন্না" বলিলেন কি প্রকারে? জল হইতেই কমলের উৎপত্তি, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি অবশ্য অস্বাভাবিক; সুতরাং বিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে জলময়ী জাহ্নবীর উৎপত্তি বলায় আলঙ্কারিক দোষ ঘটিতেছে। ফলতঃ এইরূপ বৈয়াকরণ-চতুষ্পাঠীর বালক ছাত্রের যোগ্য বিতর্ক বিবাদে মহাপ্রভু আপনিই আবার এইরূপ সুমধুর সমাধান করিলেন যে, কৃষ্ণ পাদপদ্মের অতি অচিন্ত্য-শক্তি; স্বভাবের নিত্যপ্রসিদ্ধ স্বাধীনতা ইহারই অধীন; অতএব শ্রীবিষ্ণুর চরণরূপ কমল হইতে জলরূপা গঙ্গার উদ্ভব কখনও অস্বাভাবিকতা-জনিত আলঙ্কারিক অসঙ্গতির উদাহরণ নহে। অতএব ঐরূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের অন্তর্গতিতে ভবসমুদ্রে ভগবৎ-পাদপদ্মের বিকাশ ও ভবাব্ধি-মগ্নের তদ্ধূলী-কণত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ অসঙ্গত নহে। যাহাহউক, অতঃপর আমরা মূল শ্লোকের পদ-পদার্থালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

( ১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

| ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা. |
|---|---|---|

## জাতিভেদ।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

### চতুর্থ অধ্যায়।

১। আহার ও বিবাহ।

জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না।

যে পরাশরস্মৃতি কলির ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই লিখিত আছে :—

"ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥"

যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিব্রতধারী, তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্য কব্যে" ভোজন করিবে।

"But in the olden times we see from the Mahabharata and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other. Manu lays down generally that a twice born should not eat the food cooked by a Sudra ( IV 223 ); but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken ( IV. 253 ). The implication that lies here is that the three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of a Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriaya or Vaisya ) who observes his religious duties ( 17,1 ). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according

to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, except with the Sudras. But even here there is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent ( I-18. 9, 13, 14 )."*

আমরা বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর একত্রে আহার-নিষেধই জাতিভেদের প্রথম নিদর্শন। সেকালে আহার সম্বন্ধে এরূপ হইত না, তাহা শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহোদয়ের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইবে। মনু, আপস্তম্ব, গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার নিজাভিমত পোষণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এল্ফিনষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন—"But there is no prohibition in the code against eating with other classes, or partaking of food cooked by them ( which is now the great occasion for loss of caste ), except in the case of Sudras ; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days ( ch XI. 153 )."†

অন্যত্র ভাণ্ডারকর মহাশয় বলিয়াছেন—

"Even in the time of the epics, the Brahmans dined with the Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic sage Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas." *

মন্বাদির সময়েই জাতিভেদ এত কঠিন হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখনই দেখিলাম, এমন কি—সে সময়েও আহারাদি সম্বন্ধে অনুশাসন কঠোর ছিল না, বরং শিথিলই ছিল। সুতরাং হিন্দুসমাজে যখন জাতিভেদের বন্ধনই শিথিল ছিল, তখন আহারাদি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিয়ম ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখনও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত, ইহা সেই তাৎকালিক-সমাজের উদার-ভাবের পরিচায়ক। সেই সময় ক্ষত্রিয়-রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহারাও সেই সকল যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠ করিলেই জানিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডব-দিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। বৈদিক-সময় হইতে মন্বাদির সময় পর্য্যন্ত খাদ্যাদি কিরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার আমার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

* "Social History of India" by Ramkrishna Gopal Bhandakar. M. A., PHD, C I E.

† Elphinstone's History of India P. 20.

* Dr. R. G. Bhandarkar on "Social Reform and the programme of the Madras Hindu social Reform Association."

তবে আমি পাঠকদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। ঋগ্বেদ—১৬১।২ ; ২।৭।৫ ; ৫ ২।৭ প্রভৃতি ঋক্।

২। Muir's Sanskirt Text-vol V. pages 463-64.

৩। Dr. Rajendralal Mitters "Indo Aryan" vol I ; pages 354 421.

৪। Mr. R. C. Dutt's "History of civilisation in Ancient India" vol I, pages 41-44.

৫। Mr. P. N. Boses' "History of civilisation under British Rule" vol II ; pages 84-85.

৬। মনুসংহিতা—৫।১২ ১৮ প্রভৃতি শ্লোক।

অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের কথা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই। উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ হইত, তাহারই নাম অনুলোম বিবাহ এবং উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীলোক ও নিম্ন জাতীয় পুরুষে যে বিবাহ হইত, তাহাকেই প্রতিলোম বিবাহ বলিত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু মনু অনুলোম বিবাহের বিধি দিয়া গিয়াছেন।

প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিলোমজ-রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।*

আবার অন্যত্র দেখিতে পাই :—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচস্যাচ বিশঃস্মৃতে।
তেচ স্যাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাশ্চাগ্রজন্মনঃ॥"*

শূদ্র কেবল একমাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, বৈশ্য শূদ্র ও বৈশ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্যা এবং বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, এবং ব্রাহ্মণ চারি জাতিরই কন্যা বিবাহ করিবে।

"Men of the three first-classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place in their family. But no marriage is permitted with woman of a higher class."†

শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশসমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে বদ্ধ হইয়া উচ্চ বংশত্ব প্রাপ্ত হইত।

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥"

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥"‡

বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিক ক্রমে সাত পুরুষ

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০। ৭৮। ২৩, ২৪

* মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

† Elphistone's History of India.

‡ মনুসংহিতা ১০। ৬৪, ৬৫

পর্য্যন্ত চলে, তাহা হইলে সপ্ত জন্মে উপরোক্ত পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতি ক্রমে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হয় এবং শূদ্র ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২। সংক্ষিপ্তসার।

এতক্ষণ আমরা কি দেখাইলাম, তাহা সংক্ষেপে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা দেখাইলাম যে, হিন্দু আর্য গণ দলে দলে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অমিতবিক্রমের নিকট সেই প্রাচীন ভারতের অসভ্য সন্তানদিগের বাহুবল অধিক দিন টিকিতে পারিল না, তাই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না বা যাহাদিগের পলায়নের কোন সুযোগ ঘটিল না, তাহারা বিজেতৃগণের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিন্তু যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, যাহারা দুর্গমকাননে, দুরারোহ শৈল-শিখরে অন্ধতমোরাশিব্যাপ্ত গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কতক বা স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং কতক বা শত্রুনিপীড়ন ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে হিন্দু-আর্য্যদিগের নব উপনিবেশ সমূহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের বিক্রম তৃণসংলগ্ন অগ্নিবৎ অধিক দিন বর্ত্তমান ছিল না।

আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সময়ে, আর্য্য-হিন্দুদিগের এই সর্ব্ব-প্রথমযুগে—ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বেদোপাসক আর্য্যগণই বেদের স্রষ্টা। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রধান। সেই ঋগ্বেদে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাতিভেদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক পুরুষসূক্তেই জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, সেই শ্লোকাবলী ঋগ্বেদের অন্যান্য শ্লোকের তুলনায় তত প্রাচীন নহে—অপ্রাচীন ও আধুনিক। ঋগ্বেদের ভাষা কঠোর ও তাহার শব্দ-সঙ্কলন এবং ব্যাকরণবিধিও স্বতন্ত্র। কিন্তু পুরুষসূক্তের ভাষা অনেকটা আধুনিক-সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদে অন্যান্য যে সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অধুনা অপ্রচলিত। কেবল পুরুষসূক্ত সম্বন্ধেই সে কথা খাটে না। এইরূপ আরও অন্যান্য যুক্তিবলে আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরুষসূক্ত ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদের যুগে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল না। সুতরাং আর্য্যদিগের রচিত স্বভাবসুন্দর সরল মন্ত্রগুলি তখন সকলে মুখে মুখে শিখিয়া রাখিত। তাহার পর আমরা দেখাইয়াছি যে, সমগ্র ঋগ্বেদ প্রণয়নে প্রায় ৬০০ শত বৎসরেরও অধিক কাল ব্যয়িত হইয়াছে এবং এই প্রণয়নকার্য্য একজন বা দুইজন বা তিনজনে হয় নাই।

এই সকল এবং অন্যান্য কারণেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক থাকা অসম্ভব নহে এবং প্রকৃতও তাহাই আছে।

আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে, স্মৃতি আছে—পুরাণ আছে, তন্ত্র আছে, ইতিহাস আছে, কাব্য আছে—আমাদিগের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। এই সকল প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক উভয়-বিধ গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণিত আছে। আমরা সেই সকল গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-মনুষ্যের উৎপত্তি অনেক স্বতন্ত্র। যে সকল গ্রন্থের স্থানবিশেষে পুরুষ সূক্তের ছায়া আছে, সে সকল স্থান বিশ্বাস্য নহে—কারণ পুরুষসূক্তই প্রক্ষিপ্ত, তাহারই মৌলিকতা নাই।

জাতিভেদ বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতের আর্যসমাজে তেমন একটা কিছু ছিল না। এখনযেমন জাতিভেদ বংশগত হইয়াছে, তখন তাহাও ছিল না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, পদ্মপুরাণ, ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, স্কন্দ পুরাণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, কৌষিতকী উপনিষৎ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাশি হইতে নানাবিধ শ্লোক এবং উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া, বায়ু পুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি এবং Mr. Elphinstone কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মিঃ পি এন্ বোস (BSC, FES, MRAS &c) কৃত "ইংরাজ শাসনে হিন্দুসভ্যতা" (History of civilisation under British Rule) নামক পুস্তক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহাশয়ের "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস," শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর MA., PHD, C. I. E., মহাশয়ের "ভারতের সামাজিক ইতিহাস" (Social History of India) এবং "Social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Reform-Association," অধ্যাপক কে, রামানুজাচারী মহোদয়ের "নিম্ন-জাতির অবস্থা" (The condition of Low castes") প্রভৃতির সাহচর্য্যে আমরা দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বে জাতিভেদ গুণগত এবং কর্ম্মগত ছিল। তখন ব্রাহ্মণ সন্তান কর্ম্মদোষে বা স্বভাব দোষে অনায়াসেই নিম্নস্তরে নামিয়া যাইত এবং শূদ্র বা বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অনায়াসেই স্বভাব-গুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত।

সর্ব্বশেষে আমরা দেখাইয়াছি, তখন বিবাহ-পদ্ধতি একরূপ ছিল না। অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া পরিগণিত হইত। যদিও প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রতিলোমজ ঋষি একটী ব্রাহ্মণ-সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আহারাদি সম্বন্ধেও প্রাচীনভারতে এখনকার মত এমন সকল নিয়ম ছিল না। এমন কি, শুদ্ধ, শান্ত, ক্রিয়ানিরত, ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণের আহারও দূষনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না, বরং শাস্ত্রানুমোদিতই ছিল।

## পঞ্চম অধ্যায়।

### হিন্দুসমাজে জাতিবিভাগ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতভূমে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম প্রবৃত্ত করিলেন। অনার্য্যগণ যুদ্ধে পরাভূত হইল।

আর্য্যেরা অপ্রতিহত গতিতে দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনার পঞ্জাব খণ্ডে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক সাহসী ও বলশালী ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে ভাগিরথী-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তৎপূর্ব্ব-দেশে উপস্থিত হইয়া নূতন নূতন অধিনিবেশ সমূহ স্থাপন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আর্য্য-আচার ব্যবহার দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে অসংখ্য নদ নদী অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন উপনিবেশ সমূহ স্থাপন করিবার সময় আর্য্যদিগের যে কত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহার আর সংখ্যা নাই। অবশেষে এই সকল হিন্দু অধিনিবেশ সমূহই ভারতের সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীন উপনিবেশ হইতেই অযোধ্যায় কোশল, উত্তর বিহারে বিদেহ, এবং বারাণসীতে কাশীবংশের উদয় হইয়াছিল। সমকালীন ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের সেই বৈদিক যুগের প্রারম্ভে বর্ণ-ভেদ ছিল, জাতিভেদ ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের ভিতর যে প্রভেদ—গৌর ও কৃষ্ণের ভিতরে যে প্রভেদ—বিজেতৃ ও বিজিতে যে প্রভেদ, সর্ব্বপ্রথমে শুধু তাহাই ছিল। তখন জাতিভেদ ছিল না। তবে কি প্রকারে এই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল? আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে, যখনই কোন দেশে একটী নবাগত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাহাদিগের সহিত আদিম অধিবাসীদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেই পরাজিত আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর কতক কতক নূতন শত্রুর পদানত হইয়াছে, আর কতক বা স্বাধীনতার মায়া কাটাইতে না পারিয়া বিজন অরণ্যে বা দুরধিগম্য গিরিশৃঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।

আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত কর—সেত আর অধিক দিনের কথা নহে, তিন চারি শত বৎসরের কথা মাত্র যখন শ্বেতকায় ইউরোপীয় দল আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কি দশা ঘটিয়াছিল? ইতিহাসের পত্রে লিখিত আছে যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক শান্তিপ্রিয়, যাহারা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তাহারা বিজেতৃগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জেতাদিগের বিজিত গ্রাম ও জনপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর যাহারা স্বাধীনতাপ্রিয়, অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান্ ও সাহসী,

তাহারা দুর্গম্য "আশ্বিন" পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় লইয়াছিল।

সেই প্রাচীন স্যাক্সনদিগের আগমনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। দেখিবে, তখন বিটনের আদিম অধিবাসিবৃন্দ পরাভূত হইয়া কতক বা দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কৃতদাসের ন্যায় বিজেতৃগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল আর অবশিষ্টাংশ ওয়েলস ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল।

গ্রীসেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। আবার যখন লেসিডোমনিয়গণ সদল-বলে স্পার্টা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আদিম অধিবাসীদিগের কিয়দংশ হেলট্ বা দাসরূপে পরিণত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক মেসিনা প্রদেশের পর্ব্বত ও বন-শ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমাদিগের ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অনার্য্যদিগের মধ্যে কতক আর্য্যের দাসত্ব স্বীকার করিল, আর কতক পর্ব্বত-শৃঙ্গে, বনশ্রেণীতে আশ্রয় লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। ইহারাই আর্য্যকর্ত্তৃক দস্যু বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সময়ে "গৌরবর্ণ" আর্য্য "কৃষ্ণবর্ণ" দস্যু, এই দুই বিভাগে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে গেলে বৈদিক যুগেই জাতিভেদ প্রথার বীজ সর্ব্ব প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। সেই সমাজে যাহারা দাসত্ব স্বীকার করিল তাহারা "দাস" ও যাহারা উপদ্রবকারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা "দস্যু" নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়েই এক জাতির লোক। অবশেষে যে সকল অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্যদিগের আচার, নীতির অনুকরণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে তাহাদিগের অধিকার জন্মিল না *

যাঁহারাই রোমান নগরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রোমে বর্ষে বর্ষে যে সকল অসভ্য জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইত, রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিতেন। সেই ক্রীত দাসগণ সর্ব্ব প্রকার সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত।

"In the early Roman republic, the principle of the absolute exclusoin of foreigners pervaded the Civil Law no less than the constitution. The alien or denizen could have no share in any institution supposed to be coeval with the state......They refused, as I have said befcre, to decide the new cases by pure Roman Civil Law. They refused, no doubt because it seemed to involve some kind of degradation, to apply the law of the particular state from which the foreign litegant came. ...they set themselves to form a system answering to the primitive and literal meaning of Jus Gentum, that is, Law common to all nations."†

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

† "Ancient Law" by Sumner Maine; PP 48-49.

ভারতবর্ষেরও যে এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর যাহারা আর্য্যদিগের দাস হইল, তাহারা শীঘ্রই সকল প্রকার সামাজিক সুখ-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের কোলাহল, অস্ত্রের ঝন্ঝনা বাতাসের সহিত মিলিয়া গেল। আর্য্য ও দস্যুর শোণিতে সিক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র আবার শুষ্ক ও কঠিন হইয়া উঠিল; উচ্ছ্বসিত চঞ্চল সমাজ আবার শান্ত হইল—এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যগণ আর্য্যভূমির রাজা হইলেন। কিন্তু সেই পলায়িত দস্যুদিগের উপদ্রব কমিল না।

আর্য্যগণ নূতন নূতন গ্রাম, নূতন নূতন জনপদ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নূতন ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল—কিন্তু অনার্য্য দস্যুদিগের সাময়িক অত্যাচার ও আক্রমণের বিরাম হইল না।

অবশেষে যখন নির্ব্বিঘ্নে হোমাদি সম্পন্ন করা দুষ্কর হইতে লাগিল—নিশ্চিন্তে বিনিদ্র হইয়া রজনী যাপন করা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের ভিতর কতকগুলি সবলকায় সাহসী ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া আপনাদিগের গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্ন, সুখ ও শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। ইহারাই অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

যাহারা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, তাহারাই ক্ষত্রিয়। তাই উল্লিখিত অস্ত্রধারী পুরুষগুলি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে দেখাইয়াছি—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং"

অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ জাতি একাকী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিল।

এই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন:—

"পঞ্চনদের প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গপ্রদেশে প্রাধান্য লাভ সময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা রাজাদের আড়ম্বর ও স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগ-বিলাসাদির বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। একদিকে সাধারণ লোকের অবনতি, অপর দিকে রাজাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা, এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। তখন রাজারা কোন সম্ভ্রান্ত কৃষক বা ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক রক্ষা করা লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিএ।

## স্বরজ্ঞান। ‡

### পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন,—

স্বরজ্ঞানং শিরো যস্য লক্ষ্মীঃ করতলে ভবেৎ।
প্রতত্ত্ব শরীরে যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ।

যে ব্যক্তি স্বরশাস্ত্রকেই সকল শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া স্বরশাস্ত্রানুসারে চলেন, লক্ষ্মী তাঁহার করতলগত এবং যাঁহার স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহার সর্ব্বদা সুখ হইয়া থাকে।

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥

যিনি স্বরজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং নিত্য যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বদুঃখহীন হইয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করেন।

প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্তালোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥

সমস্ত বেদের মধ্যে প্রণব যেমন শ্রেষ্ঠ এবং জগতের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তদ্রূপ স্বরজ্ঞানী ব্যক্তি মর্ত্তালোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলেরই পূজনীয় হইয়া থাকেন।

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈবচ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যাং লক্ষকোটি রসায়নম্॥
একাক্ষর প্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ী ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব যিনি জ্ঞাত আছেন, লক্ষকোটি রসায়নবেত্তাও তৎসদৃশ হইতে পারেন না। এ হেন অনুপমের অমূল্য স্বরশাস্ত্রের একাক্ষর এবং উক্ত নাড়ী তিনটির স্বরূপ উপদেশ যিনি প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা সেই উপদেষ্টাকে দান করিলে উপদিষ্ট ঋণমুক্ত হইতে পারে।

স্বর, তত্ত্ব, গর্ভ, বর্ষ, রোগ ও চিকিৎসা, কাল, দেববশীকরণ ও স্ত্রীবশীকরণ—এই দশ প্রকরণ স্বরশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে স্বর ও তত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছি (১)। এক্ষণ গর্ভাদি অন্যান্য বিষয় ক্রমে বলিতেছি।

### বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়।

ঋতুরক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে এবং স্ত্রীর বাম নাসিকায়

‡ সন ১৩০৮ সালের মাঘ মাসের হিন্দু পত্রিকায় স্বরজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে আর লিখিতে পারি নাই। কেন না, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হইলে আমাদের ইচ্ছায় কোন কায হয় না। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন লিখিতে পারি নাই।

(১) স্বর ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার এখানে অনেক বাকি আছে ; তাহা যথাসময়ে বিশদ রূপে বিবৃত করিব। আর স্বরোদয় মতে চিকিৎসা কেবল কৌশল মাত্র। ইহার সুফল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোকের ঔষধ কি মন্ত্র এবং অর্থব্যয় না হইলে বিশ্বাস হয় না।

নিশ্বাস বহন কালে গর্ভধান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় (২)

ঋতুকালে রবিঃ পুংসাং স্ত্রীয়াশ্চৈব সুধাকরঃ
উভয়ো...... প্রাপ্তে বন্ধ্যাপুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী অথবা জলতত্ত্বের উদয় কালে ঋতু রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা নারীও গর্ভ ধারণ করিবে। যথা—

ক্ষিতি অপ্ তত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও গর্ভবতী হইবে। আর ঐ দুই তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

গর্ভাধানং মারুতে স্যাচ্চ দুঃখী,
দিশাখ্যাতো বারুণে সৌখ্যযুক্তঃ।
গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ,
ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ॥

ইহার অর্থ—জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান সুখী হয়, এবং তাহার সুখ্যাতি নানাদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে। আর পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই সন্তান সুন্দর, ভোগী ও ধনবান্ হইবে। বায়ু তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে। অগ্নি তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, গর্ভস্রাব হয় কিম্বা অল্পায়ুবিশিষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস এবং স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুসন্তান লাভ হয়। কিন্তু পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র এবং জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা জন্মিয়া থাকে।

মাহেয়ে চ সুতোৎপত্তির্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাত মাত্রস্য বা মৃতিঃ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। জলতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা হয়। এই দুই তত্ত্ব ব্যতিরেকে অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই তিন তত্ত্বের কোন তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট হয় কিম্বা সন্তান জন্মিবামাত্রেই মরিয়া যায়।

যাঁহাদের সন্তান হয় নাই, স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া ধারণা হইয়াছে, কিম্বা যাঁহাদের উপর্য্যুপরি কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা ঋতুরক্ষা কালে উপরোক্ত নিয়মে পৃথ্বী তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান করিলে সুন্দর সুপুত্র লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

(২) পূর্ব্বে প্রবীণা গিন্নিরা নববধূকে স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিবার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিতেন। এখনকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নব্যগণ প্রাচীন সকল প্রথাকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান্। কিন্তু আমরা ঐরূপ শয়নের প্রথার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য দেখিতেছি; এইরূপ আমরা ভূয়োদর্শনে বুঝিতেছি যে, হিন্দুর গৃহে আবহমান প্রচলিত কোন প্রথা অনর্থক কি অনাবশ্যকীয় নহে। বামপার্শ্বে শয়নের উদ্দেশ্য বিজ্ঞ পাঠকগণ পশ্চাদুক্ত "নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়" পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

যাহার কন্যা লাভের ইচ্ছা থাকে, তিনি জলতত্ত্বের উদয়কালে ঋতুরক্ষা করিলে সুখী ও ভাগ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন।

এরূপ নিয়মেও যদি কাহারও ভাগ্যে পুত্র বা কন্যা লাভ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা নহে, সেই পুরুষ নিজেই বন্ধ্যা। অর্থাৎ পুরুষের শুক্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক প্রকার জীবন্ত কীটাণু থাকে, তাহাকে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে স্পারমাটোজিয়া কহে। ঐ Spermatozea ( শুক্রকীটে ) যাহার অচেতন ও মস্তকবিহীন হয়, তিনি সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শতনারী বিবাহ করিলেও সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

যাঁহারা স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া থাকেন; কেহ বা বিবাহ করিয়া শেষে, সংসার অশান্তির আগার করিয়া নিজেও আমরণ জ্বালাতন হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বরমতে প্রোক্ত নিয়ম পালন করিয়া নিষ্ফল হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ শুক্রে জীবন্ত কীটাণু আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। নিজের বন্ধ্যাত্ব না বুঝিয়া, কেবল অবলা সরলা স্ত্রীর স্কন্ধে বন্ধ্যাত্ব দোষ চাপাইয়া নববরবেশে রসের বাসর-ঘরে আবার আসর জমকাইয়া বসিবার আশা করিলে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়।

স্বর মতে উপরোক্ত নিয়মে গর্ভাধান করিবার পূর্ব্বে একটি ঔষধ সেবনের বিধি আছে, যথা—

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্‌গাপো বহতে যদা।
ভর্ত্তুরগ্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ
ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
রূপলাবণ্য সম্পন্নং নরসিংহং প্রসূয়তে ॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানান্তে পতির সম্মুখে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার বলিয়া পুত্রার্থে পৃথ্বীতত্ত্বের বহন কালে এবং কন্যার্থে জলতত্ত্বের বহন কালে গোদুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী পান করিবে (৩)। পরে রাত্রিকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলে রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহাবলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে।

যদিও এই ঔষধটি স্বরশাস্ত্রে আছে; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা বলেন যে, বাধকাদি স্ত্রীজাতীয় কোন পীড়া না থাকিলে এ ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় না।

গর্ভাধান সময়ে যেমন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তেমনি স্বরের বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া অনুকূল অবস্থায় কার্য্য না করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

(৩) দুগ্ধ ও শঙ্খবল্লী কত পরিমাণে পান করিবে, তাহা স্বরশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু স্বরজ্ঞ গুরুদেবেরা পরিমাণ জ্ঞাত আছেন। পরিমাণটি আমার ঠিকস্মরণ নাই। আমি চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছি; শিক্ষার সময়ে যে খাতায় ঐ গুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন সঙ্গে আনি নাই। এজন্যে পরিমাণ লিখিতে পারিলাম না।

যদি এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, তবে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সেবন করিতে হইবে। যে কোন পীড়ায় যে কোন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ মাত্রই দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন সময় সেবন করিতে হয়। ইহাই স্বরশাস্ত্রের নিয়ম।

চপলঃ কাতরো মূর্খঃ কৃপণশ্চাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অসত্য বহুভাষী চ জাতো বাল স্বরোদয়ে॥
ব্যবসায়ী কলাভিজ্ঞঃ স্ত্রীরতঃ সুভগঃ সুখী।
দীর্ঘায়ুররিভিঃ শূরঃ কুমারোদয় সম্ভবঃ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণো রাজা ভবতি বিশ্রুতঃ।
সর্ব্বকাল জয়ী যুদ্ধে জাতো যুবোদয়ে শিশুঃ॥
স্ত্রীজিতো ধার্ম্মিকঃ কামী বিবেকী স্থির-সাহসঃ।
সত্যবাদী সদাচারঃ পুমান্ বৃদ্ধোদয়োদ্ভবঃ॥
ক্লেশী সমৎসরঃ ক্রূরো বিভ্রমো বিকলেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বকার্য্যালসো দুষ্টো জন্ম যস্য মৃতোদয়ে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, বালস্বরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান চঞ্চল প্রকৃতি, মূর্খ, কৃপণ, অজিতেন্দ্রিয়, মিথ্যাবাদী, বহুভোগী ইত্যাদি দোষবিশিষ্ট হয়।

কুমারস্বরোদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ু ও কলাভিজ্ঞ, শূর, সুখী ইত্যাদি হয়।

যুবাস্বরে জন্ম গ্রহণ করিলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন রাজা হয় অথবা রাজা সদৃশ হয় এবং সর্ব্বকাল যুদ্ধে ও মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভ করে।

বৃদ্ধস্বরোদয়ে জন্ম হইলে সদাচারী, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও বিবেকী ইত্যাদি হয়।

মৃতোদয়ে জন্মিলে দুঃখী, ক্রূর, অলস ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া গর্ভাধান এবং অন্যান্য সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

## পুত্র সুকবি, পণ্ডিত ও বাগ্মী হইবার উপায়।

জাত মাত্র বালকং পিতা স্বর্ণং দত্বা পশ্যেৎ।
ততো গৃহান্তরে গর্ভাধান পদ্ধত্যুক্তং পঞ্চদেবতা পূজাদি ধারা হোমান্তং কর্ম্মকৃত্ব পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ। "হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি ইত্যেভির্মন্ত্রৈরিতি।
ততঃ কাংস্যপাত্রে সমাংশেন মধুসর্পিষী সমানীয় তদুপরি ঐমিতি সপ্তধা জপ্ত্বা।
"হ্রীং আয়ুর্ব্বর্চ্চাদি" ইতি মন্ত্রেণদক্ষিণ হস্তানামিকায়াং শিশুং প্রাশয়েৎ।
ইত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা পিতা গুপ্তং নাম কুর্য্যাৎ ততো জন্মদিনাবধি ত্রিদিনাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যং যথা—

বালকস্য তু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে ন্যসেৎ।
মধুনা শ্বেত দূর্ব্বাভিঃ সুবর্ণস্য শলাকয়া।
ইদং বাগ্ ভব কূটস্থ* লিখেদ্বৈ জননান্তরে।
স এব পণ্ডিতো ভূয়াদ্ভু মূর্খো ভবেদ্ ধ্রুবং।
বাগ্ ভবকূটমপি তত্রৈব যথা।—
কামদেবস্ততো যোনিস্তূর্য্যা স্বর পুরন্দরী।
ভুবনেশী ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চবক্ত্র বিভূষিতঃ।*
অয়ংস বাগ্ ভবো দেবী বাগীশত্ব প্রদায়কঃ।
অনেন বাগ্ ভব কূটেন বালকঃ পণ্ডিতঃ সুকবিঃ শব্দালঙ্কারবিচ্চ ভবতি।
যদীমং মন্ত্রং কৃতপুরশ্চরণো বালিশস্যাপি (৪) মূর্দ্ধ্নি হস্তং দত্বাষ্টোত্তর শতং জপেত্তদা সোঽপি শ্লোকং করিষ্যতি। যদিচেমং মূকস্য জিহ্বায়াং ন্যসেত্তদা সোঽপি কবির্ভবতি।

---

* "এই মন্ত্রটি ক্লীং হ্রীং ঈং শ্রীং হ্রীং হসৌঃ।" ইহার নাম বাগ্ ভবকূট।

(৪) বালিশস্য—মূর্খস্য।

বাগ্ ভব কূট—মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।

জিহ্বাং সম্মার্জ্জ্যদেবেশি লিখিদ্ধেম-শলাকয়া
দূর্ব্বায়া বা মহাদেবি জিহ্বোষ্ঠয়োঃ
সমালিখেৎ।

পংক্তিদ্বয়েন সংলিখ্য কুর্য্যাচ্চ বালসংক্রিয়াং
একাদশাহে দেবেশি দ্বাদশাহেহথবা পুনঃ।
বর্ণ জাত্যাদি ভেদেন যাসান্তঃ সম্ভবিষ্যতি।
যথা শক্ত্যুপচারেণ দেবতাং পূজয়েৎ পুনঃ।
সংপূজ্য দেবতাং ভক্ত্যা লিখেৎ মন্ত্রং মহেশ্বরী
যদি পিতা ন দেশস্থো পিতৃব্যো মাতুলোহপি
বা।

লিখিত্বা পরমেশানি কুর্য্যাচ্চ বালসংক্রিয়াং
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্তোষ্ঠে শ্বেতদূর্ব্বায়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুত কবি-
র্ভবেৎ।

জিহ্বায়াঞ্চ লিখেদ্ যন্ত্রং যত্নে দারুকুশেন বা
বারত্রয়স্তু সম্মার্জ্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিং কুর্য্যাৎ
সুশোভনং।

আদৌ স স্কার কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুং।
কবির্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সর্ব্বকাম প্রকারকঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ধার্ম্মিকো জায়তে
মহান্।

ইহার প্রয়োগ এইরূপ—

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, পিতা স্বর্ণ দ্বারা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক পঞ্চ দেবতাদি পূজা করিয়া ধারা হোম করিবেন (৫)। পরে পঞ্চাহুতি দিতে হইবে (৬) তৎপর কাংস্যপাত্রে ঘৃত ও মধু সমানাংশে লইয়া তদুপরি ঐং মন্ত্র শতবার জপ করিয়া আয়ুর্বর্চ্চাদি মন্ত্রে (৭) দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঐ ঘৃত মধু লইয়া শিশুর মুখে দিবেন। ইহাকে আয়ুর্জনন কহে। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটি নাম রাখিবেন।

ইহার পর তৃতীয় দিনে শ্বেত দূর্ব্বা অথবা স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে বাগ্ভবকূট অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রাঁ ঈঁ শ্রীং হ্রীং হসৌঃ— এই বীজ লিখিয়া দিবেন।

তৎপর জাতি অনুসারে শুভশৌচান্ত দিনে পিতা অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য কিম্বা মাতুল অবস্থানুসারে উপচার দ্বারা দেবতা পূজা করিয়া নিজ কুলদেবতার মন্ত্র ওষ্ঠে লিখিবে এবং জিহ্বাতে পূর্ব্বোক্ত বাগ্ভব কূট লিখিবে। অগ্রে

---

(৫) হিন্দুর গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কার্য্যে দেওয়ালে ঘৃত দ্বারা ধারা দেওয়া রীতি আছে। তাহাকে বসুধারা বলে। এখানে ধারা হোমের নিয়ম বলিয়াছেন। ধারা হোম যথা—দেহলাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ সপ্তধা পঞ্চধা বিন্দন্ দদ্যাৎ সিন্দুর চন্দনৈঃ। প্রত্যেকবিন্দৌ মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্। ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্বা।
কাম, মায়া, রমা অর্থে—ক্লীং হ্রাং শ্রীং হইবে,

(৬) পঞ্চ আহুতি যথা—হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা হ্রীং ইন্দ্রায় স্বাহা, হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা, হ্রীং ব্রাহ্মণে স্বাহা।

(৭) হ্রীং আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো।

স্বর্ণ দ্বারা জিহ্বা তিনবার মার্জ্জনা করিবে, পরে স্বর্ণশলাকা কিম্বা শ্বেত দূর্ব্বা দ্বারা ওষ্ঠে মন্ত্র লিখিবে এবং কাষ্ঠ অথবা কুশ দ্বারা জিহ্বাতে লিখিতে হইবে; কিন্তু প্রথমোক্ত প্রকারে ধারাহোমাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বালকের সংস্কার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শিশু সুপণ্ডিত সুকবি, বাগ্মী, শব্দালঙ্কারবিৎ হইবে।

এইরূপ করিবার দিন পূজোপকরণ ও অন্ন বস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিবার বিধি আছে। আর ঐ সকল কার্য্য নিজে করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের দ্বারা সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ,— "মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ, তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাঃ।" এ কথা যেন মনে থাকে।

ইহা ব্যতীত গর্ভাধান করিবার আরো নিয়ম স্বরশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অতঃপর তাহা বলিব; কিন্তু আমি প্রথমে যে স্বরশাস্ত্র গ্রন্থ দৃষ্টে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহা পাই নাই। জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থিতি সময় পঞ্জাব দেশীয় এক পরমহংস বাবার নিকট স্বরশাস্ত্রে নিম্নের লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম * পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিতেছি।

চতুর্থ প্রহরে রাত্রে যো গচ্ছেৎ রমণীঃ নরঃ
হরিভক্তিরতং সুতং লভতে স মহামতিঃ।
তনয়া জায়তে তস্য ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।
রাত্রিগত ফলং দেবি ইতিতে কথিতং ময়া।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করিলে হরিভক্তি পরায়ণ মহামতি পুত্রলাভ করিয়া থাকে অথবা কন্যা সমুৎপন্ন হইলে, সেই কন্যা পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা হয়।

অতএব সুপুত্র লাভের আশা করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন দিনে গর্ভাধান করিতে নিষেধ আছে।

শ্রীহরি বাসরে তথা অমাবস্যা দিনে চৈব
অথবা পূর্ণিমা তিথৌ চতুর্দ্দশী দিনে চৈব
তথা বৈ অষ্টমী তিথৌ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং
পরিত্যজেৎ মহাদেবি যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং

যদি আপনার হিত কামনা থাকে, তবে হরিবাসর, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী অষ্টমী ও রবিবার এবং সংক্রমণ সংক্রান্তি দিনে গর্ভাধান করিবে না। (৮)

---

* এই পরমহংস বাবার হস্তে একটি অলাবু পাত্র সর্ব্বদা থাকিত। তিনি যতবার ঐ পাত্রের মধ্যে হাত দিতেন, ততবার পাঁচটি টাকা বাহির করিতেন এবং তাহা দ্বারা মিষ্টান্ন কিনিয়া বালকদিগকে দিতেন ও অন্যান্য প্রকারে দান করিতেন। বাঙ্গলা সন ১২৮২ সালের পূর্ব্বে অনেক দিন লাহোর সহরে ছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে "তুম্বুরো বাবাজি" বলিয়া ডাকিত।

(৮) স্বরমতে গর্ভাধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কবি, বাগ্মী ও পণ্ডিত হইবার যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি। ইহার প্রকরণ যিনি বুঝিতে না পারিবেন, তিনি আমাকে লিখিলে নিয়ম প্রকরণ সমস্ত বুঝাইয়া দিতে সম্মত আছি।

স্বরের যে পঞ্চাবস্থা বলিয়াছি, তাহা বিচার করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থা এবং কোন অবস্থায় কোন্‌২ কার্য্য করা উচিৎ, তাহা বলিতেছি।

স্বরাণাং বালদ্যাবস্থা ফলঞ্চ।
উদিতস্য স্বরস্য স্থানাম স্বর বশেনতঃ।
পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ স্ব স্ব কাল প্রমাণতঃ।
আদৌ বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থা স্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ।
কিঞ্চিল্লাভ করো বালঃ কুমারশ্চ র্দ্ধ লাভদঃ
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে বৃদ্ধেহানি মৃতে ক্ষয়ঃ।
যাত্রা যুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে দুষ্টে রুজান্বিতে।
বালস্বরো ভবেদ্দুষ্টো বিবাহাদি শুভেষ্বশুভঃ।
সর্ব্বেষু শুভ কার্য্যেষু যাত্রাকালে তথৈব চ।
কুমারঃ কুরুতেসিদ্ধিং সংগ্রামে সঙ্কতো জয়ী
শুভাশুভেষু সর্ব্বেষু মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধনে।
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে যাত্রাযুদ্ধে বিশেষতঃ।
দানে দেবার্চ্চনে দীক্ষা গূঢ়মন্ত্র প্রজল্পনে।
বৃদ্ধ স্বরো ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো রণ ভঙ্গোভয়ঙ্গমে।
বিবাহাদি শুভং সর্ব্বং সংগ্রামাদ্যা শুভং তথা
নকর্ত্তব্যং নৃভিঃ কিঞ্চিদ্যাতে মৃত্যু স্বরোদয়ে
মৃতো বৃদ্ধস্তথা বালঃ কুমার স্তরুণঃ স্বরঃ।
যথোত্তর বলাঃ সর্ব্বে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ

ভাবার্থ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক নাসিকায় এক ঘণ্টা হিসাবে শ্বাস বহন হয়। ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে স্বরের পাঁচটি ভাব বা অবস্থা হয়। যথা—বাল, কুমার যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। এই পাচ প্রকার অবস্থা ও নামানুসারে কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমরা কোন কার্য্যোদ্দেশে গমন করিয়া কিম্বা ব্যবসায়াদি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফলমনোরথ হই এবং অদৃষ্ট পূর্ব্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দেই, কিম্বা সমস্ত দোষ বিধাতার ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা ও তত্ব বিচার না করিয়া কার্য্য করি, এ জন্য আমাদের আশানাশ মনস্তাপ হয়; ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং ইহাতে সংশয় করা উচিৎ নহে। বালস্বরে কার্য্য করিলে কিঞ্চিল্লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবাস্বরে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধ ও মৃত্যু স্বরে কার্য্য করিলে হানি ও ক্ষয় হয়।

যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহাদি কার্য্য বাল স্বরে করিলে অশুভ হয়।

যাত্রা, সংগ্রামে এবং সর্ব্ব প্রকার শুভকার্য্য কুমার স্বরে হইলে শুভ হয়।

মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধন, কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রা, যুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কার্য্য যুবাস্বরে করিলে সিদ্ধি হয়। যুবা স্বরে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

দান, দেবার্চ্চনা, দীক্ষা, গূঢ় মন্ত্র সাধন বৃদ্ধস্বরে ভাল। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বৃদ্ধ স্বর ভাল নয়।

মৃত্যু স্বর উদয়ে কোন কার্য্য করিতে নাই। ইহাতে যে কার্য্য করিবে, তাহা নষ্ট হইবে।

---

যে জন্য কোনস্থানে যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত নহি। ফল কথা একবার পরীক্ষা দ্বারা স্বরশাস্ত্রের সত্যতা প্রত্যক্ষ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (৯)

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। আর নাড়ী সংক্রমণ ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন কার্য্য করিতে নাই। সংক্রমে যে কার্য্য করিবে, তাহাই নষ্ট হইবে।

## নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণে কর্ত্তব্য।

এক নাসিকা হইতে নিশ্বাস অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবার সময় নাড়ী সংক্রমণ বলিয়া কথিত হয়। যথা—বাম নাসিকায় একঘণ্টা বহন শেষ হইয়া দক্ষিণ নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবে, ইহাকে নাড়ী সংক্রমণ বলে। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্ত এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস যায়, সেই মুহূর্ত্তেই নাড়ী সংক্রমণ তত্ত্ব সংক্রমণ ও এইরূপ। একতত্ত্ব শেষ হইয়া আর এক তত্ত্ব আরম্ভ হইবার সময় তত্ত্ব সংক্রমণ বলিয়া থাকে। নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

নাড়ী সংক্রমণ কালে তত্ত্ব সংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা।

নাড়ী সংক্রমণ কালে ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে শুভ কার্য্য মাত্রেই করিবে না এমন কি, সংক্রমণ কালে দানাদি পুণ্য-কর্ম্ম করিতে নাই।

সংক্রমণ সময়ে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়। যথা—

যুগ্মে যুগ্মং ক্ষয়ো নষ্টে মাতুর্মৃত্যুশ্চ সংক্রমে।

আমাদের দেশে মা খেগো ছেলে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া কিছুদিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে তাহাকে মাতৃরিষ্টি বা মাখেগো ছেলে বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা নিজের অজ্ঞতা ও দোষ না বুঝিয়া বালককে মাখেগো বলিয়া সমস্ত দোষ তাহার স্কন্ধে চাপাই। (১০)

সংক্রমণ কালে কোনস্থানে যাত্রা করিলে যাত্রা হানিকরী হইয়া থাকে—

যাত্রা হানিকরী তস্য মৃত্যুকালে ন সংশয়ঃ।

এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় নিশ্বাস বহন আরম্ভ হইবার সময় সংক্রম বলিয়া মন্দফল প্রদান করে কেন, তদ্বিবরণ বলিতেছি।

পিঙ্গলায়াং স্থিতা রুদ্র ইড়ায়াং সঙ্গতাঃ পরে
সুষুম্না মধ্যগা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকাঃ

অত্র প্রকারো—বাম নাসাতো দক্ষিণ নাসা প্রবেশ প্রারম্ভ সময়ে দেহ বায়ুঃ

(৯) এই পঞ্চ অবস্থা চিনিবার উপায় পরে বলিব।

(১০) সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের সুখ সুবিধার জন্য ভগবান নানা উপায় করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিনা, জানিনা এবং জানিতে চেষ্টাও করি না। বাস্তবিক মানুষ ইচ্ছা করিলে—শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে সুন্দর, সুখী, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুসন্তান লাভের উপায় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে।

কিঞ্চিৎকালমুত্তরত্র বহতি স-দক্ষিণায়ণ-প্রারম্ভসময়ান্তর্বর্তিনাং, ম্ল, ৯ কারাত্মকং মুস্বস্ত্রমুদেতি এবং দক্ষিণনাসাতো বাম-নাসাগমনকালেঽপি স-উত্তরায়ণপ্রারম্ভ-কালান্তর্বর্তিনীং ম্লঃ রূপ দর্শয়ন্ন মুদেতি।

পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে,—

স্বরং সপ্তমমারভ্য চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ।
তে সুষুম্নাশ্রিতে প্রাণে প্রোদাস্তায়ন-
সংক্রমে। ইতি।

সংক্রমণ কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, কিন্তু আকাশ তত্ত্বে কেবল যোগ-সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি হয়। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার কার্য্য আকাশতত্ত্বে নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বলিয়াছেন "নভো বহতি সংক্রমে।" অর্থাৎ সংক্রমণ কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়, এজন্য কোন কার্য্য করিলে আকাশতত্ত্বের ন্যায় বিফল হয়। (১১)

(ক্রমশঃ।)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়

---

(১১) স্বরজ্ঞান পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয় জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বরের বাহ্যাদি অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে অতঃপর পূর্ব্ব ঠিকানায় পত্র না পাঠাইয়া "জেলা নোয়াখালি সদর কোর্টের হেড কনেষ্টবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের কেয়ারে" আমাকে লিখিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর পাইতে অবশ্য বিলম্ব হইবে না।

# তত্ত্ব-সমাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মহর্ষি কপিলদেবের তত্ত্ব-সমাসের চারিটী সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্প্রতি পঞ্চম-সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। চতুর্থ-সূত্রে চেতন বিশ্বাবভাসক 'পুরুষ' নামক অবিকৃততত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এই পঞ্চম সূত্রে মূলপ্রকৃতির স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কপিলদেব বলিতেছেন,

ত্রৈগুণ্যং। ৫

মূলপ্রকৃতির স্বরূপ ত্রৈগুণ্য। ত্রিগুণ-ভাব এই সৃষ্ট সংসারের সূক্ষ্ম-সীমা। এই বিরাট বিশ্বের তাবৎবস্তুবাক্তিতে ত্রিগুণ-ভাবের উপলব্ধি করা যাইতেছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, জগতে সর্ব্বানুস্যূত ত্রিগুণভাব, জগৎকারণ মূল-প্রকৃতির ত্রিগুণভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনুমান-জগতে তথ্যাবিষ্কারের প্রণালী দ্বিবিধ। অনুমানক্রমের অনুলোমপ্রবাহ এবং বিলোমপ্রবাহ। অনুমানের প্রণালী যখন ক্রমস্ফুট অবস্থায় গমন করে, তখন তাহা হইতে অনুলোমক্রম আবিষ্কৃত হয়, আর যখন ক্রমশঃ সূক্ষ্মাবস্থায় বা বিপরীত-নিয়মে, বিকাশেরপ্রতিকূলপথে গমন করে, তখন উহাদ্বারা বিলোমপ্রবাহ অবগত হওয়া যায়। কার্য্য দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কারণস্তরে উপনীত হইতে এই প্রণালী সহায়তা করে। কারণদর্শনে কার্য্যের সম্ভাবনাকল্পনায় অন্যবিধ উপায় উপকারী।

উভয়ের প্রকারগতপার্থক্যের ন্যায় ফলগত-পার্থক্যও যথেষ্ট।

ব্যক্তকার্য্যজগৎ ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং ইহা হইতে অব্যক্ত-জগতের পরমকারণ প্রকৃতিতেও ত্রিগুণভাব কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিগুণময় জগতের সূক্ষ্মতমতর-কল্পনা যেখানেই না কেন বিশ্রাম লাভ করুক্, তাহাকে ত্রিগুণময় না বলিলে চলিবেনা৷ কপিলদেব বলিতেছেন, বাহ্য এবং আন্তর উভয়জগতের মূলকারণ এক ত্রিগুণময় বিকারশীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব।

ত্রিগুণ কি, তাহা এখন বিবেচনা করা যাউক। ত্রিগুণ শব্দের অর্থ তিনটী গুণ। ইহাদের স্বরূপ স্থির করিবার জন্য শব্দার্থের আলোচনা আগে করা যাউক। শব্দের অর্থ সাধারণতঃ যেরূপভাবে গৃহীত হয়, দার্শনিকগণ তদপেক্ষা ভিন্ন অর্থে সেই সকল শব্দ ব্যবহার করেন, এইজন্য ইঁহাদের "পারিভাষিকঅর্থ" নামক একটী নূতন আভিধানিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

'গুণ' বলিলে ন্যায়বৈশেষিকদর্শন-রচয়িতা গোতমকণাদমহর্ষিদ্বয়, দ্রব্যাশ্রিত-ভাব বিশেষ বুঝিতেন। ইঁহাদের মতে গুণ শব্দ যে ভাবের পরিজ্ঞাপক, ইংরেজী Quality শব্দ সেইরূপ ভাব বুঝায়। কণাদ বা গোতম লঘুত্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস ইত্যাদি দ্রব্যাশ্রিত ভাবসকলকে 'গুণ' শব্দে বুঝিলেও, কপিল তাহা বুঝেন নাই। কপিলের গুণ স্বয়ং দ্রব্য, দ্রব্যাশ্রিত ভাববিশেষ নহে। কণাদ ও গোতমের 'গুণ' এই কপিলের 'গুণে' বিদ্যমান, কিন্তু কণাদ ও গোতমের 'গুণে' আর 'গুণ' থাকেনা।

মীমাংসকগণ 'গুণ' বলিলে দ্রব্যাগতভাব বা ধর্ম্মবিশেষকে বুঝেন নাই, তাঁহাদের মতে 'গুণ' অর্থ অঙ্গ। কোনও প্রধান কার্য্যের দশটী অঙ্গ আছে, ঐ অঙ্গগুলিও কার্য্য, প্রধানকার্য্য ও কার্য্য, ইহাদের পার্থক্য এই যে, উহাদের প্রাধান্য নাই, আর প্রধান বা মূল কার্য্যের প্রাধান্য আছে। 'গুণ' শব্দের অর্থ সুতরাং অপ্রধান। অপ্রধান-কার্য্য প্রধানকার্য্যের অনুরোধেই করিতে হয়, অতএব অপ্রধানকার্য্যের কোনও স্বার্থ নাই, কেবল পরার্থতা (প্রধান কার্য্যার্থতা ই) উহাদের জীবন। প্রধানের জন্য অঙ্গ, প্রধান নহিলে অঙ্গ অনাবশ্যক। মীমাংসা শাস্ত্রে 'গুণ' নামের মূলতত্ত্ব পরার্থতা। কপিলদেব প্রকৃতির পরিচয়ে ত্রিগুণ-ভাবের কথা বলিতেছেন। ত্রিগুণ আর প্রকৃতি কিছুই পৃথক্ নহে। তিনটী গুণ অর্থাৎ পরার্থপদার্থসমবায়ই কপিলদেবের প্রকৃতি। জগতের সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া, তিনি তিনটী সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সেই তিনধর্ম্মযুক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমহাপুরুষভাবকেই জগৎকারণ বলিয়াছিলেন; এই পর্য্যন্ত অনুমান শাস্ত্রের সহায়তায় অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতির পরার্থতাই প্রধান পরিচয়। প্রকৃতি বা গুণত্রয় ভোগ্যবস্তু, আর পুরুষ বা চৈতন্য-তত্ত্ব ভোক্তা। সাংখ্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির পরার্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচনে পুরুষতত্ত্বের অনুমান করিতে গিয়া, কপিলদেব "সংহত পরার্থত্বাৎ" এই সূত্রে প্রকৃতি পর্য্যন্ত জড় তত্ত্বের পরার্থতা প্রতিপাদন, এবং তাহাই পুরুষানুমানে

কারণ, ইহা বলিয়াছেন। "ভোক্তৃভাবাচ্চ" এই সূত্রে পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও বলিয়াছেন। প্রকৃতি অর্থ গুণত্রয়। প্রকৃতি পদার্থ অর্থাৎ গুণত্রয় পদার্থ; এখন বুঝা গেল পদার্থতাই মীমাংসকগণের ন্যায় কপিলাচার্য্যের মতেও 'গুণ'শব্দপ্রয়োগের হেতু।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে আচার্য্যপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, সাংখ্যাচার্য্যগণ যে 'গুণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতের 'গুণ' পদার্থের বাচক নহে। 'গুণ' শব্দের অর্থ তাঁত। ত্রিগুণরজ্জু বলিলে বুঝা যায়, যাহাতে তিনটী গুণ বা তাঁত আছে তাদৃশ রজ্জু। এখানে 'গুণ' শব্দ অপ্রধান বাচক হইলেও সাধারণতঃ বন্ধক অর্থেই ব্যবহৃত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, ত্রিগুণই পুরুষ বা জীবের বন্ধের কারণ। ত্রিগুণের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়াই, আপনাকে (ত্রিগুণাতীত পুরুষস্বরূপকে) গুণাত্মক মনে করেন, এবং মোহবশতঃ বদ্ধ হন; প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ মোক্ষ কথার কথা। পুরুষ যে ভ্রমবশতঃ বাঁধা পড়েন, সেই বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণময়রজ্জু প্রকৃতি। এরূপভাবে ও 'গুণ' শব্দের রূপকগত অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, বস্তুতঃ দার্শনিক ক্ষেত্রে রূপকের প্রাবল্য কল্পনার ভারণা প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের পন্থা কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে।

এতক্ষণ ত্রিগুণ কথাটির অর্থ এবং তদানুষঙ্গিক দার্শনিক অভিসন্ধি আলোচিত হইল। সম্প্রতি দেখা যাউক, ত্রিগুণের কার্য্যপরিচয়াদি কি প্রকার। শাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি "সত্ত্বরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ"। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই ত্রিগুণ যখন সমভাবে সমবেতশক্তিতে অবস্থান করে, তখন এই ত্রিগুণেরই নাম প্রকৃতি, যখন পৃথক্ অবস্থায় ন্যূনাধিক ভাবে থাকে, তখন তাহারাই প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তাহারাই সৃষ্টামুখী প্রকৃতি। সাংখ্যপ্রবচনে আছে, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎকারণীভূত জড়পদার্থ; এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়।

সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, লঘুতা ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম্ম প্রণোদনা ও চলত্ব প্রভৃতি; তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব ও আবরকতা বা অপ্রকাশক ভাব। ঈশ্বর-কৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় এই কথা বলিয়াছেন, যথা—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ, গুরুবরণকমেব তমঃ।" সাংখ্যশাস্ত্রের ভূয়ঃ প্রচারকর্ত্তা আচার্য্য পঞ্চশিখ বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, লাঘব, অভিষঙ্গ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলিলে সত্ত্বগুণ সুখাত্মক। রজোগুণ—রাগ, চপলতা, ক্রোধ, দুঃখ, উদ্দীপনা প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট, কিন্তু সংক্ষেপে রাগাত্মক। তমোগুণ—নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ, মোহ, ভীতি প্রভৃতি অশেষ গুণশালী হইলেও সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক।

গীতা, মনুসংহিতা, মহাভারত ভাগবতাদি অশেষ গ্রন্থে গুণত্রয়ের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তথায় অনুসন্ধান করিবেন, এখানে সাধারণতঃ

ইহাই বক্তব্য, সুখ-দুঃখ মোহই ত্রিগুণের অসাধারণ ধর্ম্ম।

জগতের সমস্তকার্য্যকারণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সুখ দুঃখ মোহ এই তিনে জগৎ আবৃত। জগতে যাহা কিছু, প্রত্যেক পদার্থই হয়ত সুখ, নয় দুঃখ, নয় মোহ উপস্থিত করিবে; ইহা ছাড়া এ জাগতিকপদার্থের অন্যবিধ সামর্থ্য নাই। কোনও একটী রম্যবস্তু দর্শনে একজন সদাশয়ব্যক্তি দর্শনসুখ লাভ করেন, অন্যআকাঙ্ক্ষা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। অপর কামী ব্যক্তি ঐ বস্তু দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মপীড়া পায়, যেহেতু সে উহা লাভ করিতে চায় এবং অকৃতকার্য্য হয়। আর এক ব্যক্তি মুগ্ধ, উহাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারপরাঙ্মুখদশায় উপনীত হইবে; ইহাই সংসারে ত্রিগুণের রঙ্গ। জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি বা মানস ব্যাপারের দ্বারা উপলব্ধ; এই জড়জগৎ আমাদিগকে সুখ, দুঃখ ও মোহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব প্রদান করে না; আর আমাদিগের মানসশক্তিও এই ত্রিবিধভাবেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত। অনুকূলতাজ্ঞান, প্রতিকূলতাবোধ এবং সম্মুগ্ধভাব, এই তিন ভাবই সত্ত, রজঃ, ও তমোগুণের কার্য্য, ইহা সুখদুঃখমোহাত্মক গুণত্রয়ের কথা বলায়, স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, জড়জগতের জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের উপকরণ মানসদ্রব্য ত্রিগুণাত্মক। আমরা ক্রমশঃ জড়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় আলোচনা করিয়া, যতই দূরে অগ্রসর হই না কেন, জড়জগতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারিবনা, ত্রিগুণাত্মকভাবও ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং আমাদের কল্পনা বা অনুমান সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্তরে—সে অনুমিতির রাজ্যে ও জড়ধর্ম্ম ত্রিগুণাত্মকভাব—সুখদুঃখমোহময়তা দেখিতে পাইবে। কার্য্য স্থূল ব্যক্ত, কারণ সূক্ষ্ম অব্যক্ত, কিন্তু উভয়ই জড়, উভয়েই ত্রিগুণভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

জড়জগতের মূল কারণ জড় অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক, এই পর্য্যন্ত এ সূত্রে অবগত হওয়া গেল। অতঃপর সাংখ্য-দর্শনের সৎকার্য্যবাদ বা কার্য্যকারণের অভিন্নভাবপরিজ্ঞাপক ষষ্ঠ সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ইহাতে জগৎসৃষ্টিই সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য, কিন্তু ভঙ্গ্যন্তরে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত।

সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ। ৬

কার্য্য জগৎ, কারণ অব্যক্ত ত্রিগুণময় মহতী জড়সত্তা। এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, সঙ্কোচ বিকাশ এই দুইটী কার্য্যের আবশ্যক হয়।

মহামুনি কপিল বলিতেছেন, সৃষ্টি রহস্য আর কিছুই নয়—কার্য্যকারণের ভিন্নতাঅনুভব আর কিছুই নয়, কেবল 'সঞ্চর' এবং 'প্রতিসঞ্চর'। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি এবং শুণ্ডটী যখন শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখন বোধ হয়, ঐ অঙ্গগুলি পূর্ব্বেও কূর্ম্মের শরীরে ছিল, কিন্তু এখন তাহার সঞ্চর অর্থাৎ বিকাশ উপস্থিত হইল। যখন কূর্ম্ম হস্ত পদ প্রভৃতি শরীরাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখে, উহা

আমাদের অনুভবের বিষয় হয় না, তখন উহার প্রতিসঞ্চর বা লুক্কায়িতভাব আমরা অনুভব করি।

সৃষ্টি অর্থ বিকাশ, বিনাশ অর্থ সঙ্কোচ। সৃষ্টিতে ব্যক্তভাব, বিনাশে অদর্শন। যখন ব্যক্ত কার্যভাবে আমরা উপলব্ধি না করি, অর্থাৎ কারণভাব বা অব্যক্তভাববশতঃ অনুভব করিতে পারিনা, তখন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি উহা 'নাই'। আর যখন কার্য্যরূপে ব্যক্তভাবে অনুভব করি, তখন মনে করি উহা 'জন্মিল', কিন্তু বস্তুতঃ পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নহে। যখন পদার্থ অদর্শন অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আমরা বিনষ্ট বলিয়া মনে করিলেও, উহার তিরোভাব ব্যতীত আর কিছুই হয় না। পদার্থমাত্রের স্বভাব, কখনও ব্যক্তদশায় উপনীত হইবে, আবার কখনও অব্যক্ত অবস্থায় পৌঁছিবে। কার্য্য এবং কারণ একই পদার্থ, তবে প্রকটিতঅবস্থায় তাহাকে কার্য্যবলে, এবং তিরোভূত অবস্থায় তাহাকে কারণ বলে। 'উৎপত্তি হইল' বলিলে একটা নূতন কোথাও হইতে আসিল, এবং পূর্ব্বে ছিলনা, সংপ্রতি জগতে আসিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত।

সাংখ্যাচার্য্য বলেন—ঘট নির্ম্মিত হইল, ইহার অর্থ ঘটের আবির্ভাব হইল। এই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ঘট ছিল, কিন্তু সংপ্রতি যে আকারে সে সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই আকারে সেইভাবে ব্যবহৃত হইত না। প্রত্যেকপদার্থেরই তিনটী ভাব আছে, একটী কারণভাব, আর একটী কার্য্যভাব, আর একটী সংহারভাব। ঘট যখন মৃত্তিকা ছিল, তখনও ঘট ছিল, কিন্তু তাহাদ্বারা জলআনয়ন প্রভৃতি ঘটের বর্ত্তমানকার্য্য হইত না, যেহেতু তখন তাহার কার্য্যাবস্থা নহে, কারণাবস্থা। যখন ঘট ঘটেরকার্য্য জলানয়নাদি করিতে পারে, অর্থাৎ যে অবস্থা বা আকার দেখিলে, আমরা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকি, উহা ঘটের কার্য্যাবস্থা; এই অবস্থাতে ব্যবহারনিষ্পাদন করা যায় বলিয়া, ব্যবহারিকজগতে এই অবস্থাকেই 'ঘট' সংজ্ঞা দেয়। যখন ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়া কেবল চাঁড়া খোলা রূপে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন ঘটের সংহারভাব; তখন ও ঘট আছে, কিন্তু কার্য্যকারিতা নাই। এই ঘটের সংহারভাবকে সাংখ্যাচার্য্যগণ ঘটের ধ্বংস, সংহার বা অতীতাবস্থা বলিয়া থাকেন। সাংখ্যমতে মাটী এবং শেষ চাঁড়া খোলা উভয়ই ঘট, মধ্যাবস্থাও ঘটই। কার্য্যনিষ্পাদন দ্বারাই সংসারে পরিচয়, কাজেই বিস্তৃতঘটসত্তা কেবল মাঝখানে কতটুকুকাল 'ঘট' নাম লাভ করিতেছে।

কার্য্য কারণ এক হইলে প্রকৃতিও জগৎ একই হইল। জগতের অব্যক্তভাব প্রকৃতি, প্রকৃতির ব্যক্তভাব জগৎ। কার্য্য আর কারণ এক না হইলে, কার্য্য কারণাত্মক হইবার হেতু থাকে না। কারণ বলিলে অবশ্য এখানে উপাদান কারণই বুঝা হইতেছে, ইহা মনে রাখা দরকার। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় সূত্র হইতে হয় না, অতএব ঘটও মৃত্তিকা একই জিনিষ, কেবল মৃত্তিকার অবস্থাসংস্কারবিশেষ ঘট, এবং অসংস্কৃতস্বভাবসিদ্ধভাব মৃত্তিকা।

কূর্ম্মসঙ্কর প্রতিসঙ্কর দৃষ্টান্তে দেখা গেল—কার্য্য, কারণ হইতে একটু বিকসিতভাব। কোনও পদার্থ অসৎ নহে। সবই ছিল এবং থাকিবে। জগতে অসৎ কিছুই নাই, সবই সত্যতত্ত্ব; তবে উপলব্ধিকালে "আছে" বলা আমাদের ভ্রমাত্মক সংস্কার। আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও, যেমন কূর্ম্মের শরীরাভ্যন্তরস্থ শুণ্ডটী বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিতে পারিনা, তদ্রূপ যখন ঘটকে কার্য্যভাবে ব্যক্তদশায় ব্যবহারিকজগতে কার্য্যসম্পাদকরূপে দেখিতে না পাই, তখন ঘট নাই, এরূপ মনে করাও আমাদের অন্যায়। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই কার্য্যকারণের অভেদবাদ এবং সৃষ্টি বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব ভিন্ন কিছুই নহে, এই রহস্য কূর্ম্মশরীরাবয়বের সঙ্কর প্রতিসঙ্কর দ্বারা দেখাইয়া, তাঁহাদের অভিমত জগৎকারণ অব্যক্ত তত্ত্বের সহিত ব্যক্তজগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তমসূত্রে ভগবান্ কপিলাচার্য্য সমস্ত-জিজ্ঞাসার মূলকারণ ত্রিতাপবাধার বিবরণ পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন। যে ভয়ে ভীত—যে কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া, মহর্ষি আসুরি কপিলের নিকট তত্ত্ব কথা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেই সংসারজ্বালামালারজনক—অশেষঅশান্তির উৎপাদক—ত্রিবিধ দুঃখ স্বরূপের পরিচয় না দিলে, সমস্ত বক্তব্যই উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া যায়, কাজেই আচার্য্য বলিতেছেন,—

অধ্যাত্মমধিভূতমধি দৈবঞ্চ ।৭

দুঃখ ত্রিবিধ, অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব। সংসারে কোনও কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাব অনুভব করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সুনিয়ম। অভাবে না পড়িলে, কেহই উপযোগিতা বুঝিতে পারে না। অভাব জগতের শিক্ষক, অভাবের নিকটই প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ। আহারের প্রবৃত্তি কেন? ক্ষুধা উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধা কি? আহার্য্যের আবশ্যকতা জ্ঞাপক এক রকম অভাবের আহ্বান। "নাই চাই" এই প্রাকৃতিক ঈঙ্গিতই আমাদের ক্ষুধা। সর্ব্বত্রই অভাবের আহ্বানে জগতের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং জগৎ কর্ত্তব্য পথে চলিতে থাকে। আসুর দেখিলেন—জগতে শান্তির অভাব, সংসার মরুস্থানের মত ভয়াবহ। সংসারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত-পর্য্যন্ত অভাবের ঘনরোলকল্লোল কর্ণ বিদীর্ণ করিতেছে। সংসারে শান্তির অভাব! তৃপ্তির অভাব!! শান্তি পাইনা কেন? দুঃখ আসিয়া পীড়ন করে। শান্তির উদ্দেশে ছুটিতে থাকি, সহসা পৃষ্ঠদেশ হইতে দুঃখ আসিয়া ভীষণ আঘাত করে। দুঃখের তাড়নায় সংসারের সর্ব্বত্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। এই দুঃখ কতপ্রকার, এবং কি কি কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা জানা আবশ্যক। শত্রুর প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তাহাকে পরাস্ত করা যায় না; রোগের প্রকৃতি না বুঝিলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। দুঃখের প্রতীকার অবশ্যই অভিপ্রেত। সংসারের সকল শ্রেষ্ঠধর্ম্মাচার্য্য এবং মনস্বীগণই একবাক্যে সংসারের দুঃখবহুলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের অনিন্দ্যপুরুষ বুদ্ধদেব সংসারে অসংখ্য দুঃখ দেখিয়া, তাহার প্রতীকারার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আদি বিদ্বান্ কপিল

ত্রিবিধদুঃখ পরিহারই জীবজীবনের উদ্দেশ্য-রূপে বর্ণনা করেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিত সোপেন্‌হার ও সংসারের দুঃখবহুলতা বেশ ভাল রূপে বুঝিয়াগিয়াছেন। সকল জীবেরই বাসনা, দুঃখে পতিত না হই। স্তন্যপায়ী শিশু হইতে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দুঃখের জ্বালনায় আকুল। এই দুঃখকে ভালরূপ চিনিতে না পারিলে, ইহাকে বিনাশ করা যাইতে পারে না, কাজেই পরিচয়—দুঃখ ত্রিবিধ।

সম্প্রতি দুঃখের নিমিত্তব্যাখ্যাদ্বারা দুঃখের ত্রিবিধ বিভাগের সার্থকতাসম্পাদন করা হইতেছে। প্রথম দুঃখ আধ্যাত্ম। আধ্যাত্ম যাহা আত্মাকে অধিকার করে। আত্মা অর্থ শরীর এবং মন, শারীর এবং মানস দুঃখ সুতরাং অধ্যাত্ম। যদিও সমস্ত-দুঃখই মনে অনুভূত হয়, অর্থাৎ মন ব্যতীত কোনও প্রকার দুঃখানুভব হয় না; তথাপি শরীরে রোগাদিজনিত দুঃখ শারীর এবং মনের কামাদিজন্য দুঃখ মানস; এরূপ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় দুঃখ অধিভূত। ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহ হইতে আগত দুঃখ অধিভূত। ব্যাঘ্রচৌরাদি-প্রাণিজন্যদুঃখ যেরূপেই অনুভূত হউক্ না কেন, উহাদের উৎপত্তিহেতু ভূত বা প্রাণী (ব্যাঘ্র চৌরাদি) নিশ্চিত, সুতরাং ঐ দুঃখ অধিভূত। কেহ কেহ 'ভূত' অর্থাৎ অগ্নি বায়ু জলাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে অধিভূত বলেন। অনন্তর তৃতীয় দুঃখ অধিদৈব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, দেব অর্থাৎ দেবযোনি ভূতপিশাচাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ অধিদৈব। দেব অর্থ দেব-যোনি, দেবযোনির মধ্যে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি মনুষ্য শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া মানবকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করে, এরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন আচার্য্যগণ এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় 'ভূত' শব্দে অগ্নি বায়ু বুঝেন নাই, প্রাণিমাত্র বুঝিয়াছেন। এই দলই "অধিদৈব" শব্দের ব্যাখ্যায় 'দেব' শব্দে অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে বুঝেন। উভয় মতের সংক্ষিপ্ত রহস্য, এক মতে 'ভূত' প্রাণী, ও 'দেব' অগ্ন্যাদি। অপর মতে 'ভূত' অগ্ন্যাদি, এবং 'দেব' ভূতাদি দেবযোনি। জগতের সমস্ত প্রকার দুঃখই এই তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। স্বশরীরের অথবা নিজ চিত্তের অবস্থান্তর প্রাপ্তিজনিত সঞ্জাত দুঃখ অধ্যাত্ম, অন্যহেতু হইলে, হয় তাহা অধিভূত, নয় অধিদৈব; সুতরাং জগতের যাবতীয় দুঃখানুভব এই গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গেল। দুঃখহেতু, দুঃখস্বরূপভেদ বুঝা গেল, এখন দুঃখের প্রতীকার বেশ সহজসিদ্ধ হইল। বারান্তরে কাপিল তত্ত্বসমাসের অপর অংশ ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য।
কপিল সেবকস্য কস্যচিৎ
বেদবিদ্যালয় যশোহর।

# শঙ্কর-গীতা।

——:•:——

## ( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

অতঃপর শঙ্কর-গীতার মূলতত্ত্ব আরম্ভ। সর্ব্বাগ্রেই বৈরাগ্যোপদেশ লিখিত। নৈমিষ-কাননের মুনিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষি পুঙ্গব! মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কি জন্য কোথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? সূত তদুত্তরে কহিলেন—তাপসগণ! দণ্ডক অরণ্যে ভার্য্যাবিয়োগকাতর শ্রীরাম চন্দ্রকে উপদেশ দিতে অগস্ত্যঋষি আপন ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন—হে রাজন্! আপনি বৃথা আশা করিতেছেন। লঙ্কা-দুর্গ অজেয়—মহাবল পরাক্রান্ত দশানন তাহার অধিপতি, বৃত্র-নিধনকারী ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাথ তাহার পুত্র, দেবগণত্রাস কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা, দিব্যাস্ত্রধারী অতিকৌশলী বিভীষণ অপর অনুজ। লঙ্কাপতি রাবণ শঙ্কর-দত্ত বরলাভে মহা দর্পিত হইয়া এই স্বর্ণলঙ্কা উপভোগ করিতেছে। বালকে যেমন চন্দ্র ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ লঙ্কা-বিজয় আশা করিতেছ। আমি দেখিতেছি, মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ গ্রহণ অনিচ্ছার ন্যায়, তুমি কামক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হিতকর বাক্য গ্রহণ করিতেছ না। ইত্যাদি প্রকার কতকগুলি ভয়সূচক কথায় অগস্ত্য রামচন্দ্রকে লঙ্কাবিজয়কার্য্যে অনুৎসাহিত করিয়া তাহার পর মূলতত্ত্ব আরম্ভ করিলেন যথা—

"ন গৃহ্লাতি বচঃ পথ্যং কামক্রোধাদি পীড়িতঃ
হিতং ন রোচতে তস্য মুমূর্ষোরিব ভেষজম্॥১
মধ্যেসমুদ্রংযানীতা সীতা দৈত্যেন মায়িনা
আয়াস্যতি নরশ্রেষ্ঠ! সাকথং তব সন্নিধিং॥২
বধ্যন্তে দেবতাঃ সর্ব্বা দ্বারি মর্কটযূথবৎ
কিঞ্চ চামরধারিণ্যো যস্য সন্তি সুরাঙ্গনাঃ॥৩
ভূংক্তে ত্রিলোকী মখিলাং যঃ শম্ভুবরদর্পিতঃ
নিষ্কণ্টকং তস্য জয়ঃ কথং তব ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রজিন্নাম পুত্রো যস্তস্যাস্তি স বরোদ্ধতঃ
তস্যাগ্রেসমরে দেবা বহুবারং পলায়িতাঃ
কুম্ভকর্ণোহবরো ভ্রাতা যস্যাস্তি সুরসূদনঃ
অন্যো দিব্যাস্ত্র সংযুক্তশ্চরজীবী বিভীষণঃ
দুর্গং যস্যাস্তি লঙ্কাখ্যং দুর্জ্জেয়ং দেবদানবৈঃ
চতুরঙ্গ বলং যস্য বর্ত্ততে কোটি সংখ্যয়া।
একাকিনা ত্বয়া জেয়ঃ সকথং নৃপনন্দন।
আকাঙ্ক্ষতে করে ধর্ত্তুং বালশ্চন্দ্রমসং যথা
তথাত্বং কাম মোহেন জয়ং তস্যাভিবাঞ্ছসি।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর যখন রামচন্দ্র সীতা শোকে অভিভূত হইয়া ক্রোধে লঙ্কা জয় করিতে প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন—তখন অগত্যা অগস্ত্য ঋষি বৈরাগ্যোপদেশ দ্বারা শক্রমিত্রসমজ্ঞানতা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রথমেই মুনিবর কহিলেন—

কিং বিষীদসি রাজেন্দ্র কান্তাকস্য বিচার্য্যতাং জড়ঃ কিংনু বিজানাতি দেহোহয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ
নির্লেপঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
আত্মা ন জায়তে নৈব ম্রিয়তে নচ দুঃখভাক্।
অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! এই দেহ পঞ্চ ভূতের—কেহ কাহারো প্রিয় অপ্রিয় নহে।

বিবেচনা করিলে কে কার কান্তা? তবে আপনি এত ম্লান হইতেছেন কেন? যিনি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ আত্মা, তাঁহার সহিত কাহারো সংযোগ বিয়োগ নাই; অথবা তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি কিছুতেই দুঃখের ভাগী নন।

সূর্য্যোঽসৌ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুষ্টেন ব্যবস্থিতঃ
তথাপি চাক্ষুষৈর্দোষৈর্নকদাচিদ্বিলিপ্যতে।
দেহোঽপিমলপিণ্ডোঽয়ং মুক্ত জীব জড়াত্মকঃ
দহ্যতে বহ্নিনাকাষ্ঠৈঃ শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপিবা
তথাপি নৈবজানাতি বিরহে তস্য কা ব্যথা।

অর্থাৎ সূর্য্য যেমন সকলের চক্ষুর উপর অবস্থিত থাকিয়াও, চাক্ষুষ-দোষসংশ্লিষ্ট নহেন, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বঅন্তরগত হইয়াও, দৃশ্যমানদোষদ্বারা বিলিপ্ত হন না। জীবন বিনষ্ট হইলে, এই জড়াত্মক মলভাণ্ডপূর্ণ দেহ কাষ্ঠাদি উদ্ভিদ্দ্বারা ভস্মীভূত হয় অথবা শৃগাল আদি জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—দেহ-বিনাশবেদনা কেহ অনুভব করেনা।

সুবর্ণ গৌরী দূর্ব্বায়া দলবচ্ছ্যামলাপিবা
পীনোত্তুঙ্গস্তনাভোগভুগ্নসূক্ষ্মবিলগ্নিকা॥
[illegible]রিতস্বজঘনা রক্তপাদসরোরুহা।
[illegible]াকাচন্দ্রমুখী বিম্বপ্রতিবিম্বরদচ্ছদা॥
নীলেন্দীবর নিকাশ নয়নদ্বয় শোভিতা
[illegible]ত্তকোকিল সংলাপা মত্তদ্বিরদগামিনী॥
কটাক্ষৈ রনুগৃহ্লাতি মাং পঞ্চেষু শরোত্তমৈঃ
[illegible]তি যাং মন্যতে মূঢ়ঃ স তু পঞ্চেষুশাসিতঃ॥
[illegible]স্যাবিবেকং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতোনৃপ
[illegible] চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ॥
[illegible]মূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা সেক্ষী স জীবিনঃ।
[illegible] তন্বঙ্গী মুগ্ধবালা মলপিণ্ডাত্মিকা জড়া
সা ন পশ্যতি যৎ কিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যাবুদ্ধ্বা ত্যজস্ব রাঘব॥ ১৬

হে রঘুকুলশেখর রাম! যে মূঢ় ব্যক্তি কামের বশবর্ত্তী হইয়া দূর্ব্বাদল প্রভ শ্যামলাঙ্গী, রক্ত কোকনদ তুল্য চরণতল ধারিণী, চন্দ্র-মৌলিশুভ্রদশনপংক্তি শোভিনী, নীলোৎপল-সদৃশ নয়না, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা, পীনোন্নত-পয়োধরা, কোকিলকলনাদিনী, দ্বিরদগামিনী রমণীর পূর্ণকামকটাক্ষপরিপূরিতদৃষ্টি ইচ্ছা করে, তাহার যেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তাহা তোমাকে ক্রমে শুনাইয়া সত্য পথে আনিতেছি—শ্রবণ কর। এই বিশ্বে স্ত্রী পুরুষ ক্লীব কেহ নহে, পরিপূর্ণ সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মাই সমগ্র বিষয় দৃষ্টি করিতে-ছেন। যাহাকে মূঢ়গণ কোমলহৃদয়া কৃশাঙ্গী বালা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার কোন রূপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, এবং ঘ্রাণ শক্তি নাই। সেই মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা রমণী কেবল রক্তমাংসময়চর্ম্মেরদেহ ধারণ করে মাত্র। হে রাম! এই সকল জানিয়া শুনিয়া ভ্রম জ্ঞান বিদূরিত কর—ভার্য্যা-সীতাবিয়োগদুঃখ দূর কর।

যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ্ঘৃণাস্পদং
জায়স্তে যদি ভূতেভ্যো দেহিনঃ পাঞ্চ-
ভৌতিকাঃ॥
আত্মা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব
সহোদরাঃ॥
নির্ম্মিতায়াং গৃহাবল্যাং তদবচ্ছিন্নতাং গতং
নভস্তস্যাং তু দগ্ধায়াং ন কাঞ্চিৎ ক্ষতি-
মৃচ্ছতি॥

তদ্বদাত্মাপি দেহেষু ভেষ্বেবং স স্বয়ং নৈব হন্যতে।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং
তাবুভৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে
অস্মাৎ পতি দুঃখেন কিং খেদস্যাস্তি কারণং
স্বস্বরূপং বিদিত্বেদং দুঃখং ত্যক্ত্বা সুখী ভব॥

হে রাম! যখন এই দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, তখন যে নারীকে অতি আদরের বলিয়া বোধ করা হয়—সে অতি ঘৃণাস্পদ।

একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই যখন সকল বস্তুতে নিত্য বিরাজমান, তখন কেহ কাহারও স্ত্রী নহে অথবা কেহ কাহারও স্বামী নহে। ধরিতে হইলে, সকলি একস্থান হইতে উদ্ভূত বলিয়া সহোদর স্বরূপ। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বগত আত্মা অবিনাশী তাহার বিনাশ নাই। শূন্যের উপর যেমন গৃহের ভিত্তি ক্ষণভঙ্গুর হয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রেই ক্ষণ ভঙ্গুর। আবার শূন্যে অবস্থিত গৃহ দগ্ধ হইলে, যেমন শূন্যের কোন অনিষ্ট নাই সেইরূপ দেহীর দেহ বিনাশ হইলে, আত্মারও কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। আবার হত্যাকারী হত্যা করিয়া, এবং আহত ব্যক্তি হত হইয়া, কেহই "আমি হত্যা করিতেছি, কি, আমি হত হইতেছি" ইহা অনুভব করিতে পারেনা; সুতরাং হে রঘুকুল ভূষণ! আত্মার এই রূপ স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, বিষাদভাব পরিত্যাগ করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা কর।

তপোবননিবাসী চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী আত্মজ্ঞ অগস্ত্য যখন মায়িকজগতের একটি সাংসারিককামক্রোধাদি পীড়াগ্রস্তজীবকে, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বিষয়ে, এইরূপ একটি নাতিহ্রস্ব নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা, ভার্য্যা কিছু নহে, জগত মিথ্যা, আত্মা সত্য, এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতা রাম কহিলেন—হে ভগবন! আপনি বলিলেন যে, দেহের কোনরূপ সুখ দুঃখ নাই, এবং আত্মারও তদ্রূপ অবস্থা। তবে আমি এইমাত্র কেন সীতার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইতেছি! আমি যাহা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি, আপনি তাহা বলিতেছেন, "কিছুই না"। মুনিবর! ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব?

মুনে দেহস্য নো দুঃখং নৈব চেৎ পরমাত্মনঃ
সীতাবিয়োগদুঃখাগ্নির্মাং ভস্মীকুরুতে কথং?
সদানুভূয়তে যোঽর্থঃ স নাস্তীতি ত্বয়েরিতঃ
জায়তাং তত্র বিশ্বাসঃ কথং মে মুনি সত্তম!
অন্যত্র নাস্তি কো ভোক্তা যেন জন্তুঃ প্রতপ্যতে
সুখস্য বাপি দুঃখস্য তদ্‌ব্রূহি মুনিপুঙ্গব!

শিষ্যের কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া, গুরু বা উপদেষ্টা ঋষি অগস্ত্য কহিলেন শুন—

দুজ্ঞেয়া শাম্ভবী মায়া তয়া সংমোহ্যতে জগৎ
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং॥
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ
সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তো বিভুরাত্মা মহেশ্বরঃ॥
তস্যৈবাংশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তে কাষ্ঠযোগতঃ॥
অনাদি কর্ম্ম সম্বদ্ধাস্তদ্বদংশা মহেশিতুঃ।
অনাদিবাসনাযুক্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ইতিতে স্মৃতাঃ॥

মনো বুদ্ধি রহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ং
অন্তঃকরণ মিত্যাহুস্তত্র তে প্রতিবিম্বিতাঃ॥

এই জগত শম্ভুর শাম্ভবী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহা অতীব দুর্জ্ঞেয়, স্থূল কথা মায়াই মা প্রকৃতি, মায়ী ই মহেশ্বর। আবার সর্ব্বজ্ঞানময় অনন্তআত্মাই মহেশ্বর; সুতরাং মহেশ্বরের সকল অবয়বময় ভূতগণদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। এই মহেশ্বরের অংশই জীবহৃদয়ে অবস্থিত। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্যপদার্থ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ লোকের হৃদয়স্থিত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত শৈবাংশ অনাদি বাসনাযুক্ত হইয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত হয়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধিও মন লইয়া অন্তঃকরণ গঠিত হইয়া থাকে। মহেশ্বর রূপ আত্মার অনন্ত অংশ, এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে।

জীবত্বং প্রাপ্নুয়ুং কর্ম্ম ফল ভোক্তার এব তে
ততো বৈষয়িকং তেষাং সুখং বা দুঃখমেববা
ত এব ভুঞ্জতে ভোগায়তনেহস্মিন্ শরীরকে
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতি দ্বিবিধং বপুরুচ্যতে
স্থাবরা বৃক্ষ দেহাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা গুল্মলতাদয়ঃ
অণ্ডজাঃ স্বেদজাস্তদ্বদুদ্ভিজ্জা ইতি জঙ্গমাঃ
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেহনু সংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং
সুখ্যহং দুঃখ্যহঞ্চেতি জীব এবাভিমন্যতে।
নির্লেপোপি পরং জ্যোতির্ম্মোহিতঃ শম্ভুমায়য়া
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদোমাৎসর্য্যমেব চ
মোহশ্চেত্যরিষড়্বর্গমহঙ্কারগতং বিদুঃ।
স এব বধ্যতে জীবঃ স্বপ্ন জাগ্রদবস্থয়োঃ।
সুষুপ্তৌ তদভাবাচ্চ জীবঃ শঙ্করতাং গতঃ॥
স এব মায়াসংস্পৃষ্টঃ কারণং সুখদুঃখয়োঃ
শুক্তৌ রজতবদ্বিশ্বং মায়য়া দৃশ্যতে শিবে।
ততো বিবেকজ্ঞানেন ন কোহপ্যত্রাস্তি দুঃখভাক্
ততো বিরম দুঃখাদ্বং কিং মুধা পরিতপ্যসে।

উক্ত প্রতিবিম্বিত অংশই জীবত্ব পাইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করে। কেননা উহারাই সুখ দুঃখাদি সাংসারিক ঘটনার-কারণ। স্থাবর জঙ্গম ভেদে শরীর দুই রূপ—লতাদিগণ স্থাবর। আর অণ্ডজ স্বেদজাদিই জঙ্গম নামে পরিচিত। এই দ্বিবিধ শরীরে মহেশ্বরের সেই কথিত অংশই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন জীব কর্ম্মানুসারে স্থাণুশরীর এবং যোনান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় জীব নির্লিপ্ত হইলেও, শৈব মায়ায় অভিভূত হইয়া "আমি সুখী" আমি দুঃখী" ইত্যাদি রূপ অহঙ্কার বা অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। কামাদি ষড়রিপুর সমষ্টিকে অহঙ্কারতত্ত্ব কহে। জীবগণ স্বপ্ন আব জাগ্রদবস্থায় উক্ত অহঙ্কারের বশীভূত হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া জীব শিবত্বপদ প্রাপ্ত হয়। মায়ার মোহিনীশক্তিতে যেরূপ শুক্তিকে রজত জ্ঞান হয়, সেইরূপ মায়াবশে বিশ্ব আরোপিত হয়। স্থূল কথা এই যে—জীব মায়াকর্তৃক সুখদুঃখ উপভোগ করে। কিন্তু পরমমঙ্গলাস্পদ আত্মতত্ত্বজ্ঞানউন্মেষি-বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইলে, আর দুঃখাদি অনুভব হয় না—সুতরাং হে রামচন্দ্র! তুমি এই সকল জানিয়া শুনিয়া বৃথা বিলাপ পরিত্যাগ কর।

যখন আত্মারূপী মহেশ্বর সতত জীবদেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, শীতাতপাদিদ্বন্দ্ব যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তখন— ইহা আমার, উহা আমার, ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া, ভার্য্যাদিবিনাশরূপ অনিত্যচিন্তা হইতে বুদ্ধিকে সত্য স্বরূপ অব্যয় চিন্ময় সদাশিবের প্রতি বিনিযুক্ত করিয়া বিগতক্লেশ হও। ইত্যাদি। তখন শ্রীরামচন্দ্র আবার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ আমি সকল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু প্রারব্ধভোগ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছেনা। ইহার যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তাহাই আমায় বলুন। মদ্য যেমন নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে উন্মত্ত করে, সেইরূপ কর্ম্মফল ও বিবেকিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেনা।

মত্তং কুর্য্যাদ্ যথা মদ্যং নষ্টাবিদ্যমপি দ্বিজং
তদ্বৎ প্রারব্ধভোগোঽপি ন জহাতি বিবেকিনং

তখন রামচন্দ্র আবার কহিলেন— হে ব্রহ্মন্! আমি আর সহ্য করিতে পারি না—প্রপীড়িত হইয়া জীব স্থূলদেহ বিনাশ করিয়া থাকে—আমারও তদ্রূপ প্রজ্ঞা উপস্থিত। এখন ইহার উপায় করুন।

আমি ক্ষত্রিয় হইয়া স্ত্রী হরণকারী দুরাচার-আততায়ীরাক্ষসকে বিনাশ করিতে না পারিলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

ক্ষত্রিয়োঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্য্যা মে রক্ষসাহৃতা
যদি তং ন নিহন্যাশু জীবনে মেঽস্তি কিংফলং।

এইরূপ কহিয়া, অতঃপর রামচন্দ্র সীতাহরণ জনিতশোকমিশ্রিতক্রোধের অনুগত হইয়া, আবার কহিলেন—মহর্ষে! আমার আর তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের অবশ্যক নাই। ক্রোধাদিরিপুগণ নিয়ত আমাকে দগ্ধ করিতেছে। নিজস্ত্রী শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িতা হইলে, যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করিয়া, তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে, তাহাকে পুরুষাধম ভিন্ন আর কি বলিব? যাহাতে রাবণবিনাশ হয় আমারে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, দণ্ডকারণ্যে দ্বিতীয় গুরু কেহ নাই।

কামক্রোধাদয়ঃ সর্ব্বে দহন্ত্যেতে তমুং মম
অহঙ্কারোঽপি মেনিত্যং জীবনং হন্তুমুদ্যতঃ।
হৃতায়াং নিজকান্তায়াং শত্রুনাবমতস্য বা
যস্য তত্ত্ববুভুৎসা স্যাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ।
তস্মাত্তস্য বধোপায়ং লঙ্ঘয়িত্বাম্বুধিং রণে।
ব্রূহি মে মুনিশার্দ্দূল ত্বত্তোনান্যোঽস্তি মে গুরুঃ॥

ইহার পর অগস্ত্য ঋষি প্রদত্ত শৈবীয়-"বিরজা"দীক্ষাপদ্ধতি আরম্ভ। এই বিরজা দীক্ষা অরাতিবিজয় কার্য্যে সহায়। শাস্ত্রে দীক্ষার অনেকরূপ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে, তন্ত্রভিন্ন পুরাণের মতে দীক্ষাপদ্ধতি চারি প্রকার। বিরজা দীক্ষা তাহার অন্যতর। এই পর্য্যন্ত শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করিয়া তাপসপ্রবর সূত সেদিনের মত নৈমিষকাননের তাপসগণের নিকট বিদায় লইয়া, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে গমন করিলেন। মহাগুহ্যবিরজাদীক্ষাপদ্ধতি তাহার পরদিন পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তন্ত্রে দীক্ষা বলিতে—

দীয়তেজ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ
তেন দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা পাপচ্ছেদক্ষমাক্রিয়া।

অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান দান করা হয় এবং পাপ ক্ষয় হয় তাহাকে দীক্ষা কহে। কিন্তু শঙ্করগীতার এই বিরজা দীক্ষা ক্রিয়া অন্যরূপ। এইরূপ দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে,

লোকের পাপবিনাশকরা দূরে থাকুক, বরং প্রাণীহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অগস্ত্যপ্রদত্তদীক্ষার গুণে রামচন্দ্র নাকি রাবণবিনাশ করিয়াছিলেন! তাই এই শঙ্করগীতা গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। সূতমুখপদ্ম হইতে ব্রাহ্মণগণ অতঃপর বিরজাদীক্ষাপদ্ধতি শুনিতে লাগিলেন।

আমরাও অদ্য হিন্দু-পত্রিকার পাঠকের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। শঙ্করের ইচ্ছা হইলে আবার তাঁহার বিরজাদীক্ষা-পদ্ধতি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য—
মাগুরা।

---

# চারুচর্য্যা।

---

শ্রীলাভসুভগঃ সত্যাসক্তঃ স্বর্গাপবর্গদঃ।
জয়তাৎ ত্রিজগৎপূজ্যঃ সদাচার ইবাচ্যুতঃ॥ ১
ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে পুরুষস্ত্যক্তেন্নিদ্রামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃ প্রবুদ্ধং কমলমাশ্রয়েচ্ছ্রী গুণাশ্রয়া॥ ২

---

লক্ষ্মী লাভে সৌভাগ্যবান, সত্যে আসক্ত কৃষ্ণপক্ষে—সত্যভামায় আসক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষদাতা ও ত্রিজগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সদাচার জয়যুক্ত হউন। ১

মনুষ্য আলস্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন; গুণের আশ্রয়ীভূত লক্ষ্মী (শোভা) প্রাতঃকালের সুহাসিনী সরোজিনীকে আশ্রয় করে। ২

[ এ বিষয়ে মনু যথা—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
৪ অধ্যায়ে ৯২

পুণ্যপূত শরীরঃ স্যাৎ সততং স্নান নির্ম্মলঃ।
ততাজবৃত্রহাস্নানাৎপাপংবৃত্রবধার্জ্জিতম্॥ ৩
নকুর্য্যাত ক্রিয়াং কাঞ্চিদনভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্।
ঈশার্চনরতং শ্বেতং নাভূন্নেতুং যমঃ ক্ষমঃ॥ ৪

---

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষযামে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় চিন্তা করিবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে তুত্থায় ধর্ম্ম মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
কূর্ম্ম পুরাণে ১৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তেউত্থায়মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ।
বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বণি ১০৪ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত যথা—

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।
আহ্নিক তত্ত্বধৃত পিতামহ বচনং।

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥
ঐ ভবদেবীয় নির্ণয়ামৃতে স্মৃতি বচনং।

পশ্চিমে যামে পশ্চিমার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ।

মদন পারিজাতে প্রথমস্তবকে উচ্চারবিধি-প্রকরণে।]

সর্ব্বদা স্নানদ্বারা নির্ম্মল হইয়া পুণ্য পূত শরীর হইবে; ইন্দ্র স্নানদ্বারা বৃত্রবধার্জ্জিত পাপ দূর করিয়াছিলেন। ৩

মহাদেবকে অর্চ্চনা না করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিবে না; মহাদেব অর্চ্চনায় রত শ্বেত মুনিকে যম লইয়া যাইতে পারেন নাই। ৪ (এই উপাখ্যানটি লিঙ্গ পুরাণের পূর্ব্বভাগে ৩০ অধ্যায়ে আছে উহার তাৎপর্য্য এই—শ্বেতনামা মুনি মহাদেবের পূজা অর্চ্চনায় রত থাকিতেন, কালক্রমে দেহ-পরিবর্ত্তনের সময় হওয়াতে, যম আসিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন। তিনি কহিলেন যে,

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতং কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রোক্তেনৈববর্ত্মনা।
ভুবিপিণ্ডং দদৌ বিদ্বান্‌ভীষ্মঃ পাণৌ ন শন্তনোঃ॥ ৫

নোত্তরস্যাংপ্রতীচ্যাংবাকুর্বীতশয়নেশিরঃ।
শয্যাবিপর্য্যয়াদ্দিতের্গর্ভোদিতেঃশক্রেণপাতিতঃ॥ ৬

আমায় কে বদ্ধ করিবে? আমি মৃত্যুঞ্জয়ের ভক্ত। যম কহিলেন শ্বেত! আমি তোমাকে যমালয় লইতে আসিয়াছি মহাদেব তোমার কি করিবেন? এই শুনিয়া শ্বেতমুনি 'হা রুদ্র' হা রুদ্র' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া, ভয়ে যম শ্বেতমুনিকে ত্যাগ করিয়া মুনির নিকট পড়িয়া গেলেন ও চীৎকার করিতে লাগিলেন—

সসর্জ্জ জীবিতং ক্ষণাৎ ভবং নিরীক্ষ্য বৈ ভয়াৎ।
পপাতচাণ্ড বৈ বলী মুনেস্ত সন্নিধৌ দ্বিজাঃ॥

পরে যম মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাদেবও মুনির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।)

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রদ্ধান্বিত শ্রাদ্ধ করিবে; বিদ্বান্ ভীষ্ম মৃত্তিকায় পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, শান্তনু রাজার হস্তে দান করেন নাই। ৫ (এই উপাখ্যান শ্রীহরিবংশে প্রথম পর্ব্বে ১৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

উত্তর কিম্বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেনা; শয্যাবিপর্য্যয়ে দিতির গর্ভ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পাতিত হইয়াছিল। ৬

(উদক্‌শিরা ন স্বপেত তথা প্রত্যক্‌শিরা ন চ।
মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বণি ১০৪ অধ্যায় ৪৯।

নোত্তরাভি মুখঃস্বপ্যাৎ পশ্চিমাভিমুখো ন চ।
কূর্ম্ম পুরাণে ১৯ অধ্যায়।

অর্থি ভুক্তাবশিষ্টং যৎ তদশ্নীয়ান্মহাশয়ঃ।
শ্বেতোঽর্থি রহিতং ভুক্‌ত্বা নিজমাংসমুজোঽভবৎ॥ ৭

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ। নোত্তরাপরাবাক্‌শিরাঃ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৭০ অধ্যায়।

আর্দ্র পদে, উত্তর পশ্চিম ও নিম্ন মুখে নিদ্রা যাইবে না। একদিন দিতি সন্ধ্যা বেলায় ব্রতকর্শিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ও পদ ধৌত না করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, ইন্দ্র এই অবসরে দিতির গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রদ্বারা গর্ভ সাত খণ্ড করিয়াছিলেন—

একদা সাতু সন্ধ্যায়াং মুচ্ছিষ্টা ব্রত কর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুস্বাপ বিধিমোহিতা॥
লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃত চেতসঃ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া।
চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কণক প্রভং॥
শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়।)

মহাশয় ব্যক্তি যাচকের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবেন; শ্বেতরাজা যাচককে না দিয়া ভক্ষণ করিয়া, নিজের মাংস ভক্ষক হইয়াছিলেন। ৭

(দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃশেষভুগ্ ভবেৎ॥
বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৭ অধ্যায়।

দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহ দেবতাগণের পূজা করিয়া তদনন্তর গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্।
হিত্বাগৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ উল্লাসে।

গৃহী কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও, মাতা, পিতা পুত্র, স্ত্রী, অতিথি ও সহোদরকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না।

শ্বেত রাজার উপাখ্যান বাল্মিকীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৭৮ সর্গে।)

জপহোমার্চ্চনং কুর্য্যাৎ সুধৌতচরণঃ শুচিঃ।
পাদশৌচবিহীনং হি প্রবিবেশ নলং কলিঃ॥ ৮
ন সঞ্চরণশীলঃ স্যান্নিশি নিঃশঙ্ক মানসঃ।
মাণ্ডব্যঃ শূললীনোঽভূদ চৌরশ্চৌরশঙ্কয়া॥ ৯

চরণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুচি হইয়া জপ ও হোমার্চ্চনা করিবে; কলি, নলের শৌচপদ না থাকাবশতঃ নলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮

( সুস্নাতঃ প্রক্ষালিত-পাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চায়াং স্থলে বা ভগবন্ত মনাদি নিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ।

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৫ অধ্যায়।

উত্তমরূপে স্নান, হস্তপদপ্রক্ষালন, পরে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাদিতে অথবা স্থলে, অর্থাৎ ঘটাদিতে জন্মমৃত্যুরহিত ভগবন্ বাসুদেবের পূজা করিবে।

নল রাজার শরীরে কলির প্রবেশ উপাখ্যান—

কৃত্বা মূত্রমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃশৌচং তত্রৈনংকলিরাবিশৎ॥

মহাভারতে বন পর্ব্বণি ৫৯ অধ্যায়।

নিষধাধিপতি মূত্র পরিত্যাগ করিয়া, পদ ধৌত না করিয়া, আচমনপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন দেখিয়া, কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। )

নিঃশঙ্ক মনে রাত্রে গমন করিবেনা। সাধু মাণ্ডব্য চোর বিবেচনায় শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। ৯

( নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত। নাধার্ম্মিকৈঃ সার্দ্ধম্......নাতি প্রত্যুষসি। নাতিসায়ং। ন সন্ধ্যয়োঃ। ন মধ্যাহ্নে ন সন্নিহিত পানীয়ম্। নাতিতূর্ণং। ন রাত্রৌ। ন সন্ততং ব্যাল ব্যাধিতার্ত্তৈর্বাহনৈঃ।

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬৩ অধ্যায়।

একা পথে চলিবে না, অধার্ম্মিকের সহিত না, অতি প্রত্যুষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, উভয় সন্ধ্যায় নয় অর্থাৎ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নে না; জলের নিকটে না, অতি শীঘ্র না; রাত্রে না, সর্ব্বদা সর্প পীড়িত কিম্বা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না।

মাণ্ডব্যোপাখ্যানং মহাভারতে আদি পর্ব্বণি ১০৭ অধ্যায়—

মাণ্ডব্য নামে ব্রাহ্মণ স্বীয় আশ্রমস্থ-বৃক্ষনিম্নে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া, ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া তপস্যা করিতে ছিলেন। এক দিন কতকগুলি দস্যু অপহৃত দ্রব্য লইয়া, রক্ষকের অনুসরণ ভয়ে সেই আশ্রমে ধন লুকাইয়া আপনারাও সেই স্থানে থাকিল। পরে রক্ষকগণ সেই স্থানে আসিয়া, মুনিকে কোন পথ দিয়া দস্যুগণ গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, মুনি কোন উত্তর প্রদান না করিলে, রক্ষকগণ সেই আশ্রমে অনুসন্ধান করাতে অপহৃত দ্রব্য সহিত দস্যুগণকে, দেখিতে পাইল। রক্ষকেরা মুনিকেও বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া গিয়াছিল। রাজা মুনিকেও বধের আজ্ঞা দিলেন। রক্ষকেরা মাণ্ডব্যমুনিকে জানিতে না পারিয়া, শূলে আরোপণ করিয়াছিল—

তংরাজাসহতৈশ্চৌরৈরন্বশাদ্বধ্যতামিতি।
স রক্ষিভি স্তৈরজ্ঞাতঃ শূলে প্রোতো মহা-তপাঃ॥ )

ন কুর্য্যাৎ পরদারেচ্ছাং বিশ্বাসং স্ত্রীষু বর্জ্জয়েৎ।
হতোদশাস্যঃ সীতার্থে হতঃ পত্ন্যা বিদূরথঃ॥১০

অন্যের স্ত্রীতে স্পৃহা করিবে না ও স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না; সীতার জন্য রাবণ হত হইয়াছিলেন ও বিদূরথ রাজাকে তাঁহার রাণী হনন করিয়াছিলেন। ১০

( পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ।
পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্॥

গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অধ্যায় ৫

পরান্ন, পরদ্রব্য, পরশয্যা, পরস্ত্রী ও পর গৃহে বাস ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী হরণ করে।

নমদ্যাবাসনী ক্বাবঃ কুর্য্যাদ্ বেতালচেষ্টিতম্।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥
ঐ ১১১ অধ্যায় ১২।

স্ত্রীতে অবিশ্বাস কর্ত্তব্য যথা—

নখীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনম্।
বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥
ঐ ১০৯ অধ্যায় ১৪।

স্ত্রীষু বাজাগ্নি সর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রু সেবনে।
ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
ঐ ১১৪ অধ্যায় ৪৬।

স্ত্রীষু রাজসু সর্পেষু স্বাধ্যায় প্রভুশত্রুষু।
ভোগেষ্বায়ুষি বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥
মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ৩৬ অধ্যায় ৫৭।

তজ্জন্য শান্তিশতকে কহিয়াছেন—

আবর্ত্তঃসংশয়ানামবিনয়ভবনংপত্তনংসাহসানাং
দোষানাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্র-
মপ্রত্যয়ানাং।
দুস্ত্যাজ্যাং যন্মহদ্ভিঃ সুরনরবৃষভৈঃ সর্ব্বমায়া-
করং তৎ।
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্ম-
নাশায় সৃষ্টং॥

সংশয়ের উদ্যম, অবিনয়ের ভবন, সাহসের আদিস্থান, দোষের আকর, কপটময়, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, দেবতা নর, বৃষ ও মহৎ ব্যক্তিও ত্যাগ করিতে পারেন না; এই অমৃতময় স্ত্রীরূপবিষকে ধর্ম্মনাশের জন্য কে সৃষ্টি করিয়াছেন!

বিদুরথ উপাখ্যান বৃহৎসংহিতায় ৭৮ অধ্যায়ে আছে—

'শস্ত্রেণ বেণীবিনিগূহিতেন বিদূরথং স্বা
মহিষী জঘান।'

বেণীতে লুকায়িত শস্ত্র দ্বারা বিদূরথকে তাঁহার মহিষী হত্যা করিয়াছিলেন।

'বেণীনিগূঢ়েন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং
বিদূরথং (জঘান)
হর্ষচরিতে ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে।

মুষলয়ো হি যযুঃ ক্ষীবাস্তৃণপ্রহরণাঃ ক্ষয়ম্॥ ১১
(ক্রমশঃ) শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ভূতের ন্যায় কার্য্য করিবে না; কারণ বৃষ্ণিগণ মত্ত হইয়া পরস্পর তৃণদ্বারা প্রহার করিয়া নষ্ট হইয়াছিলেন। ১১

(হিন্দুশাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ। মহাপাপ পঞ্চ যথা—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পানকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
মনুঃ ১১ অধ্যায় ৫৫

ব্রহ্ম-হত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের ৮০ তোলা স্বর্ণ চুরি, বিমাতৃ গমন এই চারিটি মহাপাপ ও তাহাদের সহিত যিনি এক বৎসরকাল বাস করেন তিনিও মহাপাপী মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥
৩য় অধ্যায় যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ উশনঃস্মৃতৌ

বহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণ সুবর্ণ হরণং গুরুদার গমনমিতি মহাপাতকানি। তৎসংযোগশ্চ। বিষ্ণুস্মৃতৌ ৩৫ অধ্যায়। সম্বৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্। ঐ

এই যদুবংশক্ষয় কথা মহাভারতে মৌষল-পর্ব্ব ১ম অঃ। শ্রীভগবতে ১১ স্কন্ধে ৩০ অঃ ব্রহ্মপুরাণে ১০০ অঃ। শ্রীদেবী ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৮ অঃ। ইতিহাস এই—একদিন কতিপয় মুনিকে যদুবংশীয় কতিপয় বালক জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের এই স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করিবে? বালকগণ একটি বালককে গর্ভবতী স্ত্রী সাজাইয়াছিলেন। মুনিগণ জানিতে পারিয়া ক্রোধে কহিয়াছিলেন 'ইনি নাশন মুষল প্রসব করিবেন।" কালক্রমে একটি মুষল প্রসূত হইল। মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ক্ষিপ্ত হইল। চূর্ণভাগ তীরে লাগিয়া উহা হইতে এরকা উৎপন্ন হইয়াছিল; যদুগণ মত্ত হইয়া উহাদ্বারা পরস্পর বিবাদ করিয়া হত হন।

শ্রীহরিঃ।

( ১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরী কৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

## বর্ণভেদতত্ত্ব।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

### ( বর্ণ ও জাতি শব্দ। )

মনুসংহিতায় আরও দেখা যায়।—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥ ১২ ২৬

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥ ১২ ২৭

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্॥ ১২

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥ ১২ ২৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ-দ্বেষ। প্রাণীরই এই তিনগুণ আছে। যখন যে প্রীতিকর শুদ্ধাভ, প্রশান্ত কোনও ভাবের উদয় হইতে দেখা যাইবে, তখন বুঝিবে, তাহা সত্ত্ব। যাহা নিজের অপ্রীতিকর, দুঃখযুক্ত ও প্রতিকূল, তাহাকেই অনিষ্টোৎপাদক রজ বলিয়া জানিবে। যাহা মোহযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, তাহাই তম বলিয়া ধারণা করিবে।

সাংখ্য পাতঞ্জল শাস্ত্রে সত্ত্বাদিগুণত্রয় বিষয়ে বিপুল গবেষণা আছে, তাহা এস্থানে অতিরিক্ত; সংক্ষেপে ঐ শাস্ত্রের রহস্য— পঞ্চশিখসূত্র,—

"সত্ত্বং নাম প্রসাদ লাঘবাভিষঙ্গ প্রীতি-তিতিক্ষা সন্তোষাদিরূপানন্তভেদং সমাসতঃ সুখাত্মকং, এবং রজোঽপি শোকাদি নানাভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকং এবং তমোঽপি নিদ্রাদি নানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি।"

প্রসাদ, লাঘব, অভিষঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি বহুবিধ লক্ষণ সত্ত্ব গুণের,

সংক্ষেপে সত্ত্ব সুখাত্মক। এইরূপ রজো-গুণের শোকাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে রজ দুঃখাত্মক। ঐরূপ তমোগুণের নিদ্রাদি নানা লক্ষণ, সংক্ষেপে ঐ গুণ মোহাত্মক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায়—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ!

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং, তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহি-নম্ ॥১৪।৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহি-নাম্।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত! ॥১৪।৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত!
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥১৪।৯

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১৪।১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ! ১৪।১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!১৪।১৩

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৪।১৭

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক অনাময়; এ গুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করে। অর্থাৎ সুখে আকৃষ্ট করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক ও তৃষ্ণাসঙ্গোত্থ, উহা কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধন নিষ্পাদন করে। জীব ঐ জন্য কর্ম্মপর হয়। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, উহা সকল জীবের মোহজনক। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা ঐগুণ জীবকে বন্ধন করে; অর্থাৎ তমোগুণবশতঃ নিদ্রাদির আধিক্য হয়। সত্ত্ব সুখের দিকে চালিত করে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদের পথে জীবকে পরিচালিত করে। যখন সকল ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানা-ত্মক প্রকাশের আধিক্য অনুভূত হইবে, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে সময় লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, (যাহা লৌকিক প্রতিষ্ঠাজনক, তাদৃশ কর্ম্মারম্ভ) স্পৃহা, অশম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রজোগুণের বৃদ্ধি হই-য়াছে, জানা যায়। তমোগুণ আতিশয্য লাভ করিলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রকৃতির কর্ত্তা, কর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও জ্ঞান কিরূপ, আবার রজঃপ্রকৃতির ও তমঃপ্রকৃতির জ্ঞান কর্ত্তা ইত্যাদি কি প্রকার, এ সকল বিষয় গীতাশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিচারিত হইয়াছে। সে সকলের অবতারণা এ প্রসঙ্গে অতা-দিক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের লক্ষণ বুঝা গেল, এখন সত্ত্বাদি গুণানুসারে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির কি প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাউক্। সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব-উপসর্জ্জন রজঃ-প্রধান, বৈশ্য রজউপসর্জ্জন তমঃপ্রধান এবং শূদ্র তমঃপ্রধান।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাইতেছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
৭।১১।২১
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
৭।১১।২২
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥ ৭।১১।২৩
শূদ্রস্য সন্নতিঃশৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥
৭।১১।২৪
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
৭।১১।৩২

ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সরলতা, ক্ষমা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা ও সত্য, এগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য, এগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও পরমেশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্মার্থকাম, এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিকতা, নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য, বৈশ্যের লক্ষণ। সন্নতি, শুচিতা, অকপট-প্রভুসেবা, মন্ত্রহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, চুরি না করা ও সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষণ, এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। স্বভাববিহিত বৃত্তিদ্বারা সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমান পুরুষ ক্রমে স্বভাবজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব (মোক্ষ) লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণগুলি পাঠকরিলে ব্রাহ্মণাদির পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারী, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে দেখিতে পাই—

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রূহি বদতাম্বর॥২১॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥২২॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥২৩॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥২৪॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥২৫॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥২৬॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥২৭॥

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রইবা কিরূপে হয়, আমাকে বলুন। ভৃগু বলিলেন, জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, ষট্কর্ম্মশালী (সন্ধ্যাবন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসৎকার, এই ছয়টী, অথবা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ,

এই ছয়টী ষট্‌কর্ম্ম। শেষোক্ত ছয়টী অধিক সঙ্গত। যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা ( অকার্য্য করিতে লজ্জা ) ঘৃণা ( নিন্দ্য কর্ম্মে ঘৃণা ) ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্য কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, আর যাহার ভাল মন্দ কর্ম্মের বিচার নাই, এবং যে বেদত্যাগী, আচাররহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে, কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেলনা। যদি গুণ-কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণভেদের কারণ পাওয়া কষ্টকর এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ বৃথা। মানব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই যদি ব্রাহ্মণাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে কি ছিল? সৃষ্টিপ্রবাহের আদি অন্ত নাই, সুতরাং চিরন্তন অনাদি অদৃষ্ট আশ্রয় করিয়া দার্শনিক সহজ উত্তর দিতে পারিবেন। সামাজিক তত্ত্ব কল্পনা করিয়া ক্রম পরিবর্ত্তন-বাদী আধুনিক অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। তিনি সুতরাং বলিবেন, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিয়াছে; তাহা পরবর্ত্তিসময়ের সামাজিক নির্দ্দেশমাত্র। সমাজে সম্মান, স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণানুসারে যোগ্যতের প্রতিষ্ঠা ও অধিকারলাভ, দোষের প্রশ্রয় না দেওয়া, বরঞ্চ দোষসংস্কারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ সমর্থিত হইয়াছিল। গুণকর্ম্ম ত্যাগ করিলে, সে জাতীয় যুক্তিবিকাশের অবকাশ থাকিবে না, সুতরাং বর্ণভেদ প্রহেলিকা মাত্রে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

ভৃগুরুবাচ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥১০

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১॥

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥১৩॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥১৪॥

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥ ৫॥

ভৃগু বলিলেন, বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট। কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কাম-ভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ ক্রোধপরবশ, সাহসপ্রিয়, স্বধর্ম্মত্যাগশীল, রক্তবর্ণ, তাহারা ক্ষত্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ গোরক্ষাদিবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে, পীতবর্ণ দেহ, কৃষিজীবী, ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসা ও মিথ্যা পরতন্ত্র, লোভী, শুচিতাবিহীন, সর্ব্বকর্ম্মজীবী, কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলে বোধ হয়, প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল, অর্থাৎ জাতিভেদ ছিল না, পরে কর্ম্মানুসারে তাহারাই ক্ষত্রিয়াদি লাভ করিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রমাণ যথা,—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এ বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে এক বেদ, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। বাস্তবিকও এক প্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করিলে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের জন্য সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন; নচেৎ গুণের পূজা এবং দোষের সংশোধন হয় না; তাহাতে সমাজ উচ্ছিন্ন যায়। সমাজের মজ্জাগত দোষ দূর করিতে হইলে উত্তমাধম বিভাগ আবশ্যক হয়। মহাভারত ও ভাগবত মতে বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বর্দ্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এরূপ মনে হয়। গুণ বংশগত হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত নয় বলিয়া, বংশগত জাতিভেদ গুণকর্ম্ম জন্য জাতিভেদের ফলস্বরূপ সমাজে দেখা দিয়াছিল। জাতি বংশগত থাকিলে, গুণ-কর্ম্মানুসারে শরীরের বর্ণ পার্থক্য বিশেষ সম্ভব নয়; ক্ষত্রিয়োচিত আচরণে মহাভারতের দ্রোণগুরু বা কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সিত ভিন্ন রক্তবর্ণের উৎপত্তি কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে না। কর্ম্মত্যাগ এবং অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিলে, শরীরের রঙ্ সহসা পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিয়া মিলান কষ্টকর।

শরীরের বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইলেও কর্ম্মে ব্রাহ্মণ অনেকে ছিলেন। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ও শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় অসবর্ণ বিবাহের ফল বলিয়া মনে হয়। শরীরের বর্ণ বংশগত সামগ্রী, ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে সন্তান অন্যতরবর্ণ হইবে। এইরূপ বিজাতীয় আদান প্রদানে ব্রাহ্মণ রক্ত, পীত হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় শ্বেত ও পীত এবং বৈশ্য শ্বেত-রক্ত হইতে পারিয়াছিল বোধ হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, শাস্ত্রের এ কথার অর্থ বিবেচ্য। শুধু ক্ষত্রিয় হইয়াছিল বলিলে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের সমর্থন হইত। রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার প্রমাণ,—

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥

শরীরের বর্ণানুসারে যদি ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ হয়, তবে সকল বর্ণেরই শারীর বর্ণ সঙ্কর দেখা যাইতেছে। এই বচন পাঠে বুঝা যায়, 'সর্ব্বেষাং' পদ থাকায় চারি বর্ণের বর্ণগত সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছিল; তাহা হইলে শূদ্রের সহিত ত্রিবর্ণের বিহিত অবিহিত যেমন হউক, শোণিত-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল অনুমান করা অনুচিত নয়। ভরদ্বাজের সময়ে অবশ্য গুণের আদর ছিল, শরীরের রঙের আদর ছিল না; তাহা হইলে রক্তবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। মোটের উপর জাতিভেদের মূলতত্ত্ব শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধারণা হয় না। ভাগবতের শূদ্র বিনয়ী, শুচি, সত্যবাদী, গোব্রাহ্মণরক্ষক ও অকপট-প্রভুসেবক, আর মহাভারতের শূদ্র অনাচারী, খাদ্যাখাদ্য-বিচারহীন, সর্ব্বকর্ম্মকারী। সম্ভবতঃ উভয় লক্ষণের লক্ষ্য এক না হইতে পারে। শূদ্র-লক্ষণ যেখানে থাকুক না কেন, তিনি শূদ্র; ব্রাহ্মণে থাকিলেও ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। গুণকর্ম্মের রাজপূজা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যে যুক্ত্যনুসরণ বৃথা প্রয়াসে পর্য্যবসিত হয়, এই টুকুই সান্ত্বনার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদান্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৫

পুরুষের জাতিপরিচায়ক যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্যত্র অর্থাৎ ভিন্ন জাতিতে দেখা যায়, তাহাহইলে সেই লক্ষণ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তজ্জাতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি বৈশ্য জাতিতে দৃষ্ট হয়, তবে বৈশ্যকেও ব্রাহ্মণ-লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কথাটী বড় বিষম। সমাজে অনেক স্থানে অনেক সময় এ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। আরও দেখা যায়—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥২৮॥

শূদ্রের লক্ষণ যদি শূদ্রে এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে এবং সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণের গুণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, এর্কথায় বুঝা যায়, জন্ম-বলে যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণ না থাকে। নচেৎ গুণ-কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে তাহাতে গুণ থাকিবেনা কেন? গুণকর্ম্মবাদীও এখানে জন্মমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদি হইতে পারিবেনা, এই কথা বলিতেছেন। গুণ থাকিলে জন্মমাহাত্ম্যের আবশ্যকতা নাই, এরূপ বলিলে বুঝা যায়, জন্মানুসারে জাতিভেদ প্রচলিত থাকার সময় যৌক্তিকতা অবলম্বন করিয়া গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদ ব্যবস্থাপিত হয়। অতএব উভয়বিধ জাতিভেদ সময়ানুসারে আবশ্যক মতে অবলম্বিত হয়। এইরূপ বুঝিতে বিশেষ বাধা নাই।

গুণ-কর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে বর্ণান্তর-প্রাপ্তির আরও পরিচয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥

মনু তপোবীজপ্রভাবের সহিত "জন্মত"ও লিখিয়াছেন। গৌতম বলেন, "বর্ণান্তর-গমনং উৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।"

গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণ হওয়া যায়, ইহা মহর্ষিগণের মত।

অত্রিসংহিতায় দেখা যাইতেছে,—

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ সংগ্রামে ধন্বানঃ সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যাব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা লবণ সম্মিশ্রং কুসাম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

বেদান্তানুশীলনরত, সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য-যোগবিচারনিরত, বেদপাঠী ব্যক্তি দ্বিজ। যুদ্ধে অস্ত্রধারী বিপ্র ক্ষত্রিয়; বাণিজ্যশীল, কৃষিকারী গোরক্ষক বিপ্র বৈশ্য, লাক্ষালবণ-মধুমাংস-দধিদুগ্ধাদি বিক্রেতা বিপ্র শূদ্র। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবির্জ্জিত, সকল প্রাণীর উপর নির্দ্দয় বিপ্র চণ্ডাল। বেদ-পাঠীই বিপ্র। সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজ। এখানে বুঝা গেল, বেদপাঠীও যদি উক্ত হীনকর্ম্মশীল হন, তিনিও শূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বে শূদ্রের যে লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, এ লক্ষণ তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ। এই লক্ষণে বেদাধ্যায়ীবর্গকে স্বধর্ম্মনিরত হইতে বলা হইয়াছে। না হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নবর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইবে, এইরূপ ভীতি-প্রদর্শন ব্যতীত এ শ্লোকের অপর কোনও মূল্য আছে, বোধ হয় না। দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য, তাহা অবলম্বন করিলে বেদাধ্যায়ী শূদ্র হইবে কেন, বুঝা যায় না। নিন্দিত দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্যের বহির্ভূত এবং সেবা-মাত্রাবলম্বী শূদ্রের একটা লক্ষণ, একথা শাস্ত্রের হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনায় বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যযোগ-বিচার ব্যাপারটা কি, বুঝিতে হইলে, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ একরূপ লেখা হয় নাই, বলিতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের লক্ষণ স্থির। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের লক্ষণ সময় মত পরিবর্ত্তিত হইত বোধ হয়। এ বিষয়ের বিচার এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আর একটী বচন আছে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" জন্মে শূদ্র হইয়া, সংস্কারের পর নাম দ্বিজ, বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্ম জানিলে ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হয়। এ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা দুষ্কর। বেদপাঠী ও সংস্কার-সম্পন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য নন, যদি ব্রহ্ম না জানিয়া থাকেন। অন্য-শাস্ত্রের বহুবিধ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সাংখ্যযোগ-বিচার পর্য্যন্তেও কুলাইল না। ব্রহ্মকে জানা চাই। ব্রাহ্মণ তবে বড় বড় মহর্ষিরাও হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদেরও অনেকের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সামান্য পরিচয় ছিল না, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। নামজাদা ঋষি মহাশয়েরাও রাজা অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন, ঋষিরা বেশ বুদ্ধিমান, সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নাদি না দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই দিলেন। উপনিষদের

এই সুদীর্ঘ গল্পের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। মোটের উপর অলঙ্কারের আতিশয্যে ও গোঁজামিলের প্রাচুর্য্যে শাস্ত্রের জাতিতত্ত্ব অপরের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। বহুদিন পরে আলোচনা করিয়া ইহার শৃঙ্খলা সংগ্রহ করা কষ্টকর।

জন্মানুসারে অর্থাৎ বংশগত ও গুণগত জাতিভেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বংশগত জাতিভেদ এখনও বিদ্যমান, গুণ-কর্ম্মগত জাতিভেদ দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায়।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায়ে দেখুন—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণ-কর্ম্মানুসারে ভিন্ন জাতি হয়, ইহার আরও প্রমাণ আছে। যথা বায়ু পুরাণে—

পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতদ্ বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।

শুনকের বংশে বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র হইয়াছিল। আরও বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় —

গৃৎসমদস্য শুনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাহভূৎ।

শুনক চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন। আরও আছে।—

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষিত্বং গতঃ প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্॥

রাজা বীতহব্য যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। এ প্রমাণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবার দৃষ্টান্ত মিলিল না কি? আরও হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে।—

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত বিশ্বামিত্র মহোদয় যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত। শাস্ত্রে, তাঁহার দেহ বিনাশ করিয়া পুনর্দ্দেহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কথিত আছে। সেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্ভব বা অসম্ভব, তাহা এখানে আলোচ্য না হইলেও বুঝা যায়, ঐ টুকু বংশগত জাতিভেদের খাতিরে গোঁজামিল। বর্ত্তমান যুগেও কৌলিন্য-প্রথার কৃপাতাপে কত নিম্নজাতি, ঘটকের অঘটন ঘটাইবার ক্ষমতায়, রজতচন্দ্রের কল্যাণে একেবারে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছে! তবে ইহাতে গুণ-কর্ম্মের কিছু নাই; আর এ নিম্নতা গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল, এই মাত্র পার্থক্য। এখনও—অল্পদিনের কথা,—

"* * * আমি যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত।" ইত্যাদি শ্লোক আবালবৃদ্ধ বঙ্গীয় জনের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের শুভাদৃষ্টবশতঃ ভারতীয় সমাজের উদরাগ্নিতে অনেক কোটি বৌদ্ধ জাতিভেদ ত্যাগী ব্যক্তির গুণ-কর্ম্ম-জন্ম সবই পরিপাক পাইতে পারিয়াছে! বংশগত জাতিভেদ যে কতরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা অল্পদিন পূর্ব্বের "ভরার মেয়ে বিবাহে" অনেক বুঝা যায়। ব্যভিচারের কথা বলিতে চাহি না। গুণ, কর্ম্ম এবং জন্ম, এই মাত্র শাস্ত্রীয় জাতিভেদের নিদান। তাহার কোনওটী বর্ত্তমান

সমাজে অক্ষুণ্ণ নহে ; সুতরাং বর্ত্তমান-জাতি-ভেদ, না জন্মানুসারে, না গুণ-কর্ম্মানুসারে ; বস্তুতঃ অশাস্ত্রীয় ; যেহেতু শাস্ত্রে ঐ উভয়বিধ ব্যতীত অন্য উপায়ে জাতিভেদ সমর্থিত হয় নাই।

শাস্ত্রের জাতিভেদে যুক্তি আছে কি না, তাহা আমরা এখন দেখাইব। সম্প্রতি দেখা যায়, গুণ, কর্ম্ম এবং জন্মানুসারে জাতি-ভেদ হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে আছে।

যখন দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা পত্পত্ রবে উড্ডীন থাকে, তখন দেশীয় ব্যক্তিবর্গের চতুর্দ্ধাবিভাগ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণশ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা দেশের মহোপকার সাধন করিতেন। ক্ষত্রিয়-শক্তি বাহুবলে অস্ত্র-তেজে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তি সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। বৈশ্য জাতি ধন-ধান্য দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ রাখিতেন। বাণিজ্য ও গো-রক্ষায় দেশের অসংখ্য অভাব পূরণ ও বিদেশীয় বিজাতীয় উন্নতির অংশ গ্রহণ করাতে বিবিধ হিত সাধন হইত এবং কৃষিবল অক্ষুণ্ণ থাকিত। এই তিন সম্প্রদায়ই দেশের কর্ম্মযোগী। চতুর্থ শূদ্রগণ জ্ঞানচর্চ্চা, রাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির অযোগ্য বলিয়া কেবল ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। দেশে যখন শান্তির সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন এই অপূর্ব্ব প্রথাই দেশের অশেষ মঙ্গল নিদান হয়। বিদেশীয় বিজাতীয় জনের নিকট পরাজিত পদদলিত ঘৃণিত দেশের পক্ষে ক্ষত্রিয়-শক্তি স্বপ্নদর্শন। কৃষি-বাণিজ্য আবশ্যক, কিন্তু তাহাতেও বর্ত্তমান সমাজ উদর-পোষণ করিতে পারিতেছেনা। গ্রাসাচ্ছাদন নিষ্পন্ন হওয়াও যখন কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তখন দেশের বৈশ্য-বল বৃথা হইয়া গিয়াছে। শূদ্রকর্ম্ম পরিচর্য্যাই এখন সকলেরই তাহাই সম্বল ; কিন্তু ইহাতে জাতীয় জীবন উন্নতির স্রোতে নীত হয় না ; অতএব রন্ধনকারী 'পশ্চিমে ব্রাহ্মণ' কায়স্থ প্রভুর পদমর্দ্দন করুক, আর কায়স্থ স্বজাতি অথবা পরজাতির বাটীতে খানসামাগিরিই করুক, কিছুতেই দেশের জাতীয় উপকারের প্রত্যাশা নাই। অধিকন্তু উদরান্ন সংস্থানের সম্ভাবনা থাকিলেও, স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা অতিক্রম করেন নাই ; এই জন্য শ্বেতাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, কাহারও সেবায় আমাদের জাতিভেদের মর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণবল এখন কেবল সমাজের গলগণ্ডে বিস্ফোটক মাত্র। যে জ্ঞানের আলোচনায়, যে দর্শন-বিজ্ঞানের গৌরবে, যে গণিতের, যে সমাজনীতির—অর্থনীতির মহিমায় ভারতের নাম জগতের মুখে শুনা যায়, যে জন্য ভারত জগতের সম্মানার্হ, যে ধর্ম্মবিজ্ঞানে ভারত সমগ্র সভ্যজগতের আচার্য্য, সেই জ্ঞান, সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-শক্তি। সেই শক্তি কুশিক্ষায়—কুদীক্ষায়, অনাচারে, অত্যাচারে, ব্যভিচারে, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা কলঙ্কিত করিয়া, সেই কলঙ্ক-মসী স্বীয় গাত্রে মাখিয়া মলিন দীন ক্ষীণ পরাধীন হইয়াছে। বলিতে গেলে, এক কথায়—ভারতের জাতীয় জীবনের মূলদেশ দৃঢ়রূপে আঘাতিত, এমন কি—অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং ভারতীয় বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রোক্ত উভয়বিধ জাতিভেদই

বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছু নয়। আমরা বর্ত্তমান কালোপযোগী জাতিভেদ বুঝিবার জন্য শাস্ত্রীয় জাতিভেদের যৌক্তিকতা ও মৌলিকতা এবং বর্ত্তমান জাতিভেদের মৌলিকতা বিচার করিব। পরে উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, এই প্রবন্ধের অবসানে উপস্থিত হইব।

( ক্রমশঃ )

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

---

# আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

( পূর্ব্বানুবৃত্ত। )

ব্রহ্মচারীর কেশবপন ব্যাপার পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার প্রকার-বিশেষ প্রতিপাদিত হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

দক্ষিণতো মাতা ব্রহ্মচারী বানড় হে শকৃৎপিণ্ডে যবান নিধায় তস্মিন কেশান্ উপযমা উত্তরয়া উডুম্বরমূলে দর্ভস্তম্বে বা নিদধাতি। ৮

যে ব্রহ্মচারীর কেশবপন করা হইতেছে, তাহার মাতা অথবা অন্য কোনও ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়া, কোন পাত্রে বৃষগোময়পিণ্ড স্থাপন করিয়া, তাহাতে কতকগুলি যব ছড়াইয়া দিবেন; এবং ঐ পাত্রে কেশসমূহ উপযমন পূর্ব্বক "উপ্তায়কেশান্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা উডুম্বরমূল বা কুশস্তম্বে কেশরাশি রক্ষণ করিবেন। কুমারের মস্তকমুণ্ডন ব্যাপারে মন্ত্রপাঠ আবশ্যক। যদি কুমারের মাতা এই কার্য্যে প্রস্তুত হন, তবে অপর যে কেহ তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া দিবেন। ব্রহ্মচর্য্যবান্ ব্রাহ্মণ হইলে, তিনি স্বাধ্যায়শীল, সুতরাং তাঁহাকে অপরের পড়াইবার অপেক্ষা নাই।

স্নাতমগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে পালাশীংসমিধমুত্তরয়াধাপ্য উত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদাশ্মানমাস্থাপয়তি আতিষ্ঠেতি। ৯

কেশবপনানন্তর স্নাত অলঙ্কৃত বদ্ধশিখ সুবাসা কুমারকে "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবে। তৎ-পরে অগ্নির উপসমাধান হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত শ্রৌতসূত্র-প্রতিপাদিত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া, পরে কুমারের দ্বারা পলাশনির্ম্মিত সমিধ প্রদান করাইবেন। আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (আয়ুর্দাদেব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক) কুমারের দ্বারা সমিধ্ প্রদান করাইবেন। মতান্তরে কুমার মন্ত্রপাঠ করিবে, আচার্য্য তাহাকে পড়াইবেন। পাঠের পর অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিতশিলা দক্ষিণচরণের দ্বারা ব্রহ্মচারী আক্রমণ করিবেন; এই সময় আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া "আতিষ্ঠেমং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। সূত্রে "স্নাতং" এই কথাটীর দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদানাদি সমস্ত কর্ম্মের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ইহা বৃত্তিকার হরদত্ত স্বামীর অভিপ্রায়। তিনি বলিতেছেন, "ততস্তং যজ্ঞোপবীতিনং দেবযজনমপ্যনতি

ইতি বোধায়নঃ, তত্সর্ব্বস্ত উপলক্ষণং স্নাত-বচনং।" বোধায়ন বলেন, অনন্তর যজ্ঞোপবীতাকে দেবযজনে উপনয়ন করিবে; সুতরাং এ সূত্রে দেবযজন উপনয়নের পূর্ব্বে যে স্নানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই 'যজ্ঞোপবীতদানাদির উপলক্ষক'। কেশবপনের পরেই স্নান করান, এবং সুবাস পরিধান পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিরূপ ধারণ, ও তদনন্তর যজনস্থানে আচ্ছাদিত দেহে গমন, উপবীত ধারণ, এই সকল কার্য্যের পরেই সমিৎপ্রদানাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুমারকে আচমন করাইবার কথা বলা হয় নাই; কিন্তু বোধায়ন-গৃহ্যসূত্রমতে তাহাও স্নানের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া করিতে হইবে। বোধায়ন বলিয়াছেন, "যজ্ঞোপবীতিনং অপ আচময্য দেবযজনমুপনয়তি" অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে জল দ্বারা আচমন করাইয়া দেবযজন জন্যে লইয়া যাইবে।

অশ্মারোহণের সময় হরদত্তমতে আচার্য্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর দক্ষিণপদ উভ-হাতে ধরিয়া লইয়া তাহাকে শিলায় উঠাইয়া দিবেন। ব্যবহার-বুদ্ধিতে ইহা বড়ই বিসদৃশ দৃশ্য, তবে পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহারিক জগতে হয়ত কোনওকালে এরূপ প্রথাও প্রচলিত ছিল। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে একথা বলেন নাই, তথাপি যখন হরদত্ত বলিয়াছেন, তখন হরদত্তের সমসাময়িক ব্যবহার-বৃত্তান্তে তৎকালীন সমাজের একটা চিত্র ইহা হইতে গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায় নহে। সাধারণের অবগতির জন্য হরদত্তের বাক্যটুকু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। হরদত্ত বলেন "আচার্য্যো মন্ত্রমুক্ত্বা দক্ষিণং পদং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা অশ্মনি নিধাপয়তি।"

বাসঃসদ্যঃকৃত্তোতমন্তরাভ্যামভিমন্ত্র্য উত্তরাভিস্তিসৃভিঃ পরিধাপ্য পরিহিতঃ উত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে। ১০

"সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র রেবতীস্ত্বা" ইত্যাদিমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া 'যা অকৃন্তন' ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রপাঠ করিয়া পরিধান করাইবে এবং 'পরীদং বাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র পরিধানকারী ব্রহ্মচারীকে অভিমন্ত্রিত করিবে। যে বস্ত্র সদ্যঃকৃত্তোত নামে এই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার সূত্রনির্ম্মাণ ও বয়নক্রিয়া একই দিনে করিতে হইবে, এইরূপ কথা হরদত্ত বলিয়াছেন।

সদ্যঃকৃত্তোত শব্দের অর্থ সদ্যনিষ্পন্ন সূত্রজাত বসন। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে সম্প্রতি দেখা যায় না। অস্মদ্দেশে ইহার স্থানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্রই ব্যবহৃত হইতে চলিয়াছে; তবে পূর্ব্ববঙ্গে কোনও কোনও স্থানে "জোলার কাপড়" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপনয়নার্থ ব্রহ্মচারীর পরিধেয়রূপে "জোলার কাপড়" পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয় কিনা, জানিতে পারিবেন; দীন লেখকের পূর্ব্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা অত্যল্প মাত্রই সম্বল, সুতরাং শ্রুতমাত্র বিষয়ে বিশেষ নির্ভর করা চলে না।

মৌঞ্জীং মেখলাং ত্রিবৃতাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং উত্তরাভ্যাং পরিবীয়াজিনমুত্তরমুত্তরয়া॥ ১১॥

অনন্তর আচার্য্য কুমারকে মুঞ্জ-নির্ম্মিত মেখলা দ্বারা 'দুরুক্তাৎ' ইত্যাদি

মন্ত্রপাঠ সহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ পরিন্যাস করিবেন। মেখলা ত্রিবৃতা, অর্থাৎ ত্রিরাবৃত্তা, তিন তারওয়ালা। এই মেখলা ধারণ করিবার মন্ত্র বলা হইল। অজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম "অজিনং কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধারণ করাইবেন। মেখলা ও অজিনধারণ বিনিযুক্ত মন্ত্র কুমার পাঠ করিবেন, আচার্য্য স্বয়ং তাহাকে পড়াইবেন। মেখলা ধারণ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু কোথাও মুঞ্জনির্ম্মিত, কোথাওবা কুশনির্ম্মিত মেখলা ধারণ করা হইয়া থাকে। অজিনধারণ এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী সূত্ররচিত যজ্ঞোপবীতের একস্থানে একটী সর্ষপপরিমাণ চর্ম্মের টুক্রা বাঁধিয়া তাহাই ধারণ করা হয়। ঐ চর্ম্মটুকু প্রায়ই যজমানকে সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরোহিত ঠাকুরের পুঁথির গাত্রে উহার বড় একটা টুকরা সহস্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের যজ্ঞোপবীত পবিত্র করিবার জন্য বহুকাল হইতেই বাঁধা থাকে, তদ্দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় উপনয়ন-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, কৃষ্ণাজিন ধারণের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রীয়তা কি। সম্প্রতি অজ্ঞাতসূত্রতাস্থ চর্ম্মখণ্ড-বিশেষ সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া উহার মহিমা এবং কুসংস্কারের প্রাবল্য ও শাস্ত্রমর্ম্মের অবমাননার প্রমাণ স্পষ্টরূপে উপস্থিত করিতেছে। অধঃপতিত সমাজ আর কৌলিক মার্জ্জার-বন্ধন প্রথার অনুসরণ না করিয়া পারিবে কেন? উদ্দেশ্য ভুল হইলে কাজটা একটা খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের সংস্কারানুষ্ঠানাদি বিকৃত হইতে হইতে একেবারেই কিছু নয় মত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদের এদিকে লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্‌ঘাটন, প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ ও তাহার মৌলিক সত্যাবিষ্কার এখন পণ্ডিত-সমাজের কর্ত্তব্যের বাহিরে গিয়াছে। এখন 'বিদায়' ভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য নিক্ষেপের সময় নাই। হা আর্য্যাচার! তুমি এখনও হতভাগ্য সমাজের উপর করুণাকটাক্ষপাত কর।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য তেষ্বেন-মুত্তরয়াবস্থাপ্যোদকাঞ্জলিমাপ্য অঞ্জলাবানীয় উত্তরয়া ত্রিঃ প্রোক্ষ্য উত্তরৈর্দক্ষিণে হস্তে গৃহীত্বা উত্তরৈর্দেবতাভ্যঃ পরিদায়োত্তরেণ যজুষা উপনীয় সুপ্রজা ইতি দক্ষিণে কর্ণে

জপতি ১২

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে কুশ বিস্তৃত করিয়া সেই কুশসমূহের উপরিভাগে উপনেতব্য কুমারকে অবস্থিত করাইবেন। তৎকালে আচার্য্য "আগন্ত্রা সমগন্মহি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবেন। কুমারকে কুশে বসাইয়া, নিজে ভূমিতে অবস্থান করিয়া, নিজের হস্তের অঞ্জলি জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই জলাঞ্জলি কুমারের হস্তে দিবেন। অনন্তর ঐ জলাঞ্জলিদ্বারা "সমুদ্রাদূর্ম্মিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনবার প্রোক্ষণ করিতে হইবে (প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জল ছিটাইয়া দেওয়া।) অনন্তর ব্রহ্মচারীকে দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া আচার্য্য "অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ" ইত্যাদি দশমন্ত্র পাঠ করিবেন। কুমার আচার্য্যের অনুমতিমতে স্বপাঠ্য মন্ত্র পাড়

বেন। তৎপরে তাঁহাকে "অগ্নয়েত্বা পরিদদামি" ইত্যাদি একাদশমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর "দেবস্যত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপনয়ন করিবে। হরদত্ত বলেন "যজুরুচ্চারণমেব তত্র ব্যাপারো নান্যঃকশ্চিৎ"। এখানে যজুর্ব্বেদীয় "দেবস্যত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ব্যতীত আর কিছুই করিতে হইবে না।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারীকে এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গুরুকুলে লইয়া যাওয়া হইত; হরদত্তের সময়ে গুরুগৃহে বাস প্রথা বিলুপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করা প্রচলিত হইয়াছিল, কাজেই তিনি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মন্ত্রপাঠ ভিন্ন কিছু করিতে হইবে না।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর দক্ষিণকর্ণে আচার্য্য 'সুপ্রজ্ঞা' ইত্যাদি মন্ত্রজপ করিবেন। উপনয়ন কথার অর্থ গুরুগৃহে শিক্ষার্থ লইয়া যাওয়া, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি অস্মদ্দেশে কোন কোন প্রদেশে গুরুগৃহবাস ও বেদপাঠ প্রচলিত নাই, তবে স্থানে স্থানে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে দুইচারি লোককে বেদপারায়ণ দেখা যায়। ভারতের অন্যস্থলে ইহা প্রচলিত নাই; সুতরাং উপনয়ন এখন নাই, তবে উপনয়নকালে যে সকল যাগদানাদি ও পূজার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইত, ভারতের প্রদেশসকলে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা অদ্যাপি তাহাদের যথাকথঞ্চিৎ বিকৃত নিয়ম সকল ও পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া ঐ প্রথার স্মৃতি জাগাইতেছেন।

দশমখণ্ড
সম্পূর্ণ

---

## একাদশখণ্ড, চতুর্থপটল।

এইখণ্ডে উপনয়নের প্রকৃত মৌলিক উদ্দেশ্য বিবৃত হইতেছে। উপনয়ন কেবল ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়নের সূচনা করিয়া দেয়, তজ্জন্যই এই সংস্কারের এত গৌরব। জীবনে ব্রহ্মচর্য্যই পবিত্রতার জনক—ব্রহ্মজ্যোতির আবির্ভাবসম্পাদক। এতক্ষণ এই প্রধান কার্য্যের জীবনোন্নয়নের—জ্ঞানবিকাশের এই মূল রহস্যের পূর্ব্বকার্য্য সকলই কথিত হইতেছিল, এই সূত্রে সেই ব্রহ্মচর্য্য-বৃত্তান্তের পরিচয় দেওয়া হইবে। গুর্ব্বভিবাদন ইহার "প্রারম্ভ।" আপস্তম্ব দেখাইতেছেন,——

ব্রহ্মচর্য্যমাগামিতি কুমার আহ।১

কুমার গুরুগৃহে গিয়া" ব্রহ্মচর্য্যমাগাং" ইত্যাদি "সবিত্রাপ্রসূত" ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চরবে উচ্চারণ করিবে। হরদত্ত বলেন "আহ" কথাটীর অর্থ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা।

পৃষ্টং পরস্য প্রতিবচনং কুমারস্য।২

'কোনামাসি' ইত্যাদি মন্ত্ররূপ আচার্য্যের প্রশ্নে, 'শ্রীঅমুকনামাস্মি' এইরূপ কুমার প্রতিবচন প্রদান করিবেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবেন "কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি অমুক !" (ওহে! তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? এইরূপ অর্থ।) ব্রহ্মচারী বলিবেন, "প্রাণস্যব্রহ্মচার্য্যস্মি।" (আমি প্রাণের ব্রহ্মচারী) এক কথায় সূত্রের অর্থ বলিতে হইলে বলিতে হইবে, "কোনামাসি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর বোধক চারিটী মন্ত্রের মধ্যে প্রশ্নবোধক মন্ত্র আচার্য্যের প্রশ্ন এবং উত্তরবোধক মন্ত্র কুমারের প্রত্যুত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। গৃহ্যসূত্রে সাধারণতঃ মন্ত্রবিনিয়োগ-

প্রণালীর অনুসরণ করার ক্রিয়া-প্রতিপাদনের ক্রম-ভঙ্গ হয়।

শেষং পরো জপতি। ৩

শেষ অর্থাৎ অনুবাক শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্র আচার্য্য পাঠ করিবেন। সুদর্শনাচার্য্যের মতে শেষ অর্থ অনুবাকশেষৈকদেশ "বিষ্ণুশর্ম্মবতে দেব" ইত্যাদি "অনুসঞ্চর বিষ্ণুশর্ম্মন্" ইত্যন্ত মন্ত্রই আচার্য্যের পাঠ্য।

প্রত্যগাশীষং চৈনং বাচয়তি। ৪

তৎপরে আচার্য্য কুমারকে প্রত্যগাশী-মন্ত্র পড়াইবেন। "অধ্বনামধ্বপতে" ইত্যাদি মন্ত্রই প্রত্যাগাশীর্মন্ত্র, এইরূপ হরদত্ত বলেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "অধ্বনাং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন-সমাপ্তি পর্য্যন্ত "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি যে সকল প্রত্যগাশীর্মন্ত্র অর্থাৎ আত্মগামী আশীর্বাদ-বোধকমন্ত্র আছে, তাহা সকলই পাঠ করাইতে হইবে। আচার্য্য নিজে পাঠ করিবেন, কুমার শ্রবণ করিয়া অনুচ্চারণ করিবেন।

উক্তমাজ্যভাগান্তং। ৫

আজ্যভাগান্ত উক্ত করিয়া পশ্চাৎ যে প্রত্যগাশীর্মন্ত্র মেখলা পরিধাপনাদি ব্যাপারে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই "ইয়ং দুরুক্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করাইতে হইবে, ইহাই সূত্রার্থ।

অর্থৈনমুত্তরা আহুতীর্হাবয়িত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে। ৬।

প্রত্যগাশীর্ব্বাচনের পর "যোগেযোগঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকৃত একাদশটী প্রধানাহুতি আচার্য্য কুমারের দ্বারা প্রদান করাইবেন। প্রকৃতপক্ষে কুমার ঐ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ একাদশটী প্রধান আহুতি দিবে আচার্য্য কেবল প্রযোজককর্ত্তা মাত্র। মন্ত্র পড়াইয়া দিলেই তাঁহার প্রযোজকত্ব সিদ্ধি হইল। একাদশ আহুতি শেষ হইলে, আচার্য্য স্বয়ংই জয়াদিহোম সম্পাদন করিবেন। এখানে ব্রহ্মচারীর দ্বারা করাইলে চলিবে না।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা অপরেণাগ্নিমুদগগ্রং কূর্চং নিধায় তস্মিন্ উত্তরেণ যজুষোপনেতোপবিশতি। ৭

জয়াদিহোম ও পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অগ্নির অপরদিকে কূর্চনামক কুশময় আসন স্থাপন করিয়া, 'রাষ্ট্রভৃদসি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচার্য্য ঐ কূর্চাসনে উপবেশন করিবেন।

পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ঙাসীনঃ কুমারো দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমন্বারভ্যাহ সাবিত্রীংভো-অনুব্রূহীতি। ৮।

আচার্য্যের সম্মুখে প্রত্যঙ্মুখ উপবিষ্ট কুমার দক্ষিণকরদ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ-চরণ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলিবে, "সাবিত্রীংভোঅনুব্রূহি।" (সাবিত্রী মন্ত্রটী আমাকে একবার বলুন, এইরূপ অর্থ।) সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণই উপনয়নের দীক্ষাংশ। সবিতা অর্থ সূর্য্য অথবা জগৎপ্রসবকর্ত্তা পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধী মন্ত্রকেই সাবিত্রী মন্ত্র বলা সঙ্গত। আমরা দেখিতে পাই গায়ত্রী মন্ত্রই সাবিত্রী মন্ত্র নামে আখ্যাত হয়। এই মন্ত্রে সেই শ্রেষ্ঠাৎশ্রেষ্ঠতর জগৎপ্রসবকর্ত্তার মহামহিম তেজঃ, মহিমা অথবা অলৌকিকজ্যোতি একমাত্র ধ্যেয় পদার্থ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই পরম

তেজঃ যে জীবজালের বিবেকবুদ্ধির প্রণোদক, ইহাও ঐ মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, এজন্য এই মন্ত্রকে পণ্ডিতেরা সাবিত্রীমন্ত্রই বলেন। সাবিত্রী বেদত্রয়ের সারসংকলন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম শ্রোতব্য এবং শিক্ষণীয়। বেদাধ্যায়ী বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের পরমজ্যোতির বিষয়ই সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া, পরে বেদবিচার-বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলে, কোনমতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না, এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসারভূত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত বিদ্যা বা জ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মজ্ঞান, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই উপদেশই অপেক্ষিত, অতএব সর্ব্বতোভাবেই প্রথমে সাবিত্রী শিক্ষা করা সঙ্গত। প্রথমে মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, আর কেহ সহসা ভ্রমে পতিত হয় না।

তস্মা অন্বাহ তৎসবিতুরিতি ॥৯

ব্রহ্মচারী সাবিত্রী শুনিতে চাহিলে, আচার্য্য তাঁহাকে "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্র অর্থাৎ সবিতৃদৈবত ঋক্ মন্ত্র উপদেশ দিবেন। এই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র কিরূপে পড়াইবেন, তাহার প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথম শিশিক্ষু কুমার একেবারে সমগ্র মন্ত্রটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কিনা, এই আশঙ্কায় উহা অংশ অংশ করিয়া ক্রমে ক্রমে শিখাইয়া, পরে সমগ্র মন্ত্র পাঠ করান উচিত বিবেচনা করিয়াই মহর্ষি আপস্তম্ব উহার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পচ্ছোঽর্দ্ধর্চ্চশস্ততঃ সর্ব্বাং। ১০।

প্রথম 'পচ্ছঃ', অর্থাৎ পাদে পাদে পরিসমাপ্তি করিয়া। একপাদ একপাদ ভিন্ন ভিন্ন বারে উচ্চারণ করিয়া, পরে "অর্দ্ধর্চ্চশঃ" অর্থাৎ সমগ্র ঋক্‌টীর অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক একএকবারে উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর সমগ্র মন্ত্রটী একেবারে উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাই "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের ক্রম।

এই পাঠের বিশেষ নিয়ম বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে,—

ব্যাহৃতীর্বিহৃতাঃ পাদাদিষন্তেষু বা।১১।

প্রথমে যেবার এক,একপাদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেইবারে প্রত্যেক পাদের শেষে অথবা প্রথমে একএকটী ব্যাহৃতি সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া পাঠের সময় এবং সমস্ত পাঠ কালে কিরূপে ব্যাহৃতিযোগ করিতে হইবে, তাহা এতৎসূত্রে মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন।

তথার্দ্ধর্চ্চয়োরুত্তমাং কৃৎস্নায়াম্।১২

দ্বিতীয়বার পাঠকালে অর্থাৎ যেবার অর্দ্ধর্চ্চ অর্দ্ধর্চ্চ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, সেবার অর্দ্ধর্চ্চ দুইটীর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে প্রথম দুইটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। আর অবশিষ্ট তৃতীয় ব্যাহৃতিটী সমগ্র মন্ত্রপাঠ সময়ে সংযোগ করিতে হইবে। প্রত্যেকবার পাঠকালেই সর্ব্বসারভূত প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" এই বাক্যটী সর্ব্বাগ্রে যোজনা করিতে হইবে। এখন পাঠের রীতি হইল "ওঁ ভূঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং" "ওঁ ভুবঃ ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁ স্বঃ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ

প্রথমপাদশঃ পাঠকালে। "ওঁ ভূঃ তৎসবিতু-র্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি" "ওঁভুবঃ ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এইরূপ দ্বিতীয়বার পাঠসময়ে। তৃতীয়বার পঠন সময়ে "ওঁ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি. ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।" এইরূপ ক্রম ঋগ্বেদীয়গণের সাবিত্রীপাঠে ব্যবহৃত হয়, অন্যবেদীয় প্রথায় শাখান্তরে ব্যাহৃতিপাঠে একটু বিশেষত্ব কদাচিৎ উপলব্ধ হয়, বিস্তারভয়ে সে সকল বিধান বিবেচিত হইল না। বৃত্তিকার হরদত্ত এইরূপ ক্রমপ্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্য হইতেই আমরা রীতি অনুবাদ করিলাম। সুধীগণ জানিবেন, সুদর্শনাচার্য্য এখানে অন্যপ্রকার মত অবলম্বন করেন নাই, এইমতেই অনু-মোদন করিয়াছেন।

কুমার উত্তরেণ মন্ত্রেণোত্তরমোষ্ঠমুপ-স্পৃশতে।১৩

অনন্তর সেই স্থানে উপবিষ্ট কুমার "অবৃধমসৌ" ইত্যাদি উত্তরমন্ত্র দ্বারা নিজের ওষ্ঠ উপস্পর্শন করিবে। মন্ত্রে যে 'অসৌ' শব্দটী রহিয়াছে, তাহার অর্থ প্রাণ। কুমার বা আচার্য্য কেহই এই 'অসৌ' শব্দের বাচ্য নহে। যদি কুমার হইত, তাহাহইলে নামোল্লেখ করা হইত, অর্থাৎ 'অসৌ' শব্দের স্থানে কুমারের নামটী নিবেশ করিয়া, সেই কুমার নামযুক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইত। সূত্রের "উপস্পৃশতে" এই আত্মনেপদ বিধান ছান্দসত্বপ্রযুক্ত। বেদে সর্ব্বত্র ব্যাকরণ-নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, বেদ অতি প্রাচীন ভাষা, জগতের যাবতীয় সভ্য-জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে রচিত গ্রন্থই বেদ। জগতে পুস্তকপ্রণয়নের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুর ঋগ্বেদকে সর্ব্বপ্রথমস্থানে উল্লেখ করিতে হইবে। এহেন বেদ রচনার কালে ব্যাকরণের নিয়ম বড়ই শিথিল ছিল। ভাষার প্রথমদশায় বা বর্দ্ধনশীল অবস্থায়, তাহা ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে পারে না। বস্তুতঃ তখন ভাষার ব্যাকরণও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কাজেই বেদের ভাষা সর্ব্বদা ব্যাকণের নিয়মের ধার ধারিতে বাধ্য হয় না। অপর কেহ বলেন যে, সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মদ্বারা বৈদিকভাষা শাসিত হয় না বটে, কিন্তু বৈদিকব্যাকণের দ্বারা উহা নিয়-মিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ, প্রক্রিয়াকৌমুদী, রত্নমালা, হরিনামামৃত, লঘুকৌমুদী এবং মধ্যকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ দ্বারা যে সমস্ত বৈদিকপদ সাধিত হয় না, তাহারাই আবার পাণিনীয় ব্যাক-রণের দ্বারা সমর্থিত হয়। সকল মতেই সামঞ্জস্য অল্লাধিক আছে।

কর্ণাবুত্তরেণ।১৪

অনন্তর কুমার "ব্রহ্মণ আণীস্থ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এককালীন স্বকীয় কর্ণযুগল দুইহস্তে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বসূত্রের "উপ-স্পৃশতে" পদের সহিত এই সূত্রের অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

দণ্ডমুত্তরেণাদত্তে।১৫

"সুশ্রবঃ সুশ্রবসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দণ্ডগ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারীর দণ্ডগ্রহণ প্রথা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত রহিয়াছে, তবে

দণ্ডধারণের সময় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যকাল তিন রাত্রিতে শেষ হওয়ায়, প্রায় সর্ব্বত্রই তৎপরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এখনও সাতরাত্রি ঘরে থাকিবার প্রথা আছে।

কোন্ অধিকারীর দণ্ড কিরূপ কাষ্ঠজাত হইবে, তাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইতেছে।

পালাশো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৈয়গ্রোধস্কন্ধজোবাঙ্গ্রোরাজন্যস্য বাদর ঔডুম্বরো বা বৈশ্যস্য। ১৬

পলাশবৃক্ষজাত দণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী স্কন্ধজ অবাচীনাগ্র ন্যগ্রোধবৃক্ষজাত দণ্ডগ্রহণ করিকরিবেন। বৈশ্যব্রহ্মচারী বদর বা ঔডুম্বর বৃক্ষজাত দণ্ড গ্রহণ করিবেন। বর্ণগত পার্থক্যের সহিত দণ্ডেরও পার্থক্য বিধান উক্ত হইল।

পার্থক্য কথনের পর এই সূত্রে যাহা বলা হইতেছে, তাহা অধিকারিবিশেষের জন্য নহে; এই বিধি সর্ব্বসাধারণ। এখানে বিধ র্থ করিতে হইলে অনুবাদ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধি করিতে হয়।

বার্ক্ষোদণ্ড ইত্যবর্ণ সংযোগেনৈকেউপদিশন্তি। ১৭

যজ্ঞীয় বৃক্ষবিকারজ দণ্ড কোনও বর্ণের সহিত সংযুক্ত নহে, অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণসাধারণ, এইরূপ কোনও কোনও আচার্য্য উপদেশ দিয়া থাকেন। বর্ণত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিশেষভাব পরিহারপূর্ব্বক এই সূত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

স্বস্তং চ ম ইত্যোতদ্বাচয়িত্বা গুরবে বরং দত্বা উদায়ুষেত্যুত্থাপ্য উত্তরৈরাদিত্যমুপস্থিতে॥ ১৮

কুমার দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক সেইস্থানে উপবেশন করতঃ 'স্বস্তং চ ম' ইত্যাদি ব্রত সংকীর্ত্তন করিবে। এই 'স্বস্তং চ ম' ব্রতসংকীর্ত্তন মন্ত্র আচার্য্য কুমারকে পড়াইবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী "গুরো! বরং তে দদামি" ইত্যাদি মন্ত্রে আচার্য্যকে বর দিবেন। তৎপরে আচার্য্য কুমারকে "উদায়ুষা" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপিত করিবেন। "তচ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি সূর্য্যাংদৃশঃ" ইত্যন্ত মন্ত্রসমূহদ্বারা আদিত্যোপস্থান করিতে হইবে। এই মন্ত্রসকল আচার্য্য পড়াইবেন, ব্রহ্মচারী পাঠ করিবেন। 'ণিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, প্রযোজকত্বরূপে আচার্য্যের কর্ত্তৃত্ব-প্রতিপাদনও এখানকার লক্ষ্য নহে।

যং কাময়েত নায়মচ্ছিদ্যেতেতি তমুক্ত্বা দক্ষিণে হস্তে গৃহ্ণীয়াৎ। ১৯

যে কুমার সমাবর্ত্তন (ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহগমনকালে সমাবর্ত্তন নামক হোম করিতে হয়।) পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে ছিন্ন হইবে না, অর্থাৎ বিপ্রযুক্ত হইবে না (অন্যত্র চলিয়া যাইবে না) বলিয়া আচার্য্য মনে বাঞ্ছা করিবেন, তাহার দক্ষিণহস্ত "যস্মিন্ভূতং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবেন। ছাত্র ব্রহ্মচারী অন্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে না যায়, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ণব্রহ্মচর্য্যকাল আমার নিকটই পড়িবে, এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, আচার্য্য ঐ মন্ত্রপাঠ করিয়া শিষ্যের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিবে। প্রাচীনকালে শিষ্য বড় সম্মানের সম্পত্তি ছিল। শিষ্য যাহাতে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিতে না পারে, তাহার জন্ত বৈদিক মন্ত্রাদি-চেষ্টাও করা হইত। শিষ্য ভাগিয়া না যায়, ইহা এখনও বেশ লক্ষ্য করিবার জিনিষ; যখন শিষ্যাই সম্বল ছিল, তখন যে উহা কত অধিক মাত্রায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ছাত্রসংরক্ষণ আবশ্যকও বটে।

ত্র্যহমেতমগ্নিং ধারয়ন্তি। ২০

ব্রহ্মচারীকে তিনদিবস পর্য্যন্ত উপনয়নাগ্নি ধারণ করাইবে।

ক্ষারলবণবর্জ্জনংচ। ২১

ক্ষারলবণাদিশূন্য ভোজন অর্থাৎ (তাৎপর্য্যাধীন) হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাইবে।

ব্রহ্মচর্য্য-জীবন কঠোরতার সুযোগ্য শিক্ষাস্থল। মনোমত আহার্য্যগ্রহণ ও বিলাস-বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিলে, মানব পৌরুষশক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ অলস অবস্থায় উপনীত হন এবং জীবনের উন্নতির আশা ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হন। সুতরাং কর্ত্তব্যের কুটিল ও কণ্টকিত পথে পদার্পণ করিতে তিনি অপারগ হইয়া উঠেন। ব্রহ্মচর্য্য এইজন্য মানবকে শিক্ষা দেয় যে, কষ্ট-দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, বিপদের প্রতি-কূলে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে। আহার-নিয়ম-সঙ্কোচ লাভ না করিলে, মানব ঔদ্ধত্য নামক রজোগুণের কার্য্য অতিক্রম করিয়া ধীর, স্থির, শান্তিপ্রিয়তারূপ সাত্ত্বিক-গুণের অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় "ব্রহ্মচারীর প্রতি গোভিলের উপদেশ" নামক প্রবন্ধে উহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। সে সকল প্রবন্ধে ঐ সকল নিয়মের বৈজ্ঞানিক মৌলিকতা সম্বন্ধেও কিছু কিছু সাধারণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ সেই সংখ্যা দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন। এখানে সে বিষয়ে আমরা বিরতিলাভ করিলাম।

পরিষেত্তি পরিমৃজ্য তস্মিন্ত্ত্বরয়ৈর্মন্ত্রৈঃ সমিধ আদধ্যাৎ। ২২

"পরিত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উপন-য়নাগ্নির চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা মার্জ্জন করিয়া, "অগ্নয়ে সমিধং" ইত্যাদি দ্বাদশমন্ত্র দ্বারা দ্বাদশ-খানি সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবে। এই সমিৎপ্রদান কার্য্য নিত্যকর্ম্ম। হরদত্ত-মতে প্রত্যহই দ্বাদশখানি সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নিধারী ব্রহ্মচারীর উপ-নয়নাগ্নিতে এই হোমকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

এবমন্যস্মিন্নপি। ২৩

অন্য অগ্নিতেও এই সমিৎপ্রদান করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নি চিরকাল ধারণ করা কর্ত্তব্য; অপারগ হইলে, কেবল তিন দিনে চলিবে। পূর্ব্বে যে তিনদিন ধারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপারগতা পক্ষে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিত্য উপনয়নাগ্নি ধারণ করিবেন, তাঁহারা তিন দিন ঐ উপনয়নাগ্নিতে সমিধ্ দিবেন, পরে অন্য অগ্নিতে সমিধ্ দিবেন। যে অগ্নিতে হউক না কেন সমিৎপ্রদান নিত্যকর্ম্ম, উহা করিতে হইবে। উপনয়নাগ্নি ধারণ করা হয়, তাহই

নচেৎ অগ্নি আঘাতে দিলেও চলিবে। ফলে সমিধ্ দেওয়াটা বাদ না পড়ে।

ক্রমশঃ—

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ।

( বেদবিদ্যালয়, যশোহর। )

---

# আত্মজ্ঞান।

জীবাত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্থূল দেহের সহিত যেমন তাঁহার সম্পর্ক নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণদেহের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ নাই। মন, বুদ্ধি ,ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমষ্টিকে 'সূক্ষ্ম-দেহ' কহে এবং আদ্য-উপাদন-স্বরূপিণী অব্যক্ত-প্রকৃতিকে 'কারণ-শরীর' কহে। অতএব স্থূলদেহ জীবাত্মা নহেন; সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদিও জীবাত্মা নহেন। কেহ কেহ মন-বুদ্ধিকে জীবাত্মা বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু মহর্ষি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, মনোবুদ্ধি, জীবাত্মারূপ কর্ত্তার করণ মাত্র; সুতরাং মনোবুদ্ধ্যাদি সহিত সূক্ষ্ম দেহ এবং প্রকৃতি বা স্বভাবরূপী কারণ-দেহও জীবাত্মা নহেন। উক্ত কোনরূপ দেহ তাঁহার উপাদান নহে এবং তিনিও কোনরূপ দেহের উপাদান নহেন। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহ তাঁহার স্বজাতীয় ও আত্মীয় স্থান নহে। সেই সব দেহ হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবাত্মা স্বতন্ত্র এবং সে প্রত্যেক দেহই অনাত্মা। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন জীবের দেহ, বৃক্ষাদি কোন স্থাবর পদার্থের দেহ, অথবা দৈব ও আসুরিক কোন মূর্ত্তি জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা, জন্ম-বৃদ্ধি-অপক্ষয়-পরিণামশূন্য এবং অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী। রথচক্রের নাভিদেশে অর সকল যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, জীবাত্মা সকল সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কলার অর্থাৎ করণের সহিত পরমাত্মাতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সৃষ্টি-কালে তাঁহারা ঐ সকল কলার সহিত সেই ব্রহ্মচক্রে প্রকটিত ভাবে ঘূর্ণ্যমাণ হন, এবং প্রত্যেক প্রলয়কালে সেই চক্রেতেই অপ্রকটিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই প্রকটাবস্থা উপলক্ষে তাঁহাদের জন্ম এবং তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তর্যামী, চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্যরূপে পরমাত্মার অনুপ্রবেশ পরিকল্পিত হয়; নতুবা পরমার্থতঃ তাঁহাদের জন্ম নাই এবং পরমার্থতঃ জ্যোতিঃ-সম্পন্ন নয়নের ন্যায় তাঁহারা নিত্যকাল কূটস্থ ব্রহ্মের স্বত্বকল্প চিদাভাস সমন্বিত। এই পরমাত্মা ও জীবাত্মার আত্মীয় সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়তত্ত্ব এবং প্রাকৃত-বুদ্ধি-যুক্তির অগম্য। জীবাত্মার ন্যায় ঐ সমস্ত উপাধির আদি-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিও ব্রহ্মচক্রের অন্তর্গত। জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব।

"তদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে।"

সেই একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদিত হয়। যে জীবাত্মার ঐ ব্রহ্মচক্রে, অর-স্বরূপে পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয়, তিনি ঐ চক্রের নাভিদেশে স্থান লাভ করেন; আর তাঁহাকে ঘূর্ণ্যমান হইতে হয় না। ইহাই শান্তি;

ইহাই মোক্ষ। ইহারই নাম ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাব প্রত্যেক মুক্ত আত্মার পক্ষে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও প্রলয়েরও মহানন্দময় মহা জাগ্রত অবস্থা। যদিও সমস্তই ব্রহ্ম, কিন্তু যতদিন চক্রে পরিভ্রমণ, ততদিন আত্মহারা হইয়া, জীব, প্রকৃতিকে আত্মস্বে বরণ করেন; কেননা প্রকৃতি ফল-ফুলে পরম শোভাময় এবং দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সচেতন উপাধি দ্বারা পরমসুখের প্রস্রবণ। এই-রূপে আত্মতত্ত্ব রূপ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এবং আত্মতত্ত্বরূপ নিবাসে নিরাশ হইয়া, জীবাত্মা প্রবাসে ভ্রমণ করেন। আত্ম-তত্ত্বের অন্বেষণ করেন না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও সুখ-সম্পদ-সম্বন্ধাধীন তিনি আপনাকে কর্ত্তা-ভোক্তা রূপে অভিমান করেন। কিন্তু যখন আত্মরতি নিবন্ধন প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, দেহ আত্মা নহে, এই বিবেক-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয়, সর্ব্বপ্রকার ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং "আমি হই—আমি করি" এই অভিমান বিদূরিত হয়, তখন জীবাত্মা আপনার উৎসস্বরূপ একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ভূমা পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি করেন। পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা, জগ-তের আত্মা, জগদ্‌যোনি, সকল আত্মার একাধার ও মহাসদ্ভাব। জীবাত্মা, এইরূপে দেহাত্মজ্ঞান ও নানাপ্রকার দেহসম্পর্কীয় জীবভাব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, বিসর্জন দিয়া, পরমাত্মাকে যে আত্মধাম ও আত্ম রূপে জ্ঞান করেন, সেই জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) কেবলমাত্র জীবাত্মার অমরত্ববোধ বা লোকান্তরে পরিভ্রমণের বিশ্বাস আত্ম-জ্ঞান নহে। কেননা, সে জ্ঞানে মোক্ষ হয় না। জীবাত্মাতে ঐহিক পারত্রিক কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাঁহার স্বীয় হৃদয়-গুহাতে আত্মারূপে ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ-অধিষ্ঠান দৃষ্ট হয়। ঐ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়সার, এবং ব্রহ্মাত্মরূপ পুরাতন সম্পত্তি। উহা "জীবাত্মকোষে ছিল না, কোন প্রকার যত্ন বা ক্রিয়া দ্বারা দেশান্তর হইতে আনিলাম" এমন নহে; সুতরাং উহা কোনরূপ পুরুষকার দ্বারা উৎপাদ্য বা অবতরণীয় নহে। আর এমনও নহে যে, অবহেলায় বা যত্নের ত্রুটিতে উহা মলিন-ভাবে আছে, আমি গুণাধান ও সংস্কার দ্বারা উহাকে মাজিয়া ঘষিয়া রসান দিয়া নির্ম্মল করিয়া লইলাম; সুতরাং উহা বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য নহে। "আত্মাতে আত্মাতা করা ব্রহ্মের সাধন।" (রাঃ মোঃ রায়) তাহাই জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ।

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি-
সর্ব্বাত্মনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ।"

একমাত্র ব্রহ্মই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান-নিবৃত্ত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধন দ্বারা জীবাত্মার কোনরূপ সংস্কার ও উন্নতি করা যায় না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্ম্মল। প্রকৃতি ও দেহরূপ আবরণ সরিয়া গেলেই তাঁহার নির্ম্মল তত্ত্ব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া যায়। তখন এক অদ্বয় আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ও দ্বিধাশূন্য আনন্দরূপে প্রতিভাত হন। ঐ আত্মজ্ঞান শুদ্ধ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অপাপবিদ্ধ, অশরীরী, সর্ব্বগত, নিত্য, প্রপঞ্চোপশম, এক, অদ্বিতীয়। উহা কঃ

ভোক্তৃ, দ্রষ্টা, দৃশ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক লক্ষণাক্রান্ত নহে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রকৃতির অতীত এক স্বতন্ত্র আনন্দনিকেতন।

(৩) এত বড় মহা কর্ম্মস্থান যে ভারত কর্ম্মভূমি, যেখানে দ্বিজাতি প্রভৃতি জাতিদিগের অসংখ্য অসংখ্য বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায় সকল, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাখণ্ড পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সাগরাবধি পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এমন ক্রিয়াক্ষেত্রে, ক্রিয়াসংস্পর্শবিহীন আত্মজ্ঞানের উপদেশ স্থান পাইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহার বলবৎ কারণ আছে। তাহা এই যে, ভারতবর্ষে বেদের অসামান্য সম্মান। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বেদশাস্ত্রকে সমভাবে "শব্দ-ব্রহ্ম" অভিধানে আদর করেন। কর্ম্মই হউক আর জ্ঞানই হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহারই নাই। তবে অধিকার বিশেষে যথা যেমন প্রয়োজন, উহার প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কর্ম্মীগণ অনাদর না করিয়া, ঐ অক্রিয়াপর আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে স্ব স্ব অধিকারে ক্রিয়ার লক্ষণ মধ্যে গ্রহণ করেন, এবং অনেক জ্ঞানীও সেইরূপ অখিল কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানে পরিসমাপন করেন। ভগবদ্গীতা—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" হে পার্থ! ফল সহিত শাস্ত্রবিহিত সকল ক্রিয়াই জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে। কিন্তু উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানকে ক্রিয়াসংস্পর্শরহিত রূপেই উপদেশ করেন। ইহাই কর্ম্ম, দেহ ও প্রবৃত্তিসংস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টি।

(৪) ঐ সমস্ত শাস্ত্রের মীমাংসা এই যে, আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ নহে। যজ্ঞ, দান, ব্রত, অনশন, তপস্যা প্রভৃতি বৈদিকী বা তান্ত্রিকী ক্রিয়াই হউক, আর পুরুষকাররূপ সাংসারিক ক্রিয়াই হউক, তাহার ফল প্রকৃতির অধিকারে ইহকাল বা পরকালে শরীর, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ হয় এবং জীবাত্মা সেই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। কোন ফলই শরীর ও মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ ব্যতীত জীব ভোগ করিতে পারেন না। যত প্রকার ভোগ আছে, স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, পার্থিবই হউক আর স্বর্গীয়ই হউক, তাহার ভোক্তাস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত জীবাত্মার প্রয়োজন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাপন্ন জীব দেহাদিতে আত্মজ্ঞান এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন না। শ্রুতি কহেন, কেবল ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই দেহাদি উপাধি বিগত হয়। সেই আত্মজ্ঞানোদয়ে সর্ব্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, ফলকামনা, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরব্রহ্মজ্ঞানানন্দ-সুধার্ণবে বিলীন হইয়া যায় এবং জীবাত্মা তখন জীবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় অসাধারণ আত্মউৎস স্বরূপ ব্রহ্মেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করেন। অতএব আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, আর কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও কর্ম্মফল জন্মে না এবং কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও ক্রিয়া দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না। এতাবতা ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব নাহি।

(৫) ক্রিয়ার লক্ষণ এই যে, তাহা

বিধিপরতন্ত্র, কর্তৃতন্ত্র এবং মানসব্যাপারাধীন। শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ক্রিয়া আচরিত হয়, অতএব তাহা বিধিপরতন্ত্র। কর্তার ইচ্ছাই ক্রিয়ার প্রবর্তক, অতএব তাহা "কর্তৃতন্ত্র"। ধ্যান-ধারণা-উপাসনা-প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসকের মানসিক কর্তৃত্বাধীন, অতএব তাহা "মানসব্যাপারাধীন"। ক্রিয়া কখনও বস্তুতত্ত্বকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু কেবল মানসিক সাধনা এবং শাস্ত্রবিধির উত্তরসাধকতা অনুসারে সাধিত হয়। অতএব ক্রিয়া বেদের দাসত্ব, বিধিকৈঙ্কর্য্য এবং কর্তৃতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, তাহা বস্তুতত্ত্বস্বরূপ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সত্যবস্তু-স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্যাপরতন্ত্র; কোন পার্থিব আলোক বা মানসকর্তৃত্ব তাহা প্রকাশ করিতে পারে না; সেইরূপ, জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মরূপ পরম সত্যবস্তুর অধীন। তাহা মানসব্যাপার, বেদবিধি ও ক্রিয়ার অতিক্রান্ত। শাস্ত্রানুসারে যাহা জ্ঞান, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ম্প্রকাশ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই জীবের মুখ্যাত্মা।

(৬) দেহ হইতে যে আত্মা স্বতন্ত্র, এই পরমার্থতত্ত্ব কেবল জীবের ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই অনুভূত হয়; নতুবা পরমাত্মাকে ব্যতিরেক করিয়া, বহু তর্ক-যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা জীবাত্মার অমরত্ব এবং এই মর্ত্য শরীরান্তে তাঁহার স্থায়িত্ব নিরূপণ করিলেও, তাঁহার দেহ-সম্পর্কবিবর্জিত নিরবচ্ছিন্ন পরম কৈবল্যসত্তা অনুভূত হইতে পারে না। কেননা, এই মর্ত্যদেহের অভাবেও তাঁহার মনো-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় রচিত সূক্ষ্ম কলেবর এবং প্রকৃতিরূপী কারণ-শরীর তাঁহার সহগামী হয়, ইহা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ঐ সূক্ষ্ম কলেবর ও কারণ-শরীর অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অসংখ্য স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ। অতঃপর জীবাত্মা দেহ-বিনাশের উত্তরকালে, দেহ হইতে উড্ডীন হইলে, নানা সম্প্রদায়ের বাদীরা তাঁহাকে নানাপ্রকার দেহ ও অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার অনেকরূপ সুখ-দুঃখ কল্পনা করেন। জীবাত্মার এই সকল ঔর্দ্ধদেহিক কোন অবস্থা হইতে তাঁহার চূড়ান্ত দেহবিরহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেই, মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়াদি-সূক্ষ্মদেহ ও প্রাকৃতিক স্নেহ-মমতা তাঁহাকে অপহরণ করিবে; এবং তিনি মহা মোহে তাহাদের সমষ্টিকে আমি ও আমার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অতএব তাঁহার তাদৃশ অবস্থাপন্ন অমরত্ব প্রকৃত অমরত্ব নহে; বিশুদ্ধ দেহবিহীন ভাব নহে।

(৭) কেবল যে জীবাত্মার পরমাত্মাতে আত্মজ্ঞান জন্মে, তিনি স্বকীয় পরকীয় আর কোন দেহকে আত্মজ্ঞান করেন না; কেননা পরস্পর দুটী বিরুদ্ধ জ্ঞান জীবাত্মার পক্ষে এক কালে সম্ভব হয় না। যদি পরমাত্মাকে আত্মজ্ঞান করেন, তবে দেহ-মনাদিকে আত্মজ্ঞান করিতে পারেন না; আর যদি দেহাদিকে আমি বলিয়া ভাবেন, তবে তো পরমাত্মা পরিত্যক্ত হইলেন। অতএব পরমাত্মাতে জীবের যে আত্মজ্ঞান, তাহাই

বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব। সেইজন্য আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক যত শাস্ত্র আছে, সর্ব্বত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একাধারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে দ্বৈতবাদই বল, আর অদ্বৈতবাদই বল, কিন্তু এ আত্মজ্ঞান মহামোক্ষস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র। জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একীকৃত না হইলে মোক্ষ হয় না। আর ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, ব্রহ্মই জীবাত্মার অবলম্বন স্বরূপ একমাত্র আত্মারূপ প্রাধান্য লাভ করেন। সেই প্রাধান্যের গ্রহণে মোক্ষপ্রাপ্ত নিরুপাধিক জীবাত্মারও গ্রহণ সিদ্ধ হয়। মোক্ষাধিকারে "আত্মজ্ঞান" শব্দ প্রকৃতির সহিত দেহাদি-উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার একমাত্র অবলম্বন ও পরমলোক স্বরূপ কেবল পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করে। কিন্তু ক্রিয়ার অধিকারে উহা কেবল সোপাধিক জীবাত্মাকে বুঝায়। ফলে পরমাত্মীয় আত্মজ্ঞানই সত্য, আর জীবাত্মজ্ঞান, নানা-প্রকার ক্রিয়া, কারক, ফল, কল্পনা অধ্যারোপিত বিধায় অসত্য। কেননা, পরমাত্মাকে লাভ করিলে এ সমস্ত আরোপ তিরোহিত হয়। অতএব মোক্ষশাস্ত্রে জীবাত্মজ্ঞানকে কোথাও আত্মজ্ঞানরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেবল উপাধিকল্পনা-শূন্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকেই আত্মজ্ঞানরূপে মানিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
২৩।৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, )
কলিকাতা। )

---

# চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ।

(শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ।)

(১ম হইতে ১২শ শ্লোকে কবি শ্রীমতী রাধিকার রূপবর্ণনচ্ছলে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন।)

(১)

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥

নব গোরোচনা সম তব কলেবর
গৌরবর্ণে কিবা শোভা পায় নিরন্তর।
তোমার সুরমা-বেণী-কৃষ্ণসর্পী ফণা
মণিগুচ্ছ বলিয়াই হয় বিবেচনা।
রম্য নীলপদ্ম সম তোমার বসন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(২)

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্॥

সেই পদ্ম সেই চন্দ্র, কিংবা আর আর
যত কিছু বস্তু আছে উপমা দিবার,
সেই সবাকার গর্ব্ব খর্ব্বের কারণ,
বিরাজ করিছে তব সুন্দর বদন;
অষ্টমীর চন্দ্র-নিন্দি-ললাট উপর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু থাকি নিরন্তর
তোমার অঙ্গের শোভা করিছে বর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

(৩)

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥

তোমার দুইটী ভুরু রম্য অতিশয়,

মদনের ধনুকেও করে পরাজয়;
তুমি সে ভ্রূভঙ্গ-বাণ বারেক হানিয়া,
সে ত্রিভঙ্গ শ্যামে রাখ বিমুগ্ধ করিয়া!
পরম শ্যামল—পুনঃ পরম চঞ্চল,
তোমার অলকাবলী শোভে অবিরল;
কজ্জলে উজ্জ্বল তব নয়ন-চকোরী—
যত দর্শনীয় বস্তু—সব পরিহরি,
শুধু কৃষ্ণচন্দ্রে লক্ষ্য রাখে সর্ব্বক্ষণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৪ )

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালী-বন্ধুরদ্বিজাম্॥
তিলপুষ্প সম তব নাসাগ্রে নিয়ত
কনক-জড়িত-মুক্তা রহে সুশোভিত;
বন্ধূক-কুসুমে তব লোহিত অধর
রাখিয়াছে পরাজিত করি নিরন্তর;
কুন্দমালা সম তব বন্ধুর দশন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৫ )

সরত্নস্বর্ণরাজীবকলিকাকৃতকর্ণিকাম্।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্॥
হীরকাদি-রত্ন-যুত সুবর্ণ-রচিত
পদ্মকলি কর্ণে তব শোভে অবিরত;
অধরের অধোভাগে তব নিরন্তর
কস্তূরী-তিলক-বিন্দু শোভে মনোহর!
রত্নময় কণ্ঠহার তোমার ভূষণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৬ )

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজমৃণালিকাম্।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাচিকাম্॥
সুন্দর কেয়ূরে ভুজ-মৃণাল তোমার—
পরম সুন্দর শোভা ধরে অনিবার।
ইন্দ্রনীল-মণি-যুত পরম সুন্দর
তোমার বলয় মণিবন্ধের উপর
করিতেছে সুমধুর শব্দ অনুক্ষণ,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৭ )

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসিবরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্।
মনোহরমহাহারবিহারিকুচকুট্মলাম্॥
তব কর-কমলের অঙ্গুলি সকল
রত্নময় অঙ্গুরীতে শোভে অবিরল।
মহামূল্য মুক্তাহার পরম সুন্দর—
তোমার কমল-কলি-কুচের উপর
পড়িয়া করিছে তার শোভা বিবর্দ্ধন,
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৮ )

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্॥
সর্পীর মস্তকে শোভে মাণিক যেমন,
সেইরূপ রোমাবলী তব সর্ব্বক্ষণ—
হার-মধ্য-মণি-যোগে নিত্য শোভা পায়,
তব ক্ষীণ কটিদেশ পাছে ভেঙ্গে যায়,
ত্রিবলী লতায় বদ্ধ আছে একারণ;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ৯ )

মণিসারসনাধারবিস্ফারশ্রোণিরোধসম্।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্॥
তোমার বিশাল কটি তটের উপর
মণিময় চন্দ্রহার শোভে নিরন্তর;
সুবর্ণ-রম্ভার গর্ব্ব করিবে বিনাশ,
তব উরু-যুগ করি এই অভিলাষ,
আপনার শোভা সদা করে প্রদর্শন;
বৃন্দাবনেশ্বরি! বন্দি তোমার চরণ!

( ১০ )

াস্থদ্যুতিজিতকুন্নপীতরত্নসমুদ্গকাম্ ।
রমীরজনীরাজামঞ্জীরবিরণৎপদাম্ ॥

কুদ্র সম্পুটক পীতরত্ন-বিনির্ম্মিত—
তোমার জানুর কাছে হয় পরাজিত ;
পরম সৌন্দর্য্যময় তব পদদ্বয়
শরতের কোকনদে করে পরাজয় ।
করিছে চরণ তব নূপুর-স্বনন ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

( ১১ )

াকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিম্ ।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥

পূর্ণিমার কোটি চন্দ্রে যে শোভার স্থিতি,
তাহাকেও জিনে তব পদ-নখ-দ্যুতি ;
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পানে রাখিলে নয়ন,
যে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব দেয় দরশন,
তাহাতে ব্যাকুল হয় তব দেহ-মন ;
বৃন্দাবনেশ্বরি ! বন্দি তোমার চরণ !

( ১২ )

ুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্ ।
বামারক্তপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥

হানিলে কৃষ্ণের পানে কটাক্ষের বাণ,
মদন-তরঙ্গে তুমি হও ভাসমান ;
তোমার এরূপ ভাব হেরিলে নয়নে,
পরম আনন্দ হয় শ্রীকৃষ্ণের মনে ;
তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী, বলে ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে বন্দি আমি তোমার চরণ ।

( ১৩শ হইতে ১৭শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতী রাধিকাকে বিনয় সহকারে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন । )

( ১৩ )

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে ।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥

তব স্থায়ী রতি-রস-ভাব নিরন্তর
বিহ্বল করিয়া দেয় তোমার অন্তর ।
নায়িকা নারীর যে যে অষ্ট ভাব রয়,
সে সব তোমার যবে উপস্থিত হয়,
তখন তোমার কথা কি বলিব আর,
কর নানা চমৎকার বিলাস-সঞ্চার !

( ১৪ )

সর্ব্বমাধুর্য্য-বিজ্ঞোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে ।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ॥

ধন্য ধন্য ধন্য তব চরণ-কমল,
সর্ব্ব মাধুর্য্যের স্থিতি যথা অবিরল ।
তব পদ-নখ-প্রান্তে যে শোভা সতত,
লক্ষ্মীও তাহার জন্য সদা লালায়িত !

( ১৫ )

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি ।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে ॥

গোকুল নগরে শত শত চন্দ্রাননা
বসতি করেন সদা গোপের ললনা ;
সেই সব ললনার তুমিই সুন্দরি !
সীমন্ত-ভূষণ-ভূত-কুসুম-মঞ্জরী ।
তব মৃদু-মন্দ হাস্য-কলিকার বলে
ললিতাদি সখীগণ বাঁচে ভূমণ্ডলে !

( ১৬ )

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে ।
তাতপাদযশস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥

তব কটাক্ষের বিন্দুমাত্র মধুরস
কৃষ্ণকে করিয়া দেয় আনন্দে অবশ ;
বৃষভানু-রাজ-কীর্ত্তি-রাশি-কুমুদিনী,
তুমিই কৌমুদী তার উল্লাস-কারিণী !

( ১৭ )

অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥

অগাধ অপার তব কৃপা-জল-রাশি—
তব মনোহ্রদ পূর্ণ রাখে দিবানিশি।
দাসীভাবে রাখিয়াই মোরে বারমায
সুপ্রসন্ন থাক রাধে! এই অভিলাষ।

(১৮শ হইতে ২১শ শ্লোকে শ্রীমতী রাধিকারে দাসী-ভাব-প্রার্থী ভক্ত কবি স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন।)

( ১৮ )

কচ্চিৎ চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
যখন দেখিব, সেই নন্দের নন্দন
শত শত প্রিয়বাক্যে করিয়া সাধনা,
করিবেন তব কৃপা-কটাক্ষ প্রার্থনা।
তুমিও তাঁহারে কৃপা করি প্রদর্শন,
চঞ্চল কটাক্ষ-শর করিবে ক্ষেপণ!

( ১৯ )

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
যখন দেখিব, শিল্পী শ্রীমধুসূদন
মাধবী কুসুম দিয়া যতন করিয়া
দিবেন তোমার দেহখানি সাজাইয়া।
তাঁর স্পর্শে তব স্বেদ ঝরিবে যখন,
ব্যজন করিব আমি তোমায় তখন!

( ২০ )

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
কৃষ্ণ সনে কেলি-কালে তোমার যখন
আলুলায়িত হবে বক্র অলক-সম্ভার,
আদেশ করিবে মোরে তাহার সংস্কার!

( ২১ )

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে।

এ মোর মনের সাধ মিটিবে কখন,—
সুলোহিত ওষ্ঠাধরে তোমার যখন
প্রদান করিব এক মধুর তাম্বূল,
অমনি দেখিয়া তাহা, হইয়া ব্যাকুল
ব্রজধাম পতি সেই নন্দের নন্দন
কাড়িয়া লইয়া সুখে করিবে ভক্ষণ!

(২২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে সাধক কবি শ্রীমতীর দাস্যভাব প্রার্থনা করিয়া স্তোত্র সমাপ্ত করিলেন।)

( ২২ )

ব্রজরাজকুমারবল্লভা-
কুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা
পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের আছে বহু প্রিয়সীমন্তিনী,
কিন্তু তুমি তাঁহাদের সীমন্তের মণি!
প্রসন্ন হইয়া রাধে! আমার উপরি,
দাসীভাবে লও মোরে বিলম্ব নাকরি।

( ২৩ )

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং
তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ
সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥

বৃন্দাবনে একমাত্র তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
দাসী ভাবে লও দেবি! মোরে কৃপা করি।
তা হ'লে হইব আমি অবশ্য তখন
কেশি-প্রাণ-নাশি কৃষ্ণ-প্রার্থনা-ভাজন!
(এই শ্লোকে ফলশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে।)

( ২৪ )

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্

রাধিকার এই স্তব "চাটুপুষ্পাঞ্জলি"
যেই জন, পাঠ করে হ'য়ে কুতূহলী,
অমনি তখন সেই বৃন্দাবনেশ্বরী
নিজ-দাসী-পদ তারে দেন কৃপা করি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি এ।
(২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্যামবাজার, কলিকাতা।)

---

# শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-

## স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র।

---

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।)

( ১ )

রাহুগ্রস্ত হ'ড় শশধর যবে;
ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রকাশিতা ভবে;
চতুর্দ্দশ শত সাত গৌড়-সালে,
মায়াপুরে শচী-গর্ভে সায়ংকালে;
চিচ্ছক্তি-প্রকট-লীলা-মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ সেই মিশ্র সুতে স্মরি॥

( ২ )

বিশ্বম্ভর হরি-প্রিয়-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি—
ক্রমে যাঁর ইত্যাকার নামের বিস্তৃতি,
নবখণ্ড-বিমণ্ডিত ধন্য এই বঙ্গে,
স্মরি সদা সে কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গে,

( ৩ )

স্বসুখদা রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে,
নিশ্রাবাসে স্বশ্রী গৌরহরি হয়ে,
পল্লীবাসিনীর উল্লাস-বৰ্দ্ধিনী
বাল্যক্রীড়া কত করিলেন যিনি,
হামাগুড়ি দিল' অঙ্গনেতে রঙ্গে;
বন্দি, আমি সেই স্বর্ণবর্ণ অঙ্গে॥

( ৪ )

সর্পাঙ্গ অনন্ত হলে স্বাঙ্গন প্রবিষ্ট,
তদঙ্গ আসন করি যিনি উপবিষ্ট!
স্বজনানুরোধে যিনি ত্যজিলেন তাঁরে,
নমি আমি নিত্য সেই দেব বিশ্বম্ভরে।

( ৫ )

"হরিবোল—হরিবোল" বাক্যে শুনি,
রোদন নিবৃত্ত হইতেন যিনি;
তাই নারীদলে সদা নাম-গান!
মাটি খেয়ে যিনি মারে দিলা জ্ঞান;
নাম-গানাশ্রয়—কলিমলহর,
বন্দি আমি সেই গৌরাঙ্গসুন্দর।

( ৬ )

বাল্যে দ্বিজগৃহে চাপল্য-বিস্তারী,
বিদ্যারম্ভে শিশু-বেষ্টন-বিহারী;
গঙ্গাস্নানে রঙ্গে অঙ্গে দিয়ে বারি,
দ্বিজপত্নীগণ উদ্বেজনকারী,
চপলের চূড়া—কৌতুক প্রধান,
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

( ৭ )

তীর্থাটক এক দ্বিজকুল-মণি,
তাঁ'র পক্কান্ন ভখিলেন যিনি;
পরে স্বকৃপায় দিলা জ্ঞান গূঢ়।
মোহি চৌরদ্বয়ে হৈলা স্কন্ধারূঢ়!
সুজন-সুখদ—দুর্জ্জন-দণ্ডদ—
বন্দি আমি সেই শ্রীগৌর শ্রীপদ।

( ৮ )

শিবভক্ত ভিক্ষু পৃষ্ঠ-আরোহণে,
আনন্দিত রুদ্র গুণানুকীর্ত্তনে;

ভক্তজন ভক্ত মহানন্দধাম,
নমি আমি সেই গৌর ভগবান।

( ৯ )

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রণয়-বিহিত
মিষ্টান্নাদি যিনি করি অঙ্গীকৃত,
দিলা শুভবর চিত্ত-সন্তোষণ ;
মসীচিহ্নে যিনি তুষিলা স্বজন ;
স্মরণ করি সে পরম রসিকে,
চিত্তচোর সেই শ্রীগৌর হরিকে।

( ১০ )

একদা উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডে হয়ে অধিষ্ঠিত,
অদ্বৈতমার্গের পণ্ডিতের উপাসিত—
সত্যজ্ঞান মাকে যিনি দিলা সে প্রসঙ্গে,
নমি আমি নিত্য সেই বরাঙ্গ গৌরাঙ্গে।

( ১১ )

নিজ লোষ্টাঘাতে দেখে মাতৃক্লেশদশা,
বাৎসল্য ভকতিভরে সে শিশু সহসা—
শ্রেষ্ঠ নারিকেলদ্বয়ে মায়ে তুষ্ট করে,
নমি আমি নিত্য সেই মাতৃভক্তবরে।

( ১২ )

ত্যজি গৃহবাস, লইলে সন্ন্যাস
বিশ্বরূপ যদগ্রজ,
মিষ্টালাপে যাঁর, শমিত পিতার
শোক সুত-বিরহজ।
বিয়োগে পিতার, শোকার্ত্তা মাতার,
শোক নিলা যিনি হরি,
পরম সুখদ সে মাতৃভকত
শ্রীগৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

( ১৩ )

দ্বিজ-পরিবৃত, গয়াতীর্থগত
সর্ব্বদেব-বন্দ্যমান—
যিনি লীলাছলে পুরী-গুরু-স্থলে
দশাক্ষর মন্ত্র পান ;
এসে বঙ্গধামে, চিরবিরক্তি-ভাবে
আত্মতত্ত্ব ব্যক্তকারী—
নবরসসার, ভক্তমূর্ত্তিধর
সে গৌরাঙ্গে আমি স্মরি।

( ১৪ )

বিপ্র পদ-বারি যিনি পান করি,
হইলা নীরোগ বপু ;
বর্ণাশ্রমাচার সুপালিত যাঁর,
স্মরি সেই মহাপ্রভু।

( ১৫ )

যথাবিধি শ্রীবল্লভআচার্য্যের মেয়ে
শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শুভবিবাহ করিয়ে,
গৃহস্থ হইয়ে যিনি পূর্ব্বদেশে যান ;
শাস্ত্রবৃত্তি—বিদ্যালাপে বহুধন পান ;
গৃহস্থপ্রধান যিনি—ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

( ১৬ )

সুজন তপনমিশ্রে কাশী পাঠাইয়া,
দেশে এসে লক্ষ্মীর বিয়োগ-দগ্ধ-হিয়া
স্বীয় প্রসূতিরে শান্তি-সুখদ বচনে—
সান্ত্বনা দিলেন যিনি তত্ত্বআলোচনে ;
বিরতি সুখদ যিনি—শান্তি মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

( ১৭ )

মাতৃবাক্যবশে যিনি পুনরায়
বিবাহ করিলা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় ;
গঙ্গাতীরে যিনি নিজগণ সঙ্গে,
দিগ্বিজয়ী-দর্প হরিলেন রঙ্গে ;
অধ্যাপকসিংহ সকল সম্বন্ধে ;
বন্দি সুধীশ্বর সে নদীয়া-চন্দ্রে।

( ১৮ )

স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, অথবা তান্ত্রিক,
সর্ব্বজিৎ জয় করি,

বিদ্যার বিলাসে নদীয়া-নিবাসে
বিরাজিত গৌরহরি !
সাক্ষাৎ যে জ্ঞান মূর্ত্তিমান,
নমি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

( ১৯ )

সদা সদা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে,
কৃষ্ণভক্তি-রস আলাপনে,
অদ্বৈতাদি মুখ্য মহাজন
যাঁর পদাশ্রয় প্রাপ্ত হন ;
যাঁর ঐশীচেষ্টা-যোগে হয়—
নিত্যানন্দ চন্দ্রের উদয় !
সুদর্শন ষড়্‌ভুজধারী,
বন্দি সে দয়াল গৌরহরি ॥

( ২০ )

সহসা সুবরণীয় বরাহ শরীরে
করিলা করুণা যিনি গুপ্ত মুরারীরে ;
ব্যাসপূজাছলে বলদেব-ভাব ধরি
মধুযাচ্ঞাকারী সেই পরতত্ত্বে স্মরি।

( ২১ )

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজগণ-সহকারে,
ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রে পূজিলেন যাঁরে ;
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি পরিপূর্ণ তত্ত্ব,
শ্রীধরাদি-মোহান্ত-শরণে স্মরি নিত্য।

( ২২ )

যে প্রভু স্বকীয় গুণগণ-প্রদর্শনে
বিশোধিয়া শ্রীবাসের পালিত যবনে,
সাধু ভক্ত বিষয়-বিরক্ত প্রেম-মত্ত
করিলেন, স্মরি সেই গোরাচাঁদে নিত্য।

( ২৩ )

শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীরঘুনাথ-স্তুতি—
শ্রীরামস্বরূপে শুনি সুখী যিনি অতি ;
কৃপায় মুকুন্দে যিনি ছাড়ান কুসঙ্গ ;
শুদ্ধভক্তিপ্রদাতা স্মরি সে গৌরাঙ্গ।

( ২৪ )

অবধূতে, হরিদাসে, যেই ভগবান
আদেশিলা নগরে বিলাতে হরিনাম,
সর্ব্বত্রই—ছোটবড় সর্ব্বজীবে আর,
সে মহাপুরুষ স্মরি করুণাবতার।

( ২৫ )

নিত্যানন্দ সহ যেতে অদ্বৈত-মন্দিরে,
ধর্ম্মধ্বজী সুরাসক্ত ভাক্ত সন্ন্যাসীরে
দিলেন ললিতপুরে যিনি তত্ত্বজ্ঞান,
স্মরি সেই শিবদাতা শুদ্ধভক্তিধাম।

( ২৬ )

কপট অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতের পৃষ্ঠ
সহসা চাপড়ি প্রেমে, ভক্তিপথ-নিষ্ঠ
করিলেন তাঁরে যিনি, সেই গৌরহরি,
মায়াহর সুবিমল, সদা তাঁরে স্মরি।

( ২৭ )

লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধরি চন্দ্রশেখরের ঘরে,
দিলা নিজ দুগ্ধ ভজনাব্ধি-মগ্ন নরে ;
উদ্ধারিলা স্ববিভূতি দেখায়ে বিজয়ে ;
স্মরি সেই সর্ব্বশক্তি-বিভব-আশ্রয়ে

( ২৮ )

নিদ্রোত্থান, স্নানাহার, পূর্ব্বাহ্ণে গোক্রমে;
সংকীর্ত্তন-বিচরণ ক্রমে গ্রামে গ্রামে ;
অল্পনিদ্রা, ইত্যাদি নিয়মধারী হয়ে,
যামে যামে লীলা যাঁর ভক্তগণে লয়ে;
সেই প্রভু গৌরাঙ্গ ভজন-সুখধাম,
স্মরণ তাঁহারে আমি করি অষ্টযাম।

( ২৯ )

শ্রীনিবাস আদি সংকীর্ত্তন-সঙ্গিগণ-
সঙ্গে রঙ্গে করিলেন পতিতোদ্ধারণ ;
জগাই মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ত পতিত
দ্বিজগণ-দুষিবর প্রেমেতে পূরিত
করিলা যে প্রেমসিন্ধু পতিত-শরণ,
করি সেই শ্রীগৌরাঙ্গে সতত স্মরণ।

( ৩০ )

যিনি ভাবভরে সর্ব্ব সুজনেরে
শিখালেন ভক্তিতত্ত্ব ;
সদয় হৃদয়ে দোষ সমুদয়ে
ক্ষমিলেন যিনি সদা ;
সুজন-সভায় ভক্তির ব্যাখ্যায়
বিখ্যাত যে গৌরহরি,
স্বজন-দুষ্কৃতি- মার্জ্জন-মূরতি—
সে মহাপ্রভুরে স্মরি ।

( ৩১ )

কীর্ত্তন-সুধাব্ধি চাঁদকাজী উদ্ধারিয়া,
নগরে নগরে সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
করি হরিসংকীর্ত্তন কলি-মলহারী,
বারম্বার নদীয়ায় নদীয়া-বিহারী,
নর্ত্তন-বিবশ অঙ্গ দীর্ঘভুজবান,
স্মরি আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান।

( ৩২ )

গঙ্গাদাস, শ্রীধর, মুরারি,
ভিক্ষু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী,
সবে যাঁর প্রেমে হয়ে বদ্ধ,
প্রেমপূর্ণ হইলেন সদা ;
যাঁহার শ্রীমুখোচ্ছিষ্ট সেবি,
সুব্রতিকা নারায়ণী দেবী ;
পরম পুরুষ দিব্যকায়,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়।

( ৩৩ )

শ্রীবাস-প্রণয়ে বশীভূত হয়ে,
মৃত-সুত-মুখে তার,
বিকাশিয়া বাণী, শুনালেন যিনি
শুভদ সুতত্ত্বসার !
ভৃত্যাদলে আর সুমতি-সঞ্চার
করিলা যে গৌরহরি ;
সেই অকুহক জীবনিস্তারক—
শ্রীমহাপ্রভুরে স্মরি ॥

( ৩৪ )

লভি গোপীভাবাবেশ, আবিষ্ট যে পরমেশ,
মুষ্টিবদ্ধ যষ্টি-দণ্ড ধরি,
বাদাসক্ত জড়মতি মূঢ়ছাত্রগণ-প্রতি
তাড়ন করিলা কোপ করি ;
তাই সে মূঢ়েরা হায় ! নিস্তারিয়া বৈরতায়
হ'ল যাঁর প্রতিপক্ষী আর,
বিমুখ-দমনে যেই দিব্যসিংহ সম, সেই
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

( ৩৫ )

তা সবার পাপরাশি- প্রশমন-অভিলাষী,
অকস্মাৎ কাটোয়ায় আসি,
সিতপক্ষে মাঘমাসে, কেশবভারতী-পাশে,
সাজিলেন নবীন সন্ন্যাসী !
বিদ্বৎসমাজে যিনি সুবিদ্বান-শিরোমণি,
পণ্ডিতের যিনি অগ্রগণ্য,
আহা ! সে মুণ্ডিতমুণ্ড ধৃত-কমণ্ডলু দণ্ড,
স্মর প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

( ৩৬ )

স্বজন-সগৃহ নবদ্বীপে ত্যজি,
নিতাইচাঁদের প্রেমানন্দে মজি,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাটোয়া ত্যজিয়ে,
শান্তিপুরে যিনি উদিলা আসিয়ে ;
ব্রজ-গমনেচ্ছাবিষ্টমূর্ত্তি যাঁর,
স্মরি সেই শ্রীচৈতন্য অবতার।

( ৩৭ )

হৃষ শোকাহতা সে অজিত-মাতা
তথায় আনীতা হয়ে,
দিনকত ধরি, ভিক্ষা দান করি,
পালিলেন যে তনয়ে ;
মাতৃভক্ত্যাবেশে, মাতার আদেশে,
যিনি ক্ষেত্রধামগামী,
ভ্রমণতৎপর ছাগীকুলেশ্বর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গে আমি।

( ৩৮ )

সাধু হরিদাস, দামোদর, নিত্যানন্দ,
সেবক মুকুন্দ, সুধী শ্রীজগদানন্দ

এ পঙ্ক্তি-ভকত-পদ-ভৃঙ্গ-সঙ্গগামী—
প্রণত-প্রেয়ান্ন—স্মরি সে গৌরাঙ্গে আমি।

( ৩৯ )

ত্যজি গঙ্গাদেশ, দেখি অম্বুলিঙ্গেশ্বরে,
উড়িষ্যায় রেমুণায় দেখি ক্ষীরচোরে,
কটকনগরে যিনি করিয়া গমন,
আত্মরূপ গোপালকে করিলা দর্শন;
স্বভজন-পরায়ণ ভক্তমূর্তিধর,
স্মরি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।

( ৪০ )

রুদ্রলিঙ্গ দেখে করিয়া প্রণাম,
শিবের একাম্রবনে,
নিজ দণ্ড রেখে, পুনঃ যিনি যান
কপোতেশ-দরশনে;
এই অবসরে নিত্যানন্দ যাঁর—
করিলা সে দণ্ড-ভঙ্গ;
ভক্ত-ভক্ত যিনি চম্পকবাকার,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

( ৪১ )

দণ্ডভঙ্গে হয়ে কপট-কুপিত,
ভক্তগণে ত্যাগ করি,
একাকী যে প্রভু লাভিলা ত্বরিত
নীলাচল-পাত-পুরী;
কৃষ্ণরূপ তথা হেরিয়া যে প্রভু
মহাভাবাবিষ্ট-অঙ্গ;
বিরচিতদণ্ড, স্বর্ণবর্ণ বপু,
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

( ৪২ )

ভাবাস্বাদাবেশ প্রকট যখন,
সার্ব্বভৌম যাঁরে সেবিলা তখন;
সে সেবার ফলে স্বাভাবিক যত
অনর্থ যাঁহার কৃপায় বিগত;
যাঁহার বিপুল কৃপার বৈভব
লভি সার্ব্বভৌম হইলা বৈষ্ণব;
শ্রীকৃষ্ণ বেদার্থ-প্রচার-প্রসঙ্গে
তন্মূর্ত্তি সেই—স্মরি শ্রীগৌরাঙ্গে।

( ৪৩ )

দিনকত করি তথা অধিষ্ঠান,
দাক্ষিণাত্যে যিনি করিলা প্রয়াণ;
যিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগভোগী
বাসুদেব দ্বিজে করিলা অরোগী;
বিজয়নগরে রায় রামানন্দে
প্রেমসিন্ধু যিনি দিলা প্রেমানন্দে;
জন-সুখকর তীর্থমূর্ত্তিমান!
স্মরি আমি সেই গৌর ভগবান।

( ৪৪ )

দেশে দেশে সাধুগণে প্রেম বিতরিয়া,
রঙ্গক্ষেত্রে ভট্টদের পল্লীতে আসিয়া,
কিছুদিন রহি তথা, ভট্টাচার্য্যগণে—
করিলেন কৃষ্ণভক্ত কৃপাবিতরণে;
শ্রীগোপাল-আলয়ের আনন্দের নিধি,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি নিরবধি।

( ৪৫ )

বৌদ্ধ-জৈন—যারা ভক্তি-ভজন-বিহীন,
তত্ত্ববাদমত—মায়াবাদ-হ্রদ-লীন,
শুদ্ধভক্তি প্রচারি—দিয়া আত্মবল,
করিলা তাসবে যিনি ভজন-কুশল,
এইমতে বহুমত-বোদ্ধা-উদ্ধারণ—
স্মরি সে গৌরাঙ্গচন্দ্র পতিতপাবন।

( ৪৬ )

যে ঈশ্বর, বিতরিয়া দাক্ষিণাত্য-জনে
কলিযুগ হবানন্দ, কৃষ্ণদাস-সনে,—
ভজনের গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়া,
আলালনাথের মন্দিরের পথ দিয়া,
প্রত্যাগত নীলাচলে প্রসাদিতমতি,—
ভবপার সে গৌরাঙ্গে স্মরি নিরবধি।

( ৪৭ )

কাশীমিশ্র-গৃহে যেই হেমকান্তিধর,
স্বরূপ-প্রমুখ সহ স্বজন-নিকর,
করি অধিষ্ঠান, সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ
করিলেন কৃষ্ণনামানন্দ বিতরণ;
স্বজন-সহিত সেই প্রফুল্লমুরতি
শ্রীগৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি নিরবধি।

( ৪৮ )

নীলাচল-নাথ যবে বিরাজিত রথে,
বেষ্টিত-বৈষ্ণববৃন্দ—যিনি তদগ্রেতে,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে গেয়ে হরিনাম,
প্লাবিত করিলা প্রেমে সবাকার প্রাণ।

গজপতি-প্রমুখ উড়িয়া ভক্তগণে—
শুদ্ধভক্ত করিলেন প্রেম বিতরণে;
স্বসুখ-জলধি যিনি ভাব-মূর্ত্তিমান,
স্মরি আমি সদা সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

( ৪৯ )

উড়িয়া পার্ষদগণে উড়িষ্যা-সীমায়
পরিহার করি, পরে যিনি পুনরায়,
গেলা গৌড়দেশে ওড্রদেশ পরিহরি,
শচীসুত সে গৌরাঙ্গদেবে আমি স্মরি।

( ৫০ )

শ্রীবাসে ও শ্রীরাঘবে, আর দত্ত বাসুদেবে,
গিয়ে সে সবের স্বমন্দিরে,
দিয়ে দরশন-দান, যিনি শান্তিপুরে যান,
স্মরি সেই গৌরাঙ্গসুন্দরে।

( ৫১ )

বিদ্যানগরাখ্য গ্রাম, বিদ্যাবাচস্পতি-ধামে
করিলেন যিনি আগমন;
নদীয়ার কুলিয়াতে গেলা যিনি তথা হতে,
করি সেই গৌরাঙ্গ ভজন।

( ৫২ )

বিদ্যা-রূপ-জন্ম-ধন-জনে ভবে
যে দুর্লভ ধন না লভে মানবে,
শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাই সে ধন!
দেবানন্দ যাহা করিলা অর্জ্জন,
কেবল সরল দীনতার বলে,
পূজিয়া যাঁহার ভকতমণ্ডলে;
কুলিয়ানগরে যাঁহার কৃপায়—
সদযুক্ত সাধু সুব সমুদায়—
এক শুদ্ধভক্তিযোগে যাঁরে পান,
বন্দি আমি সেই গৌর ভগবান।

( ৫৩ )

বৃন্দাবন-দরশন ছলে গৌড়দেশে
মাতৃদরশন যিনি করিলেন এসে;
স্নেহে রূপ-সনাতনে করিয়া উদ্ধার—
যবন-কবল হতে, উৎকলে আবার
আসিয়া, স্বজন-ত্রাণে যিনি হৃষ্টচিত্ত,
স্বতন্ত্র পরাত্ম, স্মরি সে গৌরাঙ্গে নিত্য।

( ৫৪ )

ব্রজে যেতে পুনঃ দৃঢ়মতিমান—
হয়ে যে স্বতন্ত্র পুরুষ প্রধান,
বহুবিধ-জন-সঙ্গ পরিহরি,
একমাত্র বলভদ্রে সঙ্গী করি,
বন-পথে ব্যাঘ্র আদি পশুদলে—
প্রেমে মাতাইয়া যিনি আত্মবলে,
চলিলেন আত্ম-আনন্দ বিতরি!
পশুমতিহর সে গৌরাঙ্গে স্মরি।

( ৫৫ )

গিয়ে বৃন্দাবন, গিরি-নদী-বন,
গ্রাম-কুঞ্জ দরশনে,
স্মরি পূর্ব্বলীলা মূর্চ্ছিত হইলা
ভাবপুঞ্জাবিষ্ট মনে!
বলভদ্র তা'তে ব্রজ-বন হ'তে
বাহির করিলা যাঁয়;
নিজ-জনাধীন মূরতি সুদীন!
স্মরি সে গৌরাঙ্গরায়।

( ৫৬ )

করি যাঁরে দৃষ্ট মহাভাবাবিষ্ট,
পথিমধ্যে, কতিপয়
শুভমতিমান স্লেচ্ছ ভাগ্যবান
কৃপা যাঁর প্রাপ্ত হয়;
তারা ভক্তিপূত, প্রেম-বশীভূত,
হ'ল যাঁর পরসাদে,
জন্ম-মলহর শুদ্ধমূর্ত্তিধর,
স্মরি সে গৌরাঙ্গচাঁদে।

( ৫৭ )

শ্রীজাহ্নবী-যমুনার মিলনে উদ্ভব যাঁর,
পুণ্যতীর্থ সে প্রয়াগধামে,
রূপে করি কৃপালেশ, প্রসাদিলা যে পরেশ,
পররসময়ী বিদ্যা দানে।
যিনি বুধ বল্লভেরে করিলা করুণাভরে
গোকুলপতির প্রেম দান,
রস-গুরু-শিরোমণি, মূর্ত্তিমান শাস্ত্র যিনি,
স্মরি সে গৌরাঙ্গ ভগবান।

( ক্রমশঃ— )

শ্রীঅরবিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ

( ১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরী কৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা।

## জাতিভেদ।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

যাঁহারাই একটু প্রণিধান পূর্ব্বক মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, গাঙ্গাপ্রদেশের প্রথম যোদ্ধৃজাতিরা কিরূপ সৎসাহসী, তেজস্বী, মহাবলশালী ও স্ব স্ব অধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। যে সকল জাতি গাঙ্গপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগের অসীমকীর্ত্তিসমূহ হিন্দুদিগের মহাকাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কুরু ও পঞ্চালের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের যুদ্ধ-বিবরণই হিন্দুর মহাকাব্য।

কিন্তু ভাগীরথীবিধৌত শস্যশ্যামল উর্ব্বর সুরম্য গাঙ্গপ্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিতে করিতে হিন্দুদিগের ভিতর যেমন বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহাদিগের সাহস ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। যতই তাঁহারা নিম্নতর প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃজাতির বীরত্ব, সাহস ও তেজস্বীতার লক্ষণগুলি তাঁহাদিগের স্বভাব হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন বিদেহ ও কাশী পণ্ডিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তখনকার ইতিহাসে বীরত্বের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। রামায়ণ পাঠে সামাজিক ও পারিবারিক কার্য্যনিচয়ের যথেষ্ট পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোশল রাজ্যের মনুষ্যগণ যে একটী সুমার্জ্জিত জাতি হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন যে পৌরহিত্যের প্রাধান্য হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যায়। ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্ধবিশ্বাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সেই বীরত্বের কাহিনী তখন শুনিতে পাওয়া যায় না। তখনকার সময়ে তাহারই অভাব হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রণালীর পর্য্যন্ত কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সরলহৃদয়ে ভক্তিভরে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, গাঙ্গপ্রদেশের শান্ত, দৃপ্ত, কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে তাহাদিগের স্থান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা এখন ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তখনকার সেই সকল সরল ক্রিয়াকাণ্ড আর যেন তাঁহাদিগের মনঃপূত হইত না। ক্রমশঃ পুরোহিতদিগের সংখ্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের নিয়ম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইল।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আর্য্যগণ যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের জীবনে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই অত্যুন্নত তুষারধবল শৈলশিখর—সেই কলনাদিনী খরগামিনী তরঙ্গিনী—সেই অসংখ্য ফলফুল-শোভিত সুন্দর সুন্দর বনশ্রেণী—সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রপরিপূর্ণ শ্যামল শস্য-সম্ভার, সেই বিহগকূজন, ভ্রমরগুঞ্জন, সেই রক্তিম রাগরঞ্জিত সুন্দরপ্রভাত—সেই কুয়াসাবিমুক্ত জলদজালপরিমুক্ত সুনীল আকাশ—সেই শুভ্র-জ্যোৎস্নাময়ী পুলকিতা যামিনী—সেই নাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দপবন সঞ্চালন,—এই সমস্তই একে একে আর্য্যদিগের হৃদয়ে কবিত্বের সৃষ্টি করিল। সেই নিদাঘতপ্ততপন-বিকীরিত কিরণ সম্পাতে সমুজ্জ্বল প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, প্রাবৃটের ঘনজলদজালাচ্ছন্ন প্রকৃতির গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইতে লাগিল। বালকের জগৎদর্শনের ন্যায় তাঁহারা বিমুগ্ধ চিত্তে সমস্তই অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন নির্গলিতাম্বুগর্ভ মেঘবিমুক্ত বিমল শারদাকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, তখন তাঁহাদিগের সরল হৃদয়ের মধুর বাঁশরী আপনি বাজিয়া উঠিত। তাঁহারা মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়া, ঋকের পর ঋক্সমূহ সৃষ্টি করিয়া, সেই সরল হৃদয়ের সরল কোমল চঞ্চল ভাবসকল গাহিয়া উঠিতেন। তাই তাঁহারা যাহা দেখিতেন, তাহারই মন্ত্র রচনা করিতেন। প্রকৃতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতি-নিয়ন্তার স্তোত্র গাহিতেন। ভারতবর্ষের জগৎ তাঁহাদিগের নিকট বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল। সুন্দরে সরলে মিশিল—আর্য্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ঋকের স্রোত বর্ষার জলপ্লাবনের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তখনকার যুগে বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল না, তখন লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু এই সকল মন্ত্রগুলি অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ তখনকার ধর্ম্ম বল, যাগ বল, যজ্ঞ বল—তখন আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই এই সকল মন্ত্রের শাসনে চালিত হইত। তাই তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই এই সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্ররাশি উচ্চারণ করিয়াই যজ্ঞের সহায়তা করা হইত।

কিন্তু আর্য্যগণ স্বস্ব কার্য্য স্বহস্তে করিতেন। তাঁহারা যেমন হলচালনা করিতেন, তেমনি আবার হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানও করিতেন। তাই সকলের পক্ষে বেদের এতগুলি মন্ত্র শিক্ষা করা ঘটিয়া উঠিত না; অনেকের সেরূপ সুযোগও ছিল না এবং অনেকের পক্ষে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অভাবও আসিয়া শিক্ষার পথ রোধ করিত। অন্যান্য সহস্র কার্য্যের মধ্যে মন্ত্র শিক্ষার সময় এবং ধৈর্য্য ক্রমশঃই অনেকটা হ্রাস পাইতে ছিল। কারণ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জীবন-সংগ্রামও ক্রমশ: অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য হইতেছিল। তাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাদিগের চিন্তা সহস্র পথে ধাবিতা হইত।

"There were over a thousand of them ( the hymns ) ; and each would on the average fill one page of an octavo volume. This was not all ; every hymn must be recited in a particular manner—every word, every syllable must be pronounced in a prescribed way. Besides many idioms of the ancient hymns gradually became obsolete. The Aryan territories gradually covered a considerably wider area ; population increased .........Every Aryan was expected to have gone through hymns once. But very few of those, who were engaged in the ordinary occupations of life could afford-room in their brains, for a thousand and odd long hymns, with obsolete idioms and expressions, so as to be able to reproduce them at notice. All these circumstances tended to create a class of men, the Brahmans."*

সহস্রাধিক মন্ত্র শিক্ষা করিবার মত ক্ষমতাও তখন সকলের ছিল না। কারণ. প্রত্যেক মন্ত্রই অতিশয় দীর্ঘ, তাহার উপর সেই সকল মন্ত্রগুলির উচ্চারণ ভিন্ন২ প্রকার এবং তাহাদিগের আবৃত্তি-পদ্ধতিও একই রকম ছিল না। এই সকল কারণে সকলেই মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিতে পারিল না। অথচ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য প্রত্যহই মন্ত্রগুলি আবশ্যক। তাই যাহারা শিক্ষা করিল, তাহারাই সমাজের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিল। এক বৎসরে বা দুই বৎসরে সমাজের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল না।

এখনও আমরা এমন অনেক 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' দেখিতে পাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু পণ্ডিত নহেন। অথচ সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যক মন্ত্রগুলি তাঁহারা যেমন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি আবৃত্তিও করিতে পারেন—এদিকে মন্ত্রার্থবোধ তাঁহাদিগের নাই। তখন দিন দিন আর্য্যগণের অধিকৃত জনপদসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশে শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইল—আর্য্যগণ ধনসম্পদ ( wealth ) প্রাপ্ত হইলেন; এতদ্ভিন্ন এক সহস্রেরও অধিক মন্ত্র এরূপ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখা সকলের

* Hindu civilisation under British Rule,

পক্ষে যে সম্ভব হইয়াছিল না, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু দৈনিক ধর্ম্ম-চর্য্যার জন্য প্রত্যহই সেই সকল মন্ত্র আবশ্যক হইতে লাগিল; অথচ তাহাদিগের শব্দ-বিন্যাস ভিন্ন, যতি ভিন্ন, ছন্দ ভিন্ন—আবার দিনে দিনে তাহাদিগের মধ্যে অনেক শব্দ পর্য্যন্ত অপ্রচলিত হইয়া উঠিল, তখন কতকগুলি লোক সেই সকল মন্ত্ররাশি প্রাণপণ-যত্নে শিক্ষা করিলেন। তাঁহারাই তখন হইতে যজ্ঞাদির সময়ে উপস্থিত হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখনকার সমাজের ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই।

একই ব্যক্তি যুগপৎ সহস্রবিধ-চিন্তা ও লক্ষবিধ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না। তাহা থাকিলে, কোন কার্য্যই করা হয় না। তাই তখনকার আর্য্যসমাজে যাঁহারা মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিলেন, তাঁহারা কেবল তাহা লইয়াই থাকিলেন। বরং অবসর পাইয়া তাঁহারা দিবানিশি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই মগ্ন হইলেন; দার্শনিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কারে মনোযোগ করিলেন। তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পূর্ব্বেই এক দল লোক গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারাই সেই ক্ষত্রিয়।

কিন্তু আপন প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ক্রিয়াকলাপ দুরূহ করিয়া তুলিলেন; প্রত্যহই নানাবিধ খুঁটি নাটি সংযোজিত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ তাহার নূতন নূতন নিয়ম করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ। এক সম্প্রদায়কে এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া অন্যান্য সকলে নূতন নূতন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল—আর তাহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য-গুলি ব্রাহ্মণের হস্তেই অর্পিত হইল।

এই স্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার রীতি যেরূপ, তখন তেমন ছিল না। অর্থাৎ তখন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল না, গুরুগৃহই তখনকার শিক্ষা-মন্দির ছিল। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন, তাঁহারই কাষ্ঠ আহরণ করিতেন, গোসেবা করিতেন, আর অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তখনকার গুরুগণ নিয়মিতরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, পরন্তু শিষ্যদিগকে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া প্রতিপালন করিতেন। তখনকার শিক্ষক ও শিষ্যের ভিতর পিতা ও পুত্রের ভাব বিদ্যমান ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির অভাবে বিদ্যার্থীদিগের যে কি কষ্ট ও অসুবিধা হইত, তাহা অবর্ণনীয়। যখন পর্য্যন্ত বর্ণমালারও সৃষ্টি ছিল না, তখনকার কথা ত তুলনাহীন। তাই সেকালে ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যাও কম হইত এবং উৎসাহী, উদ্যমপূর্ণ বিদ্যাভ্যাসেচ্ছু কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যের সংখ্যাও তখন অল্প হইত। যে সকল গুরু শাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া খ্যাত হইতেন, নানা দিগ্দেশ হইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইত। গমনাগমন সুগম ও সহজ না হওয়াতেও অনেকে আসিতে পারিতনা।

মনুষ্যের স্বভাব এই, যে বিষয়ে যে পারদর্শী ও ব্যুৎপন্ন হয়, তাহার স্বতঃই সাধ

হয় যে, সেই বিদ্যা আপন পরিবারেই নিবদ্ধ থাকুক। সেই জন্যই এখন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যাই আমাদের দেশে কৌলিক অবস্থায় আছে। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদশির ডাক্তার দিগের অস্ত্রচিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও যেমন, তখনও তেমনি। মনুষ্য-স্বভাব চিরদিনই প্রায় একই রকম। সুতরাং গুরুগণ সর্ব্বদা হয়ত এই চেষ্টাই করিতেন যে, বেদবিদ্যা তাঁহাদিগের আপন আপন বংশেই বদ্ধ থাকুক। এইরূপে ধীরে ধীরে পৌরহিত্য কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এক সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে সজ্জিত থাকিতেন। তাঁহারাই আর্য্যভূমির রক্ষক ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মানও বড় কম ছিল না। কালক্রমে এই যুদ্ধ-বিদ্যাও তাঁহাদিগের কৌলিক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা এবং কার্য্যও যে কৌলিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। তখন দেশের অবশিষ্ট লোকগুলি কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিল। ইহাদিগের সংখ্যাই তখন অধিক ছিল। সকল সময়েই দেশে সাধারণ লোক-সংখ্যা অধিক থাকে। বেদে এই সকল ব্যক্তিই "বিশ্" বলিয়া পরিচিত। "বিশ্" অর্থে সাধারণ প্রজাবর্গ বুঝায়। এই কারণেই "বিশাম্পতি" অর্থে 'প্রজাদিগের প্রভু'—অর্থাৎ রাজা বুঝায়।

শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বলিতেছেন,—"পঞ্চনদে থাকিয়া লোকপুরুষেরা কৃষি ও গোচারণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু গাঙ্গাপ্রদেশে যোদ্ধা ও নরপতিদিগের সৈন্য-আড়ম্বর এবং ভোগবিলাস প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারাও সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বংশানুক্রমিক ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। ঋগ্বেদে যাহাদিগকে বৈশ্য বা বিশ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতি গঠিত, পঞ্চনদে থাকিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে সাহস ও বীর্য্য ছিল, এক্ষণে তাহারা সে সাহস ও বীর্য্য হারাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল।........ইহার পর হিন্দু-রাজ্য-সমূহে রাজা ও যোদ্ধাদিগের বীর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ও জনসাধারণের বীর্য্য, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত হয় না।"

এই সকল অপরিহার্য্য কারণে ভারতবর্ষে চারিজাতির সৃষ্টি হইল। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই লক্ষিত হইয়াছিল না। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তিনটী প্রধান বিষয় আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে —

* (১) নিম্নজাতীয় ব্যক্তির অন্ন-পান গ্রহণ নিষেধ।

---

* জাতিভেদ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা

(২) ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর এবং এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিষেধ।

(৩) জাতিগত পার্থক্য অনুসারে ব্যবসায়ের পার্থক্য।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### ১। বেদোক্ত জাতিভেদ বর্ণনা রূপক।

অধুনা অনেকেই বলিয়া থাকেন, বেদে এবং শাস্ত্রাদিতে জাতিভেদ-প্রথার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা রূপক মাত্র। আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জাতি বিভাগের কারণ নির্ণয়" করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতেছেন,—*

"সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প; যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহারসামগ্রী যোগাইতেন; হিংসা, দ্বেষ, লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যখন সত্যভাবী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফলমূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই প্রকৃত সুখশান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ-বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে এক দিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন, 'বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।' সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।"

"প্রথমে সমস্তই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মণাত্মক ছিল" এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বপ্রথমে যদি কেবল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্য জাতির অস্তিত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণই না থাকিত, তাহা হইলে বৃথা 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা কি? এখানে মনে করিয়া রাখ, প্রাচীনতম আর্য্যঋষিগণের সমাজ, ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কথাই বৈদিক মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা আর্য্য ভিন্ন অপর কোন মর্ত্ত্যবাসীকে মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে যে বর্ণ বা শ্রেণীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব—তাঁহাদেরই সমাজের; বৈদেশিক জাতির কথা নহে।"

* * * * *

"যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন

---

করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

উত্তর গ্রন্থের মতেই স্বীকার করিতে হইবে, সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদমন্ত্রোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল।"

"যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ হিমালয়ের তুষারশিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রজসোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্যবিস্তার, বলবীর্য্য সঞ্চার ও সাত্ত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই শেষে 'ক্ষত্রিয়' উপাধি লাভ করিলেন।* পুরাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে + তেজ বা বীর্য্য রজোগুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।"

ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই "বিশ" বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল স্থানে 'বিশ' শব্দের অর্থ প্রজা-সাধারণ, উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিক বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই।* এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, যে সময়ে ঐই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল, তখনও বৈশ্য নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি, গোরক্ষা, সুজল, ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিত, তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল + বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তিপ্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাঁহারা নিরত থাকিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজা বা জনপদের অধিকারী ও বলবীর্য্যশালী, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখশান্তির জন্য যাঁহারা কৃষি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান

---

* ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ সর্ব্ব প্রথমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ পাওয়া যায়।—

"ত্রৈষ্টুভো বৈ রাজন্য ওজো বা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ত্রিষ্টুবোজসৈবৈনং তদিন্দ্রিয়েণ সমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

+ এ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায় ১৪০—১০২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* অথর্ব্বসংহিতায় (৫।১৭।৯) এক স্থলে কেবল বৈশ্য শব্দের উল্লেখ আছে।

+ মন্ত্রটী এই—"সর্ব্বা বিশঃ কল্পন্তে স্বস্তি নঃ পথ্যাসুধন্বস্বিত্যাহ স্বপ্স্বা বৃজনে স্বর্বতি স্বস্তি নঃ পুত্র কৃথেষু যোনিষু স্বস্তি-রায়ে মরুতো দধাতনেতি মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।২।৩.

অন্যস্থানে আছে—

"ন গতোং বৈশ্যাস্তানুব্রূয়াজ্জাগতো বৈ বৈশ্যো জাগতাঃ পশবঃ পশুভিরেবৈনং তৎ সমর্দ্ধয়তি।" (১।৫।২)

সন্ততিগণ বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বৈশ্য বর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

"যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে, নির্ভয় হইয়া কেবল মাত্র সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশস কর্ম্মে নিযুক্ত, কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য।*' বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। শস্য পরিপুষ্ট হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয়, এইজন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, ত্রেতাযুগের শেষভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈশ্য সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোক-জীবিকার হেতু বৈশ্য; ঊরুই তাহাদের প্রধান অবলম্বন; সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট পুরুষের ঊরুদেশজাত, এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।"

"পুরাণেতিহাসে বৈশ্যসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে, শান্তচিত্ত, তেজস্বী, কর্ম্মী ও দুঃখী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।' অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেন।"

* * * *

"দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম—তাই শূদ্র বিরাটপুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন।"

"The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally, by Brahma, men have in consequence of their acts, become distributed into different orders. Those who became fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship............those Brahmans possessing the attributes of Rajas ( passion ) became Kshatiyas. Those Brahmans again, who, without attending to the duties, laid down for them, became possessed of the attributes of goodness ( Satwa ) and passion and

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৮ম অধ্যায়।

took to the practice of rearing of cattle and agriculture, became Vaisyas. Those Brahmans again, who were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessing the attribute of darkness (Tamas), became Sudras. Separated by occupation Brahmans became members of the other three orders.' (Mahabharata, Moksha Dharma; chap. 188). 'Niether brith, nor study, nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata, Vana Parva, chap 313, Vers 108.)"*

(ক্রমশঃ—)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ.

---

# রাজভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

যে সুন্দর প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের সদা সামঞ্জস্য সূচক সত্য ও ন্যায় নীতি ও সনাতন নিয়মাবলী তাঁহা সমগ্র বিশ্বরাজ্য নিয়মিত, পরিচালিত এবং সৌন্দর্য্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বসামঞ্জস্য ও মঙ্গলময় সনাতন উদার সাম্য-আদর্শনীতির অনুকরণে যে রাজ্যের রক্ষণ, পালন ও শাসন-নীতির ভিত্তি, সেই রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজ্য। যে রাজ্যের বল একতা, আইন সাম্যনীতি, উদ্দেশ্য জগতের হিত সাধন, সেই রাজ্যই ধর্ম্মরাজ্য। সেই রাজ্যের ভিত্তি অক্ষয়, অচল ও অটল।

আমরা ভারতীয় প্রজা, চিরকাল রাজভক্ত। রাজা আমাদের নিকট ঈশ্বরতুল্য। ভারতে মুসলমান-রাজত্বকালে মহামহিমান্বিত আকবর সাহের লোকহিতকর নূতন সাম্যনীতির আলোক যখন প্রথম ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারত সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল যে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা"। ভারতে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার সাম্যনীতির আদর্শে প্রথম রাজকৃত শুভ্র উদার নীতির জ্যোতির্ম্ময় আভাস যখন ভারতবাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনই ভারতীয় রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের অন্তরে ঐ মহান্ ভাব উদিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত-গগনে বিদ্যুতের ন্যায় ঐ শুভ্র জ্যোতি অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হওয়ায়, ভারতবাসী পুনঃ গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। যেমন প্রাচ্য গগনস্থ সূর্য্যদেব পৃথিবীর পূর্ব্বভাগ হইতে অস্তমিত হইয়া পাশ্চাত্য গগনে উদিত এবং সেই পাশ্চাত্য সৌরজ্যোতি প্রাচ্য গগনস্থ চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া, প্রাচ্য ভূমিস্থ নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণজাল বিতরণ করেন, সেইরূপ ভারতের নিয়ন্তা তেজোময় বৃটিশ-সূর্য্যের উদার নীতির স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে

---

* "Fusion of sub castes in India"—by Rai Bahadur Lala Baij Nath, B. A.

Judge, court of small causes, Agra.

এই হতভাগ্য ভারতভূমি আজ শতাধিক বর্ষ আলোকিত হইয়াছে, এবং সেই সাম্য-নীতির শুভ্র আলোক শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেই উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রকৃতি-রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্ব্বসাম্য-সমাগমী সাম্য-উদারনৈতিক শক্তির ন্যায় মূর্ত্তিমতী সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বমঙ্গল ও সর্ব্বসামঞ্জস্যের আধারভূতা শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া, এই বিপুলা পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ সুশাসন পূর্ব্বক একই সাম্য-উদারনীতিসূত্রের বাঁধা বন্ধন ও ন্যায়-রজ্জুর দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যেমন প্রকৃতির মধ্যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অনন্তের সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক বিধি, নিয়ম ও ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্তাকে আমরা অনুভব করি, সেইরূপ শাসন, পালন ও উদারনীতির আধার স্বরূপিণী আমাদের মহারাজ্ঞী বহু দূরস্থিত হইলেও, তাঁহার উদারনীতিমূলক শাসনযন্ত্র ও রক্ষণ যন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। যিনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে পৃথিবীর শীর্ষদেশাধিরোহণ ও সর্ব্বোপরি সিংহাসনাসীনা হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধভাগে সুনিয়ম সংস্থাপন ও সার্ব্বভৌমিক উদারনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক লোকরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার একই শাসন-যন্ত্রের একই সূত্রে সেই বিপুল সাম্রাজ্য নিনাদিত এবং কৃষি, বাণিজ্য, ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই রাজরাজেশ্বরীর বরাঃ স্বরূপ মূর্ত্তি চিরকাল আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার রাজনিয়ম যে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সভ্য রাজ্য মাত্রেই রাজতন্ত্র, অভিজাত নিয়মতন্ত্র বা সাধারণ প্রজাতন্ত্র (Kingly form—aristocracy—democracy) এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একপ্রকারে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বৃটিশ শাসননীতির মধ্যে ঐ তিন প্রকার আদর্শই বিদ্যমান আছে। রাজা আছেন, অভিজাত সমিতি, সাধারণ সমিতি, সমস্তই আছে।

আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮১৯খ্রীঃ অব্দে ২৪শে মে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন উইলিয়ম দি ফোর্থের মৃত্যুর পর ২১শে জুন ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্ঞীপদে বরিতা হয়েন। ১৮৪০ ১০ই ফেব্রুয়ারি বিবাহ হয় এবং ঐ অব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়া [illegible] ও ১৮৪১খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর আমাদের বর্ত্তমান রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ম হয়, এবং ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

আমাদের ভূতপূর্ব্বা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যগ্রহণের সময় আর্চবিশপ প্রত্যূষে যখন তাঁহাকে এই সংবাদ দেন, তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনি তবে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেন রাজদায়িত্ব বহনে সক্ষম হই।" ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে বৃটিশরাজ্যের সর্ব্বপ্রকারে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে তদ্রূপ উন্নতি সংঘটিত হয় নাই।

তাঁহার সময়ে—

১। রাজ্য বৃদ্ধি।

২। শাসননীতির উন্নতি।

৩। বিজ্ঞানের উন্নতি।

৪। শিল্পের উন্নতি।

৫। শান্তি।

৬। বিদ্যার উন্নতি।

সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের মহারাজ্ঞী যে অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন, তাহা তাঁহার রাজত্ব কালের প্রত্যেক একটী কার্য্যে প্রকাশ পায়। ডিউক অব্-ওয়েলিংটন তৎকালে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার অধীন একজন সৈনিক তৃতীয়বার অপরাধে অপরাধী হওয়ায়, তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, মহারাজ্ঞীর স্বাক্ষর-আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিতে যান। রাজ্ঞী তাহা অনুমোদন করিতে না পারিয়া, সজল চক্ষে করুণ কণ্ঠে বলিয়া ছিলেন, "ইহার পক্ষ হইয়া আপনি কি কিছু বলিবেন না?" তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন যে "ইহাকে আমি উপর্য্যুপরি দুইবার ক্ষমা করিয়াছি, আর ইহার পক্ষে বলিবার কিছুই নাই।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন "আপনি মহাপুরুষ, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।" তখন সেনাপতি অগত্যা মহারাণীর দয়া-প্রবণতা দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ কিছু বলিবার আছে বটে, যে, উহার গার্হস্থ্য জীবনে কোন দোষ নাই", "আপনাকে ধন্যবাদ" বলিয়া রাজ্ঞী তাহার প্রাণদণ্ড ক্ষমা করিলেন।

"মহারাণীর রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যান না" এই প্রবাদটী প্রকৃত সত্য; যে হেতু আমেরিকার ক্যানেডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড West Indies, জামেকা বৃটিশ গায়না প্রভৃতি; অষ্ট্রেলিয়া, যাহার পরিসর সমগ্র ইউরোপের তুল্য, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতীয় দ্বীপসমূহ, আটলান্টিক ও প্যাসিফিক ওসনের দ্বীপাবলী, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সায়রালিয়ন, গাম্বিয়া গোল্ড কোষ্ট, সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি, দক্ষিণ উপকূলে Cape of Good hope, নেটাল, জুলুল্যাণ্ড এবং ট্রান্সভাল পূর্ব উপকূলে মরিচ দ্বীপ, ভূমধ্য সাগরে মাল্টা, সাইপ্রাস দ্বীপ প্রভৃতি। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মহারাণীর অধিকারে কি সূর্য্য অস্তমিত হন?

মহারাণীর সময়েই ভারতবর্ষ সাক্ষাৎভাবে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পাঞ্জাব, আফগানিস্থান প্রভৃতি মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

ভারতের চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় ও মোগল-পাঠান বংশীয় সমগ্র রাজন্যবর্গের রত্ন-খচিত মুকুট যাঁহার পদতলে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং যিনি ভারতের সম্রাজ্ঞীর পদ লাভ করিয়া, ভারতীয় রাজা ও প্রজাবর্গকে সন্তানের ন্যায় সমভাবে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাশ্চাত্যবিদ্যার বিমল জ্যোতিতে প্রাচ্যভূম আলোকিত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল তাঁহার গুণগান করিব। আজ যে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জরী, তৈলঙ্গ রাজপুত ও পাঞ্জাবী, মোগল, পাঠান একত্রিত হইয়া পরস্পর এক পরিবারস্থ ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয়তা সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর মনোভাব বিনিময় করিতেছে, সে কাহার প্রসাদে? আমরা অনেকেই ঐ সব ভাষা-অনভিজ্ঞ, উঁহারাও বাঙ্গালা

ভাব। অনভিজ্ঞ, তবে আজ ইংরাজী শক্তির প্রভাবে পরস্পর ভ্রাতার ন্যায় যে সম্মিলন হইতেছে, সেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন-ভাষী ভ্রাতাদিগের শিক্ষয়িত্রী জননী কে? সেই মূর্ত্তিমতী জ্ঞানদেবী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই এই অজ্ঞান শিশুসন্তানগণের শিক্ষয়িত্রী জননী। তাই ভারতবাসী মাতৃহীন বালকের ন্যায় সকলেই সমস্বরে এবার মাঁ মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

হে মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড! আপনার মা ইংলণ্ডেশ্বরী, আর আমরা আপনার অনুগত ও পদাশ্রিত শিশু ভ্রাতাগণ, আমাদের মাও সেই ভারতেশ্বরী; তিনি প্রকৃত পক্ষে মরেন নাই। তাঁহার যশোরূপী সূক্ষ্ম দেহ কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার নহে। যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল তাহা অক্ষয় ও অমর থাকিবে।

"এই যে গোলাপপুষ্প অতীব সুন্দর হায়!
বিতরি সুগন্ধ ভূমে শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়॥
কিন্তু তার সার অংশ সহজে পায় কি ধ্বংস,
যদ্যপি প্রস্তুত হয় সুবাস আতর তায়?
যায় বটে পুষ্পরূপ, গুণ নাহি ধ্বংস পায়॥
গোলাপী আতর যাহা বিতরে সৌরভামৃত।
স্থূল রূপ ত্যজি তাহা সূক্ষ্ম গুণে বিবর্দ্ধিত।"

এইরূপ সেই মহাদেবীর স্থূল পার্থিব দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার যশোদেহ সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি তাঁহার যশঃস্বরূপ দেহের আদর্শে তাঁহার সার্ব্বজনীন উদার সাম্যনীতির অনুকরণে আমাদিগকে এবং আপনার আসমুদ্র-মহা-মহা-দেশবাসী প্রজাবর্গকে পালন করিয়া, যশস্বী হইয়া, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা মাতৃহীন হইয়াছি, এক্ষণ আপনার সুশীতল ক্রোড়-আশ্রয়ে স্থান পাই এবং সর্ব্বক্ষণ আপনার পূজা করিতে পারি, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা। আপনার নামে বুয়ার-যুদ্ধ তিরোহিত হইয়াছে, বুয়ারগণ আপনার পদাশ্রিত হইয়াছে। ভরসা করি, আপনি পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজন্যবর্গের শিক্ষার আদর্শ হইয়া, আসমুদ্র-বিপুলা পৃথিবী শাসন, পালন ও নব নব শুভসংঘটন সম্পাদন করিয়া, এই পৃথিবীকে অনাস্বাদিত ফল প্রদান করুন, এবং আপনার স্বদেশীয় লর্ড বুলার লিটন প্রণীত "Coming Race" নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করুন।

"Obedience to the rule adopted by the Government, has become, as much an instinct as if it were implanted by nature.

There being no apprehention of war. there were no armies to mentain,

Being no Government of force, there was no police to appoint and direct, what we call crime was utterly unknown to them."

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষে বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া যে কিরূপ সুখানুভব করিয়াছিলেন এবং কিরূপ আগ্রহ ও রাজভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। ভারত-ভুবন সেই কয়েক দিন যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া

ছিল। নগরে নগরে আলোকমালা, অগ্নি-ক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দপ্রদ কার্য্যের ভূরি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ শেষে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারতের প্রধান কবি ভারত-মাতাকে সম্বোধনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আশাকুসম্বল।

কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
মহিষী-নন্দন কোলেতে এল।
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
মহিষী তোমার—যাঁহার আশ্রয়ে,
এ শোক সহিয়ে আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শর্ব্বরী মাতঃ! অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে।
কেঁদনা কেঁদনা আরগো জননি!
আচ্ছন্না হইয়া শোকের ধূমে॥

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সাতক্ষিরা।)

---

## পঞ্চকোষ-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

১১। নন্থু দেহমুপক্রম্য নিদ্রা-
নন্দান্তবস্তুষু।
মা ভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনু-
ভূয়তে॥

বঙ্গানুবাদ। দেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যদি আত্মা বলিয়া মনে না কর, তবে আর কিছুই ত অনুভূত হয় না।

১২। বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনু-
ভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং
কো নিবারয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ। আনন্দময় কোষ প্রভৃতি সমস্তই অনুভূত হয়, আর কিছুই অনুভূত হয় না বটে, তথাপি যৎকর্ত্তৃক ঐ পঞ্চকোষ অনুভূত হয়, তাহাকে আত্মা বলিতে বাধা কি?

১১।১২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।—যদি স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময় কোষান্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্বরূপে বলিতেছেন,—তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহ স্বরূপ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষেরই অনুভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্য দ্বারা সেই স্থূল দেহাদির অনুভব হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর।

১৩। স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্য-
তে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো
নতসত্তয়া॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং অনুভূত, ইঁহার অনুভাবক নাই। জ্ঞাতা জ্ঞানান্তর অভাবে অজ্ঞেয়; কিন্তু তিনি অসত্তা নহেন, অর্থাৎ তিনি আছেন।

তাৎপর্যার্থ। যদি স্থূল শরীর স্বরূপ অন্নময় কোষাদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাঁহার উপলব্ধি হয় না কেন? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না? আত্মা বলিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিতাম। এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ উপায়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।— পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে সচারাচর কেহই জানিতে পারে না; কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা, অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন। জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়; যদি অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। যখন আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থে নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলে, নচেৎ তাঁহার অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

১৪। মাধুর্য্যাদি স্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্॥

বঙ্গানুবাদ। মধু-শর্করা প্রভৃতি স্বভাবতঃ মিষ্ট হেতু অন্য বস্তুতে সংসর্গ জনিত তাহার মিষ্টত্ব অর্পণ করে; আপনাতে মিষ্টত্ব অর্পণ জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না।

১৫। অর্পকান্তর রাহিত্যেপ্যস্ত্যেষাং তৎ স্বভাবতা।
মাভূৎ তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মাতু ন হীয়তে॥

বঙ্গানুবাদ। যেরূপ মধু-শর্করার মিষ্টত্ব-গুণ অর্পণকারী অন্য কোন বস্তু না থাকায়, স্বভাবতঃ মধু-শর্করাই মিষ্ট, সেইরূপ পরমাত্মার অন্য জ্ঞাতা না থাকায়, তাঁহার অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না।

১৪।১৫শ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ—আত্মাই সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অনুভব করে, এমন কোন পদার্থই নাই, এই নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সে বিষয় প্রমাণীকৃত করিয়া, আত্মার বিদ্যমানতাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। যেমন মাধুর্য্য গুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় সংসর্গ বশতঃ অন্য বস্তুতে আপন মাধুর্য্য-গুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্য গুণ স্থাপনার নিমিত্ত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু-শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমত অন্য কোন পদার্থই নাই; সুতরাং সেই মধুশর্করাদির মাধুর্য্য গুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ নাই এবং তাঁহাকে জানিবার অন্য জ্ঞানও নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না।

১৬। স্বপ্রকাশং জ্যোতির্ভবত্যেষ
পুরোহস্মাদ্‌ভাসতেহখিলাৎ।
তমেব ভান্তং মন্বেতি তদ্ভাসা
ভাসতে জগৎ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা স্বয়ং প্রকাশক, জানিবে তাঁহা হইতে সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া জানিবে; তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশক আর কেহই নাই। এই সচরাচর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন; তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৭। যেনেদং জানতে সর্ব্বং তং
কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাত্ শক্তং
বেদ্যেস্তু সাধনম্॥

বঙ্গানুবাদ। যৎকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে অন্য কর্তৃক কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? জ্ঞাতাকে কে জানিবে বা জ্ঞাতাকে অনুভব করিয়াই বা ইন্দ্রিয়গণকে কে নিয়োজিত করিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিত্য চৈতন্য দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ সেই নিত্য-চৈতন্যকে অন্য কোন্ অনিত্য বস্তু দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনরূপেই জানা যাইতে পারে না। যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে পারে না। পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব জ্ঞেয় বিষয়ে নিয়োজিত করেন, কিন্তু সেই আত্মাতে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে?

১৮। স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং
নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতা বিদিতাভ্যাং তৎ
পৃথগ্ বোধস্বরূপকম্॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সমস্ত পদার্থকে জানেন, তাঁহার অন্য পরিজ্ঞাতা নাই। বিদিত ও অবিদিত পদার্থ হইতে তিনি পৃথক্ জ্ঞানস্বরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই, এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে, সেই পরমাত্মা তৎসমুদায় হইতে

পৃথক্ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে, তাহা হইতেও সেই পরমাত্মা বিভিন্ন। তিনি নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, পরম পিতা পরমেশ্বর।

১৯। বোধেহপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহার (উপযুক্ত) বোধ থাকা সত্ত্বেও অনুভব হয়না, সেই মৃৎপিণ্ডবৎ নরাকৃতি এই শাস্ত্র কি প্রকারে বুঝিবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিযোগ সত্ত্বেও অনুভব করিতে পারেনা, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ ও জড় পদার্থের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য পাত্র। যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের বোধভাগী করা যাইতে পারে? যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্র যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বোধের অধিকারী হইতে পারেনা।

২০। জিহ্বা মেহস্তি ন বেত্যুক্তি-র্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার জিহ্বা আছে কিনা, এই কথা যেরূপ লজ্জাজনক; আমার জ্ঞান আছে, আমি জানিনা, এই কথাও সেইরূপ।

তাৎপর্য্যার্থ। যিনি পরমাত্মা, [illegible] নন্দময় পরব্রহ্ম, নিত্য বোধস্বরূপ, তিনি কোন প্রকারেও আমাদের বোধগম্য হন না; অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা কোন উপায়েও জানিতে পারিনা, এই প্রকার উক্তি করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন "আমার জিহ্বা আছে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিনা" এই বাক্য নিতান্ত লজ্জাজনক, কারণ জিহ্বা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারেনা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপি জিহ্বার প্রতি সংশয় করা যেরূপ লজ্জাকর, "নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না" এই বাক্যও তদ্রূপ নিতান্ত লজ্জাকর। "নিত্য-বোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না" এই যে বাক্য, ইহা "জ্ঞানকে জানিনা" এই বাক্যের ন্যায় অলীক ॥

২১। যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদবোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবংধীর্ব্রহ্ম নিশ্চয়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

তাৎপর্য্যার্থ। লৌকিক ব্যবহারবিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে "জ্ঞান" তাহাকেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জান, এবং সেই জ্ঞানকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাঁহার স্বরূপ নহে।

২২। পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষি-
বোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য
দুর্ঘটম্ ॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার যে সাক্ষীবোধ অবশিষ্ট থাকে, সেই বোধই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব পঞ্চ কোষের অতিরিক্ত শূন্য হইতে পারে না।

তাৎপর্য্যার্থ। যদিও তন্ন তন্ন রূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান মাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে, পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপিও পঞ্চকোষ-বিচার নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ-বিচারের উপযোগিতা আছে। বিশেষ বিবেচনা পুরঃসর অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগের অনাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট সাক্ষী স্বরূপ যে "জ্ঞান" থাকে বা প্রকাশ, তাহাই পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যদি বল, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল শূন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে; পঞ্চকোষ বিচার পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগের সাক্ষী স্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান; সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক, নচেৎ পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না।

উপরোক্ত পঞ্চকোষ-বিবেকের ১ম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য এই যে, অন্নময় কোষাভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময় কোষাভ্যন্তরে মনোময়, মনোময় কোষাভ্যন্তরে ধীময়, তদভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ হইতেছে; ঐ আনন্দময় কোষই আত্মার খনি-স্বরূপ। আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোকেই প্রকাশ। ঐ শ্লোকে পঞ্চকোষবিচার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বর্ণিত আছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে, বেদোক্ত সৎ অদ্বৈততত্ত্ব পঞ্চভূতবিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; সেই জন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক। ঐ পঞ্চভূত বিচারকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চভূতাশ্রয়-জ্ঞানের মধ্যে ঐ ভূত সকল বা ভৌতিক সমস্ত পদার্থ ত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট যে নিত্য জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে, সেই নিত্য সৎ পদার্থই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। এক্ষণে এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রথম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের মীমাংসার স্থূল অর্থ যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অতিরিক্ত নিত্য চৈতন্য বা নিত্যানন্দই আত্মা,—যে নিত্য চৈতন্যের বা জ্ঞানের ছায়া (আভাস) প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা স্বরূপে এবং যে নিত্যানন্দের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় কোষ ভোক্তা স্বরূপে ক্রিয়মাণ, সেই নিত্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আত্মা। নিত্যজ্ঞানই যে নিত্যানন্দ সৎ পদার্থ, তাহা ভূতবিবেকের প্রথমেই

প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সৎই চিৎ বা জ্ঞান এবং সৎই আনন্দ। ঐ জ্ঞান বা আনন্দই যে আত্মা, তাহাও ঐ তত্ত্ববিবেকের প্রথমে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে ভূতবিবেক বিচার কালে যাহা পঞ্চভূত-বিচার দ্বারা মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পঞ্চকোষবিচার দ্বারা তাহার মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভূতবিবেক ও পঞ্চকোষবিবেকের মধ্যে পার্থক্য কি, নির্ণয় আবশ্যক। ঐ পার্থক্য নির্ণয়ের পূর্ব্বে পাঠকগণের একটী বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভূতবিবেক বিচার কালে সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্থূলতম পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ঐ ভুবনস্থ জড়, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু পর্য্যন্ত বিচার ও সেই সকল সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম পদার্থের জড়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চকোষ বিচারকালে স্থূলতম দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া, ঐ সকল কোষের অনাত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ভূতবিবেক দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল এবং পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থের মীমাংসা দ্বারা আর্য্যঋষিগণ সৃষ্টির গূঢ় রহস্য অতি সুকৌশলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সৃষ্টি-রহস্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিলে, উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় ও ঐ উভয় বিচারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে। ইহাদ্বারা কেবল সৃষ্টির গূঢ় রহস্য নহে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যও সুবিশদ ও সুসঙ্গত হইবে।

সৃষ্টির বিবর্ত্তবাদের (Evolution theory) তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত অনন্তজ্ঞান বা চৈতন্য অপ্রকাশ অবস্থায় কেবল বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। বিষয় অবলম্বনেই জ্ঞান বা চৈতন্য প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, জ্ঞানের দুইটী পার্শ্ব মাত্র। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয়, সেই শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি। যেমন জ্ঞাতা ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ বা বিষয় উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ বিষয় ব্যতীত জ্ঞাতারও বিকাশ বা জ্ঞানেরও স্ফূরণ হয় না। এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু লইয়াই জ্ঞান। যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, তখন জ্ঞানশক্তিও অবিকাশিত বীজ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে।

মনুর ৫ম শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥৫

বঙ্গার্থ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোনও লক্ষণ দ্বারাও অনুমেয় নহে; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ৫।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।

পরে স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্ব সংসারকে ক্রম-প্রকটিত করিয়া, সেই

তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক রূপে প্রকাশিত হন।৬।

স্বয়ম্ভূ ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকথিত মত-সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থাকিলে, তাহার বীজ ঐ অব্যক্তের মধ্যে অবশ্য থাকে। ঐ অব্যক্তের মধ্যে ভগবান ও আদি মহাভূত না থাকিলে, "স্বয়ম্ভূ" ও "মহাভূতাদি বিক্তৌজাঃ" শব্দের কোনও অর্থ থাকে না। ঐ স্বয়ম্ভূর্ভগবানই জ্ঞাতা এবং আদি মহাভূতই জ্ঞেয়। ঐ জ্ঞাতাই জ্ঞানশক্তি দ্বারা, যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জ্ঞেয় বস্তুতে প্রবৃত্তবীর্য্য অর্থাৎ কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া, অজ্ঞান বা অপ্রকাশ রূপ তমোনাশক স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। গীতায় কথিত হইয়াছে "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিও ; এই পুরুষই জ্ঞাতা এবং প্রকৃতিই বিষয়ের বীজস্বরূপিণী। এই পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, উভয়ই নিত্য ; উহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই। পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে উভয়ই বিদ্যমান আছে। ঐ জ্ঞাতার নিকট যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রতিভাসিত হয়, তখন উভয় সম্মিলিত হইয়া মানসাকারে ( Ideal form এ ) ব্রহ্মাণ্ড প্রকটন করেন, ইহাই বেদান্তোক্ত মায়াবাদ ; এই মায়াবাদই বিবর্ত্তবাদের মূল। উহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতীব কঠিন ; কিন্তু যতই কঠিন হউক, ঐ মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই পঞ্চকোষবিবেকের প্রকৃত মর্ম্মের কখনই ধারণা হইতে পারে না ; এই জন্য গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববিবেক দ্বারা মায়াবাদ, তৎপরে ভূতবিবেক দ্বারা বিবর্ত্তবাদ বুঝাইয়া, এই পঞ্চকোষ-বিবেকের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ড কেহ হাতে গড়াইয়া সৃষ্টি করেন নাই, এবং ঈশ্বর কোন বিশেষ ব্যক্তি নহেন। অনাদি চিৎ বা জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবও মুকুলিত থাকে ; উহার বিকাশ বা প্রকাশই সৃষ্টি, অবিকাশ বা অপ্রকাশই প্রলয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিশেষ কেহ নহেন, তবে সৃষ্টির বিকাশ অবিকাশ কাহার নিকট এবং কেই বা তাহা অনুভব করে ? ইহার উত্তর এই যে, চৈতন্যের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডভাবের যখন স্ফুরণ হয়, তখন ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু ভাবে বিকাশিত হন। ভাষান্তরে বলিতে হইলে, ঐ চৈতন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবানুভূতির সহিত মানসাকারে বিকাশিত হন। আপনার দেহ চৈতন্য নহে, দেহ ধ্বংসশীল ; দেহাতিরিক্ত যে চৈতন্য আছে, তাহা তত্ত্ববিবেক ও ভূতবিবেক মীমাংসা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ চৈতন্য জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞাতা স্বরূপে কেবল উপস্থিত জ্ঞেয় বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা, অনুপস্থিত বস্তু অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা, এবং স্বপ্নকালে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়বস্তু যখন অনুভব করেন, তখন জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার নিকট মানসাকারে প্রকটিত হয় ; অর্থাৎ মনের মধ্যে রাম, শ্যাম, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, দ্বার, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি প্রতিভাসিত বা প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তু সকল থাক বা

অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইলে, মনের মধ্যে আকারবিশিষ্ট হয়। ভাষান্তরে বলিতে হইলে, মনই তদাকারে প্রকাশিত হয়েন। সুষুপ্তি কালে অন্তর ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারোধ হইলে, জ্ঞেয় বস্তু মানসপটে প্রতিভাত হয় না এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু অবিকাশিত হইয়া নিদ্রিত চৈতন্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। চৈতন্য যখন দেহাতিরিক্ত, তখন দেহাশ্রিত চৈতন্য ছাড়িয়া দিয়া, অনাদি অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞেয় ভাব (অর্থাৎ সমষ্টি ভাব) প্রতিবিম্বিত হইলেই ঐ ভাবসমূহ জ্যোতির্ম্ময় মহা মানসাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। ঐ সমষ্টি-মানসাকারই দার্শনিক মহত্তত্ত্ব বা 'সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব'।

ঐ সমষ্টি জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধিতত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ব্যষ্টিভাবে প্রতিবিম্বিত ও যুক্ত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ মানসাকারে গ্রথিত হয়, এবং সেই গ্রথিত মানসাকারই অহং অর্থাৎ আমিত্ব ভাবে বা কর্ত্তৃস্বরূপে পরিণত হইয়া, তাহা হইতে বহুভাব প্রসূত হয়। মনে করুন, শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্রের ভাব চিৎক্ষেত্রে অর্থাৎ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বে ক্রমিক বিকাশিত হইয়া, যথাক্রমে আকাশ, বায়ু তেজ, জল, ক্ষিতিতত্ত্বের ভাব প্রকটিত হইল। আবার ঐ সকল তত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে একটি গোল পিণ্ডবৎ সৌর জগতের ভাব মানসাকারে গ্রথিত হইয়া, তন্মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী, এবং পার্থিব জড়, উদ্ভিদ, প্রাণিজ্ঞ আকারে মহামানস-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। ঐ মহামানসক্ষেত্র মধ্যে এক একটি ব্যষ্টি জ্ঞেয় বস্তুর ভাব যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি মানসাকারে প্রকটিত হয়, সেই সেই ব্যষ্টি মানসাকারই সেই সেই ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সমষ্টি-মানসাকারই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।

চিৎক্ষেত্রে ঐ মানসাকার যে মৌলিক চৈতন্য হইতে যে জ্ঞানশক্তি বিকাশিত হয়, সেই শক্তিই জ্ঞেয় বস্তু (মানসাকারে) প্রকটিত করিয়া দেয়। ঐ শক্তির মধ্যে আকর্ষণী ও বিয়োজনী ক্রিয়া আছে।

আকর্ষণই অনুরাগ, বিয়োজনই বিরাগ। এই আকর্ষণ বিয়োজন বা অনুরাগ বিরাগ প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে প্রধান কার্য্যকারী।

এক অনন্ত অসীম চিৎক্ষেত্রে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক মানসাকার যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপ (মানস-গ্রাহ্য) বস্তুভাবে এবং ঐ ঐ বস্তুর গুণ যথাক্রমে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গ্রাহিকা শক্তি ভাবে প্রকটিত হয়; ঐ ভাবাত্মক মহামন বা মহত্তত্ত্ব কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াভাবে ব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। ঐ মহামানস মধ্যে ভাবগ্রাহিকা শক্তিই কর্ত্রী। গ্রাহ্য ভাব সমূহ—যথা আকাশ-বায়ু-তেজাদি কর্ম্ম এবং পূর্ব্বোল্লিখিত আকর্ষণ বিয়োজনই ক্রিয়া। উল্লিখিত আকর্ষণী ও বিয়োজনী ক্রিয়া হইতে প্রথমতঃ ঐ মানসক্ষেত্র কাম্পিত (vibrated) হইয়া শব্দের ভাবরূপ আকাশ ও গতি উৎপন্ন বা কল্পিত হয়। তদ্দ্বারা স্পর্শের ভাবরূপ বায়ুর বিকাশ হয়। উহাদের সংঘর্ষণে রূপাত্মক

তেজ বিকাশিত হয়। ঐ তেজের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইতে যথাক্রমে জল ও ক্ষিতি রূপ ভাবের বিকাশ হয়, এবং ঐ ঐ ভাব-গ্রাহিকা শক্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে তত্তৎভাব গ্রহণের নিমিত্ত সজীব সূক্ষ্ম পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ জৈবভাবে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ এবং বিয়োজন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ঐ মানসপ্রোথিত ভাবসমূহকে নানাকারে গঠন করিয়া জড় জগদাকারে ভাসমান হয়। ঐ পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জড়-জগতের ক্রমিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ভূতবিবেক ব্যাখ্যাকালে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ জড়াভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত ত্রিতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট মানস-শক্তি গুহ্যভাবে থাকায় এবং পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণী ও বিয়োজনী প্রভৃতি সজীব-শক্তির আভ্যন্তরিক ক্রিয়া চলিতে থাকায়, ঐ জড়ের উপাদান সকল উদ্ভিদের উপাদানে এবং উদ্ভিদের উপাদান সকল জৈবোপাদানে পরিণত হইয়া, স্বেদজ কীট পতঙ্গাদি রূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল কীট পতঙ্গ রূপ ভাবের মধ্যে ভাবগ্রাহিকা শক্তি অনন্তভবনীয় রূপে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ স্থান হইতে চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ কর্ম্মরূপ ভাবপ্রবাহ পূর্ব্বোল্লিখিতমত ভূত ও ভৌতিক তত্ত্বে পরিণত এবং জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, যেন কর্তৃত্বশক্তি রূপে পরিণতির জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহা মানস-ক্ষেত্রস্থ ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত ও একএকটি জড় বা জড়তত্ত্বাশ্রিত জীবরূপে বিকাশিত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব রূপ বস্তুর মধ্যে জৈবতত্ত্ব বিকাশিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রিতত্ত্বযুক্ত মানসশক্তি স্ফুরিত হইতে থাকে। ঐ ঐ কল্পিত ভাব-রূপ বস্তু যেন সজীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কল্পনা-কারী মনরূপে নব নব ভাব গ্রহণ ও উৎপাদন করিতে যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। যেন কর্ম্মরূপ ভাবের মধ্য দিয়া অহং চিহ্নিত ভাবগ্রাহক ও ভাবউৎপাদক কর্ত্তা শনৈঃ শনৈঃ বিকাশিত হন।

পাঠকগণ! যদি পৌরাণিক রতি-পরিণয় উপাখ্যানটি বিশ্লেষ করিয়া, উহার রূপক-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, তবে সৃষ্টিরহস্য এবং ঐ সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে স্বেদজ জীবের উৎপত্তি এবং ঐ স্বেদজ জীব হইতে সৃষ্টিচক্রের গতির পরিবর্ত্তন স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিবেন। উদ্ভিদ এবং স্বেদজ জীবের মধ্যে উৎপত্তির প্রক্রিয়ার কিছু প্রভেদ থাকিলেও, উভয়ই প্রায় একই নিয়-মের অধীন; কিন্তু অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব-সৃষ্টির বাহ্য প্রক্রিয়া উদ্ভিদ ও স্বেদজ জীবের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া হইতে ভিন্নরূপ। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং প্রাণময় মধ্যে মনোময় কোষ কিরূপে উৎপন্ন এবং প্রস্ফুটিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

এখন একটি কথা বুঝিবার আবশ্যক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য বস্তু সেই নিরাকার চিৎক্ষেত্রস্থ বিরাট মানস-কল্পিত এক একটি ভাব ভিন্ন প্রকৃত কোন বস্তু নহে। এক চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ঐ চৈতন্যই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বিকাশিত হন মাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ কল্পিত ভাবরূপবস্তু (যাহা প্রকৃতবস্তু নহে) প্রথ-মতঃ অন্নময়কোষে অর্থাৎ—আকারবিশিষ্ট

দেহরূপে কিরূপে পরিণত হয়, এবং তন্মধ্যে প্রাণময়, মনোময়, ধীময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশই বা কি প্রকারে হয়; যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে, কল্পিত ভাবমাত্র, তাহা কি প্রকারে দৃশ্য আকার অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণ করে? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কল্পিতভাব প্রথমেই স্থূল আকারবিশিষ্ট কখনই হইতে পারে না। প্রথমতঃ চিৎ-ক্ষেত্রস্থ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বই ক্রিয়া ও গতিশীল হইয়া সূক্ষ্ম জগৎরূপ মানসকারবিশিষ্ট হন; অর্থাৎ অনন্ত চিৎক্ষেত্রে মানসকল্পিত জগৎ প্রকটিত হয়, এবং ঐ মানসক্ষেত্রস্থ জগৎ বাহ্যপ্রকাশের জন্য তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্য চিদংশরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে ঐ সকল কল্পিত ভাব সত্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়া অনুভব করেন; উহারই নাম সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা বিবর্ত্তবাদ।* ঐ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ অবনয়ন-প্রণালী অনুসারে চৈতন্যশক্তি জড়ভাবে মগ্ন হইয়া পুনরুন্নয়ন প্রণালী অনুসারে ঐ জড়ের মধ্য হইতে চৈতন্যরূপে স্ফুরিত হন; কিন্তু মহামানস-গ্রথিত ভাবরূপ জগৎ প্রথমতঃই স্থূলাকারে বা অন্নময়কোষে পরিণত হয় না। ঐ মানসগ্রথিত ভাবসমূহ মানসক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মাকারে পরিণত ও গতিবিশিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বোক্তমত আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়া দ্বারা স্থূল জড়াকারে পরিণত বা উপলব্ধ হয়। ঐ স্থূল জড়ভাবের মধ্যে লুক্কায়িত চিৎশক্তি কর্তৃক জড়ের উপাদান সকল গতিবিশিষ্ট হইয়া জীবভাবে পরিণত হইলে, ক্রমক্রমে অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়। ঐ অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যে মানসশক্তি অঙ্কুরিত হইলে, মনোময় কোষ-প্রস্ফুটিত বিজ্ঞানময় জ্ঞাতার আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ সমষ্টি-ব্রহ্ম-চৈতন্য মহামানসক্ষেত্রস্থ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূল জড়াকারে অর্থাৎ জড়জগতে পরিণতি পর্য্যন্ত সৃষ্টির অবনয়ন-প্রণালী, এবং পার্থিব বা ভৌতিক জগতস্থ জড়ভাবের মধ্য দিয়া অন্নময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষের বিকাশ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ পার্থিব জীবজগতের প্রারম্ভ হইতে চরম উন্নতি পর্য্যন্ত) উন্নয়ন-প্রণালী। অবনয়ন-প্রণালীর তাৎপর্য্যই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতি। উহার নিয়ম এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ চিৎক্ষেত্রে মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব যে বিকাশিত হয়, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রথম কোষ; উহাই দর্শন-শাস্ত্রোক্ত মহত্তত্ত্ব। ঐ মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে মহামানসাকারে বিষ্ণু ও বিশ্বাত্মারূপে প্রকটিত হয়েন। কিন্তু ঐ জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশের (সৃষ্টির) অভিমানরূপ অহংত্ব বা আমিত্ব-ভাব প্রকটিত না হইলে, অনুভাবক ও অনুভাব্য বিষয়ের পার্থক্য-উৎপত্তি হইবে কেন? আমিত্ববোধই ব্রহ্মের মায়াশক্তির কার্য্য। ঐ আমিত্বভাবের স্ফুরণ হইতেই সৃষ্টি-আরম্ভ; উহাই দার্শনিক হিরণ্যগর্ভ ও পৌরাণিক

---

* প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য জগৎ একেবারে মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে। বিবর্ত্তবাদ অর্থে এক পদার্থের পদার্থান্তর-বিকাশ বুঝায়; এই জন্যই দার্শনিকগণ দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালের সহিত তুলনা করেন বা রজ্জুতে সর্পভ্রম বলেন; বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহার বিকাশ অসম্ভব।

ব্রহ্ম। ঐ মহামানস-ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধস্তুবে সৃষ্টির অভিমান রূপ আমিত্ব ( ভাব ) বা অহং-তত্ত্ব ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বিতীয় কোষ; অতএব চৈতন্য, বুদ্ধি, মানস, এই ত্রিতত্ত্ব হইতেই মহাআমিত্বের বিকাশ হয়, এবং আমিত্বের বিকাশ মাত্রেই মহা মানসক্ষেত্র কম্পিত অর্থাৎ গতিশীল হইয়া, ঐ আমিত্ব-বোধের বা জ্ঞানের নিকট শব্দের ভাবরূপ আকাশ স্ফুরিত হয়; ঐ মহাকাশই ব্রহ্মচৈতন্যের তৃতীয় কোষ; ইহাই বিশ্বের আদি ভূত। ঐ আকাশে পূর্ব্বোক্ত গতিবিশিষ্ট স্পর্শের ভাব রূপ বায়ুর যে বিকাশ হয়, ঐ বায়ু ব্রহ্মের চতুর্থ কোষ; ঐ বায়ুতে রূপপ্রকাশক তেজ বা তৈজসতত্ত্ব পঞ্চমকোষ।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# পরব্রহ্ম-স্তোত্রম্।

## ( মহানির্ব্বাণতন্ত্রোদ্ধৃতম্। )

( ১ )

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের শরণ,
তোমায় প্রণাম করি আমি অনুক্ষণ।
তুমিই নিখিল আত্মা, তুমি জ্ঞানময়,
তোমায় প্রণাম করি হইয়া তন্ময়।
তুমিই অদ্বৈত তত্ত্ব, মুক্তিদাতা তুমি,
তোমায় প্রণাম করি ভক্তিভরে আমি।
তুমিই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর,
তোমায় প্রণাম করি আমি নিরন্তর।

( ২ )

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
একমাত্র তুমি হও সবারি শরণ,
একমাত্র তুমি হও ভবে শ্রেষ্ঠ ধন।
একমাত্র তুমি হও হেতু জগতের,
একমাত্র তুমি বিশ্বরূপ এ বিশ্বের।
একমাত্র তুমি কর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
একমাত্র তুমি হও নিশ্চল নিশ্চয়।
একমাত্র তুমি সদা পূজ্য পরাৎপর,
একমাত্র তুমি নির্ব্বিকল্প নিরন্তর।

( ৩ )

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্॥
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥
ভয়-সমূহের তুমি ভয় অনুক্ষণ,
ভীষণের মধ্যে তুমি পরম ভীষণ।
তুমিই জীবের এক গতি সর্ব্বক্ষণ,
পাবন-গণের মধ্যে তুমিই পাবন।
তুমিই মহোচ্চ পদ ধ্যাত নিরন্তর,
রক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি পরাৎপর॥

( ৪ )

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্,
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য

আচণ্ডালকং ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,
জগদ্ধালকাধীশ পারাদপায়াৎ ॥
ওহে প্রভু! পরাৎপর! সর্ব্ব-রূপ ধর!
অক্ষর! অজেয়! সত্য! ইন্দ্রিয়াগোচর!
হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! সর্ব্ব-বস্তু-চর!
হে অব্যক্ত-তত্ত্ব! ভব-ভাসক! ঈশ্বর!
করুণা করিয়া তুমি আমাদের প্রতি,
দূর করি দাও যত দুরিত-দুর্গতি।

( ৫ )

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥
সেই এক বস্তুকেই মনে মনে স্মরি,
সেই এক বস্তুকেই সদা জপ করি;
জগতের সাক্ষী যিনি রন অনিবার,
সেই এক বস্তুকেই করি নমস্কার;
সবাই আশ্রয়ে যাঁর রহে সর্ব্বক্ষণ,
অথচ কাহারো যিনি আশ্রয় না লন;
ত্রিসংসারে স্থিতি যাঁর চিরদিন ধরি,
ভব-সাগরের যিনি একমাত্র তরি;
যাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলে ত্রিভুবন,
লইলাম একমাত্র তাঁহারি শরণ।

( ৬-৭ )

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমা-
প্নুয়াৎ॥
প্রদোষেঽমুং পঠেন্নিত্যং সোমবারে
বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েদ্ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্
স্ববান্ধবান্॥
পরম ব্রহ্মের এই পঞ্চরত্ন স্তুতি
যেই জন পাঠ করে হয়ে একমতি,
যে জন সন্ধ্যায় ইহা নিত্য পাঠ করে,
বিশেষতঃ যেই জন ইহা সোমবারে,
ব্রহ্মনিষ্ঠ নিজ বন্ধু সকলে ডাকিয়া,
শ্রবণ করায় কিম্বা দেয় বুঝাইয়া;
কিবা সে পরম ব্রহ্ম, কিবা সেই জন,
উভয়ের মধ্যে ভেদ না রহে কখন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন,
উদ্ভটসাগর, বি-এ

---

# শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-

## স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র।

[ সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

কাশীধামে রসহীন অদ্বৈতবাদ বিলীন
প্রেম-দীন সন্ন্যাসীসমাজে
থাকি কৃষ্ণ-প্রেমরসে, স্বজন-কৃপার বশে,
অবশেষে রূপের অগ্রজে—
হয়ে যিনি কৃপাবান, সুশক্তি করিলা দান,
বিষ্ণুভক্তি-স্মৃতি রচনায়;
ভজন বিষয়ে যিনি সাধুগুরু-শিরোমণি,
বন্দি সেই শ্রীগৌরাঙ্গরায়। ৫৮

"ধিক্ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রতি প্রণয়বিহীনে!
ধিক্ শুষ্ক-তর্কবাদরত-রসহীনে!"
এইমত বাক্যে রূপ-বাসিত চলিতে
পরম-সত্যবাদী ন্যায়ীসজ্জনীতে। ৫৯

জগন্নাথ-মন্দিরের মাঝে,
গরুড়-স্তম্ভের অতি কাছে,
প্রেমেতে বিহ্বলা এক বুড়ী,
যে গৌরহরির স্কন্ধে চড়ি,
শ্রীমূর্ত্তি করিল দরশন!
যে প্রভু তাহাতে তুষ্ট হ'ন!
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার।

সুমধুরা গুরুপদ-যোগ্যা—
ভক্তি যাঁর পুরীদেব-ভোগ্যা,
পরিনিষ্ঠ পরিচর্য্যান্বিত—
গোবিন্দ যাঁহার কৃপাশ্রিত,
স্বরূপাদি প্রিয়গণ-প্রতি
যাঁর মধুররসরূপা প্রীতি,
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতি-পথে সতত আমার। ১১

কৌপীন-উপরে সুশোভন
পরিহিত অরুণ বসন!
স্বর্ণ শৈলসম কান্তিধর
যাঁর সর্ব্বশরীর সুন্দর!
"রাধাকৃষ্ণ" নামের জপনে,
ধারা যাঁর বহে দুনয়নে!
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার। ১২

সুমধুর "হরিবোল" বলি,
গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে চলি,
যান যিনি নিজজন সঙ্গে,
নগরের পথে প্রেমরঙ্গে;
সবে যিনি বলেন কাতরে,
"বল "হরি"—এ দুটি অক্ষরে!"
থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতি-পথে সতত আমার। ১৩

যে রহস্য শাস্ত্র সমূহের—
অবিদিত পূর্ব্বপণ্ডিতের,
শ্রুতির সে গূঢ় দশ তত্ত্ব,
প্রেম-সুকালিত যার সত্ত্ব,
শিখালেন অতি দয়া করি,
যে দয়াল প্রভু গৌরহরি

থাকুন সে শচীর কুমার
স্মৃতিপথে সতত আমার। ১৪

এ সবার পরমতত্ত্ব হরি,
হরি হন [illegible] অবতারী;
হরি হন রসপারাবার,
জীবেরা বিভিন্ন অংশ তাঁর;
কতক প্রকৃতি-কবলিত,
কতক তাহাতে অতীত;
এ সমগ্র বিশ্বের বিকাশ—
ভেদাভেদে হরির-প্রকাশ!
সাধন বিশুদ্ধ ভক্তি হয়,
হরিপ্রেম সাধ্য সুনিশ্চয়;
জনগণে উপদেশ এই—
দিলা স্বয়ং গৌরচন্দ্র সেই॥ ১৫

হরিপ্রিয় ব্রহ্মা আদি হতে
বেদ যত বিদিত জগতে,
স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্প্রমাণ,
সহিত প্রত্যক্ষ-অনুমান;—
তাহার প্রমের নরাধিপ,
বেদেতেই বিদিত নিশ্চিত;
অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক-যুক্তি
প্রবেশিতে নাহি ধরে শক্তি। ১৬

বিধি শিব সুরেন্দ্র বন্দিত
এক তত্ত্ব হরি, বেদে বৃত্ত;
আকৃতিবিহীন ব্রহ্ম যাহা,
যাঁহার শ্রীঅঙ্গপ্রভা তাহা!
বিষময় বিশ্বের জনক
পরমাত্মা যাঁহার অংশক;
নবজলধর-কান্তি যিনি,
চিদানন্দ রাধাকান্ত তিনি। ১৭

হইয়াও পরাশক্তি হইতে অভিন্ন,
আত্মমহিমায় যিনি নিত্য প্রতিপন্ন;
জীবশক্তি-চিৎশক্তি-অচিৎশক্তি আর,—
এই ত্রিপাদিকা হয় ইচ্ছাশক্তি যাঁর;
সে শক্তি-সাধিত যাঁর সমস্ত বিহার,
নির্বিকার সে পরম-পুরুষের জয়! ১৮
হ্লাদিনী স্বরূপা সেই প্রেমস্বভাবে,
সম্বিৎ-সুপ্রকটিত

সন্ধিনী-সুপ্রকাশিত শ্রীধামনিচয়ে,
রসের সমুদ্রমাঝে নিমজ্জিত হ'য়ে,
যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব নিত্য ব্যক্ত রয়,
ব্রজরসবিলাসী সে শ্রীহরির জয়! ৭৯

জলদগ্নি হ'তে স্ফুলিঙ্গ যেমন,
চিৎ হ'তে জীব চিৎকণ তেমন,
হরি সূর্য্য, জীব জ্যোতিঃকণরূপ,
অভিন্ন হ'য়েও বিভিন্নস্বরূপ;
প্রাকৃতিক শক্তি, মায়া-অধীশ্বর
যিনি এ জগতে, তিনিই ঈশ্বর।
মুক্ত হ'য়ে যেই প্রকৃতিতে বদ্ধ,
স্বগুণানুসারে, সেই জীবতত্ত্ব। ৮০

স্বরূপার্থহীন, নিজসুখে লীন,
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ যারা,
হরির মায়ার গুণ-পাশ-তার
দণ্ডে দণ্ডনীয় তারা।
স্থূল লিঙ্গ আদি, দেহ দ্বিপ্রকার,
কর্ম্মবন্ধে ক্লিষ্ট অতি;
ছাড়িছে স্বরগে, পড়িছে নরকে,
এইমত জীব-গতি। ৮১

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হরিরসামৃত
রসিক বৈষ্ণবজনে—
কভু দর্শনে তদনুগমনে
রুচি হয় জীব-মনে।
ক্রমে "হরি হরি" উচ্চারণ করি,
মায়াদশা যায় তার;
স্বরূপ সে লভে, ডুবে সে এ ভবে
নিরমল রসসার! ৮২

চিদচিৎ এ বিশ্বমণ্ডল,
হরিশক্তি-পরিণতি-ফল।
বিবর্ত্তন অসত্য অশুদ্ধ,
কল্পিত, বেদের বিরুদ্ধ।
হরি-ভেদাভেদ-তত্ত্বফল—
শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সুবিমল;
সে তত্ত্ব হইতে নিত্য হয়—
নিত্যভক্তে সিদ্ধ প্রেমোদয়। ৮৩

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন,
স্মরণ ও চরণ-পূজন,
অর্চ্চনা-বন্দনা-সেবকতা,
সখ্য-আত্মনিবেদন তথা;
এই সব অঙ্গ শ্রদ্ধাভরে
অনুদিন সাধন যে করে,
আহা! সেই ভক্ত সুনিশ্চয়
সুবিমল রতিপ্রাপ্ত হয়। ৮৪

স্বরূপাবস্থিত ভক্ত যবে হয়,
মধুর রসের মতে ভাবোদয়;
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজন-জনের
ভাব অংশে ধরি, নন্দনন্দনের
প্রীতি সুধৈশ্বর্য্য অতুল জগতে—
লভিয়া অন্তরে, পরানন্দে মেতে,
বিলাস তত্ত্বের রস-সাধনায়,
চরমে পরম সেবানন্দ পায়! ৮৫

কেবা প্রভু, জীব কেবা, এ জড়জগৎ কিবা,
বিচারি এ অনর্থ প্রচুর,
ভক্তিভরে যেই জন করেন হরিভজন,
সেইজন শাস্ত্র-সুচতুর।
অভেদ-মুক্তির আশ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পাশ,
সর্ব্ব অপরাধে তেয়াগিয়ে,
হরিভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ভাসে রঙ্গে,
হরিনামানন্দরস পিয়ে। ৮৬

সেবি সম্পূর্ণ মহৌষধি,
বিনাশি অবিদ্যা-মহাব্যাধি,
সাধুসঙ্গে শুদ্ধজন ভবে
আত্মতুষ্টি ভাবপুষ্টি লভে। ৮৭

নিজ পাদপদ্ম-অলিগণে
এই সব শিক্ষা বিতরণে,
নিজ দীর্ঘোজ্জ্বল দেহটিরে
স্নাত করি নিজ নেত্রনীরে,
জগতের অনুপম বন্ধু,
যতিবর পরানন্দসিন্ধু,
সদা সেই শচীর কুমার
স্মৃতিপথে রহুন আমার।

পণ্ডিত যিনি বর্ণাশ্রমী গৌড়ীয় জনের,
সরলহৃদয় দীন উড়িয়াগণের,
পাশ্চাত্য সদয়চিত্ত সুধীদের তথা;
রহুন সে শচীসুত স্মৃতিপথে সদা। ৮৯

তাঁহার যে অপ্রাকৃত নিত্যপ্রকটিত
শ্রীনামাদিতে হয় নিত্য প্রকাশ। ১০১
সর্বদা সর্বত্র গৌরাঙ্গের বিগ্রহ
যে প্রকারে হয় ভক্তি-বিধানকৃত,
এ মৌদের গৌর-গাথা গান উচ্চস্বরে,
যুগল-ভজনে শিক্ষা করিতে তাহারে,
বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণবন্ধু—
প্রদান করেন তুমি প্রেমাবেশ-মধু। ১০২

শ্রী[illegible] মিত্র,
(অনুবাদক।)

## বিপ্লব।

কোন নগরাদিতে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইলে, সামান্য সামান্য ঔষধ, প্রতিষেধ বা সতর্কতাদি অবলম্বনে বিশেষ কিছুই ফলোদয় হয় না; তখন কোন একটা প্রবল প্রাকৃতিক বিপ্লব, যথা—মহাঝটিকা বা অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত না হইলে, অথবা কোনরূপ [illegible] অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া নগর দগ্ধ না করিলে, কিম্বা নগরবাসিগণ একেবারে নগর পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে প্রস্থান না করিলে, মহামারী বিপদের কোনরূপ বিশিষ্ট প্রতীকার হইতে পারেনা। সচরাচর দেখা যায়, যে কোন বিষয়ে যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণার্থ তদুপযুক্ত উপায় অবলম্বনই আবশ্যক হয়। একখানি প্রাচীন গৃহ পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার দ্বারা রক্ষা করিলেও, কিছুতেই তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে না; উহার আমূল পরিবর্তন পূর্বক উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

এক মণ ভারি শিলা একটি বস্তু উত্তোলন করিতে, হইলে একমণ উত্তোলনী শক্তিই আবশ্যক। দশ একসের-উত্তোলনী শক্তি চালিত হইলে, এমন কি—শত সহস্র বারও প্রয়োগ করা যায়, তথাপি উহা উত্তোলিত হইবে না। উহার উত্তোলনার্থে একেবারেই একমণ-উত্তোলনী শক্তি আবশ্যক। অনুপযুক্ত শক্তির প্রয়োগ আজীবন করিলেও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কতিপয় অঙ্গার খণ্ড একেবারে ধরাইয়া দিলে যেরূপে আমার ভাত হইয়া যায়, সেরূপে এক একখানি করিয়া বহুসংখ্যক অঙ্গার খণ্ড পোড়াইলেও আমার চাউল সিদ্ধ হইবেনা। বহু দিনের পুরাতন দাম দলাবৃত পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইলে, শুধু উপরের উদ্ভিজ্জ-আবর্জনাদি তুলিয়া ফেলিলেই ফল হয়না; নীচের পঙ্কস্তরে দামদলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, আবার উহা পূর্ববৎ হয়; সুতরাং তাহার সেই দামপচা জল সম্পূর্ণ সেঁচিয়া পঙ্কোদ্ধার করা ব্যতীত পুনঃসংস্কার সম্ভবেনা।

যেখানে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেখানে তৎপ্রতীকারোপযোগী বিশেষ উপায় অবলম্বন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধি অসম্ভব। মানুষের শরীরটি একেবারে পূর্ণরূপেই "ব্যাধিমন্দির", তাহার সামান্য টোটকা টাটকা ঔষধে কিছু হইবেনা; তাহার দেহের আমূল সংশোধক, মলমূত্র সংস্কারক ও রক্ত-পরিষ্কারক রসায়ন মহৌষধের প্রয়োজন।

কোন স্থান মল-মূত্রাদি দূষিত গলিত অমেধ্য পদার্থে পূর্ণ হইলে, সামান্য জল-

প্রক্ষালনাদি উপায়ে তাহা সংশোধিত হইবার নহে; তজ্জন্ত একটা প্রবল প্লাবনের প্রয়োজন। প্লাবনের প্রবল প্রবাহে সমস্ত দূষিত পদার্থ দূরীভূত হইয়া, সেস্থান প্রক্ষালিত ও সুমার্জ্জিত হইয়া যাইবে এবং ঐ অস্বাস্থ্যকর স্থানে পুনরায় স্বাস্থ্য বিরাজ করিবে।

সমাজে, সামাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক বা রাজনৈতিক, যে কোন সামান্য২ বিকৃতি-বিপর্য্যয়াদি উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্ম আমরা যে ক্ষুদ্র২ উপায়াবলম্বন করিয়া থাকি, তাহাকে আমরা 'সংস্কার' (চলিতার্থে সেবাস্বৎ) বলিয়া থাকি; কিন্তু ঐ সমস্ত বিকৃতি বা বিপর্য্যয় যখন গুরুতর আকার ধারণ করিয়া সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করে, তখন দেশব্যাপী প্লাবনের ন্যায় কোন সুবৃহৎ উপায়াবলম্বন আবশ্যক হয়। এইরূপ উপায়াবলম্বনকেই 'বিপ্লব' বলা যাইতে পারে। বিপ্লব যেখানে অনাবশ্যক, অর্থাৎ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হুজুকের ফল মাত্র, সেখানে 'বিপ্লব' আনিষ্টকর অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ মহাপ্রতীকারোপায় স্বরূপ যে বিপ্লব, তাহা বস্তুতঃ মহাসংস্কার বা পূর্ণ সংস্কার মাত্র; সুতরাং উহা ভগবদভিপ্রেত ও মঙ্গলপ্রদ, সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলেই জাতিগত মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়া, জাতীয় জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া গিয়াছে। সমগ্র জাতিকে এক নব সঞ্জীবনী শক্তি সংযোগে সজীব, সবল ও সমুন্নত করিয়া দিয়াছে।

মানব মানবের উপর নানাবিধ অন্যায় প্রভুত্ব দ্বারা অত্যাচার করিতে পারে। ধন, বল, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদির যেরূপ সুব্যবহার আছে, সেইরূপ অপব্যবহারও আছে। ইহাদের কোন একটির সমাজব্যাপী অপব্যবহার যখন অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, তখনই সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ফরাসী জাতির বিগত বিখ্যাত রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় চিন্তা করুন। সাধারণ প্রজাবর্গ পার্থিব ধন বল প্রভুত্বের কেন্দ্র স্বরূপ রাজশক্তি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া যে দেশব্যাপী জাতীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত করিল, তাহারই পরিণাম মহাসংস্কার স্বরূপে সমগ্র জাতিকে সুসংস্কৃত—নবীকৃত করিয়া দিল। অত্যাচারের লীলাভূমি সেই রাজশক্তি সমূলে সমুৎপাটিত হইয়া তৎস্থলে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ পাশ্চাত্য সভ্যজগতে সুপরিচিত আদর্শ স্বরূপ "ফরাসী-সাধারণতন্ত্র" সেই মহাবিপ্লবেরই মহৎ ফল।

ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের একটি উদাহরণ মনে করুন। সমগ্র খৃষ্টান-জগতের একমাত্র ধর্ম্মাধিনেতা 'পোপ' সমগ্র ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ান জাতিকে স্বীয় অসাধারণশক্তির সম্পেষণে নিপীড়িত, নির্জীব এবং ক্ষীণধর্ম্মপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহারই অতি বিবর্দ্ধন-জনিত নৈসর্গিক নিয়মে খৃষ্টান-সাধারণে এক মহাধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল, এবং উহা পোপের বিশ্বজয়ী প্রভুত্ব হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া, সমগ্র খৃষ্টান জাতিতে এক নবধর্ম্মবল ও নবজীবন আনয়ন করিল।

ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিপ্লব স্মরণ,

করুন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বালোচনায় জানা যায়, ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের উত্থান-পতনশীল তরঙ্গায়িত স্মৃতির তাৎকালিক পতনে ভারতে বৈধহিংসা-বিহিত যাগ-যজ্ঞের স্থলে যখন অবৈধহিংসা-সহিত যাগ-যজ্ঞসমূহ অভিচাররূপে পরিণত হইয়া, ভারত-ভুবনের ধ্বংস সাধনের উপক্রম করিল, তখন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

এই প্রণ অঙ্গীকার-সূত্র ধরিয়া ভারতবক্ষে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। তারপর বৌদ্ধাবতারের সেই ভারতব্যাপী বিরাট-ধর্ম্মবিপ্লবের মহাবিপ্লাবন উপস্থিত হইল, এবং শ্রীবুদ্ধদেব তৎসাময়িক সেই হিংসা-পাপে ধ্বংসোন্মুখ পশু-রক্ত-প্লাবিত ভারতবর্ষকে মৃতসঞ্জীবন অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পুনঃসঞ্জীবিত করিলেন। ভারতে ধর্ম্মবিপ্লবের এই জগদ্বিখ্যাত জীবন্ত পরিণামফল ইতিহাসের অমর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে।

তারপর আবার "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" বাক্যে বিখ্যাত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৈদিক-ধর্ম্মের পুনর্বিজয়ভেরী বাজাইয়া ভারত স্তম্ভিত করিলেন। আবার ভারত-ধর্ম্ম-সাগরে নব-বিপ্লব-বাত্যা সমুত্থিত হইল। জ্ঞানমার্গে বেদান্ততত্ত্ব প্রবাহিত হইল। কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালে বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক জ্ঞানতত্ত্বের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধির ফলে ভারতে ভবতাপ-জুড়ানো ভক্তিধর্ম্ম একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাৎকালিক ভারতসমাজে 'জ্ঞানী' পদে পরিচিতেরা কেবল ভক্তিশূন্য মরুময় হৃদয় লইয়া আত্মতাপে আপনি পুড়িতেছিলেন; আর ইতর অজ্ঞানেরা ঘোর রজস্তমসাচ্ছন্ন হইয়া সমাজ-শান্তি ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, তখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিকৃতি-বিপর্য্যস্ত আর্য্য সমাজ সেই শঙ্কর-বিজয়-বিপ্লাবনের শুভফলেই পুনঃ প্রকৃতিস্থ ও স্বীয় সনাতন আর্য্যধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আজিও এই পতিত ভারতের যে 'শিখ' জাতি জগতে মহা গৌরবান্বিত বলিয়া অভিনন্দিত হইতেছে, যে গুরুগোবিন্দ সিংহের বীরমন্ত্র সঞ্জীবিত শিখজাতি আজ মহাসংগ্রামে বৃটিশসিংহের বাহুবল বিবর্দ্ধিত করিতেছে; ভারতভূমি যে বীরপ্রসূ, যে জাতি তাহার নির্ব্বাপিতপ্রায় শেষ পরিচয় আজিও জগতে জানাইতেছে, সেই শৌর্য্যমূর্ত্তিমান শিখ জাতির এই বীরবীর্য্যবান নবজীবনী কেবল একটি মঙ্গল-পরিণাম মহৎ বিপ্লবের ফল মাত্র।

এদিকে বঙ্গে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নবানুরাগের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে তৎসাময়িক বাহ্যশক্তিকারাদিযুক্ত বঙ্গীয় তান্ত্রিক শাক্ত-প্রধান সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই অমৃতময় ফলে আজ অমৃতময় ভগবন্নাম-কীর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে! অন্নপ্রাণ কলি-কলুষ-কাতর জীবের সুসাধ্য ভবপাশ-নাশন ভগবদনুরাগ-সাধন গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রবল-প্রেম-প্লাবন-তরঙ্গেই দেশে—বঙ্গে—উৎকলে—দক্ষিণে—

# হিন্দু-পত্রিকা।

## ১৩০৮ সালের সূচীপত্র।

---

শ্রীহরিঃ।

( ১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রী কৃত। )

# হিন্দু-পত্রিকা।

| ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা. |
|---|---|---|

## শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

( পঞ্চম শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট। )

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

"অয়ি নন্দতনুজ"!—"অয়ি—কোমলামন্ত্রণে"—যাঁহাকে অতি মোলায়েম ভাবে ডাকিতে হয়, তাঁহারই সম্বোধনে "অয়ি" শব্দ প্রযোজ্য। সাধারণতঃ এবং সচরাচর স্বভাব-সুকুমারী স্বতঃমাধুর্য্যময়ী রমণীজাতির প্রতিই "অয়ি" সম্বোধনের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে যেখানে আবার বড় স্নেহাদরের বিশেষত্ব হইয়া পড়ে, সেখানে হয়ত পুরুষের প্রতিও ঐ সম্বোধনটি নর-নারীর নবনীতনিন্দিত হৃদয়-বিশেষ হইতে উছলিয়া উঠে। মহাকবি কালিদাস রতির মুখে হরকোপানলদগ্ধ পতির উদ্দেশে "অয়ি জীবিতনাথ!" বলাইয়াছেন। ভারতীয় কাব্য-পুরাণাদিতে এরূপ উদাহরণ অপ্রচুর হইলেও অপ্রাপ্য নহে।

এখানে কোমল আমন্ত্রণের পাত্র কে? সেই জগজ্জীবিতনাথ নন্দতনুজ। আহা! যাঁহার তুল্য সুন্দর নাই, যাঁহার তুল্য মধুর নাই; যাঁহার তুল্য প্রিয়তম—প্রাণপ্রতিম—প্রাণাধিক কেহ নাই, এখানে কোমল আমন্ত্রণসূচিত 'অয়ি' সম্বোধনের পাত্র সেই হৃদয়ানন্দ নন্দতনুজ।

"হে" ঐশ্বর্য্য-সম্বোধন; "অয়ি" মাধুর্য্য-সম্বোধন। কৃষ্ণকৃপায় "হে কৃষ্ণ!" অনেকে বলিয়াছে; কিন্তু "অয়ি কৃষ্ণ" বলার লোক বড় কম। তবে অবশ্য কৃষ্ণকৃপায় সবই হইতে পারে। মাধুর্য্যাধিকারী সাধক যা খুসি তাই বলিতে পারেন। তাঁর ভগবানের কাছে আদব্-কায়দায় দরকার নাই। আদব্ কায়দার সীমা ঐশ্বর্য্যভত্তেই সমাপ্ত। মাধুর্য্যাধিকারী ভক্ত 'অয়ি' 'হে' সবই বলিতে পারেন। অধিক কি, 'রে'

বলিতেও পারেন। ব্রজবাসীরা ও ব্রজ-তাহারা ত সদাই 'রে' বলিতেন। 'বাৎ-সল্য' ও 'সখ্য' রসের সাধকেরা মাধুর্য্যাধি-কার-বলে মুখে সর্ব্বদা 'রে' বলুন আর না বলুন, তাঁদের সেই চঞ্চল প্রাণ-কুক্কুটির প্রতি কেবল প্রাণেরই টান,—সম্ভ্রমের ভাব কিছুই নাই। ভগবানও মুখের কথার ধার ধারেন না। সে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্ত-চোরের চিত্তটি লইয়াই কারবার। অত-এব মাধুর্য্যাধিকারী ভক্তেরা মুখে যাহাই বলুন আর না বলুন, বাহিরে কিছু ভজনা-ঙ্গের ক্রিয়া করুন বা না করুন, ভগবান তাঁহাদের 'হে' 'রে' 'অয়ি'—সকল সম্বোধ-নেরই পাত্র। ভগবৎকৃপায় মাধুর্য্য-ভক্ত 'বৈধী' উপাসনার সীমা অতিক্রম করিয়া "রাগানুগা" উপাসনায় পঁহুছিয়াছেন। তখন তাঁহার কথাই বিধি! তখন তাঁহার কথাই ভগবানের কথার পার্থিব ভাষানু-বাদ বলিয়া গ্রহণ করাই সাধু-গুরু-কৃপা-পিপাসু সাধকসমাজে সাদরস্বীকৃত। যাহা হউক, ভগবানের মাধুর্য্যতত্ত্বে সাধনাধি-কারী ও রাগানুগভক্তিপথানুসারী ভাগ্য-বানই ভগবানকে মাধুর্য্যসম্বোধনে 'অয়ি' বলিবার স্বাভাবিক অধিকারী।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মাধুর্য্যভাবেই প্রাণ-প্রিয়তম সখাজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; তারপর যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভুবনপাবনী ভগবদ্গীতার মধু-বর্ষণ-মধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার সেই প্রাণ-কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হইল, তখনই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের চমক আসিয়া অর্জ্জু-নের চিত্তে লাগিল; অমনি কৃষ্ণবিষয়ে অর্জ্জুনের ভয়-বিস্ময়-সম্ভ্রম-সমাদরের ভাব যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তখন অর্জ্জুনের সেই স্থির ধীর নীরব নিশ্চল মাধুর্য্য-ক্ষীরোদহ্রদে অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রবল প্রমত্ত বন্যাপ্রবাহ মহা কল কল কল্লোলগর্জ্জনে যেন দিগন্ত ভাসাইয়া আসিয়া পড়িল! অমনি কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ হওয়ায়, অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্য-সূর্য্যাহত মনশ্চক্ষে যেন আঁধারি লাগিল! অর্জ্জুন ভীত, বিস্মিত, অবনত ও কর-যোড়যুত হইয়া, "ঈশ্বর" কৃষ্ণের উদ্দেশে পুনঃ২ প্রণাম করিয়া, তাঁহার সেই "মধুর" কৃষ্ণের প্রতি আপনার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণে আপনাকে অপরাধী বোধে কহিয়াছিলেন,—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"

অর্থাৎ——

সখা জ্ঞানে যত বলেছি তুচ্ছিয়া,
হে কৃষ্ণ! হে সখে! হে যাদব! ইতি।
প্রমাদে অথবা প্রণয়ে ভুলিয়া,
না জানিয়া তব মহিমা প্রমতি॥

তবুত অর্জ্জুন 'হে' বলিয়াই ডাকিয়া-ছেন। সখা হইয়াও অর্জ্জুন ব্রজসখাদের মত 'রে' কখনও বলেন নাই। শুদ্ধ মাধুর্য্য কেবল ব্রজ-জনেরই হৃদয়-সৌন্দর্য্য; উহা জগৎপূজিতা গীতায় "পাণ্ডবানাং ধন-ঞ্জয়ঃ" এই ভগবদ্বাক্যে অভিনন্দিত অর্জ্জুনেও দুর্লভ! সে যাহাহউক, স্থূলতঃ অর্জ্জুন সুসভ্য সুবিদ্বান ক্ষত্রিয়রাজ, আর ব্রজ-সখারা

অনক্ষর অমার্জ্জিত গ্রাম্য গোয়ালা জাতীয় রাখালসমাজ; অর্জ্জুনের মুখে 'রে' সাজে না, ব্রজ-রাখালদের মুখে 'হে' আসেনা। কিন্তু "অয়ি" সম্বোধন, সম্ভ্রমার্থক 'হে' ও তুচ্ছার্থক 'রে'—এ দুয়ের মধ্যগত, কেবল "কোমলা-মন্ত্রণে" ব্যবহৃত। ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত "অয়ি" সম্বোধনসুধা ভারতীয় পুরাণসাহিত্য-সিন্ধুমন্থনে বোধ হয় অতি অল্পই মিলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের এই শুভশিক্ষাষ্টক শ্লোকে মিলিয়াছে; আর একবার মহাপ্রভুরই মনুষ্যমূর্তিলীলার "পরম গুরু" অর্থাৎ গুরুর গুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর গুরু হরিভক্তিরসকল্পতরু শ্রীশ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সেই শুদ্ধ-মাধুর্য্য-নির্ঝর-স্রাত—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ!"—

শ্লোকটিতে ভারতীয় বৈষ্ণবজগতের ভাগ্যে মিলিয়াছিল।

আর একটি কথা, মুখে আমরা কে কি না বলি? আমরা যে গান গাই, বক্তৃতা করি, রচনা লিখি, তৎসমস্তের বিষয়বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি যদি আমাদের জীবনে ফলিত হইত, তবে ত আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। মুখে আমরা হয়ত ধ্রুব-প্রহ্লাদকেও অতিক্রম করিতে পারি, বুকে কিন্তু বাল্মীকি-জগাই-মাধাইর পাপপ্রমত্ত প্রথম জীবনকেও পরাস্ত করিয়া বসিয়া আছি। বক্তৃতার ব্যাপকতায় হয়ত আমি তাঁহাকে "অয়ি প্রাণাধিক!" বলিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ত আমার অভ্যাসযোগার্চ্ছিত অহিফেণ-বটিকাধিকও নহেন! সে কাঙ্গালচাঁদ হইতে এ কাঙ্গালচাঁদের ভাবনা বেশি ভাবি। যাহাহউক, মহাপ্রভুর "কাঙ্গালীভোজন" স্বরূপ এই শিক্ষাষ্টকে আমরা তাঁহার শ্রীমুখের প্রসাদ পাওয়ার ন্যায়ই "অয়ি-নন্দতনুজ!" সম্বোধনে এ জনমের আসল আবেদনটি সে চরণদরবারে নিবেদন করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার চরম ও পরম ভক্তভাব-লীলায় যে মহামাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-প্রেমোৎসবের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাশ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'অয়ি' সম্বোধন কেমন সাজিয়াছে? যেমন কম্বু-কণ্ঠে অম্বুজমালা! যেমন হিরণ্ময় করপ্রকোষ্ঠে হীরার বালা!

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে "নন্দ-তনুজ" বলা হইয়াছে। 'তনুজ' শব্দের অর্থ ঔরস বা গর্ভজাত অপত্য। তবে মহাপ্রভুর মুখ হইতে কৃষ্ণের "নন্দতনুজ" নাম নির্গলিত হওয়ার কোন হেতু-রহস্য আছে কি? কৃষ্ণকে যদি কাহারও 'তনুজ' বলিতে হয়, তবে তিনি বসুদেব-তনুজ বাসুদেব, ইহাই সাধারণতঃ পৌরাণিক প্রচলিত সংস্কার। আর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ পরতত্ত্বের পরাৎপর "বাসুদেব" আখ্যাতেও কৃষ্ণের বসুদেব তনুজত্বই প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। অতএব মহাপ্রভুর মুখের "নন্দতনুজ" বাক্যে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব আছে কিনা, কেহ২ তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কেহ২—(ফলে অনেকেই) বলেন, 'নন্দসুত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ পুরাণাদিতে ভূরি পরিদৃষ্ট হয়; তবে 'সুত' শব্দে জাত অর্থ

হওয়ায়, "নন্দতনুজ" ও "নন্দসুত" ফলিতার্থে এক পাত্রই সূচনা করিতেছে; অতএব মহাপ্রভুর উক্ত "নন্দতনুজ" সম্বোধনে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব নাই; উহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবাচক বাক্যমাত্র।

যাঁহারা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের একটু স্বতন্ত্র অর্থ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে তত্ত্বগত "এক কৃষ্ণ"কে লীলাগত ভাবে "দুই কৃষ্ণ" জানিয়া, উহার একরূপ সমাধানে উপনীত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীতও আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, বিকৃত, বিলুপ্ত, পূর্ণ বা অপূর্ণ-প্রকাশিত বিবিধ পুরাণ উপপুরাণাদিতে ভগবল্লীলা বিবিধ ভাববৈচিত্র্যে চিত্রিত। তাহাদের পরস্পর যৌক্তিক সিদ্ধান্ত-সামঞ্জস্যসংস্থাপন অন্ততঃ অস্মদাদির ন্যায় অশাস্ত্রজ্ঞ অধমাধিকারীর অসাধ্য। ফলে আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আপাততঃ উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিতর্কবিচারের প্রতি উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, সংক্ষেপে উহার পৌরাণিক মর্ম্মটি মাত্র এস্থলে নিবেদন করিতেছি।

বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, কংসাদি দুর্দ্দান্ত দানবের দুর্দ্দমদৌরাত্ম্য-পীড়িতা পৃথিবীর করুণক্রন্দনাকৃষ্ট দেবগণের প্রার্থনায়, দানবদলনার্থ মথুরাধামে বসুদেব-দেবকীর 'তনুজ' হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে গোলোকেশ্বর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়তমা গোলোকেশ্বরী রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা, তাঁহার কৃষ্ণের নিত্যসখা শ্রীদামের অভিশাপবিশেষবশে শতবর্ষব্যাপী কৃষ্ণবিরহভোগজন্য বৃষভানু-রাজনন্দিনীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিতা হইলেন। সুতরাং রাধাহৃদয়েশ্বর রাস-রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভূতলে অতুলা ব্রজলীলার অপূর্ব্ব বিলাসমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ ও বাসুদেব বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যশক্তিলীলার সাহায্যার্থ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী যোগমায়া ভগবতীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহাই যমজভাবে গোকুলে যশোদাগর্ভে "নন্দতনুজ" হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। যোগমায়ার মায়াবশে নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীবৃন্দ মোহাবিষ্ট থাকিয়া তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ওদিকে কংস-ভয়াভিভূত বসুদেব তাঁহার প্রাণপুত্তলীটি লইয়া, যোগমায়ার প্রসাদে যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে পঁহুছিলেন, এবং যশোদার সূতিকাগারে মায়ানিদ্রাভিভূতা যশোদার ক্রোড়পার্শ্বে তাঁহারই নিজ ক্রোড়ের নিধির ন্যায় নীলকান্তকান্তি সদ্যজাত শিশুকৃষ্ণ ও স্থির সৌদামিনীরূপা যোগমায়াকে দর্শন করিলেন। অপূর্ব্বভাবাবিষ্ট বসুদেব তারপর "দুই কৃষ্ণ" একস্থানে করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দুয়ে মিশিয়া এক হইলেন! তখন বিহ্বল বসুদেব বিলম্বে অসমর্থ হইয়া, যশোদার কন্যারত্নটি বুকে করিয়া দ্রুত মথুরাপ্রস্থিত হইলেন। অতঃপর ঐভাবে দুই কৃষ্ণ এক হইয়া বৃন্দাবনে থাকিলেন। ব্রজের ঐশ্বর্য্যলীলা সমস্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেব কৃষ্ণের অংশে ও মাধুর্য্য-লীলাবলী "নন্দতনুজ" গোলোকেশ কৃষ্ণের অংশে অভিনীত বা প্রকটিত হইতে লাগিল। ফলে ইচ্ছাময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ গূঢ়তত্ত্ব বাল্যলীলায় নিয়ত উহ্যই রহিল। তারপর কৃষ্ণের মথুরাগমনে বাসুদেবেরই প্রকৃত গমন

হইল; কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন যমুনাতীর হইতে অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিয়া গেলেন। চতুর্থ শ্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ যে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" বাক্যের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, উক্ত বাক্য এই পৌরাণিক বিবরণের অন্যতম শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ ভিত্তিবিশেষ। যাহাহউক, শ্রীদামের অভিশাপ পূরণার্থ, অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহবিধানার্থ কৃষ্ণ একান্ত অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিলেন; সুতরাং অলক্ষিততত্ত্বগত ভাবে কৃষ্ণসত্তা বর্ত্তমানেও স্থূল লীলাগতভাবে ব্রজে কৃষ্ণবিরহ ব্যাপ্ত হইল। অবশেষে প্রভাস-মিলনে, রাধা-হৃদয়স্থ মাধুর্য্যতত্ত্বগত রাধার কৃষ্ণ রুক্মিণীর কৃষ্ণের সহিত চকিতে পুনর্ম্মিলিত হইয়া, আবার তখনই রাধাসঙ্গ-সম্মিলনে স্বীয় মর্ত্ত্যমাধুর্য্যলীলা সাঙ্গ করিয়া, নিজ নিত্য-ধাম গোলোকধামে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠবিহারী হরি অবশিষ্ট সমস্ত লীলা সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় লীলাংশসম্ভূত সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস করিয়া, স্বয়ং ব্যাধ বাণ-বেধ-ব্যপদেশে সর্ব্বশেষে স্বস্থান বৈকুণ্ঠ ধামে প্রস্থান করিলেন।

অস্মদ্দেশীয় আধুনিক হিন্দুদৃষ্টি-অবি-শিষ্ট দার্শনিক—বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই রূপ পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা কি চক্ষে লক্ষ্য করিবেন, বলা যায়না; তবে কি না, "হিন্দুর সব ভাল ছিল" মোটের উপর এই এক মোটা ধারণা এখন যেন ভগবদিচ্ছায় ক্রমে ভুবনময় হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাই ভগবান কৃষ্ণের লীলার ঐতিহাসিকতায় এখন হিন্দু-অহিন্দু, প্রায় সকলেই অল্পাধিক বিশ্বাস-বান হইয়া, কৃষ্ণলীলার বিবিধ পুরাণেতি-হাস, আখ্যান, প্রবাদ, প্রচলিত সংস্কার ইত্যাদির সমষ্টি-সিদ্ধান্ত-সমুৎপন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণচরিত এখন আর অস্মদ্দেশে কেবল খ্রীষ্টীয় পাদরীর প্রচার-পরিচয়ে বিচারিত হইবার নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাবতারলীলার পরে প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রেমভক্তিমান বৈষ্ণব গ্রন্থকার বঙ্গভূমির ক্রোড় বিশোভিত করিয়াছিলেন। তত্ত্ব-গত এক কৃষ্ণের লীলাগত দ্বিরূপত্ব সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থকার পরমভাগবত কবি শ্রীমৎ শিশুরাম দাসের শাস্ত্রপ্রমাণ-সজ্জিত সুপ্রসিদ্ধ "প্রভাস খণ্ড" গ্রন্থে যাহা অতি ললিত রচনায় লিপীকৃত হইয়াছে, কৃষ্ণলীলামৃতলোলুপ ভক্ত পাঠকসমাজে, সেইটুকু এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

"শুনিয়া শুকের কথা ব্যাসদেব কন।
সে বড় নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
কেবল আনন্দময় বিভু নিরঞ্জন॥
না করেন কোন কর্ম্ম এই তাঁর রীতি।
কটাক্ষে করেন কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতি॥
প্রধানা প্রকৃতি রাধা তাঁহার কামিনী।
সৃষ্টিকালে মহাবিষ্ণু প্রসবেন যিনি॥
নামমালা তন্ত্রে তার দেখহ প্রমাণ।
মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি রাধার আখ্যান॥
যথা-"কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি"
মহাবিষ্ণু হইলেন রাধার বালক।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পতি ব্রহ্মাণ্ডপালক॥

দৈত্যভয়ে ভীত হয়ে যত দেবগণ।
ভূভার হরণ হেতু করিয়া চিন্তন॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে ক্ষীরোদ যাইয়া।
মহাবিষ্ণু আরাধিলা প্রণত হইয়া॥
দেবগণ প্রতি দেব হইয়া সদয়।
অবতার হব বলি দিলেন অভয়॥
দেবকীর গর্ভবাস করিয়া স্বীকার।
ভূভার হরিতে বিষ্ণু হন অবতার॥
বিষ্ণুর কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী দ্বয়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা হয়ে জন্ম লয়॥
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
এক্ষণেতে শুন রাধা-কৃষ্ণ-বিবরণ॥
শ্রীদাম-শাপগ্রস্তা হয়ে রাধা সে সময়।
ব্রজে আসি বৃষভানুগৃহে জন্ম লয়॥
রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে অবতরি।
বিষ্ণুর সাহায্য হেতু দুর্গা সঙ্গে করি॥
যমজ হইয়া জন্মে গর্ভে যশোদার।
যামলে শিবের বাক্যে প্রমাণ তাহার॥
যথা—
"নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যতে।
বাসুদেবো বিশেষস্মিন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥"
যশোদার জন্ম নিলা যমজ হইয়া।
নন্দালয়ে নিদ্রা দিয়া সবারে মোহিয়া॥
যশোদার কোলে খেলা করেন যখন।
আইলেন বসুদেব লইয়া নন্দন॥
আসিয়া দেখেন তথা অপূর্ব্ব বালক।
হইয়াছে শ্রীনন্দের পুত্রের পুলক॥
আপন বালকসম বালকে দেখিলা।
বালিকা দেখিয়া বসু অবাক্ হইলা॥
তবে বসু বালকে লইয়া সেইক্ষণ।
একত্রে রাখিয়া দোঁহে করেন দর্শন॥
যেইমাত্র দুই শিশু একত্র হইল।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে মিলিল॥
যেইরূপে সৌদামিনী মেঘেতে মিলায়।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে লুকায়॥
তাহা দেখি বসুদেব অনেক ভাবিয়া।
বালকে রাখিয়া গেল বালিকা লইয়া॥
সেই সে বালিকা কংস-হাতে নিবর্ত্তিয়া।
অনেক নিন্দিল কংসে উর্দ্ধেতে উঠিয়া॥
বিন্ধ্যাচলে অধিবাস হইল তাঁহার।
ব্রহ্মা আসি করিলেন পূজার প্রচার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ব্রজে অবতার।
আনন্দক্রীড়ন বিনা কর্ম্ম নাহি তাঁর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মে ফল নাহি লন।
ভক্তিগুণে ভক্তগণে ফলপ্রদ হন॥
স্বয়ঙের কর্ম্ম নহে ভূভারহরণ।
অংশ অবতারে করে এ সব করণ॥
যদি বল ভিন্নরূপ নহে কি কারণ।
কংসভয়-লীলায় গোপন প্রয়োজন॥
অথবা কৃষ্ণের কর্ম্ম কে বুঝিবে ভবে।
কি ইচ্ছায় কি লীলায় কি হয় কিভাবে॥
অক্রূরের সঙ্গে যবে করিলা গমন।
তখন বিভিন্ন দেহ হৈলা দুই জন।
বাসুদেব মথুরাতে করেন গমন।
নন্দসুত ব্রজধামে অলক্ষিতে রন॥
যথা—
"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"
পাঠান্তরং—"পাদমেকং ন গচ্ছতি।"
শ্রীদামের বাক্য হরি করিতে পালন।
চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে রন বৃন্দাবন॥
ব্রজবাসীগণ-চক্ষে অলক্ষ্যে রহিয়া।
পুনশ্চ মিশ্রিত হন প্রভাসেতে গিয়া॥"

"ভক্ত-কবিবর শিশুরামের এই মধুমতী ও প্রসাদগুণবতী গাথার কৃষ্ণলীলাতত্ত্বের যে রহস্যভেদ হইয়াছে, তাহাতে ইহার ঐতিহাসিকতার সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ঐতিহাসিকতার সমাধান সম্বন্ধে এক-কৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন পক্ষের কোন আপত্তির কারণ নাই; বরং তাহাই আবশ্যক। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কৃষ্ণতত্ত্বেরই ঐশ্বর্য্যসত্ত্ব বৈকুণ্ঠবিলাসী; আর মাধুর্য্যসত্ত্ব গোলোকবিহারী। বৈষ্ণবী উপাসনার এই সুসূক্ষ্ম অন্তর্নিক্কা ভাবতত্ত্ব ভেদের সহিত লৌকিক স্থূল ঐতিহাসিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিকৃষ্ণত্বের জগতে একমাত্র ঐতিহাসিক সাক্ষী বসুদেবও যোগমায়া প্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিকতা পক্ষে এবং এমন কি, "চতুর্দ্দ্বাহতত্ত্ব"বিচারবিলাসিনী বৈষ্ণবী দার্শনিকতার পক্ষেও বোধ হয় এককৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন অনুপপত্তির অবকাশ নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলাস্বাদ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণভজনের নিগূঢ় রসরহস্যভেদ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে যেরূপ হইয়াছে, তাহা "ন ভূত ন ভবিষ্যতি"—ইহাই গৌরহরি-বিশ্বাসী বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের বিশ্বাস। তাহা হইলে, গৌরাঙ্গের এই সুবিখ্যাত শিক্ষাশ্লোকে যে "নন্দতনুজ" পদের প্রয়োগ, তাহা সেই গোলোকবিহারী, দ্বিভুজ মুরলী-ধারী, সেবানন্দ-ভিখারী ভক্তের শুদ্ধমাধুর্য্য ভজনগ্রহণকারী, চিরবৃন্দাবনচারী হরির প্রতিই হইয়াছে, বলিতে হইবে। অতএব এই মতে, মূর্ত্তিমান বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞান স্বয়ং সরস্বতীপতিরূপে সেব্যমান শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্যই সর্ব্বপ্রমাণাধিক প্রমাণ। অপর, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টই এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বিবিধশাস্ত্রবিশারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বীয় সন্দর্ভে সুবিশদ শাস্ত্রীয়তা সহযোগে এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা-খণ্ডের প্রারম্ভেই দৃষ্ট হয়, শ্রীবৃন্দাবনপ্রত্যাগত, চৈতন্য-চরণ-মিলনাশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত শ্রীরূপ গোস্বামী উড়িষ্যাদেশে পঁহুছিয়া, "সত্য-ভামাপুর" নামক গ্রামে এক রাত্রি যাপন করেন। তথায় শ্রীসত্যভামাদেবী তঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, এরূপ আদেশ করেন যে, "তুমি যে কৃষ্ণলীলার নাটক রচনা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে আমার কৃষ্ণের লীলা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিও।" এ আদেশের অর্থ শ্রীরূপ তখন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রয়ে আসিয়া, তাঁহারি শ্রীমুখে আবার যাহা শুনিলেন, তাহাতে লীলাগত দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরূপের আর সন্দেহ রহিল না, এবং তিনিও "ললিতমাধব" ও "বিদগ্ধমাধব" নামে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাটক—মায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "নান্দী প্রস্তাবনা" দিয়া রচিবার সংকল্প করিলেন। এই স্থানে চরিতামৃতের সেই স্থান একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত যামলবচনং।—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঁই মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিল পৃথক্ নাটকে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥"

ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, লীলাগত দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব-রহস্য শ্রীরূপগোস্বামী স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটেই প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও ভাগবত; বিষ্ণু, পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড; হরিবংশ-ভারত প্রভৃতি পুরাণে দ্বিকৃষ্ণরহস্য-ভেদ বিস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য প্রচ্ছন্ন পুরাণোপপুরাণ, তন্ত্রাদি, প্রাচীন প্রবাদাদি ও বিবিধ দৈব প্রমাণাদি দ্বারা এবং সর্ব্বোপারি মূর্ত্তিমান সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান মহাপ্রভুর নিজ মুখোক্তিরূপ মহা 'আপ্ত' বা 'শাব্দ' প্রমাণ দ্বারা উহা শ্রীরূপের হৃদগত হইয়াছিল। সুতরাং 'লঘুভাগবতামৃতে' তিনি শ্লোক উঠাইয়াছেন, যথা—

"কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেকমত্র পুরাতনাঃ।
বূ্যহৈঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহে যানকদুন্দুভেঃ ॥
গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্ ॥
কন্যামেবপরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎ পুরং।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥"

অর্থাৎ—

কোন ভক্তগণ কন পুরুষৈক পুরাতন।
বসুদেব-পিতৃগৃহে বূ্যহ হয়ে জন্ম লন ॥
বৃন্দাবনে মায়া-সনে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম॥
বসুদেব ব্রজে করি সূতিকাগৃহে গমন,
একটি পরমা পুত্রী করি তত্র দরশন,
তাহা লয়ে সমাগত হইলেন নিজ ধামে।
বাসুদেব পশিলেন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে ॥

বৈষ্ণব সমাজে সম্ভ্রমনীয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীভাগবতের দশমে—
"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।"

অর্থাৎ—

আত্মজের উদ্ভবে আনন্দ
লভিলেন মহামনা নন্দ।

এই শ্লোকের "আত্মজ" শব্দের অর্থ করিয়া, নন্দ-গৃহেও কৃষ্ণের জন্ম জানাইয়া, দুই কৃষ্ণের একীভবন বা মিলনতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মর্ত্ত্যজীবজগতে চৈতন্য চরিতামৃত বিতরণকারী আমাদের কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপেরই চরণাশ্রিত; সুতরাং তিনিও শ্রীরূপের হৃদয়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাক্যই সর্ব্বপ্রমাণাধিক প্রমাণ মানিয়া, অথচ শাস্ত্রবিচারসুনিষ্পন্ন সারসিদ্ধান্তের সমাধান করিয়া, একাধিক স্থানে উক্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং চতুর্বূ্যহতত্ত্বের মূলপরাৎপরতত্ত্ব নন্দতনুজেই স্থাপন করিয়াছেন। তৎপর, এই নন্দতনুজই যে কলিযুগপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহাও যথাসম্ভব শাস্ত্রপ্রমাণ প্রয়োগেই

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব কৌতূহলী পাঠক শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলাখণ্ডের আদিতেই তাহা প্রধানতঃ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কবিরাজ গোস্বামীর সেই শাস্ত্র-প্রমাণ সহকৃত বিস্তৃত আলোচনার রচনা হইতে অত্যল্প কিঞ্চিন্মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলে যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঁই॥

* * * *

পরব্যোমেতে বৈসেন নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণে স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥
ইঁহো ত দ্বিভুজ—তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক-সাথ॥

* * * *

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ—কৃষ্ণ অবতার।
তিঁহো চতুর্ভুজ—ইঁহো মনুষ্যাকার॥

* * * *

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

অধিক উদ্ধৃতির স্থানাভাব ও প্রয়োজনাভাব। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পুরাণ-তন্ত্রবিশারদ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শিশুরাম দাসের "প্রভাসখণ্ডের" কৃষ্ণতত্ত্বকাহিনী-কবিতাও (যতটুকু জানা যায় ও বুঝা যায়,) এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, বামনপুরাণ প্রভৃতি, এবং তন্ত্রশাস্ত্রীয় রুদ্র-যামল, রাধাহৃদয়তন্ত্র, গোপালতন্ত্র, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণাদি পর্য্যালোচনার ফল বলা যায়। যাহাহউক, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আর অধিক অগ্রসর হওয়ার স্থানাভাব এবং অবশ্য সংস্থানাভাবও বটে। ভগবৎকৃপায়, সুবিধা হইলে, শুদ্ধ এই বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদিতে এই তত্ত্ব আভাষিত দেখিতে পাইবেন।

যাহাহউক, মোটকথা, আমাদের আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকটির নিগূঢ় শিক্ষাই এই যে, মাধুর্য্যভজন-ফলে কৃষ্ণসেবানন্দ লাভই জীবের চরম চরিতার্থতা; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-ভজনের ঐকান্তিক ফল মুক্তি তাহার নিম্নস্তরের সিদ্ধি। এই মোক্ষাতিক্রান্ত কৃষ্ণ-সেবানন্দ দানই গৌরাঙ্গাবতারের অভূতপূর্ব্ব অতুল্য অবদান। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রভাব এই পরম তত্ত্বরত্নেরই প্রভা মাত্র।

"বিদগ্ধমাধবের" উক্ত বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিভৃতহৃদয়ামৃত "চৈতন্যচরিতামৃতে" ভগবদ্ভক্তি স্বরূপ লিখিয়াছেন,—

"সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাঞা॥

সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্মঐক্য॥"

ফলে 'ব্রজভাব'রূপ রাধাকৃষ্ণসেবানন্দই অহৈতুক রাগানুগ মাধুর্য্যভক্তের সর্ব্বস্ব। দীনদাস স্বীয় পদাবলীতে বলিয়াছেন।—

ঐশ্বর্য্যে ভজিলে জীব মুক্ত সারূপ্য লভে।
মাধুর্য্যে ভজিলে কৃষ্ণসেবানন্দ লভে॥
ঐশ্বর্য্য ভক্তিতে মুক্তি বৈকুণ্ঠবিহার।
গোলোকে গোবিন্দ-সেবা মাধুর্য্যাধিকার॥

আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশ্বাস-রত্নাসনস্থ এই গূঢ় তত্ত্বই শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিক্ষা শ্লোকটির সারস্বরূপ। কৃষ্ণকিঙ্করতাই ভক্তের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। এই জন্য বলা হইয়াছে।—

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।"

এই ভীষণ ভবাম্বুধিতে মজ্জমান তোমার কিঙ্কর আমাকে উদ্ধার কর। সেব্যই সেবকের রক্ষাকর্ত্তা। তুমিই কৃপা করিয়া তোমাকে সেব্য বলিয়া চিনাইয়াছ এবং আমাকেও শ্রীপদসেবক পদের সুরেন্দ্রসেব্য-সম্পদ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিবার আশা তোমারই শাস্ত্রবাক্যে শুনাইয়াছ; তাই সেব্য তুমি, তোমার এ সেবকাধমকে এ বিষম বিষয়-বারিধি-বিমজ্জন-বিপদে শ্রীপদে রক্ষা কর। যে হতভাগ্য সেবক সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, সে সেই বিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষে স্বীয় সেব্য প্রভুকে দিব্য বিভূতিতে দণ্ডায়মান দেখিলে, উৎকণ্ঠা আশায়—আনন্দে—উচ্ছ্বসিত অন্তরে—অথচ ব্যাকুল বিহ্বল কাতরস্বরে উদ্ধার প্রার্থনা করে। প্রভো হে! আমারও যে সেই অবস্থা। এখন উদ্ধারের ব্যবস্থা তুমি ভিন্ন আর কে করিবে? তুমিইত বিপদ-বারণ, মধুসূদন, পতিত-তরণ, সঙ্কট-শরণ; অতএব এ বিষম বিপদে, এ বিকট সঙ্কটে, এ নিরুপায় কিঙ্করাধমকে পায় রাখ।

ভবোদ্ধারপ্রার্থীর এবম্বিধ প্রার্থনায় আপনাকে ভগবৎকিঙ্কর বলা হইতেছে। "কিঙ্কর" পদের অর্থ আজ্ঞাকারী—অর্থাৎ আদেশপালক ভৃত্য। বস্তুতঃ উপাসনার প্রাণ দ্বৈতবাদ। উপাস্য-উপাসক ভাবই দ্বৈত-তত্ত্বগত প্রভু-ভৃত্যভাব। অতএব ভগবানে ও জীবে এই প্রভু ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধই স্বতঃসিদ্ধ। জীব মায়াবশে এ সম্বন্ধ ভুলিয়াই ভব-বন্ধে বদ্ধ হয়।

"নিত্য কৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলিগেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

আমরা যে ভগবৎভৃত্যত্ব ভুলিয়া ভবাব্ধি-মজ্জমান; আমাদের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন যে পরিত্রাণ, তাহা মায়ামোহ-বশে আমরা বুঝিতে অক্ষম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, যেমন তাহার বুঝিতে আর তরঙ্গ তুফানের তীব্রতা বা কূলপাওয়ার ব্যাকুলতা থাকে না, আমাদের দশাও তদ্বৎ। ভগবৎকৃপা-বিধানে—কর্ম্মভোগাবসানে যার মায়া-মোহের ঘোর অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কাটিয়াছে, সে-ই কথঞ্চিৎ আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় পরিত্রাতা প্রভুর উদ্দেশে বলিতে পারে—প্রভো! পরিত্রাহি—

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।"
কৃষ্ণকিঙ্করত্বই আমাদের আত্মস্বরূপতত্ত্ব।

আমরা যে ভাবের উপাসক হওয়ার ভাগ্য-লাভ করি না কেন, দাস্যভাব অর্থাৎ সেবকত্ব সকল ভাবেরই অন্তর্নিহিত।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বৈষ্ণবী সাধনার এই পঞ্চভাবের মধ্যে চতুর্বিধ ভাব ব্রজে পূর্ণমাধুর্য্যপ্রভাবে মূর্ত্তি-মন্ত। তন্মধ্যে দাস্য অর্থাৎ সেবার ভাবটি সর্ব্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পঞ্চবিধ ভাবা-ধিকারী সাধকেরা স্ব স্ব অধিকারভেদে পঞ্চবিধভাবে কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শান্তভাব-সাধনাটি স্থূলসেবাবিষয়িণী নহে; কিন্তু তদপেক্ষা অধ্যাত্মসেবাস্বরূপিণী, সন্দেহ নাই। ফলে পত্নীর তুল্য পতিসেবা, পিতা-মাতার তুল্য সন্তানসেবা, সখার তুল্য সুহৃৎসেবা, দাসের তুল্য প্রভুসেবা এবং শান্ত-রস-রসিকের তুল্য সেই "রসো বৈ সঃ" অনন্ত পুরুষের অধ্যাত্মসেবা আর কে করিতে পারে? অতএব এই শাস্ত্রাদি পঞ্চরসভাবে সেবকের অধিকারভেদে কৃষ্ণসেবাই প্রতিষ্ঠিত। তাই ভগবানের সহিত জীবের সর্ব্বভাবেই সাধারণ সেবা-সেবকত্ব থাকায়, নিত্যকৃষ্ণদাসত্বই জীবের স্বরূপতত্ত্ব।

তারপর আর একটি বিষয় আলোচ্য। কৃষ্ণকিঙ্কর উপাসক জীবের উপাসনা কি? শ্রুতি বলিলেন,—"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। প্রভুর প্রিয়কার্য্যকরিতাই প্রভুর সেবা। শুধু সেবকের প্রভু প্রীতিতে প্রভু প্রীত হন না, অথবা তাহা হওয়াও তাঁহারি নিয়মবিরুদ্ধ; কেননা প্রিয় কার্য্যেই প্রীতির পরীক্ষা ও পরিচয়। সেই পরম প্রভুর প্রিয় কার্য্য যে কি, তাহা তাঁহারি শাস্ত্রে শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম বলিয়া সুবর্ণিত আছে। তবে কি না, "নাহং কর্ত্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যাবৎ করোমি" অর্থাৎ—

আমি কর্ত্তা নই, প্রভুর প্রীত্যর্থ,
করে যাই কর্ম্ম হয়ে তাঁরি ভৃত্য।

এই ভাব সিদ্ধ হইলে তখন সর্ব্বকর্ম্মই তাঁহার প্রিয় হয়; সর্ব্ব কর্ম্মেই তাঁহার উপাসনা হয়।

"যৎকরোমি জগন্নাথ! তদেব তব পূজনম্" যে ভাগ্যবান ভক্ত এই উক্তির যথার্থ যোগ্য, নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব তাঁহারই ভাগ্যে ভোগ্য।

দাস হইলেই প্রভুসেবার প্রয়োজন, এবং সেবা-সাধনই উপাসনা। উপ—সমীপে, আসনা—বসা। উপাসনাই কাছে বসা। কাছে না গেলে সাক্ষাৎ-সেবা সম্ভবে না। আর যে কাছে বসিতে পায়, সেই ভাল সেবক; অথবা ভাল সেবক হইলেই কাছে বসিতে পায়। অতএব উত্তমাধিকারী উপাসকই সুসেবাগুণে, অর্থাৎ প্রভুর প্রিয়-কর্ম্ম সাধন গুণে প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হন। গীতার সেই——

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অর্থাৎ—

যাহা কর, যাহা খাও হোম, দান, কর যাহা,
তপ যা কর কৌন্তেয়! আমায় অর্পিও তাহা।

এই আদেশ যিনি কৃষ্ণকৃপায় পালন করিতে পারিয়াছেন, "কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ" সিদ্ধ হওয়ায়, তিনিই কৃতার্থ কিঙ্কর; সেব দুর্লভ

কৃষ্ণসেবানন্দ সুধা তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেম ক্ষুধার পরম পরিতর্পণ! এই স্থানে যথার্থ কৃষ্ণ কিঙ্করতা কি পদার্থ, তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষাশ্লোকে জীবের "হারানিধি" এ হেন কৃষ্ণ কিঙ্করতার অবশ্যঅর্জ্জনীয়তাই শিক্ষা দিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে যাঁহারা ভব-ত্রাণার্থী, তাঁহারাই এই মহাশিক্ষার শিক্ষার্থী। তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বকর্ম্ম-দোষভ্রষ্ট কৃষ্ণ-সেবক-পদ কৃষ্ণ-পদে পুনঃপ্রার্থী।

এবার এ ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাইয়া, আর ভব-তারণের চরণ-ছাড়া না হইলেই কিঙ্কর কৃতার্থ। কিন্তু সেই অচ্যুতের চির চরণাচ্যুতি তাঁহারই চরণানুগ্রহ-সাপেক্ষ। ভব-তরঙ্গ-বেগ-বাধা অবশ জীবের নিজের সাধ্য কি? সেই কৃপাময় নিজ কৃপায় পায় না রাখিলে আর উপায় নাই। তাই শিক্ষাশ্লোকের প্রার্থনা—

"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়।"—

"তব পদ পঙ্কজের ধূলিকণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপাকুরি রাখ হরি! পায়।"

রেণু যেমন পদ্মে চিরলগ্ন, ভক্ত দাসও তদ্বৎ ভগবৎপাদপদ্মে চিরলগ্ন হইবার প্রার্থী। তাই পাদপদ্মের রেণুরূপপরিণতির প্রার্থনা। ভক্ত রামপ্রসাদও গেয়েছিলেন, "আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অভিলাষী।" এস্থলে "বিনা মাইনার চাকর"—কিনা নিষ্কাম ভক্ত; আর "চরণধূলার অভিলাষী" ফলিতার্থে সেবা-অধিকারী।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মের রেণুত্ব, অর্থাৎ তাঁহার চিরচরণসেবকত্ব ভক্তের প্রাণময়ী প্রার্থনায় প্রার্থিত হইলে, তাহা ভগবৎ-চরণে স্থান পায়। চরণে স্থান পাওয়ায় প্রার্থনাটি চরণে স্থান পাওয়া এবং প্রার্থকের চরণে স্থান পাওয়া, ফলিতার্থে একই কথা। মূল ভগবদিচ্ছা। জীবের যে পুরুষকার, ফলিতার্থে তাহাও ভগবদিচ্ছা। গীতায় সে রহস্যভেদ করিয়া ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"পৌরুষং নৃষু"—অর্থাৎ নরের যে পুরুষকার, তাহাও আমি। তবেই অহংবুদ্ধি-পরিচালিত ইন্দ্রিয়-চালনারূপ দড়ীবাঁধা স্বাধীনতা মাত্র জীবের জন্য বিধান করা হইল। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন, "জীব দড়ীবাঁধা গরু; খুঁটো থেকে দড়ীর লম্বা মাপ যতখানি, জীবের স্বাধীনতা বা পুরুষকার ততখানি বা তত খানির মধ্যে।" সুন্দর দৃষ্টান্ত! দৃষ্টান্তটি যেন দৈব পুরুষকার সমস্যার শাস্ত্রীয় সমাধানসার! যেখানে দশটি জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়, তৎপরিচালক স্বরূপ একাদশগণিত অন্তরিন্দ্রিয়; আবার তৎপরিচালনার্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং এই সমস্তেরই প্রভু বা মূল পরিচালক অহঙ্কার, জীবের প্রতি ভগবানেরই দান বা বিধান, সেখানে সেই সীমার মধ্যে পুরুষকার আছে, আবার সেই সীমার বাহিরে নাই। যত কিছু বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-পুরাণ, যত কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই যে ঐ সীমাবদ্ধ স্বাধীন জীবতত্ত্বের সেবায় নিয়োজিত! অবিদ্যা বা অহঙ্কার যতদিন, জীবতত্ত্ব যতদিন, দ্বৈতজ্ঞান যতদিন, উপাসনা যতদিন, এই

তথাকথিত ( So-called ) পুরুষকার ত্যজিলেন। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভবকাতর ভক্তের প্রার্থনাটুকুই সেই পুরুষকার। ভক্ত বুঝেন, জীবের পুরুষকারের অহঙ্কার কেবল অবিদ্যার উদ্গার; তাই তিনি আপনার ভগবৎপদধূলিত্ব-পরিণতি কৃপাপূর্ব্বক চিন্তা করিতে ("কৃপয়া—বিচিন্তয়") ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। এখন ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হউক। সমর্পিতাত্ম ভক্তের আর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা, অহঙ্কারে জীব ভোক্তা; ভগবান কেবল ফলদাতা বা বিধাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান না, বরং ফল না চাওয়াই চান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভক্ত ভগবৎপদধূলিত্ব চাহিয়াছেন। ফলে ভগবৎপদধূলিত্ব ও অহঙ্কারানুবন্ধী-ফলাভিসন্ধিশূন্যত্ব একই কথা। কেবল ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের আপাতভেদ-বোধক ভাষাভেদ মাত্র। কিঙ্করের প্রভু-পদাশ্রয় চাওয়া কর্ম্মফল চাওয়া নহে। কিঙ্করের কর্ম্ম নিজ জীবত্ব পক্ষে নিষ্কাম; উহা ঈশ্বরার্থক—কেবল প্রভুপ্রীতিকাম। তবে এই যে চরণরেণুত্ব প্রার্থনারূপ কর্ম্ম-বিশেষ, ইহাও ভগবৎপ্রীতিকাম; কারণ ভগবান ইহাতেই প্রীত। "ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ" একথা তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি সিদ্ধর্ষি-মুখে বলিয়াছেন। ভক্তি কি ? তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি বলাইয়াছেন—"পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ফলে ভগবৎপদরেণুত্ব প্রার্থনা সেই পরানুরক্তিরই ফল। ভগবৎপদরেণুত্ব সেই পরানুরক্তিরই পরম পরিণাম।

স্বয়ং ভগবানের কথা কি, আহা! ভক্তি-কাঙাল আমরা ভগবদ্ভক্তের পদরেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। আহো! সুদীন ভক্তোক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে,—

তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো !

অর্থাৎ—

তব দাস, তাঁর দাস, তাঁর দাস যত আর,<br>
কৃতার্থ করহে প্রভো! দিয়ে দাস্য তাঁসবার।

চরণরেণুত্বই চিরদাসত্ব বা চরম দাসত্ব। আহা! পরাৎপর পরমপ্রিয়তম প্রভুর দাস্যানন্দ-কৃতার্থ দাসের দাসত্বই সর্ব্বস্ব-অবিদ্যাপ্রতারিত, প্রভুপ্রত্যাখ্যাত পরিতাপিতচিত্ত ভব-ভীত ভৃত্যের প্রভু-পদে পুনঃপদাশ্রয়প্রার্থনাসূচক এই শিক্ষা-শ্লোকটির ভাব-সুধার কণিকা-প্রসাদ পাইয়া দীনদাস গাইয়াছেন,—

নাথ হে!<br>
নিত্য ও চরণে, ভৃত্য জীবগণে,<br>
মানব-দানব-দেবা।<br>
মায়ায় মজিয়ে, রয়েছি ত্যজিয়ে,<br>
সেহেন চরণ-সেবা ॥<br>
ছিনু পদলগ্ন, হনু ভবমগ্ন,<br>
ডুবে গেল ভয়তরী।<br>
হায় কি উপায়! কিঙ্করে কৃপায়,<br>
রাখ পায় প্রভু হরি ॥<br>
মায়া-মদে মরি, আর যেন হরি!<br>
শ্রীপদ ছাড়া না হই।<br>
পদ্মে রেণু যথা, অনুদিন তথা<br>
পদরেণু হয়ে রই ॥<br>
অধম তারণ সে চারু চরণ<br>
সুচির শরণ করি।<br>
মনোপ্রাণ খুলি, প্রেমানন্দে গলি,<br>
বলি হরেকৃষ্ণ হরি ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।<br>
( যশোহর। )

# চারুচার্য্যা।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি। )

ঈর্ষা কলহমূলং স্যাৎ ক্ষমা মূলং হি সম্পদাম্।
ঈর্ষা দোষাদ্ বিপ্রশাপমবাপ জনমেজয়ঃ ॥১২॥

কলহের মূল ঈর্ষা; সম্পদের মূল ক্ষমা। ঈর্ষাদোষে জনমেজয় ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১২॥

( মনুষ্যের ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥
উদ্যোগ পর্ব্বণি ২৩ অধ্যায়ের ৮৯।

মনুষ্যের ক্ষমাবান্ হওয়া কর্ত্তব্য—

ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাং।
আদি পর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়ে।

ক্ষমাবানদিগের এই লোক ও পরলোক।

———ক্ষমা গুণবতাং বলং ॥৭৪॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৩ অধ্যায়ে।

গুণবানদিগের ক্ষমাই বল।

অন্যান্য প্রমাণ ৩র্থ বর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জনমেজয় ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই উপাখ্যান হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ৩০ অধ্যায়ে যথা—

কুরোঃপুত্রস্য রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য চ।
জগাম সরথো নাশং শাপাদ্ গার্গস্য ধীমতঃ ॥৯
গার্গস্য হি সুতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ।
বাক্‌শূরং হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজেন্দ্র! রাজাকুরুর পুত্র জনমেজয়ের রথ ধীমান্ গার্গের শাপে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই রাজা জনমেজয় গার্গের বিদুভাষী বালক পুত্রকে হিংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ] ১২

ন ত্যাজেদ্ ধর্ম্মমর্য্যাদা যপি ক্লেশদশাং শ্রিতঃ।
হরিশ্চন্দ্রো হি ধর্ম্মার্থী সেহে চণ্ডালদাসতাম্ ॥১৩॥

ন সত্যব্রতভঙ্গেন কার্য্যো ধীমান্ প্রসাধয়েৎ।
দদর্শ নরকক্লেশং সত্যনাশাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ।১৪

ক্লেশদশা প্রাপ্ত হইলেও, ধর্ম্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে না; ধর্ম্মজন্য মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব করিয়াছিলেন।১৩॥

( ধর্ম্মই মনুষ্যের সুহৃৎ—মৃতব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম্মই যান, অন্য কিছু যায় না।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমিব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ ॥১৩॥
তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোঽনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মসহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদানৃভিঃ ॥১৪॥
অনুশাসন পর্ব্বণি ১১১ অধ্যায়ে।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান মার্কেণ্ডেয় পুরাণের ৭ম, ৮ম অধ্যায়ে ও শ্রীমদ্দেবী ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১৮শ হইতে ২৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

বিশ্বামিত্রে গতে বিপ্রে শ্বপেচো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বধ্বা নরেশ্বরম্ ॥
অসত্যো যাস্যসীত্যুক্ত্বা দণ্ডেনাহত্য তাড়য়ং-
স্তদা।
দণ্ড প্রহার সম্ভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্ ॥
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমানীয় নিজ পক্কণে।
নিগড়ে স্থাপয়িত্বা তং স্বয়ং সুষ্বাপ বিজ্বরঃ ॥
২৪ অধ্যায়ে। ) ] ১৩

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সত্যব্রত ভঙ্গ করিয়া কোনকর্ম্ম করিবেন না; যুধিষ্ঠির সত্যনাশে নরকক্লেশ দর্শন করিয়াছিলেন।১৪।

( সত্যমাহাত্ম্য যথা—
ন যজ্ঞ ফলদানানি নিয়মাস্তারয়ন্তি হি।
যথা সত্যং পরে লোকে তথেহ পুরুষর্ষভ ৬২॥

* * * *

সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ।
সত্যমেকাক্ষরো যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্ ॥৬৩॥

কুর্ব্বীত সঙ্গতং সদ্ভির্নাসদ্ভির্গুণ বর্জ্জিতৈঃ।
প্রাপ রাঘবসঙ্গত্যা প্রাজ্যং রাজ্যং বিভীষণঃ ॥ ১৫

মাতরং পিতরং ভক্ত্যা তোষয়েন্ন প্রকোপয়েৎ।
মাতৃশাপেন নাগানাং সর্পসত্রেহভবৎ ক্ষয়ঃ ॥ ১৬

---

সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি ফলং সত্যে পরং স্মৃতং।
সত্যাদ্ধর্ম্মো দমশ্চৈব সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬৪॥

*　　*　　*

তুলামারোপিতো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈবেতিনঃ শ্রুতম্।
সমকক্ষাং তুলয়তো যতঃ সত্যং ততোহধিকম্ ॥৬৮॥
যতোধর্ম্মস্ততঃ সত্যং সর্ব্বং সত্যেন বর্দ্ধতে ॥৬৯॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৯৯ অধ্যায়ে।

( অন্যান্য প্রমাণ চতুর্থবর্ষের হিন্দুপত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে।)

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে ১৯১ অধ্যায়ে দ্রোণকে বধ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির "অবাক্তমব্রবীৎ বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।"

এই ছলনাবাক্য কহিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একবার নরক দর্শন করিতে হয়।

ব্যাজেন হি ত্বয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ সুতং প্রতি।
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব ॥ ১৫ ॥

স্বর্গারোহণ পর্ব্বণি ৩ অধ্যায়ে।

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি ছলনা করিয়া দ্রোণকে পুত্রের জন্য বঞ্চনা করিয়াছিলে; হে রাজন্! আমিও তজ্জন্য তোমাকে ছল করিয়া নরক দর্শন করাইলাম ] ১৪

সর্ব্বদা সাধুর সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য, গুণ বর্জ্জিত অসতের সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে; বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ বশতঃ বিপুল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১৫ ॥

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥১॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ২॥

শ্রীভাগবতে একদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, যোগ ( প্রাণায়ামাদি ), সাংখ্য ( তত্ত্ববিবেক ), ধর্ম্ম ( অহিংসাদি ), বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্ট ( অগ্নিহোত্রাদি ) পূর্ত্ত ( কূপাদি নির্ম্মাণ ), দক্ষিণা ( সামান্য দান ), ব্রত ( একাদশীর উপবাসাদি ), যজ্ঞ ( দেবপূজা ) ছন্দ ( রহস্য মন্ত্র ), তীর্থপর্য্যটন, নিয়ম ও যম ( অহিংসাদি ) সেরূপ আমায় বশ করিতে পারে না, যেরূপ সকল সঙ্গের অর্থাৎ—সংসার-সঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে।

সাধুনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণ যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্ ॥

কাল্কপুরাণে ১৬ অধ্যায়ে ২১॥

বহুনা জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি যোগতঃ।
দৈবাদ্ ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বর দর্শনম্ ॥

ঐ ১২। ১৯॥

সদা সন্তোভিগন্তব্যা যদাপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈর কথাস্তেষামুপদেশো ভবন্তি তয়ঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রকরণে

সর্ব্বদা সাধুর নিকট যাইতে যদ্যপি তাঁহারা না উপদেশ দেন, তাঁহাদের যাহা স্বাভাবিক বাক্য, উহা আমাদের পক্ষে উপদেশ হইয়া থাকে।

মহাপ্রভুঃ। কিমিহ শ্রেয়ঃ?
রামানন্দঃ। সতাং সঙ্গঃ। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ৭ অঙ্কে। ] ১৫

মাতা পিতাকে ভক্তির সহিত সন্তুষ্ট করিবে; তাঁহাদের কোপ উৎপাদন করিবে না। সর্পগণের মাতৃশাপে সর্পযজ্ঞে ক্ষয় হইয়াছিল [ ( এ বিষয়ে মহাভারতে আদি পর্ব্বের এই উপাখ্যান—সত্যযুগে, কদ্রু ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে কশ্যপ-পত্নী ছিলেন। কদ্রুর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে সহস্র

জরাগ্রহণ তুষ্টেন নিজযৌবনদঃ সুতঃ।
কৃতঃ কনীয়ান্ প্রণতশ্চক্রবর্ত্তী যযাতিনা॥
১৭॥ যুগ্মকম্।

দানং সম্বর্দ্ধিতং দত্ত্বার পশ্চাত্তাপ দূষিতম্।
বলিনার্পিতোবদ্ধে দানশেষস্য শুদ্ধয়ে।।১৮

যে, রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য-শাপে জরা-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যযাতিকে কহিয়াছিলেন যে, এই জরা যাহাকে ইউক; দিয়া তাহার যৌবন ভোগ করিতে পার। যযাতির যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু নামে কয়টি পুত্র ছিলেন। তিনি সকলকে জরা দিতে চাহিলে, সকলেই জরার দোষ প্রদর্শন করিয়া, কেহ লইতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজ যৌবন দান করিয়াছিলেন। ভোগ-বাসনা কখন তৃপ্তিলাভ করে না। ইহা অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। যযাতি বিষয়ভোগে তৃপ্তি লাভ না করিয়া, পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

পুরোপ্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্ব যৌবনম্।
রাজ্যঞ্চৈব গৃহাণেদং ত্বংহি মে প্রিয়কৃৎ সুতঃ॥ মৎস্য ৩৪ অঃ ১৩।
ভারতে—আদিপর্ব্বণি ৮৫ অঃ ১৭। ]১৭

সাত্ত্বিকদান করিবে, দান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে না। বলি রাজা শেষ দান-শুদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে শরীর অর্পণ করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান শ্রীভাগ-বতে অষ্টম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে আছে।)

সাত্ত্বিক দান যথা—
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥ ২০
শ্রীভগবদ্ গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে।

অনুপকারী ব্যক্তিকে কিংবা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে॥

নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। এক দিন বিনতা-উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিয়া কহিয়াছিলেন—"এ অশ্ব শ্বেতবর্ণ।" কদ্রু কহিলেন "এ অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ।" উভয়ে পণ হইয়া-ছিল যে "কল্য অশ্ব দেখা যাইবে, যে হারিবে সে দাসী হইবে।" কদ্রু প্রতারণা করিবার জন্য পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "পুত্রগণ! তোমরা কৃষ্ণবর্ণ লোমদিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, নচেৎ আমাকে দাসী হইতে হইবে।" যে সমুদয় সর্প তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই, তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ধীমান পাণ্ডবেয় রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।"

"নাবপদ্যন্ত যে বাক্যং তান্ শশাপ ভুজঙ্গমান্।
সর্পসত্রে বর্ত্তমানে পাবকো বঃ প্রধক্ষ্যতি॥
জনমেজয়স্য রাজর্ষে পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ॥৮॥
২০ অধ্যায়ে।)

এ বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে—
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ॥২৫
কুর্ব্বতে নর বুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুং।
অবশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন এব পদে পদে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডং—৬০ অধ্যায়ে।]১৬

কনিষ্ঠ প্রণত পুত্র (পিতা) যযাতির জরা গ্রহণ ও নিজ যৌবন দানে সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন, তজ্জন্য যযাতি (পুরুকে) চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়াছিলেন [এ বিষয়ে মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৭৮। ৮৫ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ১০ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ২৭। ৩৪ অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে

ত্যাগে দয়নিধিঃ কুর্য্যাৎপ্রত্যুপকৃতিস্পৃহাম্।
কর্ণঃ কুণ্ডলদানেঽভূৎ কলুষঃ শক্তিযাচ্ঞয়া ॥
১৯ ॥

ব্রাহ্মণাবমন্তেত ব্রহ্মশাপোহি দুঃসহঃ।
তক্ষকাগ্নৌ ব্রহ্মশাপাৎ পরীক্ষিদগমৎ
ক্ষয়ম্ ॥ ২০

বলি রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার প্রতিশ্রুত তিনপাদ ভূমি বামন দেবকে অর্পণ করিও না; করিলে তোমার মহান্ অনিষ্ট হইবে, কারণ—

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তি র্বিপদ্যতে।
৮ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৮।

যাহাতে বৃত্তি বিপন্ন হয়, এরূপ দানকে প্রশংসা করা যাইতে পারেনা।

দত্তাপুতাপী-দোষ যথা—

সম্ভোগ দর্শিন্ বিষমোঽতিমানী দত্ত্বানুতাপী
কৃপণো বলীয়ান্।
বর্গপ্রশংসী বনিতাসুদ্বেষ্টা এতে পরে সপ্ত
নৃশংসবর্গাঃ॥ ১৯
উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়।

আশাং দত্ত্বানুদাতারং দানকালে নিষেধকম্।
দত্ত্বা সন্তপ্যতে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥
[ যমস্মৃতিঃ ] ১৮।

সাত্ত্বিক ত্যাগ করিবে, তাহাতে উপকারের স্পৃহা করিবে না; কর্ণ কুণ্ডলদান কালে শক্তি যাচ্ঞা করিয়া কলুষ চক্ষু হইয়াছিলেন, [ এ বিষয়ে মহাভারতে বন পর্ব্বে ৩০৯ অধ্যায়ে উপাখ্যান যথা,—

হস্তিনাপুরে কর্ণ মধ্যাহ্ন স্নানে জল হইতে উঠিয়া, যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতেন, তখন ধনের নিমিত্ত যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন, সকলকে প্রার্থনানুযায়ী দ্রব্য দান করিতেন। এই দেখিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট গিয়া, তাঁহার শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন; কবচ ও কুণ্ডল জন্ম কর্ণ সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দিতে স্বীকার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইতে কহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলেন না। পরিশেষে কর্ণ ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন "বাসব! আমার কবচ ও কুণ্ডল পরিবর্ত্তে আপনি আমার সেনামুখে শত্রুসংহারকারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন"।

"বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রু সঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে॥" ২১॥

উপকার আশা না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য—

পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যৎ ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥
( দেবলস্মৃতিঃ। )

উপকার আশায় যে দান, উহা অদান—

অদত্তন্তু ভয়ক্রোধহর্ষশোকরুগন্বিতৈঃ।
* * * *
বালমূঢ়া স্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতম্।
কর্ত্তামমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়াচ যৎ॥ ১০
নারদস্মৃতি। ৫। ] ১৯।

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না, কারণ ব্রহ্মশাপ দুঃসহ। ব্রহ্মশাপে তক্ষকাগ্নিতে পরীক্ষিৎ বিনষ্ট হইয়াছিলেন ( এই উপাখ্যান মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে—একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। একটী পলাতক মৃগের অন্বেষণে শমীক মুনির আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যানস্থিত মুনিকে মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কোন বাক্য উচ্চারণ না করায়, ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর রাজা মৌনব্রতধারী ঋষির গলে ধনুর দ্বারা একটি মৃত সর্প যোজনা করিয়া দিলেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী সহক্রীড় বালকের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আশ্রমে পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যে রাজপাংশুল আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প যোজনা

দম্ভা ব্রহ্মোক্ততং ধর্ম্মং নাচরেদম্ভ নিস্ফলম্।
ব্রাহ্মণাদম্ভলব্ধাস্ত্র বিদ্যা কর্ণস্য নিস্ফলা ॥২১

---

করিয়াছে, সেই পাপকে পন্নগেশ্বর তক্ষক অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে যম-সদনে নীত করুক—

যোহসৌব্রহ্মন্ ভাতস্য তথা কৃচ্ছ্রগতস্য চ।
স্কন্ধে মৃতং সমাস্রাক্ষীৎ পন্নগং রাজ-
কিল্বিষী ॥ ১২

তং পাপমতিসংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ।
আশীবিষস্তিগ্মতেজামদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥১৩
সপ্তরাত্রাদিতোনেতা যমস্য সদনং প্রতি।
দ্বিজানামবমন্তারং কুরূণামযশস্করম্ ॥ ১৪ )

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব পূজাত্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবকে কহিয়াছিলেন—

ন ব্রাহ্মণান্ মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজং।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়োহহম্ ৪০
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৬ অধ্যায়ে।

এই শ্লোকের প্রমাণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভৃগু মুনির পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৯ অঃ

বেদেও ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—

"ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"
ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮ অষ্টকে ৪ অঃ ১৯বর্গে ১২
শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ৩১ অঃ ১১।
অথর্ব্ববেদ সংহিতায়াং ১৯ কাণ্ডে ৬প্র-
পাঠকে ৬।

সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন......ইত্যাদি ] ২০

দম্ভ পূর্ব্বক কোন ধর্ম্ম আচরণ করিবে না, কারণ তাহা পরিশেষে নিষ্ফল হয়। কর্ণের ব্রাহ্মণদম্ভে লব্ধ অস্ত্রবিদ্যা নিষ্ফল হইয়াছিল। ( এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে রাজধর্ম্মে তৃতীয়াধ্যায়ে উপাখ্যান—

কর্ণ পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে মাংস ও রুধির ভোজী একটি কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কর্ণ সে যাতনা সহ্য করিয়া রহিলেন। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গে যখন কর্ণের উরু রুধিরাক্ত দেখিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "মূঢ়! তোর ধৈর্য্য দেখিয়া তোরে ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তুই সত্য পরিচয় দে"। তখন কর্ণ ভূতলে পতিত হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিলেন "হে ভার্গব। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভব যে সূত জাতি, আমি সেই সূতকুলোদ্ভব কর্ণ, বিদ্যাদাতা গুরু পিতৃপদবাচ্য জানিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম; এইক্ষণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"। তখন পরশুরাম কহিলেন "মূঢ়! যখন তুই অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যোপচার করিয়াছিলি, তখন এই সকল ব্রহ্মাস্ত্র তোর নিকট প্রতিভা পাইবে না"।

যস্মান্মিথ্যোপচরিতোহস্ত্রলোভাদিহত্বয়া।
তস্মাদেতদ্ধিতে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি ॥ )

মাসেবা সেবয়াদধ্যাদ্ দৈবাধীনে ধনে ধিয়ম্।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো যাতাঃ ক্ষয়ং দুর্য্যোধনা-
শ্রয়াৎ ॥ ২২

---

ইহা দিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম, ব্রত করিলাম, এইরূপ দম্ভ করিলে ভয়ের কারণ হয়, অর্থাৎ অধোগতি হয়; তজ্জন্য দম্ভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইতিদদামিতি যজ ইতি ব্রতম্।
ইত্যেতানি ভয়াস্যাহুস্তানি বর্জ্যানি সর্ব্বশঃ।
আদিপর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যং চ
বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৩ মনুঃ ৪ অধ্যায়ে।

সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥
গীতা ১৭ অধ্যায়ে ১৮ ] ২১

নীচসেবা দ্বারা দৈবাধীন ধনোপার্জনে

পরপ্রাণপরিত্রাণপরঃ কারুণ্যবান্ ভবেৎ।
মাংসং কপোতরক্ষার্থে স্বং শ্যেনায় দদৌ শিবিঃ॥ ২৩

বধ করিবে না; ভীষ্ম-দ্রোণাদি দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন [ (দুর্য্যোধনের স্বভাব যে অত্যন্ত নীচ, তাহা তাঁহার মাতা গান্ধারী দেবীও ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন, যথা—"হে রাজন্! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ও ক্রোধের বশ ও সম্পূর্ণ মোহযুক্ত হইয়াছে—

স এষ কামমন্যুভ্যাং প্রলব্ধো লোভমাস্থিতঃ।
উদ্যোগ পর্ব্বণি ১২৮ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির জন্য দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন কহিয়াছিলেন—

যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যাবিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥
২৬ ঐ ১২৬ অধ্যায়)

নীচসেবা-দোষ— যথা—গরুড়পুরাণে ১১০ অধ্যায়ে—

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ
পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা।
পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ
প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ॥ ১৭।
কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমানঃ
ঋণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা।
দরিদ্রভাবাৎ বিমুখাশ্চ মিত্রা
বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ॥ ১৮।
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনৈর্বসতিঃ——"
সপ্তরত্নম্।] ২২

অন্যের প্রাণ পরিত্রাণ জন্য করুণাবান্ হইবে; কপোতরক্ষার জন্য শিবি রাজা নিজ মাংস শ্যেন পক্ষীকে দান করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৩১ অধ্যায়ের আখ্যায়িকা—

মহাত্মা রাজা শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ইন্দ্র শ্যেনপক্ষীরূপ ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেনপক্ষীর ভয়ে শিবি রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্যেন কহিলেন "রাজন্! আপনি ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে আপনি আমার আহার না দিয়া আমায় কষ্ট দিতেছেন কেন?" শিবি কহিলেন "এই পক্ষী ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছে—শরণাগতকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কার্য্য।" শ্যেন কহিলেন "রাজন্! আমার অনেকগুলি পরিবার; আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদের গতি কি হইবে?" শিবি কহিলেন "ইহার পরিবর্ত্তে যাহা রুচিকর, বল, আমি তৎক্ষণাৎ দিব।" শ্যেন কহিলেন "আমার অন্য মাংসের রুচি নাই, যদি তোমার শরীরের মাংস এই কপোতের সহিত তুলায় ওজন করিয়া দাও, তাহা হইলে লইতে পারি।" রাজা শিবি কপোতের সহিত তৌল করিয়া নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সমুদায় শরীরের মাংস দিয়াও কপোতের সমান হইল না, তখন রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিয়াছিলেন—

ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
উৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্॥

শরণাগতকে ত্যাগ করা পাপ, যথা—

যো হি কশ্চিদ্দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাং বা লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্॥ ৬
বনপর্ব্বণি ১৩১ অধ্যায়ে।

যে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা লোকমাতা গাভী বধ করে কিম্বা শরণাগতকে ত্যাগ করে, সকলেরই তুল্য পাপ।] ২৩

অথৈব পেশলং কুর্য্যান্মনঃ কুসুম-কোমলম্।
বহুধ স্নেহলোহেন দেবদানেব সংক্ষয়ঃ॥ ২৪

কুসুমের ন্যায় কোমল মনকে যেম

অবিস্মৃতোপকারঃ স্যাৎকুর্ব্বীত কৃতঘ্নতাম্।
হত্বোপকারিণং বিপ্রো নাড়ীজঙ্ঘমধঃচ্যুতঃ॥
২৫

স্ত্রীজিতো নভবেদ্ধীমান্ গাঢ়রাগবশীকৃতঃ।
পুত্রশোকাদ্দশরথো জীবং জায়াজিতোঽত্যজৎ॥ ২৮

পূর্ণ করিবে না, কারণ দ্বেষ দোষে দেব ও দানবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

(সমুদ্রমন্থনকালে. যখন পরিশেষে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তখন অমৃত পান জন্য দেব-দানবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল; এই উপাখ্যান আদিপর্ব্বে ১৯ অধ্যায়ে—

"ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ সমীপে লবণাম্ভসঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বঘোরতরো মহান্॥)

দ্বেষ করা ভাল নহে। দ্বেষ ক্লেশমূল—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ
পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে ৩সূত্রম্।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। ৮
ঐ ঐ

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিৎ দ্বিজ।
গরুড় পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে। ৫৮] ২৪

কখনও উপকার বিস্মৃত হইবে না ও, কৃতঘ্নতা করিবে না; বিপ্র গৌতম উপকারী নাড়ীজঙ্ঘ নামে বককে বধ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [(এ বিষয়ে শান্তি পর্ব্বে ১৬৮ হইতে ১৭৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত বকনাড়ীজঙ্ঘোপাখ্যান—উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—ব্রাহ্মণ গৌতম অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন। তিনি বক নাড়ীজঙ্ঘের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাকে দুঃখের অবস্থা কহিয়াছিলেন। বকের বিরূপাক্ষ নামে এক রাক্ষস বন্ধু ছিল। বিরূপাক্ষ গৌতমকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। গৌতম দেশে যাওয়া স্থির করিয়া চিন্তা করিল যে, সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছু নাই, কি প্রকারে এত দূরপথ যাইব? একদিন রাত্রে উভয়ে একস্থানে শয়ন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য বক অগ্নি স্থাপন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বককে সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইয়া দেশে যাইতে ছিলেন। রাক্ষস জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসদিগকে আহার জন্য দিয়াছিলেন।

কৃতঘ্নতা পাপ, যথা—

কৃতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
মিত্রদ্রোহো ন কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিশেষতঃ।
মিত্রধ্রুক্ নরকং ঘোরমনন্তং প্রতিপদ্যতে॥
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপঃ কৃতঘ্নো নিরপত্রপঃ।
মিত্রদ্রোহী কুলাঙ্গারঃ পাপকর্ম্মা নরাধমঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৩ অধ্যায়ে।] ২৫

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঢ় অনুরাগবশ হইয়া স্ত্রীজিত হইবে না; রাজা দশরথ স্ত্রীজিত হইয়া পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (এই উপাখ্যান বাল্মীকীয় রামায়ণে ও অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে বিস্তৃত বর্ণিত আছে।)

পুরুষ স্ত্রীর বশ না হইয়া স্ত্রীকে বশে রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী বশবর্ত্তিনী না হইলে, সংসার দুঃখের আকর হইয়া থাকে—

বস্তুশ্চ পুত্রোহর্থকরীচ বিদ্যা
অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ।
ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী চ
দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ॥ ২০
গরুড় পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে।

স্ত্রীতে স্বামীর প্রভুতা সুখের বিষয়—

উপযন্তুর্দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।
শকুন্তলে ৫ অঙ্কে।

যেস্থানে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব, সেস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে—

স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে।৬
গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে।

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞাচ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥২৪
গারুড়ে ১০৮ অধ্যায়ে।] ২৬

ন স্বয়ং সংস্তুতিপদৈর্ম্মানিং গুণগণং নয়েৎ।
স্বগুণ-স্তুতিবাদেন যযাতিরপতৎ দিবঃ॥ ২৭

নিজ গুণ বর্ণনদ্বারা নিজ গুণকে মলিন করিবে না; যযাতি রাজা স্বগুণ বর্ণনা করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

( রাজা যযাতি এক বৎসর বায়ু ভক্ষণাদি কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গারোহণ করেন। একদিন ইন্দ্র যযাতিকে কহিয়াছিলেন "হে নহুষতনয়! যখন তুমি গৃহস্থাশ্রমের সমুদায় কর্ম্ম শেষ করিয়া বন গমন করিয়াছিলে, তখন তপস্যায় কাহার তুল্য হইয়াছিলে, বল। যযাতি কহিয়াছিলেন "হে ইন্দ্র! দেব মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মধ্যে আমি কাহাকেও আমার তুল্য তপস্বী দেখি না"। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন "রাজন্! যখন তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়া তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকলকে অবমাননা করিলে, তখন তোমার সমুদায় পুণ্যের ক্ষয় হইবে; সুতরাং তোমার স্বর্গভোগেরও শেষ হইল, অতএব তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হও,—

যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ অল্পীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকাস্ত্বন্তবন্তস্তবেমে ক্ষীণে পুণ্যে পতিতাস্যদ্য রাজন্। ৩।

ভারতে আদিপর্ব্বণি ৮৮ অধ্যায়ে )

আত্মপ্রশংসা করিলে নরকগামী হইতে হয় ও শৃগাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিতে হয়,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে।
তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থং ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি। ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

যযাতি কহিয়াছিলেন "হে নরদেব! যাহারা আত্মপ্রশংসা করে, তাহারা নরকে গমন করে,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে। ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

ত্যজেন্মৃগয়া ব্যসনং হিংসয়াতি মলীমসম্।
মৃগয়ারসিকঃ পাণ্ডুঃ শাপেন তনুমত্যজৎ॥২৮

বিবেকী ব্যক্তি দয়াবান হইবেন, প্রতিক্রিয়াচরণ করিবেন না, নির্ভয় ও আত্মশ্লাঘাহীন হইবেন,—

মৃদুঃ স্যাদপ্রতিক্রূরো বিশ্রব্ধস্যাদকত্থনঃ। ৮

শান্তি পর্ব্বণি ১১১ অধ্যায়ে।

ইষ্টং দত্তমধীতং বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
দেবলঃ ] ২৭

হিংসায় অতিমলিন মৃগয়াব্যসন ত্যাগ করিবে; মৃগয়াসক্ত পাণ্ডু রাজা শাপে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। ( এ বিষয়ে ভারতে আদি পর্ব্বে ১১৮ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান যথা—পাণ্ডু রাজা মৃগপরিবেষ্টিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনাসক্ত এক মৃগযুগল দর্শন করিয়া শর দ্বারা সেই মৃগী ও মৃগীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিমিন্দম নামে মুনি মৃগরূপ হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুকে শাপ দিয়াছিলেন যে "তুমি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ, তদ্রূপ তুমি যখন কামমোহিত হইয়া আসক্ত হইবে, তখন তুমি আমার ন্যায় জীবনান্তক দশা প্রাপ্ত হইবে"। রাজা পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নামা দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহারা পাণ্ডুর সহিত বন গমন করিয়াছিলেন। তথায় একদিন কামাসক্ত হইয়া মাদ্রীকে মৈথুনাসক্ত হওয়ায়, মুনিশাপে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন—

ত্বয়াহং হিংসিতো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বামপ্যহং শপে।
দ্বয়োর্নৃশংসকর্ত্তারমবশং কামমোহিতম্॥
জীবিতান্তকরো ভাব এবমেবাগমিষ্যতি॥)

জীবহিংসার দোষ যথা—

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন। ৩০।

শান্তিপর্ব্বণি ২৬২ অধ্যায়ে।

জীবসকলের অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। ] ২৮

ক্ষিপেদ্ বাক্যশরাংস্তীক্ষ্নান্ ন পারুষ্যাপপন্ন-
ত্যান্।
বাক্পারুষ্যরুষাচক্রে ভীমঃ কুরুকুল-
ক্ষয়ম্॥ ২৯.

---

কার্কশ্যপূরিত তীক্ষ্ণ বাক্যশর ক্ষেপণ করিবে না; ভীম বাক্যপারুষ্যক্রোধে কুরু-কুলকে ক্ষয় করিয়াছিলেন।

[ দুর্যোধন ভীমকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছিলেন, ভীম তজ্জন্য কোপে কুরুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন ]

কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলা উচিত নহে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নীতি কহিয়াছিলেন "রাজন্! পরশুদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিলে, তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না; সুতরাং কাহাকেও দুর্ব্বাক্য কহিবে না—

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্-
ক্ষতম্॥ ৭৭

উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৩ অধ্যায়।

সংরোহতীষুণা বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্-
ক্ষতম্।

বামন পুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে।

বক্রোক্তিশল্যমুদ্ধর্ত্তুং ন শক্যং মানসং বুধৈঃ।

শুক্রনীতি, ৩ অধ্যায়ে।

মহাদেবও সতীকে কহিয়াছিলেন—
তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেঽর্দ্দি-
তাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং
তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ। ১৯

শ্রীভাগবতে ৪স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে।

শত্রুর শরে হৃদয় সেরূপ বিদ্ধ হয় না, যেরূপ আত্মীয় ব্যক্তির দুর্ব্বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ হয়; কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াও নিদ্রা যায়, কিন্তু শেষোক্ত দিবানিশি মর্ম্মে ব্যথা পায়।] ২৯

পরেষাং ক্লেশদং কুর্য্যান্ন পৈশুন্যং প্রভোঃ
প্রিয়ম্।
পৈশুন্যেন গতৌ রাহোশ্চন্দ্রার্কৌ ভক্ষণীয়-
তাম্॥ ৩০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

শত্রুর পিশাচরণ করিতে গিয়া কাহাকেও অবস্থা জন্য ক্লেশ দিবে না, সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থা করায় রাহুর ভক্ষণীয় হইয়াছিলেন। (সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণ সেই অমৃত পান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাহু দেবরূপ ধরিয়া অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ন মস্তক আকাশে উঠিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। এই অবধি রাহুর মুখের সহিত সূর্য্য-চন্দ্রের চিরশত্রুত্ব নিবন্ধন রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্য-চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে—

ততো বৈরবিনির্ব্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেনহৈব।
শাশ্বতশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ॥

আদি পর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে

পিশুনতা দোষ যথা—
লোভোঽস্তি চেৎ কিং পিশুনতা যদস্তি
কিং পাতকৈঃ।

ভর্তৃহরিঃ।

যদি লোভ থাকে, শত্রুর আবশ্যক কি? যদি পিশুনতা থাকে, পাপের প্রয়োজন কি? ৩০

# কামকলা-তত্ত্ব।

"অহংকারস্ত পরমঃ [illegible] [illegible]
[illegible]
যস্যাকে [illegible] [illegible]
চর্ম্মাম্বরম্।
যম্মায়া হি রুণদ্ধি বিশ্বমখিলং পায়াৎ স বঃ
শঙ্করঃ
অর্দ্ধেন্দুবৎ কলাবিন্দুবৎ জলজবৎ জম্বুলবৎ
জালুবৎ।"

সর্ব্বযোগাধার মহাযোগী মহেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তৎকৃপায় তৎকথিত কামকলাতত্ত্ব—যতদূর সম্ভব প্রকাশযোগ্য—সংক্ষেপে বলিতেছি * ১। যোগী ও সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য এবং অপ্রকাশ্য ও অতি গোপনীয়। শ্রীকৃষ্ণে বলিয়াছেন,—

"গোপ্তব্যা হি প্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং।"
যদি আপনার হিতকামনা থাকে, তবে
অতি যত্নের [illegible] ইহা গোপন রাখিবে।
[illegible]
"একৈকং [illegible] গুহ্যাৎ গুহ্যতমং
মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতঃ স্ফোটনকরং পরম্।
মোহয়িত্বা ত্বামাপোক্তি পরস্মৈ কেতি বিবা-
দিভিঃ॥"

মূল তাৎপর্য্য—কামকলা ধ্যান গুহ্যাৎ গুহ্য। ইহা অশিষ্য বা অভক্তের নিকট কখনই বলিবে না,—বলিলে শীঘ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

আমি পর্য্যটন সময় দেখিয়াছি যে, পরমহংস ও যোগী মহাত্মাগণ ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত উপযুক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট কামকলার নাম মুখে আনেন না। আমিও কামকলা-বিষয়িণী গুহ্য তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহা বলিতে হইলে যোগের আভ্যন্তরিণ অনুষ্ঠান প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কমকলার স্বরূপ জানিয়া, কামকলা ধ্যান করা যোগী ও সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কমকলাতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত যোগ হয় না। কামকলার স্বরূপ ও কামকলাতত্ত্ব যে যোগীর অজ্ঞাত, তিনি কখনই যোগী নহেন। এরূপ ব্যক্তি যোগী নামধারী ভেকধারী মাত্র। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগসাধনা; যোগেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান-ধারণা—কামকলা। এই কামকলা যোগী ও ভোগী সকলেরই সর্ব্বোচ্চ ত:

---

(১*) সন ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের হিন্দু-পত্রিকায় 'অজপাজপ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়। হংসের কণ্ঠ ও নেত্র কামকলা।" এই কামকলাতত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠকগণ আগ্রহ সহকারে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট হইতে ৬৩ খানি পত্র পাইয়াছি; কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উত্তরে কামকলাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য স্বতন্ত্ররূপে কামকলা-তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। ঘটনা-চক্রনেমির অনবরত আবর্ত্তনে পড়িয়া এতদিন লিখিব লিখিব মনে করিয়াও লিখিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ দীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় এবং কামকলার ধ্যান দ্বারা ভবসংসার-বন্ধন দূর হয়। কোন সময়ে ভগবান বিষ্ণু কামকলা ধ্যান করিয়া স্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মহাদেবকেও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভূতপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের আশায় কামকলা ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সহিত জগদ্‌গুরু মহাযোগী মহেশ্বরকে বিমোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শঙ্করাবতার মহামনা শঙ্করাচার্য্য আদ্যাশক্তির স্তব করিবার সময় তাহা বলিয়াছেন, যথা—"হরিস্ত্বমারাধ্য * * * পুরা নারী ভূত্বা, পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ" ইত্যাদি।" বাস্তবিক যে ভাগ্যবান সাধক গুরুর নিকট স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সাধু, তিনিই সেব্য এবং তিনিই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

মনুষ্য-দেহের গুহ্যদেশ হইতে ২ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। দেব, মানব, অসুর, কুম্ভীর, কীটাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী আছেন (* ২)। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই কামকলারূপা হয়েন।

শ্রীক্রমে ব্যক্ত আছে—

"সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী।"

আগমকল্পদ্রুম-পঞ্চশাখাতে আছে যে,—

"অখিল-জন-জীব-কমলিনী বাসেক্ষণা * *।
সাধক-মন্ত্রভেদাৎ সা কালী, গৌরী তত্রূপেণ"

যিনি অখিল জীবের ষট্‌চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা। এই ভগবতীই সাধকের মন্ত্রভেদে কালী, তারা, ত্রিপুরা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিতা।

কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু। এই ত্রিবিন্দুর স্বরূপ এবং প্রকৃত অর্থ এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরাস্থিতা।
বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং।
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ চিন্তয়েত্তদধো গতম্।
এবং কামকলা সাক্ষাদক্ষরব্রহ্মরূপিণী।"

(দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।)

অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা ও অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে হ-কারার্দ্ধ চিন্তা করিবে। এই কামকলা সাক্ষাৎ অক্ষর-ব্রহ্মস্বরূপিণী।

---

(২) এই কুণ্ডলিনীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কুণ্ডলিনীই জীবন দ্বারা জীবরূপে; মনন দ্বারা মনরূপে, সংকল্পদ্বারা সংকল্পরূপে, বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে, অহংভাব দ্বারা অহঙ্কার রূপে দেহে অবস্থিতি করেন। কুণ্ডলিনীর দুই মুখ এবং পদ্মের মৃণাল তন্তুর শতাংশের একাংশ তুল্য অতি সূক্ষ্ম। উহার গতি অতিশয় দুর্লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর উপদেশে এবং সাধকের সাধন-বল ব্যতীত কুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

তার চূড়ামণিতে বাক্ত আছে, যথা—

"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্।
সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্।
সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারণং।
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সপরিষ্কৃতি মণ্ডলম্।
সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্ব্বাহ্লাদন সম্পূর্ণং সর্ব্ব বশ্য প্রবর্ত্তকম্।
এতৎ কামকলা-ধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"

ঊর্দ্ধস্থিত একবিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া, নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দুদ্বয় অমৃতে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব বিদ্যারূপ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তি ও সর্ব্ববিধ অভীষ্ট প্রদায়ক। বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ * * * কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদি, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, কামকলা-ধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

শ্রীতন্ত্রার্ণবে কথিত আছে—

"এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্।
নাসাদ্যঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুর্যোনি পদদ্বয়ম্।
অনাদিনিধনং বস্তুৎ পরাশক্ত্যাত্মমব্যয়ম্।
লাবণ্যলহরীসাররূপমানন্দ-বারিধিঃ।"

কামকলা মূর্ত্তির বিন্দুত্রয় মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি উত্তমাঙ্গ সমুদয় ও স্তনবিন্দু-যুগল হইতে বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধ কটিদেশ হইতে চরণযুগল প্রভৃতি হইবে। ইনিই অনাদি পরাশক্তি ও এই রূপই লাবণ্য-লহরীসার ও আনন্দঘনক। . . . . . . . . .।

যামলে বর্ণিত হইয়াছে যে—

"তথা কামকলাং বক্ষ্যে তদেব দেবরূপকম্।
যাদেবৈর্যোগিনীবৃন্দৈঃ সংস্থানিত্যা ব্রহ্মরূপিণী।
পারম্পর্য্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচনী॥
বিন্দুনা নিষ্কলেনৈব সকলাক্ষররূপিণী।
ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী।
সপ্তো ভিন্না বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যাস্তনদ্বয়ী।
পৃথিবীহার্দ্ধকলা যা ত্রিলোকীনাং তম্বগ্নিকা।
এবং কলাময়ী রূপা ব্যাপ্তি সা চরাচরম্।
* * * * *
ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী।
যেন পূণানন্দা দক্ষা স মুক্তো নাপরঃ শিবে।
স দেবঃ খলু লোকেষু সংযোগী সচ কৌলিকঃ
যাবান্তাবদ্বজেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাং।
তদ্রূপঞ্চ ভবোর্ম্মিভ্যা কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে।
সত্যঃ পত্যঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি।
এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতৃরুচ্চাটনকরং পরম্।
প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মাদেতৎ প্রকাশয়েৎ।
গোহচিরাদ্মৃত্যুমাপ্নোতি শত্রুর্ব্বেতি-বিধাদিতিঃ।"

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা-রূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। কামকলার ধ্যান করিলে ভব-বন্ধন বিমোচন হয়। গুরু-পরাম্পরা ক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকা-বর্ণ-স্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী ও ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান, এই

ত্রিশক্তি (৩৯)। ইহার নভোমুখী বিন্দু মুখস্বরূপ, নিম্নে শশী-সূর্য্যরূপ বিন্দুযুগল স্তনযুগল স্বরূপ কল্পনা করিতে হয়। নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। কামকলা চরাচর জগতে জাগরূকা আছেন। কামকলাবিদ্যা চক্রবিদ্যা স্বরূপিণী। যে পুণ্যবান ব্যক্তি কামকলার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই যোগী, তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কামকলা অবগত হইয়াছেন, তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই আমি সত্য ও সমীচীন পথ বর্ণন করিলাম। ইহা অতি গুহ্য। শিষ্য ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কখনই প্রকাশ করিবেনা।

বৃহৎ শ্রীক্রমে আছে—

"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।
বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় বামাদীশানমাগতা॥
সা বামা শক্তিকাখ্যা সা শিখা চিৎকলাপরা।
শক্তাশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয় মাত্রগা॥
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
বক্রীভূতা পুনর্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা॥
ইচ্ছা নাদ সমাযোগে রৌদ্রা শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী॥"

কামকলার বিন্দু তিনটীর মধ্যে কুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা। দক্ষিণস্থিত বিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে ঐ রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঈশান কোণস্থিত বিন্দু হইতে ঐ রেখা বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। ঐ রেখার নাম জ্যেষ্ঠা শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। বায়ুকোণ হইতে ঐ রেখা প্রথমোক্ত দক্ষিণদিকস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখা ইচ্ছাশক্তি ও নাদ (৪০) এবং

(৩৯) এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী নামে অভিহিতা হয়েন। যথা—

'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী।' (জ্ঞানং গৌরী শক্তিরিচ্ছা ব্রাহ্মী শক্তিঃ ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরিতি ত্রিধা ত্রিপ্রকারা।)

(গোরক্ষ সংহিতা।)

ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবিত্রী বা গায়ত্রী নামে অভিহিতা ও ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণুর সহিত সংযুক্তা হইয়া বৈষ্ণবী এবং জ্ঞানশক্তি জ্ঞানযোগী মহাদেবের সহিত সংযুক্ত হইয়া কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হয়েন।

এই তিন প্রকার শক্তি মনুষ্য-শরীরের স্থান বিশেষে ঊর্দ্ধশক্তি, মধ্যশক্তি, অধঃশক্তি রূপে বিরাজিতা আছেন।

"ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্ গুদং।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নিরঞ্জনং।"

মানবদেহের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে ঊর্দ্ধশক্তি, নাভিমূলে মণিপুরচক্রে মধ্যশক্তি, গুহ্যদেশে মূলাধারে অধঃশক্তি বিরাজিত আছেন।

এই তিন প্রকার শক্তিকে বন্ধনত্রয় বলে। যথা—

উড্ডীয়মান বন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, মূলবন্ধ।

(৪০) নাদ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতি মাত্র ছিল। সেই সমব্যাপক জ্যোতিঃ-আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়। বিন্দু-পরমেশ্বর। মানবের শিরোদেশে যে সহস্র-

এবং ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিকোণা, পরব্রহ্ম-স্বরূপা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

প্রথমে বলিয়াছি যে, জীবের মূলাধার-স্থিত কুণ্ডলিনীই কামকলারূপা। কামকলার ন্যায় কুণ্ডলিনীও ত্রয়ী, ত্রিরেখা ইত্যাদি নামে বর্ণিতা হইয়াছেন। যথা—

"আধারে সর্ব্ব ভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ত্রিগুণা সা ত্রিধোমা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিকোণা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা
বিশিষ্যতে।"

কুণ্ডলিনী ও কামকলার আকৃতিগত বিভিন্নতা নাই এবং কামকলা ও কুল-কুণ্ডলিনী অভিন্ন—এক। কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহা সার্দ্ধ তিন বিন্দু।

"সার্দ্ধ ত্রিতয় বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী।
নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সদানন্দপ্রকাশিনী।
আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী।"

(বামকেশ্বর সংহিতা।)

কুণ্ডলিনীর ত্রিবিন্দু কামকলা ও অর্দ্ধ-বিন্দু কামকলার নিম্নোক্ত হকারার্দ্ধ। সুতরাং কামকলা ও কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্ন এবং নাদরূপা আদ্যাশক্তি ত্রিপুরা দেবী। কামকলা অতিগুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য এবং প্রকৃতযোগী ও সাধনার-সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত সাধক ব্যতীত, অপরের ধারণা করা ও প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

যোগসার ও রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, কবচ, স্তোত্রাদি আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটি ধ্যান দিতেছি।

"ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াং।"

(যোগসার।)

এইরূপ ধ্যানাদি পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কামকলার ধ্যানাদি গুরু-মুখ-গত। উপযুক্ত গুরুর প্রমুখাৎ ব্যতীত কামকলার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান এবং প্রকৃত তত্ত্ব কোনমতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

যতদূর বলা হইল, ইহাতে বুঝা যায়, কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু ও ত্রিকোণাকার এবং ইহাই অনাদি পরাশক্তি কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাসুন্দরী। প্রকৃত যোগীর ধ্যান-ধারণা ঐ কামকলা। যে যোগী কামকলা-তত্ত্ব অনবগত, তিনি যোগ-পাঠশালে হাঁড়ো-কলসী লিখিতেছেন মাত্র।

কামকলার বাহ্যাকৃতি বলিলাম এবং বাহ্যরূপ বর্ণন করিলাম; কিন্তু যোগীর অন্তরীয় ধ্যান ধারণা এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না; সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা নাই; বরং বিশেষরূপে অতি নিষেধই আছে! কিন্তু অতরের আভাষ একটু দিতেছি। এ পথের পথিকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন না।

কামকলার ত্রিবিন্দুর নাম ত্রিপুর। মহাদেব ঐ ত্রিপুর বিজয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নাম ত্রিপুরবিজয়ী।

মানব-দেহের নাভিদেশে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর নামক যে পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল রহিয়াছে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যখন কুণ্ডলিনী উত্থাপিত করিয়া ষট্‌চক্রভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। ইহা ভেদ করিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথমে উদরাময় হয়। প্রভুত, সাধক এই সময় কৃশ হইয়া পড়েন।

হৃদয়ে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলযুক্ত আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রকে রুদ্র-গ্রন্থি বলা যায় (৫)।

(৫) এই চক্রে জীবের মন আছে এবং ষট্‌চক্রের মধ্যে এই চক্র ভেদ করাই সুকঠিন। গুপ্ত তিন চক্র সহিত সর্ব্বশুদ্ধ নবচক্র আছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞা চক্র, এই তিন চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিতে হয়। এই চক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলে শ্বেতবর্ণ বিন্দুরূপ বীজ আছে। সেই বীজ প্রতিপাদ্য মন ও জ্ঞানশক্তিময় শিবলিঙ্গ আছেন। তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্ম-প্রয়োজক। যোগশাস্ত্রে এইরূপ বাক্য আছে যে —

"আজ্ঞা নাম পদ্ম-কর্ণিকায়াং তেজোময়ং শুক্লবর্ণং ত্রিকোণ মণ্ডলমস্তি। তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং বিন্দুমাত্রং বীজমস্তি। তৎপার্শ্বে তদ্বীজ-প্রতিপাদ্যঃ মনঃ প্রবর্ত্তক মহাশিবাভিধান * * দেব-বিশেষোঽস্তি * * * রুদ্র ইহ ভেদ করিতে পারিলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হন (৬)।

মণ্ডলোপরদেশে মহৎ-সাধনে অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি ভাবনা প্রয়োজকং মনোঽস্তি। মণ্ডল মধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপং অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তিময়ং শিবলিঙ্গং বর্ত্ততে।"

(৬) ইহার নাম লয়যোগ। যোগশাস্ত্রে জপ ও ধ্যানাপেক্ষা লয়যোগের শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন।

"জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং, ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।"

লয়যোগ অনন্ত প্রকার।

"লয়যোগশ্চিত্ত যোগাৎ সংকেতৈশ্চ প্রজায়তে।
আদিনাথেন সংকেতানন্তকোটিঃ প্রকীর্ত্তিতা।"

(দত্তাত্রেয় সংহিতা।)

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসকলেতে লয়যোগ সাধনা হইতে পারে।

যোগতারাবলীতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"সদাশিবোক্তানি সপাদ লক্ষ
লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।"

সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ জগতে বিদ্যমান আছে।

সকল প্রকার লয়যোগের মধ্যে মানব-দেহস্থিত নবচক্রে মনোলয় করিয়া কুণ্ডলিনীউত্থাপন-ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দ দায়ক। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ লয়যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয় সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয় কৃত্বা মহাত্মভিঃ।"

কলিকালে স্বল্পায়ু-শরীরী-মানবের পক্ষে ঐ প্রকার লয়যোগ সুপ্রশস্ত এবং স্বল্পদিনের চেষ্টায় সহজে সিদ্ধ হয়। ইহা পরমার্থদায়ক ও রোগের আকর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের সর্ব্বাংশে উপকারক ও হিতজনক। লয়যোগ

এই কন্দ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, সাধকের আহার ও মল অতি কম হয়। অল্পাহার জনিত দৌর্ব্বল্য বা কৃশতা হইবে না; প্রত্যুত, শরীর কান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে।

উপরোক্ত ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। যে যোগী লয়যোগ দ্বারা ঐ তিন চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন্, তিনিও মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় ত্রিপুর-বিজয়ী।

আমাদের নিত্যপূজা কিম্বা নৈমিত্তিক ও কাম্য—দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতে হইলে অর্ঘ্য স্থাপন করিবার সময় ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। পুথিতে লেখা আছে "স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা।" তদনুসারে পুরোহিত ও পূজক একটা ত্রিকোণ করিলেন; কিন্তু স্ত্রী-দেবতার পূজার্থে ত্রিকোণ মণ্ডলের কোণ নিম্নদিকে হইবে, পুং-দেবতার পূজার্থে কোণ ঊর্দ্ধদিকে হইবে; দুঃখের বিষয়, ইহা অনেকেই করেন না, বা জানেন না দেখিয়াছি। অর্ঘ্য স্থাপনের ঐ ত্রিকোণ, দেহস্থিত তিন চক্রে পূর্ব্বকথিত ত্রিকোণ ও কামকলার ত্রিকোণ—এই তিন প্রকার ত্রিকোণের একই অর্থ; কিন্তু প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকৃত যোগী ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত।

কামকলা বা ত্রিবিন্দু-ত্রিকোণ বিষয়ে যাহা যথাসম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ-রূপিণী কামকলা অথবা ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ লইয়া যোগীরা কি করেন এবং কিরূপেইবা সাধন করেন, তাহার কিছুই প্রকাশ করিবার উপায় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত বীজবপন যেমন বৃথা ও অনর্থক পণ্ড-শ্রম মাত্র; সেইরূপ উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে এবং গুরুদেবদিগের একান্ত নিষেধ আছে।

আজ কাল যোগীর অভাব নাই। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবলে যথার্থ যোগীর নিকট যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা কামকলার প্রকৃততত্ত্ব ষট্‌চক্রধ্যানাদি ও কামকলা লইয়া কিরূপে সাধন করিতে হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন। আসল কথা, কামকলা এক প্রকার লয়-যোগ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যোগ প্রধানতঃ দশ প্রকার। যোগের গুরু মহাযোগী মহেশ্বরের পঞ্চমুখ। ঐ পঞ্চমুখের নাম পঞ্চাম্নায়। কারণ, মহাদেবের মুখকে আম্নায় কহে। পঞ্চাম্নায়ের নাম—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান। এইমুখ হইতে দশ প্রকার যোগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে আম্নায় যে দিকে, এবং যে আম্নায় হইতে যে যে যোগ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি।

"মন্ত্রোপাসনা দেবি পূর্ব্বমুখে মনোদিতা।
প্রেমভক্তি দশাদিভিঃ দক্ষিণে প্রকটীকৃতং।
ধ্যান পূজা দান যজ্ঞ জপ হোমাদিকা ক্রিয়া।
ক্রিয়াযুক্তিরিয়ং দেবি পশ্চিমায় ঈরিতা।
জ্ঞানোপদেশ বিধিশ্চ কথিতশ্চ তথোত্তরে।
বিবজং সন্ন্যাসং দেবি উর্দ্ধাম্নায়ে উদীরিতং।

---

সাধনকালীন মনে অব্যক্ত অতুলনীয় পরমানন্দ উপভোগ হয়।—( ইহা পল্লীকৃত লক্ষ্য )।

সর্ব্বদাকাঙ্খিকা দেবি যোগদাক্ষা অধোমুখে।"

( ষড়াম্নায় তন্ত্র। )

তৎপুরুষ নামক পূর্ব্বাম্নায়ে—মন্ত্রযোগ হঠযোগ

অঘোর নামক দক্ষিণাম্নায়ে—ভক্তিযোগ, লয়যোগ।

সদ্যোজাত পশ্চিমাম্নায়ে—লক্ষ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ।

বামদেব উত্তর ম্নায়ে—উরযোগ (৭), জ্ঞানযোগ।

ঈশান ঊর্দ্ধাম্নায়ে—বাসনাযোগ ও পরাযোগ (৮)।

এই দশ প্রকার যোগ পঞ্চ ম্নায়ে (পঞ্চমুখে) প্রকাশ করিয়াছেন। এই দশটিই মুখ্য। ইহার শাখা-প্রশাখায় যোগ অনেক প্রকার আছে। যেমন লয়যোগ অনেক প্রকার। হঠযোগও কয়েক প্রকার আছে।

প্রাণায়াম এক প্রকার হঠযোগ। কিন্তু আমাদের দেশে যে গৈরিকধারী ব্যবসাদার যোগার ভাণ করিয়া পাত্রাপাত্র অবিচারে যে প্রাণায়াম শিক্ষা দেন, তাহা হঠযোগ নহে বা প্রকৃত প্রাণায়ামও নহে: প্রাণায়াম সকল শরীরে সহ্য হয় না। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"আসনে প্রাণসংযমে ন শক্তাঃ সুকুমারকাঃ"

এই জন্য যোগী গুরুদেবেরা বলেন যে, হঠযোগ করিবার উপযোগী শরীর বাঙ্গালার মধ্যে অতি কম। কথাটা প্রকৃত বটে। যোগী ভেকধারী ব্যবসাদার অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যোগ নামে প্রাণায়াম বা কুম্ভক করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কুম্ভক করিতে করিতে অনেকেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন।—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য।

প্রাণায়ামের প্রধান উপাদান প্রাণাপান ও ইড়া-পিঙ্গলার নাম গন্ধ না জানিয়া, সচরাচর প্রচলিত রেচক, পূরক, কুম্ভক করিলে, প্রকৃত প্রাণায়াম হয় না। প্রকৃত প্রাণায়ামের রীতি নীতি না জানিয়া, রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে বসিয়া কেবল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি প্রাণায়াম বা যোগ হইত, কিম্বা—"মনে কর মূলাধারে কুণ্ডলিনী প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে সাপের ন্যায় মাথা তুলিতেছেন, নামাইতেছেন" বলিয়া উপদেশ দিলে যদি যোগ হইত এবং শরীরের স্থান-বিশেষ টিপিয়া একটু জ্যোতি কখন কখন দেখিতে পাইলে, সেই জ্যোতিকে পরমাত্মা বলিয়া, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইল (৯) ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলে যোগশাস্ত্রের আবশ্যক হইত না এবং প্রকৃত যোগী গুরুও লোকালয়ে দুর্লভ হইতেন না।

---

(৭) উরযোগ—রাজযোগ।

(৮) পরাযোগ—সমাধিযোগ।

(৯) ২৫। ২৬ বৎসরের অধিক হইল, কলিকাতার সন্নিকট শ্রীরামপুর নিবাসী ছবি ও পট নির্ম্মাতা কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার যোগপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেন, যে, ৫৲ টাকা দিলে পরমাত্মার সাহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। জনৈক বাবু শেষে ঐ সূত্র ধরিয়া ৫৲ টাকা লইয়া পরমাত্মা দেখাইয়া দিতেন। আমি প্রথমে কর্ম্মভোগ করিয়া কর্ম্মকারের নিকট গিয়া পাঁচ টাকা দিই। তাহার ৬।৭ বৎসর পরে দূরদেশে দ্বিতীয়োক্ত বাবুকেও পঞ্চমুদ্রা

প্রাণায়াম বড় সোজা নহে; প্রকৃত প্রাণায়াম হঠযোগ। প্রাণায়াম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু, সহরবাসী বনিতা-বিলাসী গৃহস্থের মধ্যে আদৌ নাই,— একথা উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি। হঠযোগ-রূপ প্রাণায়াম কাহাকে বলে, শুনুন।

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যঃঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্য-চন্দ্রমসো র্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে॥"
(গোরক্ষনাথকৃত সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি।)

(হশ্চ ঠশ্চ—হঠ, সূর্য্য-চন্দ্রৌ তয়োর্যোগো হঠযোগঃ। এতেন হঠ শব্দ বাচ্যয়োঃ সূর্য্য-চন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগ-লক্ষণং সিদ্ধম্)।

হ—সূর্য্য, ঠ—চন্দ্র, হঠ শব্দে সূর্য্য ও চন্দ্রের একত্র সংযোগ—অর্থাৎ প্রাণ ও অপান, এই উভয় বায়ুর একত্র মিলন। হঠ-যোগ শব্দে চন্দ্র-সূর্য্যের একত্র সংযোগ করণ। প্রাণ বায়ুর নাম সূর্য্য, অপান বায়ুর নাম চন্দ্র। আর ইড়া নাড়ীর নাম চন্দ্র, পিঙ্গলার নাম সূর্য্য। "যোগ-স্বরোদয়" মতে ইড়া ও পিঙ্গলার একত্র সম্মিলনকে হঠযোগ বলে।

প্রাণায়ামের বিধি শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু ইহার করণ, কারণ অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার ও প্রাণ-অপান বায়ুর সংযোগাদি-কৌশল গুরুমুখে শিক্ষা করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এরূপ গুরু লোকালয়ে দুর্লভ।

[ক্রমশঃ—]

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়
৮৩নং হ্যারিসন রোড্
কলিকাতা।

"আক্কেল সেলামী" দিই। তাহাতেই জানি, ঐ দুই ব্যক্তি একই প্রকারে পরমাত্মা দেখাইয়া দিতেন। কর্ম্মকার অন্যান্য ব্যবসায় কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু সুচতুর বাঙ্গালী বাবুটি কর্ম্মকারের নিকট সূত্র লাভ করিয়া, শুভক্ষণে ঐ ফাঁদ ধরিয়া বহু অর্থ প্রণিধা করিয়া বেশ জাহির হইলেন। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত অনেকেই প্রথমে প্রলোভনে ভুলিয়াছিলেন; শেষে কিছুদিন ঐ অনুষ্ঠান করিয়া বৃথা কর্ম্মভোগ অনর্থক ভুগিয়া ঐ কার্য্য ও দল ছাড়িয়া দিয়াছেন। হায়রে কাল! ঘরের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিলেই যদি যোগ বা প্রাণায়াম হইত,— যদি ৫৲ টাকায় কিম্বা পাঁচ মিনিটে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইত, কিম্বা সংসার-লিপ্ত চিত্তে সহরে বাস করিয়া, ফুলইকোট আঁটিয়া, ফুল খোলসা সেজে ইলে যদি যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ ও ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলে যোগী-ঋষিগণ সংযমী হইয়া দীর্ঘকাল বনে ও নিভৃত গুহায় বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন না। প্রকৃতযোগী বা যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ নাম জাহির করিতে চাহেন না কিম্বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া রসের বাসর ঘরে আসর জমকাইয়া বসেন না। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কিম্বা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি কি অর্থ স্পর্শ করেন? না, লোকালয়ে থাকিয়া অর্থাগমের চেষ্টা করেন, না, বুড়ো বয়সে বিবাহ করেন? ইহার বিস্তারিত কথা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।